রাজনারায়ণ বসু

নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ

সম্পাদনা

বারিদবরণ ঘোষ

পরিবেশক
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

প্রকাশক
সমীররণ চৌধুরী
কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা—৭৩

মুদ্রাকর
স্বপন কুমার দে
দে'জ অফ্‌সেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা—৭৩

বর্ণ সংস্থাপন
মডেল কম্পিউটার সেন্টার
১৬৬সি, রাসবিহারী অ্যাভিন্যু
কলিকাতা—২৯

প্রথম প্রকাশ
১ বৈশাখ ১৪০২

প্রচ্ছদপট
মদন সরকার

সূচীপত্র

।। সম্পাদকীয় ।।

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বসু একটি বিশিষ্ট নাম। রামমোহন রায়ের প্রীতিভাজন আপ্ত-সহায়ক নন্দকিশোর বসুর প্রথম পুত্র রাজনারায়ণের জন্ম হয়েছিল চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে ৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ২৩ ভাদ্র, ১৭৪৮ শকাব্দ, ১২৩৩ সন)। নন্দকিশোরের চার পুত্র। অল্প বয়সেই নন্দকিশোর স্ত্রী হিসেবে যাঁকে পেলেন—তিনি দেখতে ভালো না থাকায় বিরক্ত হন। একথা জানতে পেরে নন্দকিশোরকে রামমোহন রায় একটি চিঠিতে লেখেন—"যদি এই স্ত্রীর গর্ভে তোমার উত্তম সন্তান জন্মে তাহা হইলে জানিবে এই কন্যা সর্বাঙ্গসুন্দরী।'। রামমোহন যে দূরদর্শী ছিলেন, রাজনারায়ণ তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

প্রথানুসারে হাতে-খড়ি হওয়ার পর রাজনারায়ণের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালাটিতে। বর্ধমানের এক উগ্রক্ষত্রিয় শ্রেণীর গুরুমহাশয়ের কাছে তাঁর প্রথম শিক্ষা। সেকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই 'বর্ধমেনে' পন্ডিতেরা শিক্ষা দান করতেন। পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও এমনতর একজন শিক্ষকের কথা তাঁর 'আত্মচরিত'-এ উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে কলকাতার এক পাঠশালায় ভর্তি হয়ে গেলেন তাঁর সাত বছর বয়সে। বৌবাজারের শম্ভু মাস্টারের স্কুল, হেয়ার সাহেবের স্কুল ঘুরে তিনি অবশেষে ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে। সহাধ্যায়ী হিসেবে পেলেন মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্রদের। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সিনিয়ার ছাত্র ছিলেন।

রাজনারায়ণের দুটি বিবাহ। প্রথম পত্নীর জলে ডুবে অকাল মৃত্যু হলে তিনি বিবাহ করেন নিস্তারিণী দেবীকে। এঁর রুচি ও সাহিত্য বোধ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের একটি চিঠির অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধার করি। এ থেকেই প্রমাণিত হবে দেবেন্দ্রনাথ যাঁকে 'মৈত্রেয়ী' বলে সম্বোধন করতেন, তিনি রাজনারায়ণের কতো উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন—'I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance."

ছাত্রাবস্থাতেই রাজনারায়ণের মধ্যে সাহিত্যবুদ্ধি সঞ্চারিত হতে থাকে প্রধানত হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'বিতর্কসভা'র মাধ্যমে এবং একটি হাতে লেখা পত্রিকার সম্পাদনা-রচনায়। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে জাগরণযুগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে। 'আত্মচরিত'-এর নিবিষ্ট পাঠকের কাছে সে সব সংবাদ নতুন করে দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। এ যুগের একটা বড়ো লক্ষণ ছিল দেশকে তার প্রাচীন ঐতিহ্যে নতুন করে চেনা, নতুন করে জানা। রাজনারায়ণ সাহিত্য ছাড়া ইতিহাসে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর সিংহভাগই ইতিবৃত্তমূলক। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনারায়ণ 'historian' হিসেবে আখ্যা পেয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের গভীরতায় তাঁর প্রবেশ ঘটেছিল। ফলে নতুন জীবনের পাত্রে প্রাচীন জীবনকে তিনি যাচাই করে নিতে পেরেছিলেন। এর বড়ো প্রাপ্তিটিই হলো দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর নির্মল ও অকুণ্ঠ অধিকার। অথচ

তাঁর সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিমুখতা ছিল অসম্ভব রকমের। 'সেকাল আর একালে' রাজনারায়ণ নিজেই লিখে গেছেন—'আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। যিনি আমাদের পন্ডিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আম্‌রা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। সুতরাং যখন আমরা কালেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গলা ভাষা অতি ভীষণ 'পদার্থ ছিল'।

উনিশ শতকের বাংলার অন্য একটি বিশিষ্ট যে লক্ষণ ইংরাজি-শিক্ষার্থী নব্যযুবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল—তা হলো, মদ্যপানকে তাঁরা সভ্যতার বিশেষ অঙ্গ বলে মনে করতেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর 'নিষিদ্ধ মাংস'-এর প্রতি তাঁদের একট অকারণ ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে নবজাগরণের শিক্ষার একটা ধনাত্মক দিক অবশ্যই ছিল। তা না হলে গোলদিঘির পাড়ে মদ খেয়ে যিনি একদা 'টুপভুজঙ্গ' হয়ে বাড়ি ফিরতেন, তিনিই কেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রথম 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করবেন? প্যারীচরণ সরকারের আগেই রাজনারায়ণ এ ব্যাপার পথিকৃতের ভূমিকাটি গ্রহণ করেন।

এই যে নৈতিক পরিবর্তন তা তাঁর ধর্মজীবনেও একটা অনিবার্য পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে তিনি তৎকাল প্রচারিত হিন্দুধর্মের সারাৎসার বলে বিজ্ঞাপিত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। এই যে 'ধর্মান্তর' গ্রহণ এটা কোনো স্রোতে গা-ভাসিয়ে দেওয়া ছিল না। ধর্ম এবং যুক্তিহীন ধর্মাচরণের মধ্যে যে একটা আসমান-জমিন ফারাক আছে, সেটা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে আবিলতা, সংস্কারপন্থা এবং যুক্তিহীনতা দেখা দিয়েছিল তার পরিবর্তে তাঁর শিক্ষিত মন একটা হৃদয়গ্রাহ্য একেশ্বর এবং শ্রদ্ধাশীল ধর্মকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল; সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার কোনও বিরোধ ছিল না। বিরোধ ছিল পুরোহিততন্ত্রের গড্ডালিকাপ্রবাহের সঙ্গে। তিনি বিশ্বাস করতেন—ধর্মহীন শিক্ষা কোনও শিক্ষাই হতে পারে না। আবার এও বিশ্বাস করতেন বহুদেববাদ মানুষের মধ্যে অকারণ বিচ্ছিন্নতা ও অসম্মানের কারণ। তাঁর বক্তৃতা এবং প্রার্থনাগুলিতে তাই একটা যুক্তি-আশ্রয়ী পরিচ্ছন্ন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদী মনকে প্রকাশিত হতে লক্ষ্য করি। যা তাঁর মনের বিরোধী তার সঙ্গে তিনি আপোষ করতে নারাজ ছিলেন—এমনকি জীবন সংশয় হলেও। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার তিনি যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন তার চেয়ে বহুগুণ লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন সুরাপান নিবারণ আন্দোলনে মাতালদের হাতে।

কর্মজীবনের রাজনারায়ণ তাই ব্রাহ্মসমাজকেই প্রথম কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষা সূত্রে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। তাই দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অনুবাদক হিসেবে তিনি প্রথমে যুক্ত হন (১৮৪৬ সেপ্টেম্বর)। পরে সেকাজ ছেড়ে তিনি ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন। অবশ্য এই দুই কাজের ফাঁকে তিনি কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের ইংরাজি বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদেও চাকুরিরত ছিলেন। পরে মেদিনীপুরে যোগ দিয়ে একটানা আঠারো বছর শিক্ষকতা করে রাজনারায়ণ অবসর গ্রহণ করেন। একটি অবহেলিত স্কুল (১৮৪৪-৪৮ পাঁচবছর বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ছাত্র ছিলেন) একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যার আলয়ে পরিণত হয়ে

যায়। কিন্তু শিক্ষকতাকর্মের সঙ্গে সঙ্গেই আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং দেশপ্রেমের উদ্বোধন—দুয়েরই প্রচার ও প্রসারেও তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা স্থাপন করেন, স্থাপিত হয় জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা; প্রতিষ্ঠিত হয় একাধিক ব্রাহ্মসমাজ; সংকলিত হয় 'ব্রাহ্মধর্ম' পুস্তক, প্রসারিত হয় বিধবাবিবাহ—সেই রাজনারায়ণ ছিলেন তাঁর যুগের একটি শ্রেষ্ঠ ফসল।

স্বভাবতই এমন একজন যুগপুরুষের ভাবনা-চিন্তা তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অনুস্যূত থাকে। রাজনারায়ণ শুধুমাত্র তাঁর যুগকে নিরপেক্ষতার দেখেননি, নিজে ছিলেন সেই যুগের অংশভাক্। ফলে তাঁর রচনাবলী সেই যুগচিন্তার বাহক হয়ে রয়েছে। আমরা সেকারণে রাজনারায়ণের রচনাবলীর একটা নির্বাচিত সংকলন একালের পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার উদ্যোগ নিয়েছি তাঁর মৃত্যুর (১৮৯৯) একশো বছর পার হবার আগেই। ভালো হতো যদি আমরা তাঁর সমগ্র রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করতে পারতাম। তার প্রয়োজন হয়তো আছে, কিন্তু সাধ এবং সাধ্যে কিছুটা ফারাক থেকেই যায়, বিশেষত যখন সংশয় থাকে পাঠককুল একে কতখানি আগ্রহে গ্রহণ করবেন। যদি দেখা যায়, একটা অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। তবে হয়তো পরবর্তী খন্ডে আমরা রাজনারায়ণ বাকি বাংলা রচনাসমূহ সংগ্রহ করে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। এই খন্ডে, এখনও প্রাসঙ্গিক কিছু মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় রচনা সমাহৃত হয়েছে। এগুলি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কিছু তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক কিছু টীকা-টিপ্পনী গ্রন্থ শেষে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত' নিজেই বহু তথ্যের আকর। তবুও 'গ্রাম্য-উপাখ্যান', 'আত্মীয়সভার সভ্যগণের বৃত্তান্ত' বা 'তাম্বুলোপহারের' জন্য পাঠকের চাহিদা থাকবে। আবার বলি পরবর্তী খন্ডের জন্য সেগুলি তুলে রাখা হয়েছে। তবুও যা সংকলিত হলো, এ প্রবল কাগজসংকটের দিনে, পাঠক সাগ্রহে তাকে গ্রহণ করবেন—এই ভরসা আমরা রাখি। একাজে কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশনস্-এর কর্তৃপক্ষ পূর্ববৎ আমার উপর আস্থা রেখে যথোচিত সহযোগিতা করেছেন। বন্ধুবর স্বপন বসু—এমন একটি সংকলনের কথা শুনে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রিয়ভাজন অশোক উপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে আনুকূল্য করেছেন। শ্রীসমীরণ চৌধুরির উৎসাহ ও যোগাযোগ স্মরণ করি। শ্রীমতী অশ্রু কোলে-রচিত 'রাজনারায়ণ বসু: জীবন ও সাহিত্য' বইটি আমাদের খুবই কাজে লেগেছে।

পাঠক অবশ্যই জানেন রাজনারায়ণের রচনাবলীর একটি বড়ো অংশের স্থায়ী মূল্য আছে। ইংরেজি-নবীশ রাজনারায়ণ স্বভাবতই ইংরেজিতে প্রচুর লিখেছেন। কিন্তু পাশাপাশি বাংলা লেখাতেও তিনি সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। প্রায় কুড়ি খানি বাংলা বই ছাড়া পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে—গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, এমন রচনার সংখ্যাও প্রচুর। এর সবগুলির যে স্থায়ী মূল্য আছে, এমন মনে করা উচিত হবে না। কিন্তু সমসাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েও তাঁর বহুরচনা রয়ে গেছে যেগুলির মূল্য একশো বছর পার হয়েও শেষ হয়ে যায় নি। তাঁর 'আত্মচরিত' বা 'সেকাল আর একাল' তো চিরকালীন রচনা। ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি ও সাহিত্য—সাহিত্যের এতোগুলি

শাখায় তাঁর লেখনী অনায়াসচারী ছিল। এর কারণ তাঁর রচনাভঙ্গিতে একটা 'ঋজুতা এবং সরলতা' পাঠক সহজেই লক্ষ্য করতে পারেন। সমালোচকের ভাষায় 'কথাভাষার রস সাধুভাষার কঠিনতার মধ্যে তিনি অনেকটাই সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন।' সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি সাহিত্যসৃষ্টিতে বহুজনকে অনুপ্রাণিত করে বঙ্গসাহিত্যকে তিনি গৌণ ভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। মনে আছে আমাদের মধুসূদন দত্ত তাঁকেই তাঁর বন্ধুমন্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবোদ্ধা বলে মান্য করতেন। বস্তুত মধুসূদনের সাহিত্য বিষয়ক পত্রাবলী প্রধানত রাজনারায়ণ বসুকেই লিখিত। কারণ তাঁর ভাষায় 'There is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapore pedagogue.' রাজনারায়ণ অনুমোদন করেননি বলেই মধুসূদন 'রাধা-বিরহ' রচনার পরিকল্পনা প্রথম সর্গের পরেই পরিত্যাগ করেছিলেন।

আরও একটি সমাপাতনিক ঘটনার কথা আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে। রাজনারায়ণ বসু একটি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি অসমাপ্ত থেকে যায়। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৮২ সংখ্যায় (পৃ. ২৪) এই অসমাপ্ত উপন্যাস 'অমৃতাঙ্কুর'-এর সূচনা হয়েছিল। তাঁর উপন্যাস রচনার এই প্রথম উদ্যোগের বছরেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার প্রথম উদ্যোগ ঐ পত্রিকাটিতেই সূচিত হয়েছিল।

রাজনারায়ণ-রচিত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সেকালের একটি সাড়া জাগানো পুস্তক। এর রচনার ইতিবৃত্ত পাঠক 'আত্মচরিত'-এ সবিশেষ দেখতে পাবেন। এটি কোনো হিন্দুয়ানি প্রকাশের কারণে রচিত হয়নি, রচিত হয়েছিল 'হিন্দুধর্মে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান' লক্ষ্য করে। কারণ তাঁর মতে 'ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা'। যে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান তিনি প্রার্থনা করেছিলেন তা জড়বাদ বা বিজ্ঞানবাদ দিয়ে বিশ্লেষণযোগ্য ছিল না, তা ছিল সাধন-লব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল। ঠিক একারণেই তিনি Hindu-Revival-এর প্রথম প্রবর্তকের সম্মানটুকু ঐতিহাসিকদের কাছ আদায় করে নিতে পেরেছিলেন।

রাজনারায়ণ-রচিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮) বঙ্গসাহিত্যের সাহিত্য-ইতিহাস রচনার প্রথম যুগের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই লিখিত বক্তৃতাটি প্রকাশের আগে মাত্র দু তিনখানি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসধর্মী বই লেখা হয়েছিল—রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২-৭৩), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' (১৮৬৯) এবং মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১)। স্বভাবতই প্রথম বইটি থেকে এবং রেভারেন্ড লঙ সংকলিত 'Descriptive Catalogue of Bengalee Books' থেকে রাজনারায়ণ প্রভূত সহায়তা পেয়েছিলেন—সে ঋণ তিনি স্বীকারও করেছেন। নীতিদীর্ঘ এই বইটিতে শুধু সাল তারিখ নেই (যদিও কিছু সাল তারিখে ভুল আছেই, দ্রষ্টব্য—এই গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী অংশ), আছে তাঁর ব্যক্তিগত রসাস্বাদনের ইতিবৃত্তও। ফলে এর পাঠযোগ্যতা অনেক বেড়ে গেছে।

'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' রাজনারায়ণের ইতিবৃত্ত মূলক বইগুলির অন্যতম। ১৭৯৭ শকাব্দে প্রকাশিত এই বইটির সূচনাতেই শ্রদ্ধা উচ্চারিত হয়েছে। কারণ এই গৌরবলাঞ্ছিত বিদ্যাপীঠেই তিনি একদা পড়াশুনা করেছিলেন—'অদ্য কি আনন্দের

দিন? সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী পূর্বে যাহা কলেজে দর্শন করিতাম তাহা আজি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতেছি। আজি বোধ হইতেছে যে আমরা যেন পুনরায় যৌবনান্বিত হইয়াছি।' প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র রচিত এটিই প্রথম ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার আগে হেয়ার স্কুলের পত্তন দিয়ে এর সূচনা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে এর রূপান্তর দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত অথচ বিশিষ্ট রচনাটি শেষ হয়েছে।

রাজনারায়ণের অপর একটি বিখ্যাত বক্তৃতা লিখিত আকারে প্রকাশ পায়, 'সেকাল আর একাল' নামে। এটি এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্বৎমন্ডলীতে গৃহীত হয়ে চলেছে উনিশ শতকের শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইটি লেখক যেন তাঁর মানসিক বিনোদনের জন্যে ('হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' রচনার পর) রচনা করেছিলেন। এই বক্তৃতাটি এত জনপ্রিয় হয়ে গেছিল যে রাজনারায়ণের ডাক নামই হয়ে গেছিল 'সেকাল-একাল'। সাধারণী পত্রিকা (কার্তিক ১২৮১) এর সমালোচান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল—'কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, যে, আর সে ''সেকাল'' নাই। দেশমধ্যে সাহেবিয়ানা প্রচার জন্য আর তত লাফালাফি নাই, মোহ অমাবস্যায় হিন্দু সমাজ নদে যে 'বান' ডাকিয়াছিল, এখন ক্রমে তাহার বেগের হ্রাস হইয়াছে। জলভরা বটে কিন্তু জোয়ার থমথমে। এমনকি বোধহয় পূর্ববৎ একটু ভাটার টানও হইয়া থাকিবে।....সমালোচ্য গ্রন্থ...সেই স্বভাব গতির নিদর্শন মাত্র। রাজনারায়ণবাবু যেমন ভাটা পড়িতেছে অমনি নৌকা খুলিয়া দিয়াছেন।'' ...আর একালের সেরা সমালোচক ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—'সেকাল আর একাল (১৮৭৪) বিশেষ উপাদেয় নিবন্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন সমাজে প্রাচীন-নবীনের টানাপোড়েন শুরু হইয়াছে তখনকার দিনের কিছু সুন্দর চিত্র ইহাতে ধৃত আছে। রচনাভঙ্গিও বৈশিষ্ট্যযুক্ত—সাধু ও কথ্যরীতির সুসমঞ্জস্য মিলনে ভাষা অত্যন্ত উপভোগ্য।'

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭ খ্রি.) পূর্বকাল এখানে 'সেকাল' হিসেবে চিহ্নিত এবং রাজনারায়ণের নিজের কাল 'একাল' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এই বইটিতে। বাস্তব রসসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতালব্ধ এমন দুইযুগের তৌলচিত্র (প্রাক্ ইংরেজি সভ্যতা বনাম ইংরেজি শিক্ষাসর্বস্ব সভ্যতা) বাস্তবিকই দুর্লভ।

ঠিক এমনই একটি প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই রাজনারায়ণ তাঁর স্বকাল এবং স্বজীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন 'আত্মচরিত' রচনা করে। পাঁচটি ভ্রমণ কথা সমৃদ্ধ এই আত্মচরিতে তাঁর নিজের চেয়ে তাঁর সমকাল—যা স্বদেশে ও বিদেশে বিস্তৃত—সর্বাত্মক গুরুত্ব পেয়েছে। উজ্জ্বল স্মৃতি উজ্জ্বল বাক্যাবলী এবং ততোধিক উজ্জ্বল সেকালের জীবন এখানে অতিপ্রত্যক্ষ হয়ে উঠে পাঠকের মনে একই কালে অনুরাগ এবং বিস্ময় উৎপাদন করে। রাজনারায়ণের জন্ম হয় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৮৯৯ সালে। কিন্তু আত্মচরিতে বিবৃত হয়েছে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি ঊনপঞ্চাশ বছরের জীবন-কাহিনী। মৃত্যুর দশ বছর পরে এই স্মৃতি কথা ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। এটি তাঁর স্বহস্ত লিখিত বিবরণ ছিল না। তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজেন্দ্রলাল মিত্র তা অনুলিখন করে রাখতেন—'অদ্যপ্রাতে আমি বলিয়া যায় তদনুসারে রাজেন্দ্রবাবু আমার আত্মজীবনী লেখেন'

(১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ডায়েরির অংশবিশেষ —শ্রীমতী অশ্রু কোলের বইটিতে উদ্ধৃত)। জন্ম ও বংশবৃত্তান্ত, শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা এবং কর্মজীবন—তিন ভাগে বিন্যস্ত এই স্মৃতিচারণে ব্যক্তিমানুষ এবং যুগমানুষটি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছেন। ফলে তাঁর আশ-পাশের মানুষ ও ঘটনা একটি ভিন্নতর মাত্রা পেরেছে। এখনও পাঠক তাঁর মনের ও জ্ঞানের খোরাক এ থেকে নিত্য আহরণ করে চলেছেন।

এই 'আত্মচরিত' এর পরিপূরক কিছু রচনাও রাজনারায়ণ লিখে গেছেন। 'গ্রাম্য উপাখ্যান'-এর কথা আগে বলেছি। কিন্তু নিয়মিত দিনলিপির লেখক রাজনারায়ণের দিনলিপিগুলিকে আমার মনে হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় আত্মচরিত। সেকারণে দেওঘরে রাজনারায়ণের বাসকালীন লিখিত যে ডায়েরি তিনি লিখে রাখতেন এবং যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তার অংশ বিশেষ আমরা 'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি' নামে এখানে প্রকাশ করলাম। এটি থেকেও ব্যক্তিমানুষটিকে অনুধাবন করা যায়। বন্ধুবর অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য একদা আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় (১৩৮৩) এটিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ঋণস্বীকার করে নিই এই অবকাশে।

এই সংকলনে রাজনারায়ণ রচিত কয়েকটি খুচরো রচনাকে আমরা স্থান লিখছি। এগুলিকে তাঁর বিচিত্রভাবনার প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা হিসেবে পাঠক গ্রহণ করবেন—এই ভরসা করি। 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা' রাজনারায়ণ কৃত প্রথম বাংলা সাহিত্য-সমালোচনা' (পরে 'বিবিধপ্রবন্ধ'-এর অন্তর্ভুক্ত)। এই প্রসঙ্গে পাঠক মধুসূদন দত্ত লিখিত চিঠিগুলির কথা অবশ্যই স্মরণ করে থাকেন। 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক' বক্তৃতাতেও তিনি এই কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসংগীতেরও রচয়িতা।

রাজনারায়ণের অপর এক সাহিত্যকীর্তি ছিল রামমোহন রায়ের সুসম্পাদিত 'রচনাবলী' প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ তাঁর বঙ্গভাষার রচনাবলী দিয়ে বঙ্গসাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। উল্লেখযোগ্য কথ্যরীতি, লঘুরসাত্মক অনাবিল ভঙ্গী, পরিমিত অলংকার প্রয়োগ, বিষয়ানুসারী ভাষাভঙ্গী, সাধু ও কথ্যভঙ্গীর অদ্বৈতসিদ্ধি এবং অন্তরঙ্গ রচনাবৈশিষ্ট্যে রাজনারায়ণের রচনাবলী সমুজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি রাজনারায়ণের শ্রদ্ধাবোধ ছিল অতুলনীয়। দিনলিপিতে ১লা চৈত্র ১২৯৪ তারিখে তিনি লিখেছেন—'অদ্যপ্রাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহার দীর্ঘকেশ ও দেবতার ন্যায় চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। তিনি আমার নিকট তাঁহার নিজের রচিত দুই একটি গান গাইলেন। তাহাতে একেবারে মোহিত হইলাম।' আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'শিশুকালে আমার বয়স যখন ৮ বছর তখন হইতে আমি তাঁহাকে আমাদের পড়িতে দেখিতাম। তখনই তাঁহার পক্ককেশ-গোঁফ-দাড়ি। তবু তিনি যেন শিশুভাবে আমাদের সহিত মিশিতেন। ...রাজনারায়ণবাবু তখনকার সেই প্রবল ভাঙাগড়ার যুগে সচল কার্যের মধ্যে থাকিয়াও আমার মতো বালকের সহিত মেলামেশা কর্তব্য মনে করিতেন। শিশুদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল।'

একদা রাজনারায়ণ বালক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক ছিলেন। 'প্রজাপতির নিবন্ধ' গল্পে চন্দ্রমাধব চরিত্র, 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবুর চরিত্র 'রাজর্ষি' গল্পে রাজনারায়ণের ছায়া হয়তো 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। রাজনারায়ণের বার্ষিক স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকৃত বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন— 'রাজনারায়ণবাবুর বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্যের বিষয়। ....তিনি য:ন এই সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন তখন এই সাহিত্যের শিশু অবস্থা। তখন ইহার .ধ্যে আকর্ষণেব কিছু ছিল না। তাঁহাকে যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইত—"এই ভাষার কি আছে যে তুমি এই ভাষার সেবা করিবে?" উত্তরে তিনি কিছুই দেখাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি ত এমন ভাবে দেখেন নাই। এই শিশুর সূতিকাগৃহে যখন মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়াছিল তিনি সেই ধ্বনির মধ্যে ভবিষ্যতের গৌরববাণী নিঃসন্দেহে শুনিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন—"এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার নবীন পবিত্রতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভান্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।"

রবীন্দ্রনাথের আদেশ শিরোধার্য করে আমরা তাঁর সাহিত্যকীর্তির সেই 'চিরনবীন পবিত্রতা' এবং 'মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনি' একালের পাঠকদের সমীপে সমুপস্থিত করলাম, তাঁরা গ্রহণ করলে আমরা কৃতার্থ হব।

১ বৈশাখ ১৪০২ **বারিদবরণ ঘোষ**
রোজভিলা, বর্ধমান

আত্মচরিত

TRANSIIT, NON PERIIT.

(My Grandfather, Rajnarain Bose, died September, 1899).

Not in annihilation lost, nor given
To darkness art thou fled from us and light,
O strong and sentient spirit; no mere heaven
Of ancient joys, no silence eremite
Received thee; but the omnipresent thought
Of which thou wast a part and earthly hour,
Took back its gift. Into that splendour caught
Thou hast not lost thy special brightness. Power
Remains with thee and old genial force
Unseen for blinding light; not darkly lurks:
As when a sacred river in its course
Dives into ocean, there its strength abides
Not less because with vastness wed and works
Unnoticed in the grandeur of the tides.

AUROBINDO GHOSE

LEAN HARD.

Child of my Love—lean hard—
And let me feel the pressure of thy care.
I know thy burden, child—I shaped it—
Poised it in mine own hand—made no proportion
Of its weight to thine unaided strength;
For even as I laid it on, I said—
"I shall be near and while she leans on me,
"This burden shall be mine, not hers;
"So shall I keep my child within the circling arms
"Of mine own love." Here lay it down, nor fear
To impose it on a shoulder which upholds
The government of worlds. Yet closer come—
Thou art not near enough—I would embrace thy care,
So I might feel my reposing on my breast,
Thou lovest me? I know it—doubt not, then,
But loving me—lean hard.

LINES WRITTEN ON READING "LEAN HARD"

Father I *must* Lean Hard,
And lay on Thee the burden of this pain;
This murmuring impatience too—thou know'st
Is harder still to bear: my fainting heart
Must find its shelter neath the circling arms
Of Thine own deep love Firm, clasp it there!
Take *all* my burden—thou said'st it *shall* be Thine;
Leaning on *Thee* I know I shall be strong.
Father! dear Father! I would be closer yet—
But Thou must draw me, else I cannot come.
Thine *arm* is not enough—where else can I repose
But on Thy loving breast? Soft pillowed there
For ever let me lie! Weary and weak,
My feet had stumbled on this rugged way,
Had'st Thou not held my hand; and now I'm come
Close to the narrow stream—E'en should its waters
Roar and waves swell high—Thine everlasting arms
Shall bear me safely through—its floods can ne'er
O'erwhelm. Father! Thou lov'st Thy child—
I do not doubt—but *will* "Lean Hard".

আমার প্রকৃত ধর্মজীবন ইং ১৮৬০ সাল হইতে মদ্যপান পরিত্যাগের সহিত আরম্ভ হয়। পূর্বে কেবল কবিত্বশক্তি সহকারে বক্তৃতা লিখিতাম। ত্যাগস্বীকার না করিলে প্রকৃত ধর্মজীবন আরম্ভ হয় না। আমার সাধনের বৃত্তান্ত গ্রন্থশেষে প্রদত্ত হইবে*। উহা কিয়ৎ পরিমাণে দ্বিতীয় সংখ্যা তাম্বুলোপহারে সূচিত হইয়াছে।

আমার জীবনে সম্পাদিত কাজের ফর্দ।

(১) ব্রাহ্মসমাজে প্রেমের ভাব প্রবেশ করানো ও ব্রাহ্মধর্মের সপ্তলক্ষণ- নির্দেশক বক্তৃতা।

(২) ধর্মবিজ্ঞানের সৃষ্টি—ধর্মতত্ত্বদীপিকা।

(৩) "Grandfather of Nationality"—একজন আমাকে বলিয়াছিলেন। Hindu Revival "হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ" হইতে।

(৪) সমাজ-সংস্কার—বিধবাবিবাহ নিজ পরিবারে প্রবর্তন।

(৫) আমা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্রের দ্বারা হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন।

(৬) College Reunion.

(৭) বিদ্বজ্জনসমাগম।

*এই বৃত্তান্ত রাজনারায়ণের হস্তলিপিতে পাওয়া যায় নি। বোধ হয় তিনি লিখে যেতে পারেন নি।

আত্মচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বংশবৃত্তান্ত

১৭৭৮ শকের ২৩শে ভাদ্র দিবসে (ইং ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬) বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণা জেলার মাগুরা পরগণায় বোড়াল গ্রামে আমার জন্ম হয়।* চাপড়া ষষ্ঠীর দিন জন্ম হয়। আমার স্মরণ হয়, যে পর্যন্ত না ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করি, প্রতি জন্মতিথি দিবসে মাতাঠাকুরাণী আমাকে পীতবস্ত্র পরাইতেন ও আমা দ্বারা একটি মাছ পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়াইতেন। আমার পূর্বপুরুষদিগের নিবাস গড় গোবিন্দপুর ছিল। ইংরাজেরা যখন ঐ স্থানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করেন, তখন তাহার** এওজি জমি কলিকাতার বাহির সিমলা পল্লীতে আমার পিতৃপুরুষদিগকে দেন। বাহির সিমলার প্রাণকৃষ্ণ বসু আমার পূর্বপুরুষদিগের জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁহার বংশোদ্ভব যদুনাথ বসু এক্ষণে (১২৯৬) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম করিতেছেন।

বাহির সিমলা পল্লীস্থিত মতি শীলের পুষ্করিণীর নিকট প্রাণকৃষ্ণ বসুর বাটী হইতে আমার প্রপিতামহ শুকদেব বসু কোন কারণ বশতঃ বোড়ালগ্রামে বসতি করিতে বাধ্য হয়েন। ইতি পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়া বৈদ্যনাথ (যেখানে আমি এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছি) হত্যা দিবার জন্য স্বগ্রাম হইতে যাত্রা করেন। রাস্তায় স্বপ্ন হয়। তাহাতে যে স্বপ্নাদ্য ঔষধ লাভ করেন, তাহা লইবার জন্য আমাদিগের বোড়ালের বাটীতে ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা নানা স্থান হইতে আসিত। আমার পিতামহ, তৎপরে আমার খুড়া মহাশয়, ঐ ঔষধ বিতরণ করিতেন। অনেকে উক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। ইংরাজি ১৮৬৮ সালে যখন বোড়ালের বাটী একেবারে আমরা পরিত্যাগ করিয়া আসি, তখন সেই ঔষধ গ্রামের নবীন পণ্ডিত মহাশয়কে প্রস্তুত ও বিতরণ করিবার ভার দিয়া আসি। এক্ষণে অতি অল্প লোক ঐ ঔষধের জন্য আইসে।

শুকদেব বসুর দুই পুত্র, রামপ্রসাদ বসু ও রামসুন্দর বসু। রামপ্রসাদ বসু

* এই আত্ম-চরিতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা হয়। যে স্থলে ঐ স্থান ও লিখিবার সময় উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইয়াছে, তাহা পেরেন্থিসিসের ভিতর উল্লিখিত হইয়াছে।

** [অর্থাৎ বিনিময় স্বরূপ]

চাকরী করিতেন তাঁহার অনুজ রামসুন্দর বসু বাটীতে বসিয়া গৃহকার্য দেখিতেন। সেকালে এইরূপ রীতি ছিল, একভাই চাকরী করিতেন, আর একভাই বাটীতে থাকিয়া গৃহকার্য ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। রামপ্রসাদ বসু ঢাকার কষ্টমের দেওয়ান ছিলেন। তখন ঢাকাই কাপড়ের ব্যবসার বিনাশ করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ কাপড়ের উপর ভয়ানক জেয়াদা মাসুল বসাইয়াছিলেন। আমাকে কোন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, এই নিদারুণ প্রণালী দ্বারা ঢাকার কাপড়ের ব্যবসায়ের গলায় দড়ি দিয়া উহাকে হত্যা করা হয়। রামপ্রসাদ বসু বড় উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাহা উপার্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও অন্যান্য বস্তু দান করিতেন। সুবর্ণ দানে অনেক ফল বলিয়া তাহা দান করিতেন। সেকালে অতিথিসেবা একটি পরমধর্ম বলিয়া গণিত হইত। এদিকে খড়ো বাড়ি (সেকালে কোঠা বাড়ি করিবার রীতি এত প্রচলিত হয় নাই) এবং পিতামহীঠাকুরাণীদিগের হাতে রূপার পৈঁচে, তথাপি বাটীতে প্রত্যহ দুই বেলা একশত পাত পড়িত। পিতামহীঠাকুরাণীরা স্বহস্তে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন, এবং কেবল বাটীর কর্তা ঘি ঢালিয়া দিতেন। কোন কারণবশতঃ আমার বড় ঠাকুরদাদা ঢাকার কর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যখন কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে বসিয়াছিলেন, তখন উপরি-উল্লিখিত স্বপ্নাদ্য ঔষধ একমাত্র জীবনোপায় ছিল। একদিন গ্রামের একটি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, কল্য আমার খাওয়া হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার নিকট একটি মাত্র টাকা ছিল। তিনি আপনার কি হবে, না ভাবিয়া ঐ টাকাটি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইতে অসম্মত হন। অনেক জেদাজেদির পর তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। ব্রাহ্মণ যাইবার সময় বড় ঠাকুরদাদা মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে আমি এই টাকাটি দিলাম, বড় গিন্নী (তাঁহার বড় স্ত্রী) যেন টের না পায়, তাহা হইলে আমাকে গালি দিয়া ভূতছাড়া করিবে ; যেহেতু এই টাকাটি আমার অদ্যকার একমাত্র অবলম্বন।" ঈশ্বরের কি কারখানা! ক্ষণেক পরে কলিকাতার এক বাবুর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে ষোল টাকা আইসে।

সেকালে মুসলমান রীতি নীতি অনুসরণ করিতে আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা ভালবাসিতেন। বড় ঠাকুরদাদা ঢিলে পাজামা পরিয়া বাটীতে বসিয়া থাকিতেন এবং দলাদলি করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিয়াছিল, "ঢিলে পাজামা পরিয়া দলাদলি করিলে কেহ আপনার কথা শুনিবে না, ঢিলে পাজামা পরিত্যাগ করুন।"

আমার পিতামহ রামসুন্দর বসুও বড উদারচিত্ত লোক ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি ছাতি ঘাড়ে করিয়া গ্রামের প্রত্যেক লোকের বাটীতে যাইতেন এবং প্রত্যেক লোকের সেই দিনের জন্য আহার্য দ্রব্য আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিতেন। যাহার না থাকিত, তাহাকে তাহা নিজ বাটী হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদেশে চাকরী করে,

এমন লোকের পুষ্করিণী খনন অথবা বাটী নির্ম্মাণের ভার লইয়া দুই প্রহর রৌদ্রে বুকে মধ্যমনারায়ণ তৈল মাখিয়া ছাতা লইয়া ঐ কার্য তদারক করিতেন। বায়ুরোগ ছিল মধ্যমনারায়ণ তৈল ব্যবহার করিতেন। এই বায়ুরোগের জন্য তাঁহার ধাত এমনি গরম ছিল যে, শীতকালে একটি ফিনফিনে উড়ানি গায়ে দিয়া কাটাইতেন। গরম কাপড় সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি পাগল পুষিতে বড় ভালবাসিতেন। একদিন গ্রামের প্রান্তে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে একটি পাগলের সহিত তাঁহার মোলাকাৎ হয়; তাহাকে বাড়ি আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার তোয়াজের সীমা কি? সেই পাগলের একটি ধুতি পরা ও মাথায় একটি লাল টুপি ছিল, সেই লাল টুপিতে কতকগুলি ঘুঙ্ঘুর বাঁধা ছিল। সে সর্বদা বলিত, "আমার নাম পূর্বে অমুক মুখুর্যে ছিল, এক্ষণে আমার নাম Don Antonio Pedro, আমি লিসবোয়া (Lisbon) গিয়াছিলাম।" তখন পর্তুগীজ জাহাজ বাণিজ্যার্থে বঙ্গদেশে আসিত, বোধ হয় এই ব্যক্তি তাহাতে চড়িয়া বিলাত যাইয়া থাকিবে। ঠাকুরদাদা, বাটীতে যে সকল রোগী স্বপ্নাদ্য ঔষধ লইতে আসিত, তাহাদিগের বিষ্ঠা-মূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। রোগীদিগের সঙ্গীদিগকে তাহাদিগের সেবা করিতে দিতেন না, নিজে স্বহস্তে তাহাদিগের সেবা করিতে ভালবাসিতেন। ইহা তিনি পুণ্যকার্য জ্ঞান করিতেন। এক্ষণকার সভ্যাভিমানী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন না। কোন কোন ইংরাজকে আপনাদিগের অতি প্রিয় বন্ধুর এইরূপ শুশ্রূষা করিতে দেখা যায়। ইহাকে তাঁহারা nursing বলেন। পুরুষ অপেক্ষা বিবিরা এই কার্য অধিক করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদিগের বর্তমান বাঙ্গালী বাবুরা, যাঁহারা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতে ভালবাসেন তাঁহারা এই কার্যকে ঘৃণা করেন। আমরা ইংরাজদিগের দোষগুলি অনুকরণ করিতে পটু, সদ্‌গুণ অনুকরণ করিতে পটু নহি। রামসুন্দর বসু দীন-দরিদ্রের যেরূপ সেবাশুশ্রূষা করিতেন বর্তমান বাবুরা ততদূর না করুন, খুব নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের ঐরূপ শুশ্রূষা করিতে ঘৃণা না করিলে বাঁচি।

রামসুন্দর বসুর তিন পুত্র। তাঁহার বড় স্ত্রী দ্বারা এক পুত্রলাভ করেন। তাঁহার নাম মধুসূদন বসু। তাঁহার ছোট স্ত্রী দ্বারা দুই পুত্র হয়। তাঁহাদিগের নাম নন্দকিশোর বসু ও হরিহর বসু। নন্দকিশোর বসুর জন্ম ১৮০২ সালে এবং হরিহর বসুর জন্ম ১৮০৪ সালে হয়। নন্দকিশোর বসু আমার পিতা। ইঁহার বিবরণ দিবার পূর্বে আমার খুড়ো মহাশয় হরিহর বসুর বিবরণ দিতে উপযুক্ত বোধ করি। ইনি ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমে বায়ুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, সেই অবধি তিনি কলিকাতায় আর আসেন নাই। বোড়াল কলিকাতা হইতে ছয় ক্রোশ দূর মাত্র, তথাপি আসেন নাই। কলিকাতার বাহ্য আকারের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বচক্ষে আদবে দেখেন নাই। ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। পালকি চড়া তিনি বিপদ জ্ঞান করিতেন। তাহাতে তাঁহার বড় অসুখ হইত। স্নায়ুর দুর্বলতা জন্য অসুখ হইত।

ইনি আমাদিগের বৈদ্যশাস্ত্র বেশ জানিতেন। গ্রামে চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু কাহারো নিকট কিছু লইতেন না। কখন পীড়িত ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে, তাহা নাড়ী দেখিয়া ঠিক বলিয়া দিতে পারিতেন; এই জন্য গ্রামে তাঁহার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা ছিল। অতি বিজ্ঞ লোক বলিয়া গ্রামে তাঁহার খ্যাতি ছিল। শাস্ত্রের অনেক শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি গ্রামের একজন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। আমাদিগের বাটীতে দুই বেলা গ্রামের লোকের বিলক্ষণ জনতা হইত। অনেক তামাক পুড়িত। গ্রামের লোক তখন দুই দলে বিভক্ত ছিল। একটি দলের নাম বাজারিয়া দল, আর একটি দল ব্রহ্মজ্ঞানীর দল। আমার খুড়া মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞানীর দলের কর্তা ছিলেন। আমার খুড়া মহাশয় নবযৌবনকালে রামমোহন রায়ের একজন অনুবর্তী ছিলেন, এই জন্য তাঁহার দল ব্রহ্মজ্ঞানীর দল এই নাম লাভ করিয়াছিল। তাঁহার নবযৌবনকালে তিনি একদিন বাটীর সম্মুখস্থিত ধোবা পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া রামমোহন রায়ের গ্রন্থপাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে গ্রামের রামধন তর্কবাগীশ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। খুড়া মহাশয় কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়া তাহা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ধোবা পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। খুড়া মহাশয় দলাদলি করিতেন বটে, কিন্তু আপনার অনুচরদিগকে লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। বাজারিয়া দলের লোকেরা গ্রামের ঠনঠনিয়া বাজারে বসিয়া কেবল গাঁজা খাইত ও বাজারের লোকদিগের নিকট বলপূর্বক তোলা তুলিত। খুড়া মহাশয় একবার তাহাদিগের অত্যাচারের বিষয়ে শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের প্রকাশিত "সমাচার দর্পণ" নামক সংবাদপত্রে এক পত্র ছাপাইয়া দেন। তাহাতে দারোগা আসিয়া ঠনঠনিয়া বাজারে বসিয়া উক্ত বিষয়ে সুরতহাল করে। আমার পিতাঠাকুর কলিকাতায় চাকরী করিতেন, আর খুড়া মহাশয় বাটী থাকিয়া গৃহকার্য দেখিতেন। খুড়া মহাশয় আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাটীতে রোপিত বোম্বাই আমের গাছে প্রথম যখন ফল ফলিল, তখন আমাকে খাইতে দিয়া বলিলেন যে, অদ্য আমার গাছ পোঁতা সার্থক হইল। বিধবাবিবাহ প্রথা আমার পরিবার মধ্যে প্রবর্তিত করাতে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকিলেও আমার প্রতি এইরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আমার পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতাঠাকুর ইংরাজি ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু ঐ ভাষাতে বিশুদ্ধরূপে পত্রাদি ও বিষয়কর্মের কাগজপত্র লিখিতে পারিতেন। আমি যখন কলেজ ছাড়িয়া বেঙ্গল সেক্রেটারি হালিডে সাহেবের (ইতি পরে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর হয়েন) নিকটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী জন্য প্রার্থী হই, তখন পিতাঠাকুরের পরিচয় দেওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, "That Nanda Kishore who used to write English so well?"

রামমোহন রায়ের স্কুল হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল। পরে ইহা

পূর্ণ মিত্রের স্কুল এই নাম লাভ করে। পিতাঠাকুর স্কুল ছাড়িয়া দিনকতক রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কার্য করেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন। আমাদিগের গ্রামের নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের মদনমোহন মজুমদারও (সব বাড়ির লোকে ইঁহাকে মদনকাকা বলিয়া ডাকিত) তাঁহার একজন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন। ইনি যখন কলিকাতায় বাবার নিকট অথবা আমাদিগের বোড়ালের বাড়িতে আসিতেন, তখন আমাদিগের মহা আনন্দের উদয় হইত। ইঁহার কেশ তখন শুভ্র হইয়াছিল। আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতাঠাকুরাণীর সহিত আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় একটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা বিবেচনা করা কর্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে।

পিতাঠাকুর প্রথমে দিনকতক হরকরা অফিসে কেরানীগিরি করিয়াছিলেন। সেকালে হরকরা বলিয়া এক সংবাদপত্র ছিল। তাহা এক্ষণে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' সংবাদপত্রের সহিত একীভূত হইয়াছে। এই হরকরা সম্বন্ধে নন্দগোপাল নামক এক ইংরাজী কবি (ইংরাজী ভাল জানিতেন না, তথাপি ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে ছাড়িতেন না) তাঁহার প্রণীত 'গোল্ডেন মুন' নামক কাব্যে লিখিয়াছেন 'হরকরা স্বামী ইংরাজ স্ত্রী'। হরকরা কাগজের তেজস্বী লেখার জন্য তাঁহাকে 'স্বামী' বলিয়াছিলেন। তখন হরকরার মালিক স্যামুয়েল স্মিথ সাহেব ছিলেন। স্মিথ সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে বড় ভালবাসিতেন। পিতাঠাকুর হরকরা অফিস ছাড়িয়া অন্য দুই এক জায়গায় কেরানীগিরি করিয়া একুশ বৎসর বয়সে গাজিপুর 'অহিফেন এজেন্সি অফিস'-এ নিযুক্ত হয়েন। জন ট্রটেন সাহেব তখন অহিফেন এজেন্ট ছিলেন। পিতাঠাকুরের একবার জ্বর হওয়াতে সেখানকার ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে এমনি এক জোলাপ দেন যে, সেই জোলাপে তাঁহার অসংখ্য দাস্ত হয়। সেই অবধি তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তীব্র জোলাপ দেওয়া, ফস্ত খোলা ও জোঁক লাগান রীতি প্রচলিত ছিল। তৎপরে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন কোন আফিসে কর্ম করিয়া ট্রেজারীতে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে দেবোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত জন্য স্থাপিত 'স্পেশাল কমিশন অফিস'-এর হেড কেরানী পদে নিযুক্ত হয়েন। এই কর্ম করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজী ১৮৪৫ সালে ৭ই ডিসেম্বর ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতাঠাকুর অতিশয় খাঁটি লোক ছিলেন। তিনি যদি মনে করিতেন, তাহা হইলে 'স্পেশাল কমিশন অফিস'-এ যখন নিযুক্ত ছিলেন, তখন অন্যায়রূপে অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য অনেক লোক তাঁহাকে ধরিত, তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকোচ লইলে অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন, কিন্তু পয়সা লইতেন না। যেরূপ

আয় ছিল সেইরূপ ব্যয় করিতেন, তাঁহাকে বড়মানুষী করিতে কেহ দেখে নাই। তাঁহার মৃত্যুসময়ে আমি কোন সঞ্চিত অর্থ তাঁহার উত্তরাধিকারী স্বরূপে পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার কৃত কতকগুলি ঋণ পরিশোধ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি শেষ স্পেশাল কমিশনার মূর সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি যেখানে কর্ম করিয়াছিলেন, সকল স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক বড়মানুষের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, সকলেই তাঁহাকে তাঁহার সৎপ্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাবের জন্য অতি সম্মান করিত ও ভালবাসিত। ইনি বেদান্তধর্মে বিশ্বাস করিতেন। যখন ইঁহার মৃত্যু হয়, তখন শঙ্করভাষ্য আনাইয়া পড়িতে বলেন এবং ওঁকার জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁহার বুড়া আঙুল অন্য আঙুলের উপর রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের সকল শিষ্যেরা বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মে বিশ্বাস করিতেন। পিতাঠাকুর বেদান্ত প্রতিপাদ্য নিরাকারবাদে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু তাঁহার এই মত ছিল যে, ভিতরে যাহা মত থাকুক না কেন, "তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ" মনেতেও লৌকিকাচার উল্লঙ্ঘন করিবে না। তিনি কোষাকুষি লইয়া রোজ পূজা আহ্নিক করিতেন, আর একটি প্রেকের উপর তুলসীর মালা ঝুলানো থাকিত। রামমোহন রায়ের অনুবর্তী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির বাটীতে যাইলে তাহা পরিয়া যাইতেন। বর্তমান ব্রাহ্মেরা এ প্রকার আচরণ কপটতাচরণ জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য যে সকল ধর্ম একেবারে উন্নতি লাভ করে না। ক্রমে উন্নতি লাভ করে। অতএব সেই ধর্মের প্রথম অনুন্নত অনুবর্তীদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত হয় না। এক্ষণকার স্কুলের বালকেরা নিউটন অপেক্ষা গণিত জানে, তাহা বলিয়া কি তাহারা নিউটনের ন্যায় সম্মানার্হ? বিশেষতঃ প্রাথমিক ব্রাহ্মেরা লৌকিকাচার পালন করা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অতএব তাহা পালন কপটাচার বলিয়া কিরূপে গণ্য হইতে পারে? যদি এ প্রকার লৌকিক আচার পালন ভয়ানক দোষ বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলে মহাত্মা সক্রেটিসকে ঐ দোষে দূষিত বলিতে হইবে। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন : "ক্রিটো আই ও এ কক্ টু ইস্কিউলা-পিউস"। সক্রেটিস লৌকিকাচার পালন ধর্মের অঙ্গ মনে করিতেন। ১৮৪৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু হয়। অনেকদিন হইল পিতাঠাকুরের পরলোক হইয়াছে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, যেন এখনও তিনি জীবিত আছেন। এখনও যেন তিনি সেই ডিগ্‌ডিগে কিন্তু যেন মোম দিয়া গড়া গৌরবর্ণ শরীর লইয়া দাঁড়া ডেস্কের নিকট দাঁড়াইয়া লিখিতেছেন। তিনি কখন বসিয়া লিখিতেন না।

আমার বাল্যকালে আমার স্মরণ হয় যে, আমি শিব পূজা করিতে ভালবাসিতাম। খেলার মধ্যে তাহা প্রধান খেলা ছিল। শিব গড়িয়া পূজা করিতাম ও তাহার সম্মুখে কুমড়া ইত্যাদি বলি দিতাম। শিবকে বলি দেওয়া শাস্ত্রসম্মত নহে, মুরুব্বিরা বলিলেও তাহা শুনিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা

আমার শিক্ষা ''মা নিষাদ'' এবং চাণক্য-শ্লোক এবং

গাড—ঈশ্বর
লাড—ঈশ্বর
আই—আমি
ইউ—তুমি
কম—আইস
গো—যাও

এই সকল মুখস্থ করানো দ্বারা আরম্ভ হয়। পবিত্র বাল্মীকির পবিত্র রসনা হইতে যে অনুষ্টুপ ছন্দের প্রথম শ্লোক আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাকে আশ্চর্যরূপে আপ্লুত করিয়াছিল, তাহা সেকালে ছেলেকে মুখস্থ করাইয়া তাহার শিক্ষা আরম্ভ করান হইত। আমার স্মরণ হয় আমার জেঠা মহাশয় মধুসূদন বসু, যাঁহার নাম পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি আমাকে তাঁহার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমাকে ''গাড ঈশ্বর, লাড ঈশ্বর'' মুখস্থ করাইতেন। দুর্গানারায়ণ বসু মধুসূদন বসুর পুত্র। ইনি এক্ষণে (১২৯৬) মেদিনীপুরে কাজ করিতেছেন। ইনি অতি সুরসিক ব্যক্তি। মেদিনীপুরে গিয়াছেন, অথচ দুর্গানারায়ণকে জানেন না, এমন লোক নাই। আমি যে গুরু মহাশয়ের কাছে পড়িতাম, তিনি বর্ধমানের একজন উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি উগ্রস্বভাব ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে ভয়ানক পদার্থ বলিয়া দেখিতাম। তিনি যদি ''রাজনারায়ণ'' বলিয়া আমাকে ডাকিতেন, তখনই আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাইত। সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে পিতাঠাকুর আমাকে শিক্ষার্থ কলিকাতায় আনেন। আনিয়া প্রথমে এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় আমাকে ভর্তি করিয়া দেন। কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখিবার জন্য শম্ভু মাস্টারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এই স্কুল বৌবাজারের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। শম্ভু মাস্টার অতি অল্পই ইংরাজী জানিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ও তাঁহার নাসিকার উপর চন্দনের এক দীর্ঘ তিলক ধারণ করিতেন। তিনি অপরাহ্নে স্কুলে আসিয়া পড়াইতেন। পূর্বাহ্নে গ্রিফ সাহেব আসিয়া পড়াইতেন। গ্রিফ সাহেব শম্ভু মাস্টারের অপেক্ষাও ইংরাজি অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? একটি লাল মুখ থাকিলে যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে, এমন আর কিছুতেই নহে। ভুল করিলে ইঁহারা ফ্রেল্ দ্বারা ছাত্রের হাতে মারিতেন। অনেক দিন অবধি ফ্রেল্ শব্দের ব্যুৎপত্তি কি জানিতে পারি নাই; পরে একদিন লাটিন ভাষায় অভিধান দেখিতে

দেখিতে 'ফেরুলা' শব্দ পাইলাম। উহা একটি কাঠের চাক্‌তি, মস্ত বাঁটওয়ালা। উহা রোমানদিগের দ্বারা ও সেকালের ইংরাজদিগের দ্বারা ছাত্রকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

শম্ভু মাস্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হই। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম 'স্কুল সোসাইটিজ স্কুল' ছিল। স্কুল সোসাইটি দ্বারা সেকালে অনেক উপকার হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রকাশিত রীডারগুলি অতি উত্তম পুস্তক ছিল। স্কুলের প্রকৃত নাম 'স্কুল সোসাইটিজ স্কুল' হইলেও হেয়ার সাহেব উহার কর্তা ছিলেন। সাধারণ লোক হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়া ডাকিত। হেয়ার সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত সাধারণে অবগত আছেন। যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত 'লাইফ অফ ডাঃ হেয়ার' পড়িতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গালীরা ময়লা জাতি জানিয়া, যাহাতে বাঙ্গালী বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে যত্নবান হয়, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটি হইবার সময়ে স্কুলের ফটকে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক বালকের গা তোয়ালিয়া দ্বারা কষে ক্ষণেক রগড়াইতেন। যদি ময়লা বাহিত হইত তাহা হইলে তাহাকে দুই-এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি বালকদিগকে গা পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান দিতেন। প্রতি শনিবার তাঁহাকে হাতের লেখা দেখাইতে হইত; তিনি লিখিবার বিষয়ে যে সকল উপদেশ দিতেন, সেইরূপ না লিখিলে দুই এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি একটি অক্ষর বড় ও একটি অক্ষর ছোট হইলে বড় রাগ করিতেন। আমার ভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহার নিকট হইতে বেত খাই নাই। কিন্তু আমি তাঁহার বেত্রচালনৈষণা নিবারণ করিবার জন্য বেত খাইয়া একটি ছাত্রের আত্মহত্যার গল্প আমার তখনকার ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার এই গল্প হইতে তিনি উপদেশ লাভ করিবেন, কিন্তু করিলেন না। যখন আমি এই কার্য করি তখন আমার বয়স এগারো কি বারো। এই কার্য জন্য আমি নিজে বেত খাই নাই, এক্ষণে আমার পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি। আমার চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি। হেয়ার সাহেব আমাদিগের বক্তৃতাশক্তি ও রচনাশক্তি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে 'বিজ্ঞান সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কি না' এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। যদ্যপি আমার গণিত ভাল লাগিত না, তথাপি আমার প্রবন্ধে যেরূপ রচনা শক্তি ও নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে হেয়ার সাহেব আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি পিতার ন্যায় স্নেহপূর্বক আমাকে বলিতেন যে, "কত শীঘ্র তুমি বাড়িতেছ।" একবার জ্বর হওয়াতে আমি তাঁহাকে সংবাদ না দেওয়াতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সংবাদ দিলে তিনি অবশ্য আমাকে

ডাক্তার ও ঔষধ সঙ্গে লইয়া দেখিতে যাইতেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি পড়ি তখন আমাদিগের তিনজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একজনের নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধামাধব দে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। ইনি পরে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়াছিলেন। উমাচরণ মিত্র জনাই নিবাসী ছিলেন। রাধামাধবের বাটী কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিল। উমাচরণ হেড মাস্টার ছিলেন। দুর্গাচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন। দোষের মধ্যে এই যে তিনি আমাদিগের নিকট সংশয়বাদ প্রচার করিতেন। পরকাল নাই এবং মনুষ্য ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায়, এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে, যদি উমাচরণ আসিতেন, তাহা হইলে বলিতেন, 'আর একটু বসি আমরা, উমাচরণ আসিতেছেন'। উমাচরণ আস্তিক ছিলেন, তিনি সংশয়বাদ ভালবাসিতেন না। উমাচরণ স্কটের 'আইভানহো', পোপের 'পোয়েমজ', প্রিয়রের 'হেনরি টু এমা' এবং অন্যান্য গদ্য পদ্য কাব্য আমাদিগের নিকট উত্তমরূপে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের মনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেরূপে ঐ সকল কাব্য পড়িতেন তাহা কখন ভুলিবার নহে। যে সকল গদ্য পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের নিকট পড়িতেন, তাহা ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া। একালের কোন শিক্ষক কি এরূপ করিয়া থাকেন? আর করিবারও জো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী দ্বারা হস্তপদ বাঁধা।

রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এই রোগকে গণিতাতঙ্ক রোগ বলা যাইতে পারে। উহা জলাতঙ্ক রোগের ন্যায়। গণিতের মধ্যে বীজগণিতের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট দিয়াছি। এই রাধামাধববাবুর সহিত পরে আমার মেদিনীপুরে দেখা হয়। তখন আমি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডমাস্টার। তিনি ওভারসিয়ার পি, ডবল্যু, ডি পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন।

হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে আমি হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদপত্রে সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তুর মোতাবেক থাকিত। এই কাগজ চালানোতে আমার সমাধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করিত। ঐ সংবাদপত্রের নাম ক্লাব ম্যাগাজীন ছিল। উহার নাম আমাদিগের ক্লাবের নামে রাখিয়াছিলাম। নামটি পুরাতন ইংরাজী অক্ষরে কাগজের শিরোদেশে জাজ্জ্বল্যমান

রূপে লেখা হইত। এই কাগজ দেখিয়া দুর্গাচরণ বলিয়াছিলেন যে, উহা যেন নেপোলিয়ানের বাল্যকালের তুষারদুর্গ নির্মাণের ন্যায়। কিন্তু আমি যেরূপ বড় লোক হইব, তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুতেই হইতে পারি নাই। আমার স্মরণ হয়, হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে আমি ইংরাজীতে একটি শ্লেষাত্মক কবিতা রচনা করিয়া তাহাতে আমার প্রধান প্রধান সঙ্গীদিগকে বিশেষতঃ একজন সুবর্ণবণিকজাতীয় সঙ্গীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলাম। তাহাতে সুবর্ণবণিকেরা শব্দ দ্বারা টাকা কিরূপে পরীক্ষা করিয়া লয়, তাহার উল্লেখ ছিল। এই কবিতা রচনা জন্য আমার অনুতাপ হইতেছে।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে থাকিয়া ক্লাসের পড়া ছাড়া আমার প্রথম অতিরিক্ত পাঠের বিষয় 'রবিন্‌সন ক্রুশো'। ঐ পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনাসকল এমনি মনে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, সেগুলি আমার সম্মুখে যেন ঘটিতেছে দেখিতাম। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতের একটি ছাত্র হোমারের ইলিয়ড পড়িবার সময়ে ঐ সকল কাব্যে বর্ণিত ঘটনাসকল যথার্থই সম্মুখে ঘটিতে দেখিত। আমার ততদূর না হউক অনেকটা সেইরূপ বটে। ধর্ম বিষয়ে আমার মনকে যে পুস্তক প্রথম খুলিয়া দেয়, তাহার নাম শেভালীয়র র‍্যামজের 'ট্র্যাভলজ অফ সাইরাস'। উহা ফরাসিস্ ভাষা হইতে অতি সহজ ইংরাজীতে অনূদিত। বইটি কিন্তু মস্ত। যেখানে মিসর দেশের পুরোহিতেরা সাইরস রাজাকে বুঝাইতেছে যে, মিসরিক পুরাণ কেবল রূপকমাত্র, সেই স্থান পড়িয়া আমার প্রতীতি হইল যে হিন্দুধর্মও ঐরূপ। মন এইরূপে খুলিয়া গেলে আমি পুত্তলিকা পূজা হইতে বিরত হই। সরস্বতী পূজা সম্মুখে উপস্থিত, তাহা করিলাম না। ইহাতে আমার মনে হয়, আমার পিতা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহার মত ছিল, ''তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ''; কিন্তু সেই অবধি পৌত্তলিকাচার না করিলে আমাকে আর কিছু বলিতেন না।

ইং ১৮৪০ সালে আমি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে ভর্তি হই। তখন মধ্যে মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে বালকগণ হিন্দু কলেজে ফ্রি ভর্তি হইত। হেয়ার সাহেব বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার পিতা বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ কলেজের অধ্যাপকেরা ইহাদিগের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। এই সকল বালকদিগকে হিন্দু কলেজের ছোকরারা 'বড়ে' বলিত। কেন 'বড়ে' বলিত, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হেয়ার সাহেব তাঁহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে চালিয়া দিতেন, এই জন্য কিংবা বালকেরা দরিদ্র বলিয়া তাহারা কলেজের বড়মানুষ ছাত্রদিগের কল্পনানুসারে বড়ি ভাতে দিয়া ভাত খাইত, তাহাদিগের বড়মানুষী সমাধ্যায়ী অপেক্ষা সকাল সকাল কলেজে আসিতে সমর্থ হইত, এই বলিয়া তাহারা উক্ত বড়মানুষ ছাত্রদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের নিকট অগৌরব কিন্তু প্রকৃতরূপে গৌরবসূচক এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কিনা তাহা বলিতে পারি না। আমি প্রথমে হিন্দু কলেজের

থার্ড ক্লাসে অর্থাৎ সর্বোচ্চ দুই শ্রেণী কলেজ বিভাগ ধরিতে গেলে, তাহার স্কুল বিভাগের প্রথম ক্লাসে, ভর্তি হই। সেই বৎসরই অনেক পুস্তক প্রাইজ পাই। সেই বৎসর গভর্নমেণ্ট সংস্থাপিত 'জেনারল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'-এর সেক্রেটারী ডাঃ ওয়াইজ আমাদিগকে মিল্টনের পরীক্ষা করেন। তাহার পর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া ৩০ টাকার সিনিয়র স্কলারশিপ (সেই বৎসরই উচ্চ শ্রেণী জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রথম নির্ধারিত হয়) পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠি। দুই বৎসর উক্ত স্কলারশিপ ভোগ করি। তাহার পর ৪০ টাকার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর তাহা ভোগ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করি। তখন সর্বোত্তম ছাত্রদিগের প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত এবং টাউনহলে গভর্নর জেনারেল আসিয়া স্বহস্তে অতি নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগকে পর্যন্ত পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। দুই একবার সাহিত্য, পুরাবৃত্ত ও ধর্মনীতিতে আমার প্রদত্ত উত্তর সংবাদপত্রে ছাপা হয় ও ধর্মনীতিতে একটি রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত হই। তখন বেঙ্গল হেরাল্ড নামক একটি সংবাদপত্র ছিল। তাহা 'হিস্টরি অফ দি সিপয় ম্যুটিনী' এবং 'হিস্টরি অফ দি আফগান ওয়ার' প্রণেতা লেফ্‌টেন্যাণ্ট উইলিয়ম কেই (ইহার পর তিনি 'স্যার' হয়েন) সম্পাদন করিতেন। আমি পুরাবৃত্ত বিষয়ক যে উত্তর দিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে তিনি উক্ত কাগজে যাহা লিখেন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

"The distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindu College took place on Thursday last. Our readers will have found the abstract of the proceedings of this interesting ceremony in our last. *The Hurkaru* has published them in *extenso* including the best essay which was read by its author and the best answers to the historical questions for the senior scholarship. The essay, compared with the Hindu College Prize essays of several years past printed in the report, is very inferior; but the answers to the historical questions are astonishing for their fulness and general accuracy. They present too in their style a most marked contrast to the essay which is often not idiomatic while that of the answers is scarcely often otherwise. We have been told that it is the practice for the competitors for the scholarships to write their answers at first in rough draft and then copy them. Now if this was done in the case of the answers to which we are referring, the student who is the author of them must, besides having a most extraordinary memory, and faculty of expression in English, write it with a rapidity which is rare even among

Englishmen, for these answers occupy very nearly two columns of the Hurkaru very closely printed in brevier type. We write tolerably fast but we doubt if we could write the quantity in the same time; and we are quite sure that we could not write so mych twice over without allowing a moment for thought and recollection. If Rajnarain Bose wrote his answers at once he cannot have taken any time to recall all the historical facts embodied in his answers but have written them off as if writing from a book and not from memory and his performance, despite some slight mistakes in matter and style is really most extraordianry. He has not passed over a single question. He has answered every one in the most detailed manner generally with great accuracy and interspersed his answers with remarks that show considerable powers of reflection and discrimination. How comes it that he could not beat the essayist at the work, for the subject of the essay afforded great advantage to one whose mind is so wellstored with historical facts and who writes with such extraordinary ease and rapidity? The subject given was: "On the effects produced on the fortunes of different nations and of mankind in general by the individual character of remarkable persons illustrated from History." The author of the answers to the historical questions should surely have been able to write a better essay than the one to which the palm of superiority in business has been awarded."

["গত বৃহস্পতিবার হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে বৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের গত সংখ্যার কাগজে ইহার পাঠকগণ এই চিত্তাকর্ষক উৎসবের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার পাইয়াছেন। হরকরা সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন: শুধু তাহাই নহে, স্বয়ং লেখক কর্তৃক পঠিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধটি এবং উচ্চ বৃত্তির জন্য পুরাবৃত্ত-বিষয়ক প্রশ্নের শ্রেষ্ঠ জবাবগুলিও তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে মুদ্রিত হিন্দু কলেজের গত কয়েক বছরের পুরস্কৃত প্রবন্ধগুলি অপেক্ষা এই প্রবন্ধটি অনেক নিকৃষ্ট; কিন্তু পুরাবৃত্ত-বিষয়ক প্রশ্নের জবাবগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। জবাবগুলি যেমন সম্পূর্ণ তেমনই সাধারণভাবে নির্ভুল। রচনাটির শৈলী ভাল নয়, কিন্তু এই জবাবগুলির মুন্সিয়ানা অনস্বীকার্য। আমরা অবগত হইলাম যে, বৃত্তিগুলির জন্য প্রতিযোগিগণ তাঁহাদের জবাবাগুলি সাধারণত প্রথমে খসড়া আকারে লিখেন, তারপর সেগুলি নকল করিয়া দেন। এই নীতি যদি পুরাবৃত্ত-বিষয়ক জবাবগুলির ক্ষেত্রেও

অনুসৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে-ছাত্রটি এগুলির রচয়িতা তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও ইংরাজীতে তাঁহার প্রকাশ-ক্ষমতা তো বিস্ময়কর বটেই, উপরন্তু তিনি দ্রুত লিখনে ইংরাজগণেরও হিংসার উদ্রেক করিতে পারেন; কারণ এই জবাবগুলি হরকরার প্রায় দুইটি স্তম্ভে ছোট হরফে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা মোটামুটি দ্রুত লিখিতে পারি, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে এতটা লেখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত কি না সন্দেহ; উপরন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, না ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা দুইবারও ইহা লিখিতে পারিতাম না। রাজনারায়ণ বসু যদি একবারেই ইহা লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি ঐতিহাসিক তথ্যগুলি স্মরণ করিয়া লইবার সময় পান নাই; পক্ষান্তরে তিনি এমনভাবে লিখিয়াছেন যেন কোন পুস্তক হইতে লিখিতেছেন, স্মৃতি হইতে নহে। বিষয়গত ও শৈলীগত সামান্য ভুল থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে লেখকের এই কৃতিত্ব অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি একটি প্রশ্নও ছাড়িয়া যান নাই; প্রত্যেকটি প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন— বিস্তারিত তো বটেই, নির্ভুলও। উপরন্তু মাঝে মাঝে তিনি যে মন্তব্যগুলি করিয়াছেন তাহা তাঁহার চিন্তাশক্তি ও নির্বাচন ক্ষমতার প্রভূত পরিচয় দেয়। তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠে যে, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল, তিনি প্রবন্ধটি তত ভাল করিয়া লিখিতে পারিলেন না, বিশেষ করিয়া যখন প্রবন্ধটির বিষয় তাঁহার ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ মনের অনুকূল ছিল এবং তাঁহার লিখনশক্তি দ্রুততায় ও সাবলীলতায় সিদ্ধ ছিল? যে বিষয়টি লিখিতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইল এই : "ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের একক চরিত্র কিভাবে বিভিন্ন জাতি তথা সমগ্র মনুষ্যজাতির ভাগ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে?" পুরাবৃত্ত-বিষয়ক জবাবগুলির রচয়িতা নিশ্চয়ই পুরস্কৃত প্রবন্ধটি অপেক্ষা আরও ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন।"]

বেঙ্গল হেরাল্ড ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৪৩, শনিবার।

পাঠকবর্গকে এখানে আমার জানানো কর্তব্য যে আমি পুরাবৃত্তের প্রশ্নের উত্তর খসড়া অবস্থায় পরীক্ষককে দিয়াছিলাম। তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখি নাই।

হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে এই সকল পুস্তক পঠিত হইত :

(১) বেকনের—'এসেজ'।

(২) শেক্স্পিয়রের—ম্যাকবেথ, লীয়র, ওথেলো, হ্যামলেট।

(৩) মিল্টনের—প্যারাডাইস লস্ট, লিসিডাস, কোমাস, ল'এলেগ্রো, ইল পেনসেরসো, সনেটজ ইত্যাদি।

(৪) পোপের—'এসে অন ক্রিটিসিজম,' 'রেপ অব দি লক', 'ইলয়সা টু আবেলার্ড', 'এলিজি অন দি ডেথ অফ এ ইয়ং লেডি', 'প্রোলোগ টু দি স্যাটায়ার্স' ইত্যাদি।

(৫) ইয়ং-এর 'নাইট থটজ'।

(৬) গ্রে-র 'পোয়েমজ্'।

পুরাবৃত্তে কোন্ পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত।

(১) হিউমের 'হিস্টরি অফ ইংলণ্ড'। (সম্পূর্ণ)

(২) গিবনের 'রোমান এম্পায়ার'। (সম্পূর্ণ)

(৩) মিটফোর্ডের 'হিস্টরি অফ গ্রীস'।

(৪) ফার্গুসনের 'রোমান রিপাবলিকস্'।

(৫) এলফিনস্টোনের 'ইণ্ডিয়া'।

(৬) রাসেলের 'মডার্ন ইউরোপ'।

সর্বসুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভল্যুম হইবে।

গণিত

(১) ইউক্লিড্—প্রথম ছয় খণ্ড ও একাদশ খণ্ড।

(২) বীজগণিত।

(৩) সমতল ও মাণ্ডলিক ত্রিকোণমিতি।

(৪) বৈশ্লেষণিক কনিক-এর অংশসমূহ।

(৫) অন্তরকলন এবং সমাকলন।

(৬) মিশ্র গণিত।

(ক) হেওয়েলের 'বলবিদ্যা'।

(খ) বার্কলির 'জ্যোতিষ'।

(গ) ওয়েবস্টারের 'উদস্থিতিবিদ্যা'।

(ঘ) ফেল্পের 'আলোক ও চক্ষুর্বিদ্যা'।

(৭) গ্রহণ-এর হিসাব।

পাঠক দেখিবেন যে, উপরের ফর্দে গিবনের 'রোমান এমপায়ার' উল্লিখিত আছে পুরাবৃত্তলেখকের মধ্যে গিবন ও মেকলে, বিবিধ প্রবন্ধ লেখকের মধ্যে মেকলে এবং কবিদিগের মধ্যে স্পেন্সর, টমসন ও বাইরন আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল আমি শেক্স্পিয়র ও মিল্টনের ক্ষমতা দেখিয়া স্তব্ধ হইতাম কিন্তু আন্তরিক ভালবাসাটি উপরোক্ত কবিসকলের প্রতি ছিল। মেকলের গ্রন্থের নাম ''বর্ফি'' রাখিয়াছিলাম কলেজে থাকিতে আমি মনে মনে ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য সম্পাদন করিবার কল্পনা করিতাম। তন্মধ্যে 'জাতীয় ও ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির বিজ্ঞান' একটি প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং একটি অতিবৃহৎ 'সার্বজনীন ইতিহাস' লিখিবার কল্পনা এবং উৎকল, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া চারি বেদ ও সমস্ত পুরাণ সংগ্রহ করিবার কল্পনা প্রধান ছিল।

আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার নিকটে আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পরে তিনি বিলাত যান। তৎপরে দুই বৎসর কর সাহেবের নিকট পড়ি। কাপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শেক্‌স্‌পিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার শেক্‌স্‌পিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভারতবর্ষের সব কিছু ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার শেক্‌স্‌পিয়র-আবৃত্তি ভুলিতে পারি না।' তিনি আশ্চর্যরূপে শেক্‌স্‌পিয়র বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে "দ্যাট্ শোজ্ ইটস্ হার লীভজ্ ইন দি গ্লাসী স্ট্রীম" সেই স্থান বুঝাইবার সময়ে তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গাছের পাতা সবুজ, "হোর লীভজ্" এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইহার উত্তর দিতে না পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাতার নিম্নভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয়; সে ভাগ সাদা। তিনি 'লিটারারি লীভজ্', 'লিটারারি রিক্রিয়েশনজ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা এবং 'সিলেকশনজ ফ্রম দি ব্রিটিশ পোয়েটস্' নামক সংগ্রহের সংগ্রহ-কর্তা। ঐ সংগ্রহের প্রথমে ইংরাজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দররূপে লিখিত। এই সকল গ্রন্থ এক সময়ে ভারতবর্ষের কৃতবিদ্য সমাজে সর্বজনাদৃত ছিল। কাপ্তেন সাহেব ইয়ারগোছ লোক ছিলেন। যদি কেহ 'এ্যামিস' শব্দকে "এমিস" উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে তখনই বলিতেন, "ইউ আর এ মিস'। তিনি আমাদিগকে নাট্যলয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 'আজ থিয়েটারে যাইতেছেন নাকি?' তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি-বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত। ইনি বিলাত হইতে ফিরিয়া হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যালী করেন। তৎপরে পুনরায় হিন্দু কলেজে নিযুক্ত হয়েন। শিক্ষা সমাজের সভাপতি ড্রিংকওয়াটার বেথুন সাহেবের সঙ্গে ইঁহার বিবাদ হওয়াতে ইনি ১৮৫০ সালে কর্মচ্যুত হয়েন। কর্মচ্যুত হইবার পর কলিকাতার ওয়েলিংটন দত্তদিগের দ্বারা সংস্থাপিত মেট্রোপলিটন কলেজে দিনকতক প্রিন্সিপ্যালী করেন। ইঁনি পুনরায় অনেক বৎসর পরে মেজর রিচার্ডসন হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন। কয়েক মাস মাত্র ঐ কার্য করিয়া বিলাত প্রত্যাগমন করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা বলিতে পারি না—তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না—কিন্তু তথাপি হয়। যখন তিনি প্রথম বিলাত যান, তখন তাঁহাকে আমরা যে অভিনন্দনপত্র দিই, তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজের সর্বোত্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন ইতিহাসবিদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম, তেমনই 'গুড

রীডর' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম।

ভি. এল. রীজ সাহেব আমাদিগের গণিতাধ্যাপক ছিলেন। ইনি এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। ইনি ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ধ্বজাবাহক ছিলেন। নেপোলিয়নের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাঁহার কথা বলিতে ইঁহার মুখ দিয়া লাল পড়িত। ইনি আদবে ছাত্রদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু গণিতের কেমন একটি নৈসর্গিক ভয়ানকত্ব আছে, তাঁহার অধ্যাপনের সময় আসিলে কোন কোন বালক কলেজের রেল টপকাইয়া পালাইত। আমি কখন রেল টপকাইয়া পালাই নাই; কিন্তু আমার স্মরণ হয়, তাঁহার ভয়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় তলের হলে অন্য কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকাইয়া ছিলাম। কমিটির মিটিঙের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ঐ হল বন্ধ থাকিত। আমরা সেদিন কোন রকমে তাহার ভিতর ঢুকিয়া ছিলাম। ইনি ইংরাজী ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ইনি একদিন কেদারায় বসিয়া আছেন; ছারপোকা—যাহার সম্বন্ধে কোন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

"হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধে
সূর্যো ভ্রমতি চাকাশে মৎকুনস্য চ শঙ্কয়া।"

তাহা তাঁহার অত মোটা পেণ্টুলুন ফুঁড়িয়া কামড়াইতে তিনি 'বাগ্‌স! বাগ্‌স!" না বলিয়া 'বোগ্‌স, বোগ্‌স' বলিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি 'ডি'-কে "দ" এবং 'টি'-কে "ত" উচ্চারণ করিতেন। একদিন তাঁহার ক্লাসে বসিয়া আমি সম্মুখে কাগজ রাখিয়া তাহাতে আঁকড়ি জুঁকড়ি পাড়িতেছিলাম; তিনি আমার পিছন দিকে দাঁড়াইয়া আমার দুই কাঁধে দুই হাত দিয়া মুখটি আমার মুখের অতি নিকটে আনিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া তিনি যেরূপ উচ্চারণ করিতেন সেরূপ করিয়া বলিলেন, 'সাহিত্যে এত ভাল; গণিতে ভাল নয় কেন?'

এমন উত্তম-স্বভাব শিক্ষক আমি কখন দেখি নাই। তাঁহার স্বভাব অতি চমৎকার ছিল; কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তিনি ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন। কাপ্তেন সাহেবের খ্রীষ্টিয়ধর্মে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তিনি সংশয়বাদী ছিলেন না। কবিরা কখনও সংশয়বাদী হইতে পারেন না। মেকলে সাহেব বলিয়াছেন, শেলী নাস্তিক হইলেও তাঁহার আস্তিকতা তাঁহার কবিতার নানা স্থানে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

কর সাহেব কাপ্তেন সাহেবের মত জাঁকালো লোক ছিলেন না, কিন্তু প্রগাঢ় বিদ্বান ছিলেন। কাপ্তেন সাহেব এক বিষয়ে অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ে অসাধারণরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু কর সাহেব সকল বিষয় জানিতেন। যখন আমরা কাপ্তেন সাহেবের শিক্ষাধীন ছিলাম তখন তিনি ধর্মনীতি বিষয়ে লেকচার দিতেন। কিন্তু আমরা দুই তুলনা করিয়া দেখিয়াছি কর সাহেবের লেকচার গভীরতর বোধ হইত কিন্তু তত সুন্দর বোধ হইত না। কর সাহেব আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি প্রথমে হেড মাস্টার ছিলেন, পরে প্রিন্সিপাল হন। তাঁহার হেড মাস্টারের পদ হইতে উন্নতির

জন্য চেষ্টা বিষয়ে আমাকে সব খুলিয়া বলিতেন। তাঁহার ধর্মমত কিরূপ ছিল আমরা অবধারণ করিতে সমর্থ হই নাই। একদিন তিনি আমাদিগের নিকট আমাদিগের দেশের পৌত্তলিকতার সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের বোধ হইল তিনি প্রগাঢ় খ্রীষ্টিয়ান নহেন। ইনি পরে হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েন। সেই অবস্থাতে গভর্নমেন্টের আদেশানুসারে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার স্কুলসকল পরিদর্শন করিতে যান। সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। আমি ঐ সময়ে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাস্টার ছিলাম। ইনি বিলাত গিয়া ভারতবর্ষ বিষয়ে দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাদের নাম 'ডোমেস্টিক ম্যানার্স অফ দি হিণ্ডুজ্' এবং 'গ্লিম্প্সেজ অফ ইণ্ড'। তিন-চারি বৎসর হইল (এক্ষণে ১৮৮৯) তাঁহার মৃত্যু-সমাচার সংবাদপত্রে পাই। এই সমাচার পাইবার পূর্বে কতবার আমি এইরূপ দিবাস্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমি যেন এই বৃদ্ধ বয়সে স্কটলণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি আর তিনি আমাকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

আমাদিগের আর এক অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নাম হালফোর্ড সাহেব। মানুষটি সকল বিষয়ে বিশেষতঃ ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। লোকটি বড় নীরস ছিলেন কিন্তু স্বভাব ভাল ছিল। ইনি একদিন প্রস্রাব করিতে গিয়াছেন, আমরা তাঁহার নোট বই খুলিয়া দেখিলাম, এক স্থানে 'স্নেক, স্-নেক, নেক, নেক, নাগ' লিখিত রহিয়াছে। এইরূপে সংস্কৃত "নাগের" সঙ্গে ইংরাজী "স্নেক" শব্দ মিলাইয়া দিয়াছেন। আর এক স্থানে দেখিলাম "বোক্কাস্ কিং অফ মাউরিটানিয়া, বোক্কাস্ (গ্রীক ভাষায়)=ছাগল=বোকা (বাংলা) অর্থাৎ বোকা ছাগল।" সেই নোটবইয়ে আমরা দেখিলাম এক স্থানে রসিক পুরুষ একটি কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কখন মনে করি নাই যে হালফোর্ড সাহেব কবিতা লিখিতে পারেন অথবা কবিতা লিখিতে ভালবাসেন। সেই কবিতা লর্ড এলেনবরোর প্রতি উক্ত। বিষয় চীনের সহিত যুদ্ধ। উহাতে এক স্থানে চীন সম্রাটকে 'সেরিক লর্ড' বলা হইয়াছে, দেখিলাম। রোমানেরা চীন দেশকে সেরিকা বলিত। ইনি একদিন আমাদিগকে বলিলেন যে, সেম্যাটোলজি নামে একটি নূতন বিদ্যা ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিনের সংযোগ। সেম্যাটোলজি নামেতে আমাদিগের বড় আমোদের উদয় হইল। আমরা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে লেক্চার দিতে প্রার্থনা করিলাম। যে কয়েকজন অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আমি প্রধান। তিনি কর সাহেবকে আমাদিগের উৎসাহের কথা বলাতে কর সাহেব বলিলেন, "আপনাকে উহারা ঠাট্টা করিয়াছে।" সেই অবধি আমার প্রতি কিছুদিনের জন্য বাম ছিলেন এবং কর সাহেবও যখন আমাকে নিজ হইতে (কলেজ কমিটি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার অতিরিক্ত) সার্টিফিকেট দেন, তখন তাহাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন "যতদূর প্রত্যক্ষভাবে জানি, তাহার স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল।" কলেজ কমিটির সার্টিফিকেটে লেখা ছিল

"তাহার স্বভাবচরিত্র অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল।" সেম্যাটোলজি বিদ্যার উল্লেখ একবার যাহা আমরা হালফোর্ড সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, আর কখনও শুনি নাই। হালফোর্ড সাহেবের আর দুই একটি গল্প আমরা প্রণীত হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্তে আছে।

আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন। পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন সেকেণ্ড ক্লাস হইতে খ্রীষ্টিয়ান হইয়া ছাড়িয়া যান। তৎপরে বিশপ্‌স্ কলেজে ভর্তি হয়েন। প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসর এবং সুরাপান নিবারণী সভার প্রথম সংস্থাপক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্যারিস্টার। তিনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া বিলাত যান। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিনকতক নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে (১৮৮৯) তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। লিভিতে ইঁহার কন্যার ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বড় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যখন ভারতে ছিলেন, তখন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান। মানুষ হাজার উদার হউক তাহার পক্ষে জাত্যাভিমান সম্যকরূপে পরিত্যাগ করা সুকঠিন।' ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভূত যশের সহিত ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ পদের কার্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। ইনি বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা এবং 'গার্হস্থ্যবিধি' প্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষাতে রচনা করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার বিখ্যাত কালীশঙ্কর ঘোষদিগের বংশজাত। ইনি গণিত বিদ্যাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী কার্য কিছুদিন করিয়া পরলোকগমন করেন। আনন্দকৃষ্ণ বসু বিখ্যাত সর্ রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র। ইনি এক্ষণে জীবিত আছেন। ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবের লেখাপড়ার কার্যে তাঁহাদিগের ডান হাত বলিলে হয়। জগদীশনাথ রায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম জেলা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র অনেক দিন অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। পরলোকগত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। গিরীশচন্দ্র দেব অনেককাল হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা কার্য খ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সেকালের ছোট আদালতের জজ বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র। আমি কলেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা পড়িতাম, না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলে হয়, তাহা এমনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। ইনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একহৃদয় ছিলেন বলিলে হয়। প্রাচীন ও আধুনিক ক্ষুদ্রতম ইংরাজী কবির গ্রন্থ পর্যন্ত আমরা

পড়িতাম। ইনি কলেজ ছাড়িয়া ট্রেজারিতে এক উচ্চ কর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি কোন কারণবশতঃ ঐ কর্ম ছাড়িয়া বিলাত যান ও তথায় সেকালের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ ও আমাদিগের একজন পরীক্ষক স্যার এডওয়ার্ড রিয়ান-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী কবিতা উত্তম রচনা করিতে পারিতেন। ইনি বিখ্যাত কুমারী তরু দত্তের পিতা। ইনি যেমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক ছিলেন এমন অতি অল্প পাওয়া যায়। ইনি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন।

কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়ে আমার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে, তন্মধ্যে আমার প্রথম বিবাহ, বিখ্যাত ইংরাজী লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্রকে তাঁহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনী লেখনে সাহায্য প্রদান, স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষের সহিত রাজমহল ও গৌড় ভ্রমণ, এবং আমার ধর্মমতে পুনঃপুনঃ কয়েকটি পরিবর্তন প্রধান।

আমার প্রথম বিবাহ সেয়ালদহের রামমোহন মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত হয়। আমার বয়ঃক্রম তখন সতেরো বৎসর ও কন্যাটির বয়স এগারো বৎসর। আমার এখানে কুলকর্ম হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আদ্যরস হাটখোলার দত্তদিগের বাটিতে হয়। ইহা পরে বিবরিত হইবে। আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর ইঙ্গিত আমার বক্তৃতার দুই-এক স্থানে আছে। একুশ বৎসরে আমার আদ্যরস হয়।

ইংরাজী ১৮৪২ সালে ''কলিকাতা রিভিউ'' নামক সাময়িক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায়ের জীবনী লিখেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র বিখ্যাত টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত লোক। আমি যে বৎসর হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উঠি, সেই বৎসর তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার ঐ জীবনী প্রণয়নে মহাখ্যাত্যাপন্ন খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারক ডাক্তার ডফ্ সাহায্য করেন। ঐ জীবনী কিশোরীবাবুর সাংসারিক উন্নতির কারণ হয়। তাঁহার ঐ লেখা বেঙ্গল সেক্রেটরী হেলিডে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেলিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী পদ দেন। আমি উক্ত জীবনী রচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই। এই সকল গল্পের সঙ্গে একটি গল্প এইরূপ ছিল যে, রামমোহন রায় নিজের প্রচারিত ধর্মকে 'ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ন' অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, আর যখনই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তখনই তাঁহার অশ্রুপাত হইত। আমার পিতাঠাকুরও যখন ঐরূপ বলিতেন, তখন গদগদ হইতেন।

কলেজে পড়িবার সময়ে বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁহার বাটী ঐ সময়ে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। এইজন্য তিনি ''এজুরাজ'' অর্থাৎ এডুকেটেডদিগের রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ইংরাজীওয়ালাদিগের অনভিষিক্ত রাজা (আন্‌ক্রাউন্‌ড্ কিং) ছিলেন। তিনি ঐ বৎসর

পূজার সময়ে তাঁহার অতি সুন্দর ক্ষুদ্র স্টীমার ‘‘লোটাস’’ (পদ্ম) আরোহণ করিয়া রাজমহল ও গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য গমন করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আমাকে এবং অন্যান্য দুই-একজনকে সঙ্গে লইয়া যান। অদ্য তিন বৎসর হইল ‘‘সুরভি’’ সংবাদপত্রে উক্ত ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল॥

চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

এক্ষণে বাঙ্গালীরা কত দেশদেশান্তর যাইতেছে, সাত সমুদ্র তের নদী পার বিলাত যাইতেছে, কেহ কেহ আট সমুদ্র চৌদ্দ নদী পার আমেরিকায় যাইতেছে। কিন্তু চব্বিশ বৎসর পূর্বে কেহ যদি লেগুোর বা মসূরী পর্যন্ত যাইত, তাহা হইলে তাহাকে লোকে বীরপুরুষ জ্ঞান করিত। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ ততদূর গিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার বীরত্ব আমরা কতদূর প্রশংসনীয় জ্ঞান করিতাম তাহা বলিতে পারি না। উক্ত ঘোষজা মহাশয় তাঁহার সময়ে ইংরাজীওয়ালাদিগের প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ এবং উক্ত কলেজে পঠনশীল যুবকদিগের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহারা সকলে রামগোপালবাবুর বাটীতে একত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথোপকথন করিতেন এবং ইংরাজী বিদ্যাবিষয়ক আলাপ করিয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিতেন। এই জন্য তিনি ‘‘এজুরাজ’’ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই এজু শব্দ এডুকেটেড শব্দের অপভ্রংশ। ১৮৪৩ সালে যখন আমরা কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন একদিন রামগোপাল বাবুর সহিত আমাদের পরামর্শ হইল যে তাঁহার ‘লোটাস’ স্টীমারে আরোহণ করিয়া পূজার ছুটি বঙ্গদেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করা যাইবে। তাঁহার লোটাস স্টীমারটি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর, যথার্থই তাহা তাহার নামের উপযুক্ত ছিল। সেটিকে যথার্থ পদ্মের ন্যায় দেখাইত। বাষ্পীয়পোত আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশের দূরস্থ স্থান ভ্রমণ করা তখন দুঃসাহসিক কার্য বলিয়া লোকে মনে করিত। এরূপ দুঃসাহসিক কার্যে আমি প্রবৃত্ত হইব, পূর্বে মাতাঠাকুরাণী তাহা জানিতে পারিলে ভ্রমণে যাইতে দিবেন না, অতএব তিনি যাহাতে টের না পান অথচ কার্যটি সমাধা করিতে হইবে এই জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিলাম। সে ষড়যন্ত্রের ভিতর কেবল আমি ও আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয় ছিলেন। স্থির হইল, মাতাঠাকুরাণীকে বলা হইবে যে, আমি রামগোপাল বাবুর স্বগ্রাম বাঘাটী যাইতেছি, তাহার পর ক্রমে ক্রমে পিতাঠাকুর যথার্থ কথা ব্যক্ত করিবেন। যে দিন আমরা বাষ্পীয়পোত আরোহণ করিব সেদিন উৎসাহের সীমা কি? সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আমরা কয়জনে রামগোপাল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তখন ব্যাগ নামক পদার্থ—যাহা এক্ষণে কাপড়, তরকারী, ফল, হুঁকা, তামাক প্রভৃতি জগতের জিনিসে পরিপূর্ণ হইয়া ভদ্রলোককে ভদ্র মুটিয়াতে পরিণত করে—তাহার ব্যবহার ছিল না। আমরা প্রত্যেকে এক একটি কাপড়ের মোট লইয়া স্টীমার আরোহণ করিয়া ত্রিবেণী পৌঁছিলাম। পূর্বে ত্রিবেণী,

বলাগড়, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান কি স্বাস্থ্যকর স্থানই ছিল! লোকে কলিকাতা হইতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তথায় যাইত। এক্ষণে ঐ সকল স্থান ম্যালেরিয়ার আকর হইয়াছে। বাঘাটী ত্রিবেণীর নিকটস্থ গ্রাম। আমরা তথায় রামগোপাল বাবুর গ্রাম্য বাটীতে পূজার কয়েকদিন যাপন করিলাম। রামগোপাল বাবু নিজে পূজার কার্যে লিপ্ত থাকিতেন না; তাঁহার সম্পর্কীয় একটি বৃদ্ধ লোক পূজার সকল কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন, কেবল শান্তিজল লইবার দিনে রামগোপাল বাবুকে শান্তিজল নিতে দেখিলাম। এ কয়েক দিবস কেবল মেকলের রচনাবলী (মেকলে'জ এসেজ্) পাঠ করি। তখন আমরা মেকলে-খোর ছিলাম। তাঁহাকে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্তা বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তাঁহার শত মহদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি রচনা (এসে) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্‌গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে। তৎপরে ত্রিবেণীতে পুনরায় স্টীমার আরোহণ করিয়া আমরা মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দিনগুলি অতি আমোদে কাটান হইত। প্রাতে উঠিয়া চা, বিস্কুট ও ডিম খাওয়া হইত। মধ্যাহ্নকালে বাঙ্গালীর ভাত, ডাল, মাছের ঝোল; রাত্রিতে ইংরাজীতর অথবা হিন্দুস্থানীতর আহার হইত। সকাল বিকাল দুই বেলা তীরে নামিয়া আমরা পাখী মারিতে যাইতাম। সেই পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করা যাইত। একদিন রামগোপাল বাবু আমাকে একটি পিস্তল ছুঁড়িতে দিলেন। আমি বলিলাম, "আমি পিস্তল কখন ছুঁড়ি নাই, ভয় হইতেছে পাছে হাতটা উড়িয়া যায়।" রামগোপাল বাবু বলিলেন, "গেলই বা।" তখন ঐ কথা কঠোর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি। আমরা ক্রমে বঙ্গদেশের অক্সফোর্ড নবদ্বীপ পার হইয়া বিল্বগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে স্টীমারে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তথায় স্টীমারে নোঙর করিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্তা। তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আপনার কন্যাকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইয়া এবং অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ মহৎ কার্যে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব ন্য তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন এবং "মাই ডিয়ার মদন" (প্রিয় মদন) বলিয়া লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্বশুভঙ্করী" নামে পত্রিকা করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তর্কালঙ্কার লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় াশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য হইয়া সমাজ-সংস্কার যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত। তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাভিমুখে গমন করিলাম। আমরা

মুরশিদাবাদের ঘাটে নোঙর করিয়াছি, এমন সময়ে নবাবের মাল বোঝাই করা একটি লম্বোদর ভড় কৃশাঙ্গী 'লোটাসের' উপর আসিয়া জোরে পতিত হয়। তাহাতে লোটাসের বিলক্ষণ অঙ্গহানি হয়, লোটাসের আরোহী কয়েকজন বীর পুরুষ ভড়ের উপর উঠিয়া মাঝিদিগকে উত্তম মধ্যম দেন। এইরূপ উত্তম মধ্যম দিয়া মুরশিদাবাদ সম্মুখে আর থাকা বিধেয় নহে জ্ঞান করিয়া ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমস্থলাভিমুখে স্টীমার চালন হয়। তৎপরে উক্ত সঙ্গমস্থল হইতে আমরা রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করি। রাজমহলে পৌঁছিয়া তথায় মুসলমান নবাবদিগের নির্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দর্শন করি। তন্মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরনির্মিত সিংহ-দালান প্রধান। এই দালানে বসিয়া নবাব প্রত্যহ দরবার করিতেন। ভূতপূর্ব হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইংরাজী সুকবি ও কাব্যশাস্ত্রবিশারদ, সেক্সপিয়র প্রণীত নাটকের বিখ্যাত আবৃত্তিকারী আমাদিগের শিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন এই সকল ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে যে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

এস হে, পথিক! হেথা, এস এই স্থানে,
কালের নাশিনী গতি হের এই খানে।
যখন নিশীথ কালে পেচকের রব,
শ্রবণবিবরে আসি পশিবেক তব,
সুতীক্ষ্ণ চীৎকার ধ্বনি উঠিবে সঘনে
কৃশতনু শিবা হতে নির্জন গগনে;
যদি হে! তোমার চিত্ত হয় হে তেমন
পবিত্র উৎসাহে পূর্ণ, কবিত্বে মগন,
কিংবা জ্ঞান-চিন্তারত হয় তব মন,
এ ভগ্ন প্রাচীর তোমা বলিবে তখন,—
কি অনিত্য হয়, হায়! পার্থিব গৌরব,
মানব কীরিত্তি সহ গত হয় সব,
আশা ভরসা যত যৌবনের সাথে
হৃদয় ভগ্নাবশেষ রাখিয়া পশ্চাতে।

যখন রেলওয়ে রাজমহল পর্যন্ত হয়, তখন এই সকল ভগ্নাবশেষ রেলওয়ে এবং রেলওয়ে কর্মচারীদিগের বাসস্থান নির্মাণ জন্য একেবারে বিধ্বস্ত করা হয়। যখন এই বিধ্বংস কার্য চলিতেছিল, তখন আমি এই ভ্রমণের ১৭ বৎসর পরে রাজমহলে পুনরায় একবার যাই। তখন গিয়া দেখি মজুরেরা অতি কষ্টে নবাবদিগের অট্টালিকাসকল ভাঙ্গিতেছে। সেকালে অট্টালিকাসকল খুব মজবুত ছিল, এক্ষণকার অট্টালিকাসকল আদৌ সেরূপ মজবুত নহে। ইংরাজনির্মিত অট্টালিকাসকলে শীঘ্র ফাট ধরে। রাজমহলের উল্লিখিত ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া আমরা স্টীমারে আরোহণপূর্বক, রাজমহলের পর্বতের

দিকে গঙ্গা নদীর যে খাড়ী গিয়াছে সেই খাড়ীর ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া উক্ত পাহাড়সকল পর্যবেক্ষণ করি ও পাহাড়িয়াদিগের বন্য গীত শ্রবণ ও বন্য নৃত্য দর্শন করি।

তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পদ্মা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলাভিমুখে গমন করি। এই পথে জলদস্যুর ভয় থাকাতে আমরা রাত্রিতে স্টীমারের ডেকের উপর ভাল করিয়া পাহারা দিতাম। আমি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তলওয়ার হাতে করিয়া পাহারা দিতাম। যখন আমরা মহানন্দার ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার পুষ্করিণীর জলের ন্যায় আকাশবর্ণ জল ও তীরস্থ শ্যামল বন উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ উপস্থিত হইল। যখন মহানন্দা নদীর ভিতর স্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা ''ধোঁয়া কলের না এয়েছেরে'' 'ধোঁয়া কলের না এয়েছেরে'' বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্বে বাষ্পীয়পোত কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। স্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত, যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। একি ব্যাপার! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। ইহার মধ্যে একদিন মহানন্দার তীরে আমরা রাত্রে নঙ্গর করিয়া আছি, এমন সময়ে বাঘের ডাক শুনা গেল। যখন আমরা ভোলাহাট নামক স্থানের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন আমরা একটি ''কড়কড়ে পানীতে'' (র‍্যাপিড) পড়িলাম। স্টীমার কোন মতে আর অগ্রসর হয় না। আমরা রামগোপালবাবুকে বলিলাম, ''আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া যাক্।'' রামগোপালবাবু অসমসাহসিক কার্যসকল করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, 'ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, স্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে বইল (বয়লার) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই।'' রামগোপালবাবু বলিতেন যে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে, বন্দুকের গুলি তাঁহার শরীরের খুব নিকট দিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই। তিনি বলিতেন, ''আমি মন্ত্রপূত জীবন ধারণ করি।'' (আই বেয়ার এ চার্মড্ লাইফ)। স্টীমারে পূর্ণ জোর দিবার পূর্বে স্টীমার হালকি করিবারজন্য স্টীমারের অধিকাংশ জিনিসপত্র জালিবোটে করিয়া তীরে নামান হইল। স্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাষ্পরাশি পুনঃ পুনঃ উদ্গীরণ করতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় ''কড়কড়ে পানী'' কোন প্রকারে পার হইল। নদীর দুই তীর লোকে লোকারণ্য; যেমন পার হইল অমনি রামগোপালবাবু রামমোহন

রায়ের গান ধরিলেন, ''ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়'', কেবল ''অন্যের'' শব্দ পরিবর্তন করিয়া ''জলের'' এই শব্দ ব্যবহার করিয়া গান গাইতে লাগিলেন,—''ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলেরই ভয়।'' তৎপরে আমরা মালদহ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার তদানীন্তন ডেপুটি কলেক্টরবাবুর বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিলাম। তিনি আমাদিগকে সমাদরে তাঁহার বাসায় রাখিলেন। তথায় দুই-একদিন অবস্থিতি করিলে পরে গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে সকঁল্প হইল। ঐ ভগ্নাবশেষ মালদহ নগর হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উহা দেখিতে নিবিড় বনাকীর্ণ, আমাদিগের সঙ্গে যে কয়েকটি বন্দুক ছিল, তদ্ব্যতীত আর কয়েকটি বন্দুক ও কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করা গেল। আমাদিগের সঙ্গে মালদহের তদানীন্তন সিবিল সার্জন সাহেব জুটিলেন, তাঁহার নাম এতদিন পরে স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় ডাঃ এল্‌টন হইবে। এক হস্তীর উপর রামগোপালবাবু ও ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর উপর আমরা সকলে চলিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন—কোট ও পেন্টেলুন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফর্‌ফর্ করিয়া বাতাসে উড়িতেছে! দৃশ্যটি দেখিতে মনোহর হইয়াছিল। যাইতে যাইতে তর্কালঙ্কার হাতীর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। হাতীটি অতি শায়েস্তা ছিল, অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল। আর এক পা নিক্ষেপ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় চেপটিয়া যাইতেন। এইরূপে আমরা গৌড়ে উপস্থিত হইয়া কোতোয়ালি দরজা নামক সেকালের কোতোয়ালি ভগ্নাবশেষের মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঐ কোতোয়ালি দরজার খিলান অতি বৃহৎ। এ প্রকার খিলান, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অতি অল্প স্থানেই আছে। তৎপরে আহারের উদ্‌যোগ হইল। সাহেব ও রামগোপালবাবু একত্রে আহার করিলেন, আমাদের বাঙ্গালীতর বন্দোবস্ত হইল। গৌড়ের জঙ্গলবাসী কতকগুলি লোক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে আমরা মহিষের দুগ্ধ কিনিলাম এবং কয়জনে পড়িয়া খিচুড়ি রাঁধিলাম। ভোজন সমাধা করিয়া আমরা ভগ্নাবশেষ দর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা দেওয়ান-খানা নামক একটি ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এইখানে বাদশাহের প্রত্যহ দরবার হইত। প্রাচীরের উপর অতীব সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখিলাম। সেই কারুকার্যের মধ্যে কোরান হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি আরবী বাক্য খোদিত দৃষ্ট হইল। আমি যেন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম যে, বাদশাহ সিংহাসনে আসীন আছেন, আর উজীরর ও অন্যান্য রাজকর্মচাররিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবনতজানু হইয়া উপবিষ্ট আছেন, অনতিদূরে সুবিচারপ্রার্থী অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎপরে চটকা গেলে বোধ হইল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। মনুষ্যের কীর্তি কি অস্থায়ী! যে স্থান এরূপ জনতা ও লৌকিক কার্যের ব্যস্ততার আধার ছিল, তাহা এক্ষণে বিজন ও ভয়ানক হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে। তৎপরে আমরা প্রকাণ্ড কয়েকটি পুষ্করিণী দেখিলাম। সে সকল পুষ্করিণী এক একটি হ্রদের ন্যায়। তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কুমীর

াসিতে দেখা গেল। এক স্থানে আমরা কলিকাতার অক্টরলনী মনুমেন্টের ন্যায় একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভাকৃতি গৃহ দেখিলাম। শুনিলাম যে, তাহার উপর রাজ-জ্যোতির্বেত্তা রাত্রে উঠিয়া নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতেন। আমার ক্ষণেকের জন্য স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল, যেন অদ্যাপি রাত্রে উষ্ণীষধারী ও আপাদলম্বিত আলখাল্লাপরিহিত রাজ-জ্যোতির্বেত্তা নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ নিয়োগ করতঃ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য অনেক ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। এই সকল ভগ্নাবশেষের বৃত্তান্ত র‍্যাবেন্‌শা সাহেব সম্প্রতি তাঁহার প্রণীত "রুইন্‌স্ অব্ গৌড়" নামক গ্রন্থে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আমরা মালদহ নগরে প্রত্যাগমন করিলাম। সে দিবস সাহসী রামগোপালবাবু ও ডাক্তার সাহেব ব্যতীত আর সকলের সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্র কিংবা অন্য কোন হিংস্র জন্তুর সহিত মোলাকাৎ হয় নাই, তাহা হইলে আমাদিগের মধ্যে যে কয়জন অপদার্থ ভীরু বাঙ্গালী ছিল, তাহাদিগের দুর্দশা কি হইত বলা যায় না।

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্মমতে পর পর কতকগুলি পরিবর্তন হয়, কিন্তু উনিশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হই, তাহা এখনও আছি। এই সম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁহার কোন পত্রে নানকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখেন, 'যুগে যুগে একো বেল।'' পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে শেভালিয়র র‍্যামজে-র সাইরাসেজ ট্র্যাভেলজ্' পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের 'আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক ইন ফেভর অফ্ দি প্রিসেপ্টস্ অফ্ জীসাস' এবং চ্যানিঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায় তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।

ঈষৎ মুসলমান হইবার বৃত্তান্ত এই। প্রথম যাহা ঠাট্টাতে আরম্ভ করিলাম, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে যথার্থতঃ হইয়া পড়ি। কলেজে থাকিতে দেখিলাম, সহাধ্যায়ী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ঝোঁক ত্রিত্ববাদাত্মক খ্রীষ্টীয় ধর্মের (ট্রিনিট্যারিয়ান ক্রিশ্চিয়ানিটি) দিকে। উক্ত ধর্ম আমার বিষদৃষ্টির বিষয় ছিল। আমি মিছামিছি মুসলমান হইলাম এবং আমার সমাধ্যায়ীদিগের নিকট জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টীয় ধর্মের পক্ষে যে প্রমাণ দেখাইতে লাগিলেন, আমি ঠিক সেইরূপ প্রমাণ মুসলমান ধর্মের পক্ষে দেখাইতে লাগিলাম। তখন খ্রীষ্টীয় জগতে পেলি সাহেবের আদর বড়। আমি দেখাইলাম যে পেলি সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্মের পক্ষে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, ঠিক সেইরূপ প্রমাণ মুসলমান ধর্মের পক্ষে দেওয়া যায়। সমাধ্যায়ীরা ধরিল যে, মুসলমান ধর্মের প্রতি যদি এতই অনুরাগ তবে তুমি প্রকাশ্যরূপে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কর না কেন। আমি

বলিলাম, অবশ্য গ্রহণ করিব। আমি তৎপরে এই মর্মে এক হস্তলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলাম যে, অমুক দিন আমি কলেজ স্ট্রীটে যে মশজিদ আছে (সে মশজিদ এখনও আছে) তাহাতে বিধিপূর্বক প্রকাশ্যরূপে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিব। এই ঘোষণাপত্র সমস্ত কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল। তাহারাও বাহিরের লোকদিগকে তাহা দেখাইল। সে দিন উক্ত মশজিদের সম্মুখে অবশ্য লোক জমিত, কিন্তু পরিশেষে বিদ্রূপ টের পাইয়া জমে নাই। যাহা হউক, ধর্ম লইয়া এরূপ উপহাস করা উচিত হয় নাই। তজ্জন্য এখন অনুতাপ হইতেছে। বলিতে কি, এই হিড়িকে মুসলমান ধর্ম বিষয়ে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তখন বাটীতে পারসী পড়িতাম, সেই পারস্য ভাষা এই কার্যে অনেক সহায়তা করিয়াছিল। আমি এই সম্বন্ধে সেল-এর কোরাণ, 'চ্যাপ্‌টার্স ইন গিবনজ্ রোমান এম্পায়ার এ্যাবাউট ম্যাহোমেড এ্যান্ড হিজ্ সাক্‌সেসর্জ' এবং আর আর অনেক গ্রন্থ, যাহার নাম এক্ষণে মনে পড়িতেছে না, তাহা পাঠ করি। এই করিতে করিতে যথার্থই মুসলমান ধর্মের প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। স্যার ওয়াল্টার স্কট বলেন যে, লোকে যাহা ভান করে, ক্রমে ক্রমে তাহা যথার্থই হয়, এই কথা ঠিক।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমার পিতাঠাকুর বেদান্তধর্মাবলম্বী ছিলেন। জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ, জগৎ স্বপ্নবৎ, নির্বাণ মুক্তি, এই সকল মতে বিশ্বাস করিতেন। একদিন তিনি ও কলিকাতার শিমুলিয়ানিবাসী আমাদের জ্ঞাতি পরম বৈষ্ণব নন্দলাল বসু* ও আমি, এই তিনজন বসিয়া ধর্মালোচনা করিতেছিলাম। আমার পিতাঠাকুর নির্বাণ মুক্তির মত সমর্থন করিতেছিলেন। নন্দলাল বাবু সিঁড়িতে নামিবার সময় আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, "বাপু! তোমার বাবার মত তুমি বিশ্বাস করিও না। দেখ, চিনি হইবার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।"

হিন্দু কলেজে যত দিন থাক, ছাত্রবৃত্তি উপভোগ করিয়া পড়, তাহাতে অধ্যক্ষেরা আপত্তি করিতেন না। অধিক দিন ছাত্রেরা পড়িবে বলিয়া এই সকল ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আরো দুই তিন বৎসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকট পীড়া জন্মানোতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উৎকট পীড়ার কারণ অপরিমিত মদ্যপান। তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল; গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাড়ি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে

* ইঁহার পুত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমন মনে না করিতেন। আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া শান্তিপুরে অনেক দিন কার্য করিয়াছিলেন), প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্র্যান্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম। একদা আমি গোলদীঘিতে মদ খাইয়া টুপভুজঙ্গ হইয়া রাত্রিতে বাটীতে আসাতে মাতাঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ''আমি আর কলিকাতার বাসায় থাকিব না, বোড়ালে গিয়া থাকিব।'' পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই কৌশল অবলম্বন করাতে আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে, বাবারও যবনস্পৃষ্ট আহার চলে। মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অত্যন্ত পরিমিতপায়ী ছিলেন। কিন্তু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না। একবার রামমোহন রায়ের কোন শিষ্য অপরিমিত মদ্যপান করাতে রামমোহন রায় ছয় মাস তাঁহার মুখ দর্শন করেন নাই। পিতাঠাকুর আমাকে পরিমিতপায়ী করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। সেকালে মুন্সী আমীর আলী সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। এই মুন্সী আমীর আলী পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময় (পাটনার বিদ্রোহের সময়) গভর্নমেন্টের উপকার করাতে নবাব উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণকার (১৮৯০) হুগলীর ইমামবাড়ার মতওয়াল্লি সাহেব তাঁহার পুত্র। যে বাটীতে সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য হইত, সেই বাটীতে খাস কমিশনের কার্য হইত। খাস কমিশন সদর দেওয়ানীর অঙ্গ ছিল বলিলেই হয়। মুন্সী আমীর আলী উভয় সদর দেওয়ানী ও খাস কমিশনের ওকালতী করিতেন। পিতাঠাকুরের সহিত মুন্সী আমীর আলীর আন্তরিক বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। মুন্সী সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে ''রাজদার দোস্ত'' বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথা বলা যাইতে পারে, পার্শিতে তাহাকে ''রাজদার দোস্ত'' বলে। প্রায় প্রতিদিন মুন্সী আমীর আলীর বাটী হইতে আমাদিগের বাসায় একটি টিনের বাক্স আসিত। আমি মনে করিতাম যে, মুন্সী আমীর আলী পিতাঠাকুরকে তরজমা জন্য সদর দেওয়ানীর কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। (পিতাঠাকুর খাস কমিশনের হেডক্লার্কের কার্য করিতেন, আবার ঠিকা কাগজ তরজমা করিয়াও কিছু উপার্জন করিতেন।) একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি। তাহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্কস্ক্রু ও একটি সেরীর বোতল ও একটি ওয়াইন গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটি খুলিলেন। টিনের বাক্স খোলা হইলে

আমি দেখিলাম যে. তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই, পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা রহিয়াছে। পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তম দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরী) দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না; যখনই শুনিব অন্যত্র মদ খাও, সেইদিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।" কিন্তু আমি সেইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম। এইরূপ অপরিমিত মদ্যপানে আমার একটি পীড়া জন্মিল। *** তাহার সঙ্গে জ্বর ছিল। ছয় মাস শয্যাগত ছিলাম। পিতাঠাকুর আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি হাফেজের একটি মেসরা (পংক্তি) আবৃত্তি করিয়া আমার সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেন। সেই মেসারার অর্থ এই যে, প্রিয়তম কখন চলিয়া যাইবে সেই আশঙ্কাতে আমার চিত্ত বেত্রবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। "হমচু বেদ লর্জানপ্ত।" কিন্তু আমি ঈশ্বরেচ্ছায় সারিয়া উঠিলাম। আমি এই পীড়া উপলক্ষে কলেজ পরিত্যাগ করি। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পরই আমার প্রথমা স্ত্রী ও তৎপরে আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু হয়। আমার প্রথমা স্ত্রী জলে ডুবিয়া মরেন। তিনি পল্লীর বালিকাদিগের সঙ্গে তাঁহার পিত্রালয়ের খিড়কির পুষ্করিণীতে সাঁতার শিক্ষা করিতেন। সাঁতার দিতে দিতে তলিয়া যান। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু ১৮৪৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে হয়। যখন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কিতে উঠান গেল, তখন, তিনি পৌত্তলিক নহেন, তখনকার ব্রাহ্মধর্ম অর্থাৎ বৈদান্তিক ধর্মে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, ইহা গ্রামস্থ লোকদিগকে দেখাইবার জন্য আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আপনার কোন্ ধর্মে মৃত্যু হইতেছে সকলকে বলুন।" তিনি বলিলেন, 'বৈদান্তিক ধর্মে।" তিনি গঙ্গাতীরের পথে যাইতে যাইতে, আমার জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলেন না, এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে আমি সংশয়বাদী হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী ও পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক ও সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্মে বিশ্বাস হইল। লালা হাজারীলাল প্রথম ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ছিলেন। ইঁহার বাটী ইন্দোরে ছিল, ইঁহার একটি প্রণবাঙ্কিত স্বর্ণাঙ্গুরী ছিল। তখন যে ব্রাহ্ম হইত, তাহাকে একটি ঐরূপ স্বর্ণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। প্রণবের নীচে পারস্য ভাষায় "ইঁ হম্ নখাহদ্ মান্দ" "এইরূপ রহিবে না" এই বাক্য অঙ্কিত ছিল। এই বাক্য দেখিতে পাইলে বিপদের সময় সম্পদের অবস্থা মনে পড়িবে এবং সম্পদের সময় বিপদের অবস্থা মনে পড়িবে, এই জন্য ঐ বাক্য অঙ্গুরীতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। লালা সাহেব প্রতিদিন প্রাতে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র অনেকগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া বাহির হইতেন. দুপ্রহরের পূর্বে সেগুলি স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়া হাজির করিতেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, যাঁহারা স্বাক্ষর করিতেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মধর্ম বিশেষরূপে বুঝিয়া স্বাক্ষর করিতেন, এমন নহে। কিন্তু নিতান্ত অল্পসংখ্যক নয় এমন ব্যক্তি যে বুঝিয়া করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। লালা সাহেব লোকের

সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরের জন্যে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেন। লালা সাহেব সহভাব এবং প্রাক্-ভাব অর্থাৎ জড় পদার্থের সহিত ঈশ্বরের সহভাব কিংবা জড় পদার্থের পূর্বে ঈশ্বরের প্রাক্-ভাব এই বিষয়ে সর্বদা তর্ক করিতেন। এই বিষয় আমাদিগের মধ্যে তখন প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। এখনও যেন সম্মুখে দেখিতেছি, লাল সাহেব একবার করিয়া নস্য লইতেছেন এবং সহভাব, প্রাক্-ভাব করিতেছেন। লালা সাহেব লর্ড মর্নবড্ডোর গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার মতের অনুবর্তী হইয়াছিলেন। লর্ড মর্নবড্ডোর মত ছিল মানুষ বানর-বংশ-সম্ভূত। তিনি ডারউইনের পূর্বে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আমিষ ভোজনের বিপক্ষ ছিলেন। এমন কি, উদ্ভিদ পাক করিয়া খাওয়া অবিধেয় বলিতেন। তাঁহার মতে কাঁচা উদ্ভিদ খাওয়া উচিত। তিনি পাককার্যকে অনৈসর্গিক মনে করিতেন। লালা সাহেব এই মত অনুসারে কাঁচা বেগুন, কাঁচা লাউ প্রভৃতি (আমরা অনেক নিষেধ করিলেও) ভক্ষণ করিতেন, ইহাতে তাঁহার একবার পেটের পীড়া হয়। তিনি খুব উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ তিনিই স্থাপিত করেন। অন্যান্য স্থানের মধ্যে তিনি মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ইন্দোরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম। পীড়ার পর চৈতন্য হইয়াছিল। কোন্ সময়ে মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করি ও কেন করি, তাহা পরে লিখিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে আমার কলেজের সমাধ্যায়ীরা আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংশয়বাদী অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবুকে এক পত্র লিখি। তাহাতে আমাদিগের শাস্ত্র হইতে এমন এক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতির ও তৃতীয় ভাগে ইতিহাস পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক সকল থাকিবে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সঙ্কলনের অনেক দিন পূর্বে লিখি। দেবেনবাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ তরজমা করেন এবং শ্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন।

শ্যামাচরণ বাবু যে দিন সমাজে বক্তৃতা করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন হইত। তাঁহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইত। ''ধর্মযুদ্ধে অধর্ম-বিরুদ্ধে সাজ রে সাজ, কি ভয়, কি সংশয়, যতোধর্মস্ততোজয়, সাজ রে সাজ।'' তিনি অবশ্য গদ্যে বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত তাঁহার বক্তৃতার অংশ দিব্য ছন্দের আকারে নেওয়া যাইতে পারে।

''ধর্মযুদ্ধে অধর্মবিরুদ্ধে সাজ রে সাজ।
কি ভয়, কি সংশয়,
যতোধর্মস্ততোজয়।
সাজ রে সাজ!!''

তিনি একবার কোথায় বলিবেন, ''সংসারকে অসার জ্ঞান কর, ওঁকারকে গলার হাব কর'', তাহা না বলিয়া বলিয়াছিলেন, ''সংসারকে সার কর, ওঁকারকে গলার হার কর।'' তিনি গ্রীক জানিতেন। এমন খ্যাত ভাষা নাই, যাহা তিনি জানিতেন না। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীক বক্তা ডিমস্থিনিস্‌কে অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন। এথেননগরবাসী লোকেরা পূর্ব গৌরব এতদূর হারাইয়াছিল যে, মেসিডনের রাজা ফিলিপ সৈন্য লইয়া ঐ নগর আক্রমণার্থ প্রায় শহরের ফটকের নিকট আসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ডিমস্থিনিস্‌, দেশ শাসনার্থ সাধারণতন্ত্রের যে সভা হইত, তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার বক্তৃতা এই বাক্য দ্বারা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ''হে এথেনস্‌বাসী স্ত্রীগণ, আর তোমরা পুরুষ নহ।'' শ্যামাচরণ বাবুও একদিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, ''হে বঙ্গবাসী স্ত্রীগণ! আর তোমরা পুরুষ নহ।'' শ্যামাচরণ বাবুর স্বাভাবিক দক্ষতার প্রধান বিষয় আইন। তিনি তখন তাহার অনুশীলন না করিয়া বক্তৃতা করিতেন।

''যার কর্ম তাকে সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে।''

শ্যামাচরণ বাবু হিন্দু মুসলমান আইন সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্রও অসাধারণরূপে ভাল ছিল। তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার একটি উত্তম জীবনচরিত আমাদিগের আদি ব্রাহ্মসমাজেব উপাচার্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

দুর্গাচরণবাবু সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই বিশ্বাসে যোগ দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা দেশের উপকার হইবে। দেশের উপকার করা তাঁহার প্রাণের ব্রত ছিল। উভয়ে দেবেন্দ্রবাবুর ওখান হইতে গাড়িতে বাসায় ফিরিবার সময় তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, ''রাজনারায়ণ! চল আমরা এদেশ হইতে জর্মেনি অথবা আমেরিকায় গিয়া বাস করি, এদেশের কিছু হইবে না।'' তিনি অভিমান করিয়া এই কথা বলিতেন, উহা মনের কথা ছিল না। অভিমান করিয়া ঐ কথা বলিতেন অথচ দেশের উপকারজনক কার্য হইতে বিরত হইতেন না। তিনি সকল সদনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। এই সময়ে তিনি

ডাক্তারি ব্যবসায়ে সবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ঐ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যদি তিনি পরে পানাসক্ত না হইতেন, তাঁহা দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইত। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান লোক ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা লিখিত তাঁহার একটি জীবনী ইংরাজীতে আছে। কিন্তু উহার লেখা ভাল নহে।

কর্মজীবন

ব্রাহ্ম সমাজে বিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার ক্রমে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দুর্গাচরণ বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু তাহার কার্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্মে ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। ঐ কার্য ছয় মাস করিলে তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্যে নিযুক্ত হই। আমি তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তখনকার সুপ্রীম কাউন্সিল-এর লেজিসলেশন-মেম্বর এবং কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এর সভাপতি মাননীয় সি. এচ্. ক্যামেরন সাহেবের সুপারিশ-পত্র লইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য জন্য তদানীন্তন বেঙ্গল সেক্রেটারী এফ. এচ্. হ্যালিডে যিনি লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর হয়েন, তাঁহার নিকট কতদিন উমেদারী করি কিন্তু তাহাতে সফল হই নাই। উপনিষদের অনুবাদকের কার্য করিবার সময় দেবেন্দ্রবাবু উপনিষদের শ্লোক আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেন ও আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতাম। সন্ধ্যায় উপনিষদ তর্জমা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইতাম। দেবেন্দ্রবাবু আমাকে জাগাইয়া খাওয়াইতেন। সে সকল বন্ধুত্বের কার্য কখনই ভুলিবার নহে।

□ স্যার ডব্লিউ জোনস্-এর পারশীয়ান গ্রামার ইংরাজীতে লিখিত। উদাহরণ সকল পারশি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া পারশিক সৌন্দর্যের আভাস পাইয়াছিলাম। ঐ পুস্তকের আখ্যাপত্রে উহার নাম উভয় ইংরাজীতে ও পারশিতে লেখা আছে। পারশি নাম "শকরেস্তা তসনিকে ইউনসে অক্সফর্ডী", ইহার অর্থ "শর্করাধার অক্সফোর্ডের জোন্‌স্ কৃত।" পারশিতে জোন্‌স্ নামের মুসলমানী প্রতিরূপ "ইউনস্।" "ইউনস্" হিব্রু নাম। তাহা হইতে উভয় পারশি নাম "ইউনস্" এবং ইংরাজী নাম জোনস্ বুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পুস্তকে পারশি কবিতা হইতে যে সকল পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সৌন্দর্য আমার মনকে হরণ করিল। তখন হিন্দু কলেজে পারশি পড়াইবার জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত ছিল। তিনি মস্ত এক আমামা পাগড়ী মাথায় দিয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট পারশি না পড়িয়া আমার পিতাঠাকুরের মুন্সীর নিকট তাহা পড়িতাম। সংস্কৃতের মধ্যে উপনিষদ দেবেন্দ্রবাবুর নিকট পড়িয়াছিলাম ও সংস্কৃত কলেজে যখন ইংরাজী শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত ছিলাম তখন প্রসিদ্ধ জর্মন পণ্ডিত উইলিয়ম অগস্টাস শ্লেগেল প্রকাশিত রামায়ণের আদিকাণ্ড ও কুমারসম্ভবের

প্রথম সর্গ ঐখানকার অধ্যাপকদিগের নিকট পড়িয়াছিলাম। সংস্কৃত বিদ্যার মধ্যে আমার এই অবধি, কিন্তু লোকে বোধ হয় মনে করে আমি সংস্কৃত ভাল জানি। আমার কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ যথাক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তরজমা করি। উক্ত অনুবাদ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বীটন সভার ভূতপূর্ব সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু লিটারারী ক্রনিকল নামক সাময়িক পত্রিকা তখন প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তিনি উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রশংসাসূচক বাক্যের মধ্যে বলিয়াছিলেন "হিন্দু কলেজের একজন গুণী ছাত্রকে দিয়া উপনিষদগুলি অনুবাদ করানো হইতেছে।" ডাক্তার রো এসিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা মুদ্রিত বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা নামক সংগ্রহে তাঁহার কৃত উপনিষদের অনুবাদের ভূমিকায় আমার অনুবাদকে একটি প্রামাণিক অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার এখন বোধ হইতেছে উহা তত ভাল হয় নাই।

দেবেন্দ্রবাবু আমাকে ইংরাজী-খাঁ বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গলা ভাল জানি বলিয়া তিনি জানিতেন না। একদিন আমার প্রথম বক্তৃতা, যাহার প্রথমে "এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবী অবলোকন করিলে" এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রবাবুর তাকিয়ার নীচে রাখিয়া বাসায় চলিয়া আসি। তাহা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রবাবু কি না মনে করিয়াছেন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার পরদিন স্পন্দায়মান হৃদয়ে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার নিকট ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে এরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন যে তাহা বর্ণনাতীত! সেই অবধি বক্তৃতার পর বক্তৃতা সমাজে আমা দ্বারা করা হইতে লাগিল। পূর্বে সমাজে যেরূপ বক্তৃতা হইত (সে সকল বক্তৃতাকারীর মধ্যে অক্ষয় বাবু একজন) তাহার বক্তৃতা জ্ঞানপ্রধান ছিল। আমার উক্ত বক্তৃতাসকলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি। আমি এরূপ প্রীতিভাবের বক্তৃতা যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার একটি কারণ আমার পারশি শিক্ষা। যে সময় ঐ সকল বক্তৃতা করা হইতেছিল সেই সময়ে আমার কোন মহামান্য ধার্মিক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই সকল বক্তৃতা ঈশ্বরের সঙ্গে অমৃত হইল।"

ঐ সকল বক্তৃতা এরূপ প্রশংসাবাদের উপযুক্ত নহে। যদি ব্রাহ্মসমাজে কোন বক্তৃতা অমৃতত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহা হইল পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্যের ব্যাখ্যান। আমি যে সময়ে প্রথম কয়েকটি বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম তখন আমি বাঙ্গলা আদোবে ভাল জানিতাম না। আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গলা পণ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম। কিন্তু মাতৃভাষার এমন বৎসলতা গুণ যে আমি অনায়াসে ঐ সকল বক্তৃতা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে দিন সেই বক্তৃতা রচনা করি যাহার শেষে মুক্তির অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত আছে "সেখানে

চিররবসন্ত, চিরযৌবন, চিরপ্রেম। সেখানে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই—এ অবস্থাতে মোহতরঙ্গের কোলাহল দূর হইতে শ্রুত হইতে থাকে— সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জ্বরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইয়া থাকে'', সেদিন আমার মনে যে কি স্বর্গীয় নির্মলানন্দের উদয় হইয়াছিল তাহা কি বলিব? ''অদ্য পুত্রের সুচারু বদন দর্শন করা, কল্য তাহার মৃত শরীরোপরি অশ্রু বর্ষণ করা'' এই বাক্য যে বক্তৃতায় আছে সে বক্তৃতা যে দিন সমাজে করি সেই দিন একটি ব্যক্তি যাঁহার পুত্রের বিয়োগ অব্যবহিত পূর্বদিন হইয়াছিল তিনি অত্যন্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ঐ বক্তৃতা পড়িয়া বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ কাহার রচিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে রচিত মৃত্যু বিষয়ে আমার একটি প্রধান বক্তৃতা যাহার প্রথমে বক্তা কোন মহামান্য ব্যক্তির মৃত শরীর দেখিয়া বলিতেছেন, ''আহা! ঐ ওষ্ঠদ্বয় হইতে যে পরম পবিত্র তেজোময় অমৃতময় সদ্বক্তৃতা নিঃসৃত হইত তাহা আর নিঃসৃত হইবে না'' ইত্যাদি আছে সে বক্তৃতা যেদিন তত্ত্ববোধিনী সভর তদানীন্তন সম্পাদক বিখ্যাত রমানাথ ঠাকুরের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন সেইদিন মেদিনীপুর হইতে দেবেন্দ্রবাবুর হাতে আসিয়া পৌঁছে ইহাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু প্রথম প্রথম আমার বক্তৃতা পছন্দ করিতেন না। তাহার বিপক্ষে, দেবেন্দ্র বাবুর নিকটে সর্বদা বলিতেন। অনেক লোকের—তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের—নাম করিয়া বলিতেন উহা তাহাদিগের পছন্দ হইত না। আমি মনে করিতাম যে আমার বক্তৃতায় ত অনুপ্রাসের ছটা নাই তাহা ঈশ্বর বাবুর পছন্দ হইবে কেন? কিন্তু অক্ষয় বাবু ক্রমে ক্রমে আমার বক্তৃতা-গুণ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কোন কোন বক্তৃতায় ঈশ্বরপ্রেমের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। যখন মেদিনীপুর হইতে ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ যে বক্তৃতায় বিবৃত আছে তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিই তখন তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে ''আপনি মেদিনীপুর উজ্জ্বল করিয়া আছেন।'' ঈশ্বর গুপ্তের যে সকল গুণ ছিল তাহাতে যে আমি অন্ধ নহি তাহা আমার প্রণীত বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণিত হইবে কিন্তু তাঁহার অনুপ্রাসপ্রিয়তা আমি আদোবে পছন্দ করিতাম না। ঈশ্বর গুপ্ত আমার সম্বন্ধে একবার শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন ''বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।''

১৮৪৬ সালে পূজার সময় দেবেন্দ্রবাবু সঙ্গে আমি উলুবেড়িয়ার নদী ও দামোদর দিয়া নৌকাযোগে বর্ধমান যাই। এই ভ্রমণের সময় আমাদিগের সর্বদা ধর্মচর্চা হইত। আমাদের স্বরূপ কখন কখন মিসেস শেলীর 'দি লাস্ট ম্যান' এই নভেল আমি আপনা আপনি পড়িতাম। আমরা যখন বর্ধমানে গিয়া পৌঁছি তখন দেখি মহারাজা মহাতাব চন্দ বাহাদুর তাঁহার বডিগার্ডের নায়ক কর্ণেল গোলানি সিংহকে আমাদিগের

আহ্বানার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইনি আমাদিগের সঙ্গে করিয়া বর্ধমানে লইয়া যান। তারাচাঁদ বাবুর বাটীতে আমাদিগের বাসা হয়। রাজা প্রত্যহ গরুর গাড়ী করিয়া আমাদিগের জন্য অতি বৃহৎ সিদা পাঠাইতেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি মহাতাব চন্দ বাহাদুরের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। ইনি মনুষ্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ওয়ার্ল্ড-ম্যান এবং গড-ম্যান। ইনি দেবেন্দ্র বাবুকে ''গড-ম্যান'' অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ লোক বলিতেন। ইনি ইহার কিছুদিন পরে বর্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম বৈদান্তিক ধর্ম ছিল। যে প্রণালীতে তখনকার কলিকাতা সমাজের কার্য সম্পাদিত হইত ঠিক সেই প্রণালীতে উহার কার্য সম্পাদিত হইত। ঐ সময়ে কলিকাতার সমাজে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যে অধ্যায়ে প্রথমে ''স্বভাবমেকং কবয়ো বদন্তি'' এই শ্লোক আছে সেই অধ্যায় সমস্বরে সকলে পাঠ করিতেন। যেখানে ''জ্ঞ কাল কালো'' শব্দ আছে সেখানে ''জ্ঞ'' অক্ষরের উপর ভয়ানক জোর দেওয়া হইত। রাজা একদিন তাঁহার সমাজের উপাচার্যকে বলিয়াছিলেন যে 'জ্ঞ'র উপর যেরূপ জোর দেওয়া হয় তাহা শুনিলে আমার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠে। ঐ শ্লোকটা ভবিষ্যতে আর পড়িও না।'' বর্ধমানের এই সমাজ এখনও আছে কিনা বলিতে পারি না। সেইদিন অবধি মহাতাব চাঁদের পুত্র আফতাব চাঁদের সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। আফতাব চাঁদ নিয়মিতরূপে উহাতে উপস্থিত থাকিতেন। আফতাব চাঁদও তাঁহার পিতার ন্যায় বৈদান্তিক ছিলেন। আফতাব চাঁদের সময়ও বৈদান্তিক ধর্মের ব্যাখ্যা হইত। মহাতাবচাঁদ মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বৎসর ঘোর পৌত্তলিক হইয়াছিলেন কিন্তু বর্ধমানের সমাজ উঠাইয়া দেন নাই। আর একটি সমাজের কার্য উক্ত সময়ে বর্ধমানের সমাজ অপেক্ষাও প্রাচীনতর প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। সেটি তেলিনীপাড়া ব্রাহ্মসমাজ। তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সমাজের কর্তা ছিলেন। ঐ সমাজের কার্য ঠিক রামমোহন রায়ের সমাজের কার্যের ন্যায় সম্পাদিত হইত। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন ঐ সমাজ ছিল। প্রত্যেক সমাজের পর একটি করিয়া রীতিমত ভোজ হওয়া চাই। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার মস্ত বাবরি থাকাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে মোর্চণ্ড বলিয়া ডাকিতেন।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের পূজার সময় আমরা পুনর্বার ভ্রমণে বাহির হই। একটি প্রকাণ্ড পিনেসে দেবেন্দ্র বাবুর তখনকার সমস্ত নিজ পরিবার এবং একটি বোটে কেবল আমরা দুইজনে থাকিতাম। প্রতিদিনের ঘটনা একটি দৈনন্দিন লিপিতে লিখিতাম। নবদ্বীপ ও চুপি পার হইয়া পাটুলির নিকট যখন আমরা পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইতে অতি অল্প বাকি আছে, দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন যে দিবা প্রায় গত হইতে অতি অল্প সময় বাকি আছে, অদ্যকার দৈনন্দিন লিপি লিখ। আমি বলিলাম যে

এখন লেখা উচিত হয় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে কত কারখানা হইতে পারে। আমি মন্দের ভবিষ্যদ্বক্তা হইলাম। অল্পে অল্পে উত্তরপশ্চিম কোণে প্রগাঢ় কালো মেঘের সঞ্চার হইল। উভয় পিনেস ও নৌকাকে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, দুএর গুণ জড়াইয়া গেল। দেবেন্দ্র বাবু তখন বোটের ছাতের উপর উপবিষ্ট। এমন সময়ে ভয়ানক বাতাস উঠিল। পিনেসের জোরে বোট কাত হইতে লাগিল। জল উঠিতে দুই কি তিন ইঞ্চ বাকি ছিল। ''কাতান কোথায়! কাতান কোথায়!'' এই শব্দ পড়িয়া গেল। কাতান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। লগি দিয়া গুণ ছাড়াইবার চেষ্টা করাতে লগি দেবেন্দ্র বাবুর নাকের উপর পড়িয়া গেল। তাহাতে তাঁহার নাক কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এই সময়ে বাতাস ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল। আবার দ্বিগুণ তেজে উঠিল। মাঝিরা চেঁচিয়া উঠিল, ''আবার তাইরে'', ''আবার তাইরে।'' এই ''আবার তাইরে'' শব্দ আমার কানে এখনও বাজিতেছে। কাতান ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেল। তাহাতে পিনেসের গুণ কাটিয়া দেওয়া হইল। পিনেস বাতাস উঠিবার পূর্বে উভয় গুণ ও পালে চলিতেছিল। এক্ষণে তাহা কেবল পাল ভরে পেট ফুলাইয়া নক্ষত্রবেগে বাতাসের সম্মুখে যাইতে লাগিল। গুণ কাটিয়া দেওয়াতে আমাদিগের বোটও নক্ষত্রবেগে উচ্চ কাছাড়ে গিয়া লাগিল। বোটের মাথা ও কাছাড়ের তীর উভয় বরাবর হইল, আমরা তীরে লাফিয়া পড়িলাম। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়াছে। এমন সময়ে একটি ছোট ডিঙ্গী আমাদিগের বোটের উপর আসিয়া পড়িল। আমরা বোম্বেটিয়া মনে করিয়া ''কেও! কেও!'' বলিয়া চেঁচিয়া উঠিলাম। দেখিলাম স্বরূপ চাকর কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, হস্তে একটি পত্র। দেবেন্দ্র বাবু ঝিকিমিকি আলোকে চিঠি পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা রহিয়াছে 'ইংলণ্ড হইতে দুঃখের সংবাদ'। তাহাতেই তিনি বুঝিলেন তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের তথায় মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতায় চব্বিশ ঘণ্টায় যাইতে হইবে, তাহা না হইলে বিষয়ের মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাহার পরদিন ভারি ঝড়। সমস্ত নৌকা তীরে বদ্ধ। পাটুলী হইতে পলতা পর্যন্ত একটি মাত্র নৌকা গঙ্গার মধ্যে দিয়া তীরবেগে ছুটিতে দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই নৌকা আমাদিগের বোট। তাহাতে জল খাবারের দ্রব্য সমেত সমস্ত পরিবারের সহিত দেবেন্দ্র বাবু উপবিষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পলতায় পৌঁছিলেন। যখন নৌকা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে পলতায় গিয়া পৌঁছিল তখন নৌকার খোলে এক খোল জল। মাঝিরা বলিল, ''আর একটু বিলম্ব হইলে নৌকা টুপ করিয়া ডুবিয়া যাইত''। পলতাতে গাড়ি প্রস্তুত ছিল। রাত্রি থাকিতে দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতার বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি পিনেসে বংশবাটীর চন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে কলিকাতাভিমুখে মন্থর গতিতে চলিলাম। তিনি স্বরূপ খানসামার—(?)

সেই অবধি দেবেন্দ্র বাবুর বিষয়ের যে জোড় উপস্থিত হইল সে জোড় অদ্য বার বৎসর মাত্র (অদ্য ১২৯৬ সাল) সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়াছে। বিঘ্নবিনাশন

পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ অসাধারণ সৎব্যবহার দ্বারা তিনি ঐ জোড় পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। "সততাই শ্রেষ্ঠ পন্থা" তাঁহার জীবন এই বাক্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। সততা অবলম্বন না করিলে তাঁহার বিষয়ের কিছুমাত্র থাকিত না। যাঁহারা তাঁহার জীবনের ইতিহাস বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন। সততা অবলম্বন না করিলে " সমূলো এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃত মভিবদতি" এই বাক্য প্রতি অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার সম্বন্ধে খাটিয়া যাইত তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে রাজকীয় ঠাটে থাকিতেন। সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে "প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত; কেহ কেহ "প্রিন্স টারাগোনা" বলিয়া ডাকিত। 'টেগোর' হইতে 'টারাগোনা' করিয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি একেবারে দ্বারকানাথ ঠাকুরে মোহিত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে নয়রত্ন অলঙ্কার ও অনেক বহুমূল্য উপহার দিয়াছিলেন। এই অসাধারণ ব্যয়শীলতা নিবন্ধন তাঁহার যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রায় এক ক্রোড় টাকা দেনা আর প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাত্র বিষয় রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'কার, টেগোর এণ্ড কোং' নামক তাঁহার বিখ্যাত হৌস দেউলিয়া হইল। দেবেন্দ্র বাবু সকল মহাজনদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার অসাধারণ সরলতাতে সকলেই মুগ্ধ হইল। তিনি দেনা শোধের যেরূপ বন্দোবস্ত প্রস্তাব করিলেন তাহাতেই তাহারা সম্মত হইল। তখনকার সম্বাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল "সকল উত্তমর্ণই তাঁহার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।" তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রবাবু একেবারে হঠাৎ অত্যন্ত পরিমিতাচারী হইলেন। প্রতিদিন চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পৃথিবীর যাবতীয় উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য পূরিত টেবিলের পরিবর্তে ফরাসের উপর বসিয়া কেবল রুটি ডাল ভক্ষণ করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু সুরাপান করিতেন। এই সময় হইতে তাহা চিরকালের মতন পরিত্যাগ করেন। কেবল পীড়ার সময় ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত আর কখন ব্যবহার করেন নাই (১৮৯০)। সম্পর্কে খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর কতবার তাঁহাকে অধিকাংশ বিষয় সম্বন্ধে দেউলিয়া আদালতে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কত বার তিনি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আমাদিগকে বলিতেন যে "খুড়া মহাশয় আমাকে বিষয় বেনামী করিয়া দেউলিয়া নাম লইতে বলিতেছেন, কিন্তু আমি তাহা কখন লইব না।" আমাদিগের সঙ্গে এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করিতেন বলিয়া, কালী ভট্টাচার্য নামক তাঁহার পিতার একজন মাতাল মোসাহেব আমার নিকট একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন তাহার অর্থ এই যে "পূর্বে গরুড়ের ন্যায় পক্ষী পরামর্শদাতা ছিল, এক্ষণে বায়স সকল বাবুর পরামর্শদাতা হইয়াছে।"

দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কিরূপে তাঁহার পিতার আদ্যকৃত্য করিবেন

ইহা তখনকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রভূত আন্দোলনের বিষয় হইল। বিখ্যাত শিরসামুদ্রিক কালীকুমার দাসের ভ্রাতা রত্ন ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ী কৈলাসকুমার দাস তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি যদি অপৌত্তলিক প্রণালীতে আপনার পিতার আদ্যকৃত্য না করেন তাহা হইলে আমরা আপনার দলে থাকিব না। দেবেন্দ্র বাবু শ্রাদ্ধের দিন পিণ্ড দান না করিয়া কেবল দানোৎসর্গ করিলেন। ঠিক যে ব্রাহ্ম প্রণালীতে ক্রিয়া সম্পাদন হইল বলা যায় না। কিন্তু তখনকার হিন্দু সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক সাহসের কার্য বলিতে হইবে এবং ইহা ব্রাহ্মধর্মের প্রথম অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যাহা হউক একান্ত ব্রাহ্ম প্রণালী অনুসারে না হওয়াতে সম্বাদপত্রে বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমি দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে ইংলিশম্যান পত্রে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইংলিশম্যান পত্রে দেবেন্দ্র বাবুকে আক্রমণ করাতে আমি দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে উক্ত পত্রে সমর্থন করি। কলেজেও তাঁহার সঙ্গে টক্করাটক্করী, কলেজ পরিত্যাগ করিয়াও টক্করাটক্করী। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার স্নেহভাব কখনও তিরোহিত হয় নাই। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যুসমাচার পাইয়া কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এবার আদ্যরস হয়। কলিকাতার হাটখোলার দত্তদিগের বাটী আদ্যরস হয়। স্বর্গীয় অভয়াচরণ দত্ত মহাশয় আমার শ্বশুর ছিলেন। ইঁহারা পূর্বে বড় মানুষ ছিলেন। ইঁহার জেঠতুতো ভাই কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয়। কালীপ্রসাদ দত্তের বিষয় আমি আমার "সেকাল ও একাল" পুস্তকে লিখিয়াছি। মেদিনীপুর জেলায় নাড়াজোলের মধ্যে কোতবপুর জমিদারী ইঁহাদিগের দুইজনের নামে ছিল। ইহা হইতে তখনকার বিখ্যাত কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম উপস্থিত হয়। এক্ষণে ঐ জমিদারী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। আমার যখন এই বাটীতে বিবাহ হয়, তখন দত্তপাড়ায় হুলস্থূল পড়িয়া যায়। ব্রহ্মসভার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিল বলিয়া হুলস্থূল পড়িয়া যায়, কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয় তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি আমাকে যারপ'রনাই স্নেহ করিতেন। আমার ভ্রাতাদিগের বিধবাবিবাহ দিলেও তাঁহার স্নেহের ন্যূনতা হয় নাই। তিনি বিলক্ষণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের বাটীতে অনেক সংস্কৃত পুস্তক ছিল। ইনি একজন শাক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোকদের প্রতি ইঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। তাঁহাদের প্রতি যেরূপ স্নেহ ব্যবহার করিতেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। হিন্দুরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করে না, ইংরাজেরা যে তাহাদিগের অপবাদ দেয় তাহা অমূলক। আমার যখন হাটখোলার দত্তদিগের বাটী বিবাহ হয়, তখন ইঁহাদিগের হ্রাসের অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত ছাতু বাবুর (আশুতোষ দেবের) পিতা রামদুলাল সরকার ইঁহাদিগের সংসারে সরকারী করিতেন। এই খাতিরে ছাতুবাবু আমার শ্বশুর মহাশয়কে তাঁহার দুস্থাবস্থাতে অর্থ সাহায্য করিতেন। শ্বশুর মহাশয় ঋণ জন্য তাঁহার হাটখোলাস্থ ভবন হারান। যখন

তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি ছাতু বাবুর সালকিয়ার বাগান বাটীতে বাস করিতেন।

দেবেন্দ্র বাবুর আয় হ্রাস হওয়াতে ও তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের জন্য অধিক লোক প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে আমি ১৮৪৮ সালের প্রথমে সমাজের কার্যালয়ের সহিত (সমাজের কার্যের সহিত নহে) সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। তাহার পর দেড় বৎসর বসিয়া থাকি। এই সময়েও পিতৃতুল্য দেবেন্দ্র বাবু আমাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেন। তৎপরে ইংরাজী ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। ঐ সময়ে ছোট আদালতের জজ আমার সমাধ্যায়ী ও পরমবন্ধু গোবিন্দ রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—যিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে প্রথম বিধবা বিবাহ্ করেন ও পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন— তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালা কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার সাহিত্যের, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অলঙ্কারের, বিখ্যাত নৈয়ায়িক নরনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায়ের এবং সুরসিক ও বিখ্যাত স্মার্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন-এর সভাপতি এবং সুপ্রীম কাউন্সিল-এর লেজিসলেশন-মেম্বর অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন সাহেব বীটন বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। যে দিন উহা সংস্থাপন হয় সেদিন ফ্রিমেসনেরা পতাকা উড়াইয়া ও বাদ্যোদ্যম করিয়া মহা সমারোহের সহিত কলিকাতার রাস্তা দিয়া গমন করিয়া উহার মূল প্রস্তর নিখাত করেন। দ্বারে পূর্ণকুম্ভ ও অশোক স্থাপিত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের সকল শোক ও দুঃখ অপনীত হইবে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ উক্ত অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বাটী হইতে যে সকল গাড়িতে বালিকাদিগকে স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত সেই সকল গাড়ির গায়ের উপরে মহানির্বাণতন্ত্রোদ্ধৃত ''কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ'' এই বাক্য অঙ্কিত ছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বীটন সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। যাঁহারা প্রথমে তাঁহার বিদ্যালয়ে বালিকা দেন, তাহার মধ্যে তর্কালঙ্কার একজন। তিনি বীটন সাহেবকে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহা আমা দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতাম এমত নহে। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অল্প-বিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সকল ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান। ইনি বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উক্ত ভাষা ও সাহিত্যের পুরাবৃত্ত সম্বলিত একটি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে (১৮৯০) হুগলি নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য এই সময়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, যিনি নিজ চক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন তিনিই কেবল বুঝিতে পারেন। এক একদিন অক্ষয় বাবুর রচিত প্রস্তাব সকল তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার পূর্বে তাহা সংশোধন করিতে করিতে তিনি গলদ্‌ঘর্ম হইতেন। "সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতংযদ্বিভাতি" এই শ্লোক তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ হইতে দেবেন্দ্রবাবু প্রথম উদ্ধার করেন। অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর উহা উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা বিহিত বোধ করেন। তাহার পর অনেক আলোচনা ও চিন্তার পর "শান্তং শিবমদ্বৈতং" উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা স্থিরীকৃত হয়। "ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়" ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ এবং "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়" এই প্রার্থনাটুকু আমা দ্বারা প্রবর্তিত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী হইতে লওয়া হয়। ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞাপত্রে যে কত পরিবর্তন ও সংশোধনের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রথমে এমন একটি প্রতিজ্ঞা ছিল যে উপাসনা সময়ে কোন জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিব না। যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারা উপাসনা সময়ে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইয়া গেলে তাহা আবার পরিতেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় (উপনিষদ) অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয় কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। উক্ত অধ্যায়ে মনু হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত আছে তাহা আমি মনুসংহিতা হইতে উদ্ধার করিয়া দিই। উক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে মনু হইতে "নাত্ত্বাদূষণ" এই বাক্য যে শ্লোকের প্রথমে আছে, তাহা উদ্ধৃত ছিল। উহার অর্থ এই, মাংসাহারে কোন দোষ নাই। ঐ শ্লোকটি পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। সমাজে হারমোনিয়ম ব্যবহার করিবার পূর্বে একর্ডিয়ন দিনকতক ব্যবহার করা হইয়াছিল। কঠোপনিষদের যে শ্লোকের প্রথমে আছে "ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমন্য" সেই শ্লোক একর্ডিয়নে গাওয়া হইত। এক একদিন দেবেন্দ্রবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর এইরূপে গাওনাতে বড় আনন্দ হইত। কিরূপ আনন্দ হইত তাহা এই নিম্নের লিখিত গল্প দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। চন্দ্রনাথ রায় নামে দেবেন্দ্র বাবুর একটি পারিষদ ছিলেন। ইঁহাকে দেবেন্দ্র বাবু পরে একটি নায়েবি কর্ম দেন। ইঁহার বাটী বংশবাটী গ্রামে ছিল। ইনি একরাত্রি বাসায় ফিরিয়া না যাইতে পারাতে দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় শয়ন করিয়াছিলেন। পার্শ্বের ঘরে দেবেন্দ্র বাবু শুইয়াছিলেন। ঐ রাত্রিতে সন্ধ্যার পর বড় ব্রহ্মানন্দ হয়। দুই প্রহর রাত্রি বেলায় দেবেন্দ্র বাবু "দুপ্‌ দুপ্‌" এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে চন্দ্রনাথ রায় নৃত্য করিতেছেন। এ কি, জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন "আমার নাচ পাইয়াছে কি করি?" লোকের যেমন ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, তেমনি নাচ পায় ইহা অদ্ভুত কথা। এই সময়ে

পরস্পর পরস্পরকে আমরা শাস্ত্রোক্ত নামে ডাকিতাম। কাহারো নাম শৌনক ছিল, কাহারো নাম জরৎকারু, কাহারো নাম অষ্টাবক্র ছিল। অক্ষয় বাবু শীর্ণকলেবর, তাঁহার নাম আমরা জরৎকারু রাখিয়াছিলাম।

কোন বন্ধুর স্ত্রীকে পত্রেতে দেবেন্দ্র বাবু মৈত্রেয়ী বলিয়া ডাকিতেন। উপনিষদের আলোচনায়, উপনিষদোক্ত শ্লোক গানে এবং তখনকার ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব আলোচনায় আমাদিগের দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইত। এখন যেমন ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে দেখা হইলে কেবল পরস্পরে ব্রাহ্মনায়কদিগের দোষ গুণ আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হয়েন সেরূপ ভাব তখন ছিল না। কোন ব্রাহ্মের সঙ্গে দেখা হইলে ঈশ্বরবিষয়ক কথোপকথনে এবং ব্রাহ্মদিগের সদ্‌গুণ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। খাঁটি ঈশ্বর প্রসঙ্গে অনেকটা সময় যাপিত হইত। তখন ভগবদগীতার এই শ্লোকানুসারে অনেকটা কার্য হইত।

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।"

ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কিনা, ইহা সর্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। আমরা যে এইরূপ বিশ্বাস করিতাম তাহা আমার "ডিফেন্স অফ ব্রাহ্মইজম এ্যাণ্ড দি ব্রাহ্মসমাজ" নামক পুস্তিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

After the death of Ram Mohan Ray, the catholic character of the Samaj was not destroyed. Even while its leaders admitted the Vedas to be a revelation, they did so solely on account of the "reasonableness and cogency of these doctrines" (see Vedantic Doctrines Vindicated) as compared with the other Shastras of the Hindus and the religious scriptures of other nations. They rejected the idea of a revelation supported by external evidence. "The only ground" they said "on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it." "If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisom—if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them—the man who has received them and continues to place his trust in them will have no reason to fear the vituperative— (?) of ungodliness in respect

to his religion" (Vedantic Doctrines Vindicated). The letter of Babu Devendra Nath Tagore published in the *Englishman* in October, 1846 speaks of his religion as one "whose principles are echoed to by the dictates of that of nature and of human reason and human heart and *by the sense of the wisest of all ages and centuries."* The Revd. Mr. Mullens in his "Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity" says: "Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth they look primarily upon the works of nature as their religious teacher. From nature they learned first and because the Vedas (as they assert) agree with nature therefore they regard them, as inspired." He quotes in support of the above assertion the following passages from the "Vedantic Doctrines Vindicated." "The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths which of man unperverted by fallacious reasonings afford in abundance." It is, therefore, evident that the leaders of the Samaj at this time considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and cogency of these doctrines. Their errors lay in believing that whatever they contained was reasonable and cogent. As soon as they perceived their mistakes after a wider study of the Vedas, they shook it off at once. Now, why did they do so easily? The reason is that a higher standard of belief had always predominated in their minds as shown by the above extracts from these publications over that of written revelation, that is, the standard of reason, and, as conscientious men, they could not continue professing that to be a revelation which was found to contain errors."

["রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর সমাজের (ব্রাহ্মসমাজের) উদার-নীতি লোপ পায় নাই। এমন কি ইহার নেতৃগণ যে বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার মূলে ছিল এই মতগুলির 'যৌক্তিকতা এবং সারবত্তা' ("বেদান্তিক ডক্‌ট্রিন্‌স্ ভিণ্ডিকেটেড্" দেখুন)। ইহার সহিত হিন্দুদিগের অপরাপর শাস্ত্র এবং অন্যান্য জাতির ধর্মশাস্ত্রগুলির তুলনা করুন। যে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বাহ্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ তাহা তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহারা বলেন 'কোন বিশ্বাসের সত্যতা যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে সেই ভিত্তির প্রয়োজন যে-ভিত্তি মতগুলির প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া বিরাজমান।' উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ ধর্মতত্ত্বের মতগুলি এবং ধর্মাচরণের সূত্রগুলি যদি প্রবল যুক্তি ও প্রজ্ঞার অনুগামী হয়, যদি এই নীতি এবং উপদেশবাণীগুলি ইহাদের অন্তর্গত অনভিযোগ্য সত্যকে বহন করে, তাহা হইলে যে-ব্যক্তি ইহাদের গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাদের উপর তাহার আস্থা অটুট রাখিয়াছে, অপবাদের জন্য তাহাকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে না।" ("বেদান্তিক ডক্‌ট্রিন্‌স্ ভিণ্ডিকেটেড্") ১৮৪৬-এর অক্টোবরে ইংলিশম্যানে প্রকাশিত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রে আছে যে তাঁহার

ধর্ম সে-ই, ''যে-ধর্মের নীতিগুলি প্রকৃতির সত্যের অনুগামী, মানবিক যুক্তি ও মানবের অন্তরের অনুকূল এবং যাহা সর্বকালের সাধক মনীষীদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত।'' রেভারেণ্ড শ্রী মুলেন্স তাঁহার 'এসে অন্ বেদান্তিজম্, ব্রাহ্মইজম্ এন্ড্ ক্রিশ্চিয়ানিটি' গ্রন্থে বলিতেছেন যে, ''ব্রাহ্মগণ বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া দাবী করেন সত্য, কিন্তু সর্বাগ্রে তাঁহারা প্রকৃতির লীলাকে তাঁহাদের গুরুরূপে গ্রহণ করেন। প্রকৃতি হইতেই তাঁহারা সর্বপ্রথম জ্ঞান লাভ করেন এবং যেহেতু বেদ প্রকৃতির অনুগামী সেইজন্য তাঁহারা বেদকে প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার করেন।'' এই মতের স্বপক্ষে তিনি ''বেদান্তিক ডক্ট্রিন্স্ ভিণ্ডিকেটেড্'' হইতে উদ্ধৃতি দিতেছেন; ''প্রেরণার উৎস হইতে লব্ধ জ্ঞানের সম্পর্ক চিরন্তন সত্যগুলির সহিত, আর এই চিরন্তন সত্যগুলি পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে একমাত্র সমগ্র সৃষ্টিকে এবং অপাপবিদ্ধ মানুষের মনকে।'' সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে এই সময় সমাজের নেতৃগণ যে বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার করেন তাহার মূলে ছিল এই মতগুলির যৌক্তিকতা ও সারবত্তা। তাঁহাদের যে ভুল হয় তাহার কারণ ইহাদের অন্তর্গত সমস্ত কিছুকেই তাঁহারা যুক্তিযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লন। বেদের ব্যাপক অধ্যয়নের পরে যে-ই তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন তৎক্ষণাৎ তাহা বর্জন করিলেন। তবে কথা উঠিতে পারে যে কেন তাঁহারা একাজ সহজে করিলেন? কারণ এই যে, লিখিত প্রত্যাদেশ ছাড়াও তাঁহাদের মনে এক উচ্চতর বিশ্বাস সর্বদাই জাগরূক ছিল, অর্থাৎ যুক্তির বিশ্বাস, এবং বিবেকবান ব্যক্তি হওয়ার দরুণ তাঁহারা সেগুলিকে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বলিতে অস্বীকৃত হইলেন যেগুলি ভুলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।'']

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে দেবেন্দ্র বাবুর প্রথম সময়ের ব্রাহ্মেরা প্রকৃত প্রস্তাবে বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতেন না।

যে চারিজন যুবক পণ্ডিত দেবেন্দ্র বাবু দ্বারা কাশীতে প্রেরিত হয়েন তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর বেদকে উপরে উল্লিখিত দুর্বলাকারেও ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইবে কি না এই লইয়া আমাদিগের মধ্যে মহা তর্ক উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক; অক্ষয় বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। দুই জনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে বেদকে আর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্তব্য নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয় বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্থিরীকৃত হয় তাহার গৌরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্তব্য নহে কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয় বাবুর বন্ধুরা ইহার গৌরব কেবল তাঁহাকেই দিয়া আসিতেছেন। যিনি সর্বপ্রধান ও যাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে

কোন পরিবর্তন আদোবেই সাধিত হইতে পারিত না, তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত হইল অমনি তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা ইহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন না। রক্ষণশীল স্বভাব হইয়া অগ্রসর হওয়া আরো গৌরবের বিষয়।

ইংরাজী ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্র বাবু ও আমি আসাম প্রদেশ দেখিবার জন্য ক্যাপ্টেন হিক্‌লে সাহেবের নেতৃত্বের অধীন যমুনা নামক ষ্টীমারে আরোহণ করি, তখন আমার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর। আমরা গঙ্গাসাগর তৎপর বড় সুন্দরবন দিয়া আসামাভিমুখে গমন করি। বড় সুন্দরবন দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম যে এই একটি ক্ষুদ্র প্রণালী এত ক্ষুদ্র যে ষ্টীমার তাহাতে ফিরিতে পারে না, তাহার অব্যবহিত পরেই এমন একটি বিস্তীর্ণ নদী যে সমুদ্রবিশেষ। আমরা ষ্টীমারের উপরিভাগ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিতাম ওপারে হরিণ চরিতেছে, ব্যাঘ্রের ডাক এক রাত্রিতে শুনা গিয়াছিল। একদিন আমরা যাইতেছি দেখিলাম সুন্দরবনে যে সকল কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে যায় তাহার মধ্যে একজন নৌকা করিয়া ষ্টীমারের নিকট আসিয়া কাপ্তেন সাহেবকে বলিল যে আমাদিগের বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিৎ বারুদ ও গুলি আমাদিগকে দিউন, আমরা এই মরা হরিণ আপনাকে দিতেছি। সেই হরিণটি সেইদিনই তাহারা শীকার করিয়াছে। কাপ্তেন বলিলেন যে ইংলণ্ড হইলে এই হরিণের দাম ৫০ টাকা হইত, ভারতবর্ষে অল্প গুলিবারুদের বিনিময়ে তাহা পাওয়া গেল। আমাদিকের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাইখরচ দরুণ কাপ্তেন সাহেব ৪ টাকা করিয়া লইতেন কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না। এমন কাপ্তেন আমরা কখন দেখি নাই। ঐবার আমাদিগের ভাগ্যক্রমে ঐরূপ কাপ্তেন জুটিয়াছিল। কাপ্তেন সাহেব বোধ হয় আর জীবিত নাই। তিনি যে লোকে এখন থাকুন না কেন, অবশ্য ঐ স্বল্প আহার দেওয়ার জন্য তিনি এক্ষণে অনুতপ্ত হইতেছেন সন্দেহ নাই। একদিন ডিনারের সময় দেবেন্দ্র বাবুকে খানসামা গো-মাংসের কাবাব দিতে যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, গো-মাংস আমি খাই না।

আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙ্গালীতর; আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই। আমি মধ্যে মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে কিন্তু সচরাচর প্রত্যহ দুইবেলা মাছের ঝোল ভাত না খাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খানা খাইলে শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। স্টীমারে কিরূপ জীবন যাপন করিতে হয় তাহা পূর্বে জানিলে সেইরূপ উপায় করা যাইত অর্থাৎ ফুলের তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইতাম। স্টীমারে রুক্ষ স্নান ও দিবসের মধ্যে তিনবার অর্থাৎ হাজরি টিফিন ও ডিনরে মাংস খাওয়াতে ঢাকায় না পৌঁছিতে পৌঁছিতে তিন চারি দিবসের মধ্যে বিজাতীয় গরম হইয়া উঠিল। রাত্রিতে ঘুম হয় না। ঢাকায় যখন স্টীমার পৌঁছিল

তখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে দেবেন্দ্র বাবুকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে ঢাকায় নামাইয়া দিলেন। আমি মাছের ঝোল খাইবার অভিলাষে আমার কলেজের সমাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ঈ, চ, মি, র বাসায় আশ্রয় লইতে তদভিমুখে গমন করিলাম। ইনি তখন আবগারী কমিশনার ডনেলী সাহেবের হেড কেরানি। বেতন ২০০ টাকা। তখনকার ২০০ টাকা এখনকার (১৮৯০) ৬০০ টাকার সঙ্গে সমান। আমি তাঁহার বাসাভিমুখে গমন করিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখি তিনিও টেবিল পাতিয়া ইংরাজী রকমে আহার করিতেছেন। কি করি আমি বসিয়া গেলাম। পাছে আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী বলিয়া মনে করেন এই জন্য তাঁহাকে মাছের ঝোলের কথা তিন চারি দিন বলিতে আমার সাহস হইল না। পরে বিজাতীয়োপরি বিজাতীয় গরম হওয়াতে আমি তাঁহাকে একদিন আমার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহার স্ত্রীর একজন মুসলমান দাসী ছিল। তাহাকে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সে মুসলমান বলিয়া পেঁয়াজ রসুন দিয়া কি এক রকম জিনিষ তৈয়ার করিয়া দিল তাহা আমার বড় খারাপ লাগিল। তৎপরে ঈ-বাবুর স্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া পাঠনোতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া স্বহস্তে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনেক দিনের পর মাঝের ঝোল খাইয়া তাহা গলার ভিতর দিয়া পেটে যখন পড়িল কি পর্যন্ত ঠাণ্ডা হইলাম বলিতে পারি না। ঈ-বাবু একদিন এক কাণ্ড করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবার সাধ হওয়াতে তিনি পার্শ্বের ঘর হইতে তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও কোনমতে আসিবেন না। পরে আমি এ ঘর হইতে অনেক বলাতে আলাপ করানো কার্য হইতে বিরত হইলেন। অনেক দিন ইংরাজী রকমে সাবান মাখিয়া রুক্ষ স্নান করাতে অত্যন্ত গরম হওয়াতে একদিন ঈ-বাবুর চাকরকে দিয়া বাজার হইতে তৈল আনাইয়া নীচের তলায় একটি অন্ধকার ঘরে তৈলমর্দন করিতেছিলাম। সে অন্ধকার ঘরে ঈ-বাবুর কখন আসিবার প্রয়োজন হয় নাই। সেদিন কোন প্রয়োজনবশতঃ আসাতে আমি তৈলমর্দনরূপ অপকর্ম করিবার সময়েই তাঁহা কর্তৃক ধৃত হইলাম। তিনি বলিলেন, ‘‘এ কি’’? আমি বলিলাম, ‘‘তৈল বাজার হইতে আনাইয়া মাখিতেছি। অনেক দিন তৈল না মাখাতে গরম বোধ হইতেছে।’’ তিনি বলিলেন, ‘‘আমাকে বলিলে হইত, আমি আনাইয়া দিতাম।’’ আমি বলিলাম, ‘‘পাছে তুমি আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী ঠাওরাও এইজন্য বলি নাই।’’ এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লিখিতাম না: ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে আমাদিগের যৌবনকালের কোন কোন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তির আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহা জানাইবার জন্য লিখিলাম।

আমি সংস্কৃত কলেজ হইতে মেদিনীপুর বদলী হই। তথাকার জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। ইং ১৮৫১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ কর্মে বসি। ঐ তারিখ হইতে ১৮৬৬ সালের ৬ই মার্চ পর্যন্ত আমি ঐ কর্ম করি। শেষোক্ত

তারিখে আমার মাথাঘোরা পীড়া আরম্ভ হয়। সেই অবধি এখনও ঐ পীড়ায় ভুগিতেছি। আমি পীড়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। আমি পনেরো বৎসর কয় মাস ঐ কর্ম করি। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার জীবনের যে সকল কার্য করি তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—

(১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন।

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতি সাধন।

(৩) জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা সংস্থাপন।

(৪) সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন।

(৫) বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন।

(৬) বক্তৃতা, ধর্মতত্ত্বদীপিকা ও ব্রাহ্মধর্মসাধনা।

(৭) 'ডিফেন্স অব ব্রাহ্মইজম্ এ্যাণ্ড দি ব্রাহ্মসমাজ' নামক বক্তৃতা প্রণয়ন।

আমার মেদিনীপুরস্থ কর্মে আমার পূর্বে দুই দুই জন সাহেব ছিলেন; তাঁহাদিগের নাম টীড এবং সিনক্লেয়ার। টীড সাহেবের সময় উক্ত স্কুল সংস্থাপিত হয়। তিনি নিজে কর্মের প্রতি বিলক্ষণ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু সিনক্লেয়ার সাহেব বার্ধক্যবশতঃ ছিলেন না। তাঁহার সময় স্কুলের বড় দুরবস্থা হয়। তিনি তিনশত টাকা করিয়া পাইতেন ও স্কুলের হাতার ভিতর একটি বাঙ্গলায় থাকিতে পাইয়াছিলেন। আমি দেড় শত টাকা পাইতাম ও উক্ত বাঙ্গলায় থাকিতে পাইতাম। আমি যে বৎসর স্কুলের কাজে বসিলাম সেই বৎসরই দুই তিনজন বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রায় প্রতি বৎসর বালকেরা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইত। বালকদিগকে ভালবাসা দ্বারা চালিত করা আমার শিক্ষকতাকার্যের নিয়ম ছিল। প্রথমে কার্যে বসিয়া দুই একজন বালককে শারীরিক দণ্ড প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা হইতে পরে একেবারে নিবৃত্ত হই। শিক্ষা দিবার সময় অনেক শিক্ষাপ্রদ অথচ আমোদজনক গল্প করিতাম তাহাতে বালকদিগের মন আমার প্রতি বড় আকৃষ্ট হইত। পুস্তকের কোন স্থলের অর্থ একেবারে বলিয়া দিতাম না, প্রশ্নশ্রেণী দ্বারা প্রকৃত অর্থ তাহাদিগের মুখ হইতে বাহির করিতাম। এখন (১৮৯০) শুনিতে পাই কলেজে ছাত্রেরা কেবল শ্রোতা। শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন, বালকেরা কেবল নোট লিখিতেছেন। বৈশম্পায়ন বক্তা, পরীক্ষিৎ শ্রোতা। না আছে বালক কর্তৃক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা, না আছে শিক্ষক কর্তৃক বালককে জিজ্ঞাসা। আমি শিক্ষায় এই প্রণালী ঘৃণা করি। আমি বালকদিগের জন্য বিতর্কসভা সংস্থাপন করিয়াছিলাম। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা ও বক্তৃতাশক্তি সঞ্চার হইবার জন্য তাহা স্থাপন করি। আমি কেবল বালকদিগের মানসিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী ছিলাম এমন নহে, শারীকি উন্নতির প্রতি যত্নবান ছিলাম। আমি মেদিনীপুরের সেচ বিভাগের কর্তা ক্যাপ্টেন বিডেল সাহেবের পরামর্শ অনুসারে মেদিনীপুরসস্থ স্কুলের হাতার ভিতর একটি র‍্যাকেট কোর্ট চাঁদা করিয়া নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি তজ্জন্য

একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রে আমার প্রশংসা করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্র এই—

"It is a common saying that the natives of this country will do nothing to help themselves and that they must be assisted by the Government or by the European community. An example has just occurred at Midnapore to show that this is not always the case and when kindly advised and shown how they can benefit their race, they are not slow evern in that slowest of all operations the subscribing funds to attain the object when they feel certain it is for a particular good.

These observations arise naturally when one sees as at Midnapore a large building erected in the school compound for the manly games of Fives and Rackets and learns that it has been raised by subscriptions amongst the parents, guardians and friends of the boys, but it is so and when asked whether they required the aid of Government to complete the building, it is refreshing to learn that the reply was a respectful negative.

Great credit is due to the Head Master, Babu Raj Narain Bose, and it is a certain proof of the esteem in which his character is held that he has been able to raise the necessary subscriptions "Ce nest que la premier par qui conte." Another subscription has been set on foot among the friends of the boys to supply backs to the forms and stools for the feet of the pupils, who will no longer be placed like notes of interrogation on the forms with legs dangling, a position that weakens and deforms the frame of a growing stripling who has thus to combat with physical weaknesss in pursuing his mentally wearying studies. This is good progress and as I maintain, shows that the natives are not unwilling to help themselves when put on ti.e way of doing so."

["সচরাচর বলা হইয়া থাকে যে এ-দেশের অধিবাসিগণ নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য কোন চেষ্টাই করে না এবং সরকার কিংবা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সাহায্য বিনা এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু মেদিনীপুরের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সর্বক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। যদি সহৃদয়ভাবে

তাহাদের পরামর্শ দেওয়া যায় এবং দেখাইয়া দেওয়া হয় কিভাবে তাহারা তাহাদের জাতির উপকার সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা এমন কাজও সম্পন্ন করিতে পারে যে-কাজ সম্পন্ন করিতে সাধারণতঃ বহু যুগ লাগে অর্থাৎ চাঁদা দেওয়া এবং চাঁদার টাকা জোগাড় করার কাজ। যখন তাহারা সম্যক বুঝিতে পারে যে ইহাতে তাহাদের বিশেষ কল্যাণ হইবে তখন তাহারা ইহাতেও পিছপাও নয়।

এমন মন্তব্য করার কারণ আছে। যদি কেহ দেখে যে মেদিনীপুরের বিদ্যালয়-অঙ্গনে পুরুষোচিত 'ফাইভস্ এবং র‍্যাকেট্স্' খেলার জন্য এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে এবং যদি কেহ শোনে যে বালকগণের মাতাপিতা, অভিভাবক এবং বন্ধুদিগের চাঁদার টাকায় এই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন ঐরূপ মন্তব্য না করিয়া থাকা যায় কি? বিশেষ করিয়া যদি তাহাদের জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এই অট্টালিকা নির্মাণ করিবার জন্য তাহাদের সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল কিনা, তাহারা সসম্মানে কিন্তু একবাক্যে বলিবে: "না"।

ইহার জন্য প্রধান শিক্ষক বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভূত প্রশংসা দাবী করিতে পারেন। উপরন্তু ইহা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, লোকে তাঁহাকে কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা করে, যাহার দরুণ তিনি এত চাঁদা তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর একটি নূতন ব্যাপারে চাঁদা উঠাইবার কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। এই কাজ সম্পন্ন হইলে ছাত্রদের আর পা ঝুলাইয়া প্রশ্নের চিহ্নের মত বসিয়া থাকিতে হইবে না। কাজটি হইল পিঠের জন্য ঠেস এবং পায়ের জন্য টুল সংগ্রহ করা। প্রশ্নের চিহ্নের মত ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিলে বালকদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, বিশেষ করিয়া যখন তাহারা মস্তিষ্কের ব্যবহারে নিয়োজিত। দেহের বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইলে মনেরও ক্ষতি হইতে পারে। এই ব্যাপারে চাঁদা উঠাইবার ব্রতকে প্রশংসা করিতেই হইবে। উন্নতির পথে ইহা আর একটি ধাপ। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই দেশের অধিবাসীরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে অনিচ্ছুক নয়, যদি তাহদের পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়।]

কাপ্তেন বিডেল সাহেবের ন্যায় স্থানীয় স্থানীয় শিক্ষাসমাজের (Local Committee of Public Instruction--এর) এক একজন সভ্য এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষাকার্যে মনোযোগী ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ সভ্যদিগের ঔদাসীন্যের সহিত আমাকে সংগ্রাম করিতে হইত। সেই ঔদাসীন্যের দুই একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

স্থানীয় শিক্ষাসমাজের অধিবেশনে এক বৎসর পরীক্ষক সকল নির্দিষ্ট হয়। পরীক্ষার বিজ্ঞাপনী পত্রের উপর সিবিলিয়ান ট্রিভর গ্রান্ট (যিনি বাদ্শাই আলসে ছিলেন) লিখিয়া দিয়াছিলেন,

"Was happy in the idea that he was not on the Committee at all. Has not been gazetted."

"তিনি কমিটিতে ছিলেনই না, এই ভাবিয়া তিনি সুখে ছিলেন। গেজেট করা হয় নাই।"

Multiplication is vexation
Addition is as bad;
The Rule of Three doth puzzle me
And practice drives me mad.
গুণ করা বড় জ্বালা।
রুল অফ্ থ্রী বিহ্বল করিয়া দেয়।
প্র্যাক্‌টিস্ দেয় পাগল করিয়া।
ট্রিভর গ্রাণ্ট,
পরীক্ষক।

আর একবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মিঃ ব্রাইট ও বারিক মাস্টার (ক্যাপ্টেন শর্ট) সাহেব আসিয়া কমিটি করিয়া লিখিয়া যান—

ক্যাপ্টেন শর্ট ও মিঃ ব্রাইট উপস্থিত।

চার ঘটিকা উত্তীর্ণ।

It was resolved that as the Secretary and other members were not present the meeting should be adjourned *sine die* with a vote of thanks to the chair.

[সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে যেহেতু সম্পাদক এবং অন্যান্য সভ্য অনুপস্থিত, সেইহেতু সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা উচিত।]

ইহা ব্রাইট সাহেব লিখিয়াছিলেন। তৎপরে বারিক মাস্টার শর্ট সাহেব লিখিয়াছিলেনঃ

The meeting having adjourned, it is proposed *en passant* that the boys anxious to become students be examined as to their physical prowess, the best being:

To go head foremost through an inch *saul* board.

"Vivat Regina."

[সভা স্থগিত হইলে প্রস্তাবিত হয় যে, যে বালকগণ পড়ুয়া হইতে আগ্রহান্বিত, তাহাদের পরীক্ষা যেন দৈহিক বিক্রমের ভিত্তিতে লওয়া হয়। এমন পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ বিষয় হইল এক ইঞ্চি পুরু বোর্ডের মধ্য দিয়া সর্বাগ্রে মস্তক চালাইয়া দেওয়া।

"ভিভা রেজিনা"।]

এই সব লেখা হইতেছিল এমন সময় সম্পাদক কলেক্টর ডব্লিউ, এচ্ ব্রডহার্স্ট সাহেবের বগির শব্দ শুনা গেল। অমনি উপরোক্ত দুইজন সাহেব সুড় সুড় করিয়া আর এক দ্বার দিয়া পলাইয়া গেলেন। কলেক্টর সাহেব আসিয়া আমাকে তম্বি করিতে লাগিলেন, "তুমি কি জন্য ইহা লিখিতে দিলে"? আমি উত্তর দিলাম "আমি কি করিব?" তৎপরে সম্পাদক একা মিটিং করিলেন। তিনি কর্তব্যপরায়ণ লোক

ছিলেন কিন্তু তত বুদ্ধিমান ছিলেন না। লোকেল কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে এক একজন সভ্য অতিশয় শিক্ষোৎসাহী ছিলেন। জি, এফ, ককবার্ন মেদিনীপুরের কলেক্টর ছিলেন। তৎপরে পরম্পরা কলিকাতার চীফ্ ম্যাজিস্ট্রেট ও পাটনা ও কটকের কমিশনর হয়েন, তিনি শিক্ষাকার্য বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ডব্লিউ, লুক জাজও এইরূপ উৎসাহী ছিলেন। তিনি "রাজনারায়ণ বেদান্তবাগীশ" বলিতেন। বেদান্টিস্ট না বলিয়া বেদান্ট বলিতেন। তখন যদ্যপিও আমরা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিতাম, মতে অনেকটা বৈদান্তিক ছিলাম। জে, এচ্, রেভিট কার্নাক সাহেবও ঐরূপ ছিলেন। তিনি এক্ষণে (১৮৮৮ সাল) গাজিপুরের অহিফেন এজেন্ট।

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংস্থাপন ও উন্নতি সাধন। আমি ইংরাজী ১৮৫১ সালের প্রথমে মেদিনীপুরে যাই। তাহার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে কোন্নগর নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব দ্বারা [মেদিনীপুর সমাজ] স্থাপিত হয়। এই সময় শিবচন্দ্র বাবু মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন জন্য শিবচন্দ্র বাবুর উপর কত কটু-কাটব্য বর্ষিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি অপরাজিত চিত্তে তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি শ্লেষ করিয়া প্রভাকর পত্রে লিখেন তিনি ক্ষীণ শাখা অবলম্বন করিয়াছেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিতেন; ইহাতে সে ঐরূপ শ্লেষ করিয়াছিল। আমি যখন মেদিনীপুর যাই তাহার অনেক পূর্ব হইতে সমাজ আদোবে ছিল না; প্রথম তখনকার আবকারী সেরেস্তাদার বলাগড় নিবাসী শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা-বাটীতে উপাসনা হয়। তৎপরে স্কুলগৃহে আমার আলয়ে হইত। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজী ১৮৫২ সালের প্রথমে পুনঃ সংস্থাপিত হয়। উহার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবে যে বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ বিবৃত করি সেই বক্তৃতা অভিব্যক্ত হয়। কয়েক বৎসর পরে চাঁদা দ্বারা এক সমাজগৃহ নির্মাণ করা যায়। ইহার নির্মাণে দুই সহস্র টাকার কিছু অধিক পড়ে, তন্মধ্যে দেবেন্দ্র বাবু আটশত টাকা দেন। আমার বাসা তাহা হইতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেই অবধি সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। যেদিন নূতন গৃহে উঠিয়া যাওয়া যায়, সেইদিন বহুসংখ্যক কাঙ্গালী ভোজন হয়। এই কাঙ্গালী ভোজনের কর্মে প্রচলিত হিন্দুধর্মাবলম্বীরা পর্যন্ত যোগ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটি ধর্মালোচনা সভা এবং তাহা উঠিয়া গেলে একটি সঙ্গত সভা স্থাপন করা যায়। এই দুই সভাতে ধর্মবিষয়ক নানাকথা আলোচিত হইত। মেদিনীপুরে এতদূর পর্যন্ত কার্য করিয়াছিলাম যে কতকগুলি ব্রাহ্ম গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জমিদার নবীনচন্দ্র নাগ, অখিলচন্দ্র দত্ত এবং নীলকমল দে ছিলেন। অখিলচন্দ্র দত্ত প্রচারক হইবার জন্য মানস করিয়াছিলেন। তিনি প্রচারকের কার্যে উপদেশ পাইবার জন্য প্রধান আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন বেড়াইয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার জমিদারীতে গিয়াছিলেন। রাস্তায় পীড়িত হওয়াতে প্রধান আচার্য মহাশয় স্বহস্তে তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি এত স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। এই অখিলচন্দ্র দত্ত পরে "মেদিনী" নামক মেদিনীপুরের বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি সম্পাদকের কার্য অত্যন্ত নির্ভীকতার সহিত সম্পাদন করিয়ছিলেন। তাঁহার ভয়ে মেদিনীপুরের উভয় ইংরাজ ও বাঙ্গালী গভর্নমেন্ট কর্মচারীরা জড়সড় হইয়াছিলেন।

আমার ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে অধিকাংশ বক্তৃতা মেদিনীপুরেই করা হইয়াছিল। আমি ধর্মতত্ত্বদীপিকা মেদিনীপুরে আরম্ভ করি ও মেদিনীপুরেই সমাপন করি। ইংরাজী ১৮৫৩ সালে আমি উহা আরম্ভ করি, ৬৬ সালে উহা শেষ করি। এই ধর্মতত্ত্বদীপিকা প্রণয়নই আমার স্বাস্থ্যনাশের প্রধান কারণ। উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল। ধর্মতত্ত্বদীপিকাকে উহার ভূমিকায় আমার মানসকন্যা বলিয়াছি। আমার বন্ধুদিগকে আমি উপহাস করিয়া বলিয়া থাকি, "ঐ বেটি আমাকে খেলে।" ব্রহ্মসাধন পুস্তকও সেখানে রচনা করি। ব্রহ্মসাধন পুস্তকের সাধারণ ভাব আপহামের ইণ্টিরীয়র লাইফ হইতে নীত। আমার নিজেরও অনেক ভাব উহাতে আছে। দুঃখের বিষয় যে ঐ গ্রন্থ কেহ ছোঁয় না; কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার নিজের মত এই যে উহা আমার সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ব্রহ্মসাধন পুস্তক পাঠ করিয়া কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে লোকে উহার তত্ত্বসকল আপনার জীবনে উপলব্ধি না করিলে এরূপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হয় না। কেশববাবু আমার ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। মেদিনীপুর থাকিতে আমার ইংরাজী গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল 'ডিফেন্স অফ্ ব্রাহ্মইজম্ এ্যাণ্ড ব্রাহ্মসমাজ' বক্তৃতা প্রণয়ন করি। মেদিনীপুরে আমাদিগের ধর্মোৎসাহের সীমা ছিল না। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইতেছে। আর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইঁহাকে আমি ব্রাহ্ম করি। অনেকে অনুমান করেন যে রাজা রাধাকান্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন, তাঁহার পৌত্র ব্রাহ্ম হওয়া তাহার একটি প্রধান কারণ। চুঁচুড়ার প্রেমচাঁদ গুপ্ত একজন সুমধুর ব্রাহ্ম গায়ক। তাঁহার মেদিনীপুর গমনে আমাদের ব্রহ্মসঙ্গীত চর্চা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একদিন সমস্ত রাত্রি কুমার ব্রজেন্দ্রের বাটীতে তাঁহার গাওনা হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে দুই একজন যাঁহারা মদ্যপান করিতেন এই সকল সঙ্গীত সভায় তাহা করিতেন না। ইহার পূর্বে আমাদের দ্বারা মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপিত হওয়াতে আমার সঙ্গীদিগের অনেকে মদ্যপান হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত দিবসে এত প্রমত্ততার সহিত ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়াছিল যে একজন ব্রাহ্ম বলিলেন যে আমাদিগের প্রমত্ত ব্যবহারের শব্দ দূর হইতে যাহারা শুনিতেছে তাহারা হয়ত বলিতেছে যে "ঐ পাড়ায় মাতালের গ উঠেছে।" প্রভাত সময়ে একজন ব্রাহ্ম প্রস্তাব করিলেন যে, "এই মুখে চলুন (মেদিনীপুরের নিকটস্থ)

গো-গিরিতে যাওয়া যাক।'' আমরা অমনি তথায় চলিলাম। সেখানে সমস্ত দিন গাওনা হয়। গো-গিরিতে মেদিনীপুরের সদরআলা বাবু অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত (ইনি একজন ভক্তিমান ব্রাহ্ম ছিলেন) তাঁহার ওখানে সন্ধ্যার পর সঙ্গীত ও তৎপরে ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্মধর্মের দুইটি ভাগ আছে—একটি মধুর ভাগ, একটি কঠোর ভাগ। মধুর ভাগ ব্রহ্মসঙ্গীত, কঠোর ভাগ ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান। আমরা যদি ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া কাল কাটাইতাম তাহা হইলে আমরা ধর্মবিলাসী উপাধির উপযুক্ত হইতাম। কিন্তু আমরা কেবল ধর্মবিলাসী ছিলাম না, অনুষ্ঠানও করিতাম। মেদিনীপুরে অনেকগুলি ব্রাহ্ম আমার উপদেশে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। আমি যে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠন আরম্ভ করি তাহা মেদিনীপুরেই করি। আমার ব্রাহ্মধর্মের প্রথম অনুষ্ঠান আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম মতে দেওয়া। এই বিবাহ মহা জাঁকজমকের সহিত দেওয়া হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি আরম্ভ হয় নাই। ঐ বিবাহ উপলক্ষে দেবেন্দ্রবাবু ও কেশববাবু উভয়েই মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক ব্রাহ্ম এই উপলক্ষে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। বিবাহসভা কলিকাতার ব্রাহ্ম ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম এবং মেদিনীপুরস্থ প্রচলিত হিন্দুধর্মাবলম্বী লইয়া হয়। সভাটি মহতী হইয়াছিল। তখন হারমোনিয়ম বাদ্যযন্ত্র ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বাদ্যযন্ত্র কলিকাতা হইতে আনাইয়া সঙ্গীত সময়ে বিবাহসভায় বাজান হইয়াছিল। এই বিবাহে কেশববাবু প্রধান আচার্য এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মেদিনীপুরের পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম মেদিনীপুর জিলা স্কুলের হেডপণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয় আচার্যের কর্ম এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পুরোহিতের কার্য করিয়াছিলেন। বিবাহকার্য এত জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয় যে দেবেন্দ্রবাবু পরে বলিয়াছিলেন যে রাজারাজড়ার বিবাহে এমন হয় না। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন। ইঁহার বক্তৃতাশক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। ইঁহার বক্তৃতাশক্তি এমন ছিল যে ইঁহার নাম আমি ম্যাসিলন অফ্ বেঙ্গল রাখিয়াছিলাম। ইনি এতদিন জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মধর্মের অনেক উপকার সাধিত হইত। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী শ্রীমান কৃষ্ণধন ঘোষকে আমার ধর্মতত্ত্বদীপিকা উৎসর্গ করি। মেদিনীপুরে অবস্থিতিকালে আমি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে নূতন প্রথা প্রবর্তিত করি। সে প্রথা নৈসর্গিক শোভায় শোভিত সুরম্যস্থানে কখন কখন উপাসনা। বসন্তকালে মেদিনীপুরের গো-গিরিতে আমাদিগের বসন্তোৎসব হইত। এই উপলক্ষে বৎসর বৎসর আমি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহা ''বসন্ত-কুজন শিরে'' আমার বক্তৃতা পুস্তকে আছে। এখনও (১৮৯০) প্রতি বৎসর গো-গিরিতে উক্ত উৎসব হইয়া থাকে। আমি মেদিনীপুর নগরে থাকিতে মেদিনীপুর জেলার অন্যত্র কখন কখন প্রচার করিতে যাইতাম। ১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম সাইক্লোন অর্থাৎ ঘূর্ণবাত হয়। ঝড়ের এমনি তেজ হইয়াছিল যে কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গা হইতে জাহাজ সশরীরে তুলিয়া ওপারের মাঠের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। মেদিনীপুর নগরে ঝড়ের

এত তেজ হয় নাই তথাপি প্রবল ঝড় হইয়াছিল বলিতে হইবে। ঝড়ের পর আমি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর গ্রামে অথবা উপনগরে প্রচার করিতে যাই। জলেশ্বর সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। জলেশ্বর সুবর্ণরেখার ধারে দেবদার বৃক্ষের দীর্ঘ শ্রেণী ও তাহার নিকটস্থ সুরম্য দৃশ্য আমার মনে এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। আমার ছাত্র তথাকার পোস্টমাস্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অতিথি হইয়া জলেশ্বরে অবস্থিতি করি। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন জলেশ্বরের নিমকের কারখানা উঠিয়া গিয়াছিল। নিমক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দিব্য কুঠিখানি পড়িয়াছিল। আমি গিয়া তাহা দখল করিলাম। তথায় থাকিয়া নিকটস্থ জলেশ্বর এবং বিখ্যাত লক্ষ্মণনাথ গ্রামে প্রচার করি। লক্ষ্মণনাথে ও জলেশ্বরে মেদিনীপুর জেলার দুইটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম থাকিতেন। তাঁহাদিগের নাম কুমারনারায়ণ মিত্র ও কার্তিকচন্দ্র রায়। কার্তিকচন্দ্র রায় জলেশ্বরবাসী। কার্তিকচন্দ্র রায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের বংশোদ্ভব। জলেশ্বরে পৌঁছিয়াই শুনিলাম যে লক্ষ্মণনাথের কুমারনারায়ণ মিত্রের কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে। ইহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। কার্তিকচন্দ্র রায় আমাকে বলিলেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যুসময়ে আমার বক্তৃতা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণনাথ গ্রামের জমিদার শিব নারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র লালা যদুনাথ রায়ের বাটীতে উপাসনা করি। উপাসনার পর তিনি আমাকে ভোজন করান। তাঁহার বাটীতে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ডথালা বাটি ঘটি ও গাড়ু দেখিলাম এমন কোনখানে দেখি নাই। তাহা কলির ক্ষুদ্রাকৃতি মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী নহে, সত্যযুগের দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যের উপযোগী। যেদিন উপাসনা হয় সেদিন প্রথম শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাকে বসাইবার জন্য সেইদিন তাঁহার প্রকাণ্ড গালিচা পাতিয়া দিয়াছিলেন। অন্যদিন সেই গালিচা ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিলেন যে পূর্বে সংবাদ পাইলে আনিবার জন্য মেদিনীপুরে হাতী পাঠাইয়া দিতেন। আমি লালা যদুনাথ রায়ের বাটীতে যে উপাসনা করিয়াছিলাম সে উপাসনা তাঁহার মনের উপর কিছু কার্য করিয়াছিল এমন বোধ হইল। জলেশ্বরে থাকিবার সময় একদিন তথাকার দারোগার বাটীতে গিয়া তাঁহাকে ধর্মকথা শুনাই। তাহা শুনিয়া তিনি আমার পা জড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন এবং বলিলেন, "আমি ঘোর পাপী, আমাকে পরিত্রাণ করুন।" আমি বলিলাম, "মনুষ্যের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল ঈশ্বরই পরিত্রাণ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। পরিত্রাণ কেবল তাঁহারই হাতে।"*

[*উত্তরকালে এই ব্যক্তি পুলিসের কর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মালোচনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। মেদিনীপুর জেলায় সবঙ্গ পরগণার অন্তর্গত জামনা গ্রামে ইঁহার নিবাস। এই স্থানে তাঁহার ঠাকুরসেবাদি ধর্মকর্মের এখনো বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ইনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের ভক্ত বলিয়া খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। নাম—৺হরপ্রসাদ দাস (দারোগা)।]

জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা

এই সভার কার্যবিবরণ হইতে 'প্রস্‌পেক্‌ট্যাস অফ এ সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অফ ন্যাশ্‌নাল ফীলিং এমং দি এডুকেটেড নেটিভস্‌ অফ বেঙ্গল' রচিত হয়। হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভার পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা "গুড নাইট" না বলিয়া "সুরজনী" বলিতেন। ১লা জানুয়ারি দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত। মেদিনীপুরের কোন বিখ্যাত উকিল এইরূপ কড়াকড়ি দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে আপনি ক্রমে ভয়ঙ্কর পদার্থ হইয়া উঠিতেছেন। ইহার পর লোকে আপনার নিকট ঘেঁসিবে না। আমা দ্বারা মেদিনীপুরের বহু সভা স্থাপিত হওয়াতে ও সভা আহ্বানকারী লেফাফা ক্রমিক লোকের মধ্যে ঘোরাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে এক সভানিবারণী সভা সংস্থাপন করা কর্তব্য।

সুরাপাননিবারিণী সভা সংস্থাপন

প্যারীচরণ সরকারের সভার পূর্বে উহা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হয়। উহা বঙ্গদেশে প্রথম সংস্থাপিত সুরাপাননিবারণী সভা। উহার অনুষ্ঠানপত্রে এই কথা লিখিত ছিল যে পরিমিত পান করা মানে একটি ছিদ্র রাখা। মেদিনীপুর স্কুলের হেডপণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী সুরাপানের বিপক্ষে কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহা উৎসাহের সহিত ঐ সভায় গাওয়া হইত। এই সুরাপাননিবারণী সভার জন্য আমাকে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। মাতালেরা স্কুল ইন্‌স্পেক্টর এচ্‌ এল. হ্যারিসন* সাহেবের নিকট আমার নামে মিছামিছি নালিশ করে যে স্কুলের সময়ে আমি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকরি। এই দরখাস্তে আমার সম্বন্ধে "ফেনাটিক্‌" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "ফ্রান্‌টিক্‌" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। এমনি ইংরাজী বিদ্যা। মাতালদিগের আক্রোশের কারণ রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর সুরাপাননিবারণী সভার সভ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে মাতালদিগের জটলা হইত ও পোলাও খাওয়া হইত। তাঁহাদিগের আড্ডা ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে তাঁহারা আমার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। ইনস্পেক্টর সাহেব তাঁহাদিগের দরখাস্তের কোন খবর লইলেন না। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর

*ইনি এক্ষণে কলিকাতার মিউনিসিপাল সভার সভাপতি। ১৮৮৯ সাল।

যেরূপ সুরাপাননিবারণী সভার সভ্য হয়েন, তাহার বৃত্তান্ত অতীব কৌতুকজনক। একদিন স্কুলের হাতার চবুতরার উপর বসিয়া আছি, রাত্রি দশটার সময় মেটে মেটে জ্যোৎস্নাতে দূর হইতে একটি ঝগ্গালগ্গা পোশাকধারী এক ব্যক্তি আসিতেছেন দৃষ্ট হইল। নিকটে আসিলে দেখিলাম তিনি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর। তিনি সেই সময় অত্যন্ত মাতলামি করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এখনই সুরাপাননিবারণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে চান। আমি বলিলাম, "সহসা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দুদিন পরে তাহা ভঙ্গ করা অপেক্ষা প্রতিজ্ঞাপত্রে না স্বাক্ষর করাই ভাল।" তিনি বলিলেন, তিনি কখনই ভঙ্গ করিবেন না, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তৎপরে শুনিলাম যে তাঁহার স্ত্রীর উপদেশানুসারে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, এবং যখন ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন তখন তিনি বলিলেন যে, "লাখ টাকার কোম্পানির কাগজ আমাকে দিলে যত না সন্তুষ্ট হইতাম, এ প্রতিজ্ঞাপত্র পাইয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলাম।" ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরে শুনিলাম যে যখনই মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আসিতেন তখনই মদ খাইতেন। তৎপরে মাতাল ও দুরাচার হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র নিম্নলিখিত ব্রহ্ম সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন।

"আরো কি ভয় আছে?
যে ভয় তোমারো কাছে॥
আর সদা করিহে ভয়
তোমারে হারাই পাছে।"

আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রথমাংশ রচনা করেন

"সকলই তাঁহারই কৃপায়
ভাল মন্দ ভাব কেবল সংসারের মায়ায়!!"

আমি এই গীতটি সম্পূর্ণ করি। উহা আমার দ্বিতীয় ভাগ বক্তৃতা পুস্তকের শেষে আছে।

১৮৬৬ সালের ৫ই মার্চ তারিখে আমার প্রথম শুইয়া শুইয়া মাথা ঘোরে। তাহাতে আমি বড় ভীত হই। ঐ দিন আমার বায়ুরোগের আরম্ভের দিন। এই বায়ুরোগ জন্য প্রিয় মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

আমি মেদিনীপুর পরিত্যাগের পর যে সকল কাজ করি তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। মাথাও ঘুরিতেছে কার্যও করিতেছি।

(১) ব্রাহ্মদিগের নরপূজা নিবারণ।
(২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা।
(৩) সেকাল একাল বিষয়ক বক্তৃতা।

(৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক লেকচার।
(৫) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন।

(১) ব্রাহ্মদিগের নরপূজা নিবারণ। ব্রাহ্মসমাজে যে নরপূজা আরম্ভ হইয়াছে ইহা ইংরাজী ১৮৬৮ সালের প্রথমে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কানপুরে গিয়া যে উপাসনা করেন তাহা দেখিয়া প্রথম আমি অনুভব করি। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পরে দেওয়া যাইবে। আমার অনেক ইংরাজী পুস্তিকায় অবতারবাদ ও নরপূজার বিপক্ষে লেখা আছে। কোন খ্রীষ্টীয়ান পত্রিকা লিখিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি ২।৩ টি লোক যদি হাঁ হাঁ করিয়া না পড়িতেন তাহা হইলে কেশবচন্দ্র সেনের অনুবর্তীরা অবশ্যই অবতারবাদে উপনীত হইতেন।

(২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে লেকচার প্রদান। হিন্দুধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি। একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, খ্রীষ্টীয়ধর্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে হিন্দু ধর্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি হয়। ঐ বক্তৃতা ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ভবনে করা হয়। এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্রাহ্ম ঐ বাটীতে বাস করিতেছেন। আমি যখন বক্তৃতা করি তখন উহাতে হিন্দু ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন হইত। যেদিন বক্তৃতা করা হয়, সেদিন লোকে লোকারণ্য। এইজন্য লোকে লোকারণ্য যে এমন যে পচা জিনিস হিন্দুধর্ম ইহার পক্ষে একজন কি বলিতে পারে তাহা শুনা কর্তব্য। সেইদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার অনেক মহোদয় বক্তৃতার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ডাক্তার বক্তৃতা হইবার কিছুদিন পরে আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে "তুমি যখন বলিলে যে ঋগ্‌বেদের হিন্দুধর্ম ও বর্তমান হিন্দুধর্ম ভিন্ন আকার হইলেও তাহা এক, আমি মনে করিলাম ইহা অতি অসম্ভব কথা, কিন্তু যখন তুমি বলিলে যে বালক রামচন্দ্র ও প্রৌঢ় রামচন্দ্র ভিন্ন আকার হইলেও একই রামচন্দ্র তখন আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম।" বক্তৃতা করিবার সময় করতালি ঐ বাটীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই কেবল দিয়াছিলেন এমত নহে, বাটীর সম্মুখেস্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান শ্রোতারা পর্যন্ত উহা দূর হইতে শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন। বক্তৃতা হইবার পর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে কেহ বলিয়াছিলেন "শুনিলে তো, এক্ষণে গোবর খাইয়া পুনরায় হিন্দু হও", তাহাতে তিনি বলিলেন যে "বক্তাকে আগে গোবর খাওয়াও।" আমি হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম, প্রচলিত হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে যাহা

অখাদ্য তাহা হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা অনেকে খাইতেন, সেই অপবাদ লক্ষ্য করিয়া নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা করিবার পর সাকারবাদী কলিকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার একজন প্রধান সভ্য ভরতচন্দ্র শিরোমণি উক্ত সভায় ঐ বক্তৃতা পুনরায় করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সাকারবাদীদিগের সহিত একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার ভয়ে আমি তাহা হইতে বিরত হই। ভরতচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ বলিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহা রক্ষা করিলেন। তদানীন্তন এডুকেশন গেজেট সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃত্রিম নাম ধরিয়া ঐ পত্রের প্রেরিত স্তম্ভে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার লেখার এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, ''আমি রাজনারায়ণ বসুর গোঁড়া।'' সিমুলিয়ার পর্বতস্থিত একটি সাকারবাদী বাঙ্গালীসভা উহার সভ্য হইতে আমাকে অনুরোধ করেন; কিন্তু সাকারবাদীদিগের সহিত একীভূত হইবার ভয়ে তাহা হইতে বিরত হই। আমাকে তাঁহারা এবিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আমাকে তাঁহারা ''হিন্দুকুলচূড়ামণি'' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। আসাম প্রদেশে পদ্মহাস গোস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ছিলেন। পদ্মহাস উপবীত পরিত্যাগ করাতে তাঁহার খুল্লতাত উক্ত কার্যের ঔচিত্যানুচিত্য বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমাকে এক পত্র লেখেন, এই পত্রে আমাকে ''কলির ব্যাসদেব'' বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহাতে আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার পত্রের উত্তরে আমি এই কথা বলি যে জ্ঞানযোগ হইলে লোকে অবশ্যই উপবীত ত্যাগ করিতে পারে, আমাদিগের শাস্ত্রে এমন বিধি আছে কিন্তু পদ্মহাসের সেরূপ জ্ঞানযোগ হইয়াছে কিনা তাহা আমি এত দূর হইতে বিচার করিতে অসমর্থ। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা করিবার পর উক্ত বক্তৃতা লইয়া ভারতবর্ষে ও কিয়ৎপরিমাণে বিলাতে মহান্দোলন উপস্থিত হয়। কলিকাতার প্রগাঢ় সাকারবাদী হিন্দু বিখ্যাত শিবচন্দ্র গুহ বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণবাবুর একটি প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করা কর্তব্য। মাদ্রাজ প্রদেশীয় মসলিপত্তনের অর্জনুলু নামক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে ইংরাজীতে পত্র লেখেন যে, ''আপনি ঐ বক্তৃতার ইংরাজী ভূমিকাতে, যে দশটি বিষয়ে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যুক্তির দশটি ব্রহ্মাস্ত্র।'' কলিকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর আমার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া এক পত্র লেখেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ উল্লিখিত ইংরাজী ভূমিকার শেষে দিয়াছি। উহা আমার সামান্য সার্টিফিকেট নহে। উক্ত বক্তৃতা হিন্দুসমাজে কিরূপ আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমি ত্রিবেণীর নিকট আকনা গ্রামে ধর্ম প্রচার করিতে যাইতাম। যখন

সেখানে যাইতাম তখন তথাকার বিখ্যাত ব্রাহ্ম ভূতপূর্ব সবজজ নবীনকান্ত পালিতের বাটীতে থাকিতাম। একবার তাঁহার বাটীতে আছি, সবজজ পদধারী ঐ গ্রামের গাঢ় সাকারবাদী হিন্দু বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের সহিত তথায় আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার বাটীতে একবার উপাসনা করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। উপস্থিত শ্রোতাদিগকে আমার এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন যে, ইনি অন্যরূপ ব্রাহ্ম নহেন। ইনি হিন্দু ব্রাহ্ম। এই দুর্গাপ্রসাদবাবু আমার বক্তৃতার অনেক খন্ড ক্রয় করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে শাস্ত্র হইতে আরো অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যদি ঐ বক্তৃতা পরিপুষ্ট করেন তাহা হইলে তাহা ছাপাইবার ব্যয় আমি দিতে পারি। এইরূপে উক্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে যেমন অনুকূল মত সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তেমনি তীব্র প্রতিবাদিতাচরণও পাইয়াছিলাম। বক্তৃতার দিন একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান উঠিয়া ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে এমন সকল তীব্র প্রয়োগ ও সভাস্থলে সাধারণতঃ এমন অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন যে সভাপতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমরা অনেক ধরে করে তাঁহাকে আনিয়া পুনরায় সভাপতির আসনে বসাই। বিখ্যাত বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তদানীন্তন নিজ সম্পাদিত সংবাদপত্রে ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে বলেন যে, শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর হইতে আনীত চুন দ্বারা হিন্দুধর্মের কলি ফেরান হইতেছে। মেদিনীপুরে আমার অধিক দিন অবস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিশনারী ডাক্তার মরে মিচেল্ উহার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন, কিন্তু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত বক্তৃতার প্রতি প্রতিকূল ভাব না দেখাইয়া "হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধমের পূর্ব সূচনা" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কেশববাবু উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কলিকাতায় দুইটি ও এলাহাবাদে একটি বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বিখ্যাত চেলা ও এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও একটি বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কেশববাবুর দলের ব্রাহ্মেরা বক্তৃতার পর বক্তৃতা ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের মুখপত্র 'মিরার' এমন দিন ছিল না যে আমাকে গালাগালি না দিতেন। কেশববাবুর দলের দুইজন ব্রাহ্ম মাত্র ঐ বক্তৃতার প্রতি অনুকূলভাব দেখাইয়াছিলেন। সেই দুইজন অবলাবান্ধব-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আসামমিহির-সম্পাদক যদুনাথ চক্রবর্তী। যদুনাথ চক্রবর্তী তখন আসাম প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ বক্তৃতা উর্দুতে অনুবাদ হইয়াছে ও উহার ইংরাজী অনুবাদ থিওসোফিস্ট পত্রিকায় প্রায় নয় বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছিল (এক্ষণে ইং ১৮৮৯ সাল)। উক্ত বক্তৃতা লইয়া বিলাতেও কিয়ৎ পরিমাণে আন্দোলন হয়। তদানীন্তন ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকা সম্পাদক জেমস্ রুটলেজ সাহেব বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন। তিনি ঐ বক্তৃতার বহুল প্রশংসা করিয়া উহার সারমর্ম টাইমস্

পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই বক্তৃতা বিষয়ক আন্দোলনের সময় তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের তুলনা করিয়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়াতে লেখেন। তাহাতে হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম শ্রেষ্ঠ বলেন; কিন্তু আমার বক্তৃতার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই প্রশংসার চোট দেখিয়া একটি বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন যে "বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইয়াছে।" "The lion and the lamb have lain together"*

---

*রুটলেজ সাহেবের নিম্নলিখিত উক্তিসকল পাঠ করিয়া, বোধ হয়, উল্লিখিত খ্রীষ্টীয়পত্র সম্পাদক এই কথা বলিয়াছেন।

"The Mythology of greece and Rome is nowhere. The bloody religious rites of our own fore-fathers cannot even be traced with any certainty or accuracy. But this faith of India goes back not to a ruder but to a purer period and presents truths embodied in poems that humanity in all its future will not allow to perish. Until a man can see this, he really has no right to attempt to reason on the subject. Again Hindooism has produced immense charity and kindness, ascetic devotion almost unrivalled, and an endurance for the faith which no conqueror has been able to shake. When the Crusaders and Mussalmans were confronting each other in the name of religion for the posssession of the "Holy land" the faith of India inculcated a severe reprobation of blood-shedding even of the brute creation, and the result is seen to this day, down to the very children, who never dream of torturing or killing animals or birds, while English boys often make such torturing and killing a delight. The devotion, too, running into every act of life is something that is entitled to the respect of all men. Again, the faith is national, and that is a loyal nature which is difficult to shake from its father's faith. We grant so much, not as something extorted from us by the logic of fact, but with pleasure that so much that is of truth and right are existent in this ancient race." ভট্ট মোক্ষমূলার তাঁহার প্রণীত "ধর্মবিজ্ঞানের" ভূমিকা Introduction to the Science of Religion গ্রন্থে ঐ বক্তৃতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং টাইমস্ পত্রে প্রকাশিত সারমর্ম তাহাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

"And the Christian Misssionaries in these days to foreign lands, what does their work mean ? Some of the men are humbugs, some of them flatter natives or scorn them. Some who never would

have been above the work-shop at home earn a fair livelihood here and are *sahibs*, eat better, drink better, and clothe better than at home and have *five* servants or more where in England they would not have had one."

"We shall not be suppossed to be writing with one unkindly feeling against either the Hindoo people or their faith. We think at all events, that we shall not. We shall look upon their beautiful Durga festival without one thought to jar with the beauty of the sight. We repeat, we utterly disclaim the charge of imputing to the people mere image-worship. We believe their festivals have a suggestive and marvellous history, reflex of ages, dead and gone, of the thoughts of master minds to whom reflection was as their daily bread, if not more. We think that their faith has been cruelly caluminated. We revere its charity, its humanity, (hatred of cruelty) its gentleness, its endurance, its thoughtfulness, its friendliness, and much more. We believe in very much, Babu Rajnarain Bose has proved his case. It is something to be tolerant, to be 'religious in every act of life', to cause religion to run into laws, politics, economy, every thing, to have such a grand antiquity and such a mighty grasp on the human mind that ages upon ages of disasters have not unloosened the hold. We can admire this. We wish we could follow the threads of its story into dark times, and study so great a marvel of the human mind."

"Babu Rajnarain Bose has a right to his views, and we admire his manliness."

"গ্রীস এবং রোমের পুরাণগুলির হদিস পাওয়া ভার। এমনকি এতটুকু নিশ্চয় করিয়া কিংবা সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই আমাদের নিজেদের পূর্ব পুরুষগণের রক্তাক্ত ধর্মাচার প্রথাগুলি কি ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের এই বিশ্বাসের খোঁজ প্রাচীন যুগেও পাওয়া যায়; প্রাচীন বলিতে বর্বরযুগ নয়, সভ্যতর যুগকেই বুঝায়। এই বিশ্বাস কবিতায় মূর্ত হয় এবং মনুষ্যসমাজ কখনও চাহিবে না যে এই কবিতাগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইয়া যাউক। এই দিকে দৃষ্টি না দিয়া যদি কেহ এই বিষয়ে তর্ক করে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইহাতে তাহার কোন অধিকার নাই। হিন্দুধর্মের জন্য প্রভূত দয়া-দাক্ষিণ্য সম্ভব হইয়াছে, অতুলনীয় ঈশ্বরভক্তি ও নিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে এবং বিশ্বাসের সহিত যে সহন-মন্ত্র আনিয়াছে তাহা কোন বিজেতাই কোনদিন টলাইয়া দিতে পারে নাই। ক্রুসেডারগণ এবং মুসলমানগণ ধর্মের নামে, "পবিত্র ভূমি" দখলের নামে যখন যুদ্ধ করিতেছিল তখন ভারতবর্ষের এই বিশ্বাস রক্তপাতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল, এমন কি. পশুর পাশবিকতাকেও ক্ষমা করে নাই। ফলে দেখি, আজও তরলমতি বালকগণ পর্যন্ত

পশুপক্ষীকে নির্যাতন ও হত্যা করার স্বপ্নও দেখেনা, যদিও ব্রিটিশ বালকগণ এমন নির্যাতন করা কিংবা হত্যা করাকে আনন্দের কর্ম বলিয়া ভাবে। জীবনের প্রতি কর্মে যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা তাহাও সকলের সম্ভ্রম দাবী করিতে পারে। উপরন্তু এই বিশ্বাস এক জাতীয় বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত করা অসম্ভব। কেবল যুক্তি দিয়া নয়, তথ্যের প্রমাণ দিয়া নয়, আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে এই প্রাচীন জাতির মধ্যে এতটা সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতা বর্তমান আছে।''

(৩) সেকাল ও একাল বিষয়ে বক্তৃতা। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা করিতে আমার অনেক পরিশ্রম হয়, তাহার শ্রান্তি নিবারণ জন্য আমাদের হিসাবে সেকাল একাল বিষয়ে বক্তৃতা করি।

''এইবার এখনকার খ্রীষ্টান মিশনারীদের কথা ভাবা প্রয়োজন। তাঁহারা বিদেশে যান কিন্তু তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের অর্থ কি? তাঁহাদের কেহ কেহ হয় বাচালতা করেন, নয় তো বিদেশের অধিবাসিগণের খোসামুদি করেন কিংবা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করেন। তবে স্বদেশে ইঁহাদের অবস্থা মোটেই ভাল নয়; সেখানে তাঁহারা কষ্টেসৃষ্টে জীবন যাপন করেন। কিন্তু বিদেশে গিয়া তাঁহারা প্রচুর উপার্জন করেন, সাহেব আখ্যা পান, ভাল খানাপিনা করেন, ভাল পোশাক পরিধান করেন এবং পাঁচ কি তাহারও অধিক ভৃত্য মোতায়েন করেন, যদিও স্বদেশে তাঁহাদের একটি ভৃত্য রাখিবারও সামর্থ্য থাকে না।''

''হিন্দুজাতি কিংবা হিন্দুধর্মের প্রতি একটিও কুবাক্য আমরা প্রয়োগ করিব না। করা উচিতও নয়। তাহাদের দুর্গাপূজার চমৎকার উৎসবকে সুন্দর করিয়াই দেখিব। আমরা আবার বলিতেছি যে যাহারা হিন্দুজাতিকে নিছক মূর্তিপূজার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাহাদের সহিত আমরা একমত নহি। আমরা বিশ্বাস করি যে তাহাদের উৎসবগুলির মধ্যে এক মহান রহস্যময় ইতিহাস নিহিত আছে যাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে সর্বযুগের আদর্শ, শ্রেষ্ঠ সাধকগণের ধ্যান-ধারণা যাহা তাঁহাদিগের নিকট প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল। আমাদের মনে হয় যে তাহাদের বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছে। এই বিশ্বাসের দাক্ষিণ্য, মানবতা, (নিষ্ঠুরতার প্রতি ঘৃণা) নম্রতা, সহনশীলতা, সারগর্ভতা, সহৃদয়তা ইত্যাদিকে আমরা শ্রদ্ধা করি। বাবু রাজনারায়ণ বসু যেভাবে তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের পূর্ণ সায় আছে। ধর্ম কি?— সহিষ্ণুতা, জীবনের প্রতি কর্মে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা, আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি সমগ্র ক্ষেত্রে ধর্মকে অগ্রাসন দেওয়া—ইহাই তো ধর্ম। আর এই ধর্ম গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী, মানবজাতির আশ্রয়স্বরূপ। ইহাকে মহাকাল ধ্বংস করিতে পারে নাই। আমরা ইহার প্রশংসা

করি। আমাদের বাসনা হয় যে আমরা ইহাকে ভাল করিয়া বুঝি, অতীতের অন্ধকার যুগে গবেষণা করি, কারণ মানবমনের এক গভীর সত্য ইহাতে নিহিত আছে।"

"বাবু রাজনারায়ণ বসু ঠিকই বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসা করি।"

অক্ষয়বাবু সেকাল একাল বিষয়ে লিখিতে আমাকে প্রথম পরামর্শ দেন। ইহার বিবরণ উক্ত বক্তৃতার ভূমিকাতে লেখা আছে। ঐ বক্তৃতা বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ভুজঙ্গেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় বাড়ীতে করা হয়। ঐ দিন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা লইয়া কলিকাতায় বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছিল। কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল তাহা পশ্চাল্লিখিত গল্প দ্বারা অনুভূত হইবে। আমি একদিন কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটীর দোতলায় বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় শুনিলাম যে নীচের তলায় তাঁহার পালিত পুত্র আর একটি বালককে বলিতেছে, "উপরে কে এয়েছে জানিস? সেকাল একাল এয়েছে।" আমার নাম সেকাল একাল হইয়া গিয়াছিল। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা উহা ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া লয়েন। ছাপাইবার জন্য তর্জমা করিয়া লয়েন নাই, আপনার নিজের পাঠ্যের জন্য লইয়াছিলেন।

(৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। এই বক্তৃতা আমি ইংরাজী—— * সালে হিন্দুস্কুল থিয়েটারে করি। সেদিনও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য করেন। সে দিবস কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং অনেক খ্রীষ্টীয় মিসনরিও উপস্থিত ছিলেন। কোন কবি তাঁহার নাম উক্ত বক্তৃতায় আমাকে উল্লেখ করিতে অনুরোধ করেন। অন্য কোন কবি সভা হইতে একটু তফাত দাঁড়াইয়া তাঁহার নাম উহাতে উল্লিখিত হয় কিনা তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উক্ত বক্তৃতাতে মাইকেল মধুসূদনের দোষ দেখানতে তাঁহার গোঁড়ারা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার গুণ দেখানতে তাঁহার শত্রুরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধেও ঐরূপ করাতে তাঁহার শত্রু মিত্র উভয়েই আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই বক্তৃতা লইয়া অনেকদিন আন্দোলন হয়। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি কি একটা বল বা লিখ দুমাস তার আন্দোলন থাকে।"

* ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ, ১৭৯৮ শকের ১৯ বৈশাখ।—— সম্পাদক।

(৫) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন। আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সালে দেওঘরে আসি, আসিবার এক বৎসর পরে এই পুস্তিকা ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি। অদ্য (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬) তিন বৎসর হইল ঐ প্রস্তাব বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ করি। নবজীবনে প্রকাশিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি উহার ইংরাজী মূল মাদ্রাজ প্রদেশীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীরাজাগুডে নারায়ণ গজপতি রাও গারুর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গজপতি রাও আমি যখন হিন্দু কলেজে পড়ি তখন তিনি নীচের ক্লাসে পড়িতেন। এই পুস্তিকা সকল শ্রেণীর হিন্দুই পছন্দ করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম প্রচারক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, দ্বারভাঙ্গার বাবু চন্দ্রশেখর বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এই পুস্তিকার প্রশংসা করিয়াছেন। সংবাদপত্রের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা, ইয়ং ইণ্ডিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ময়মনসিংহের চারুবার্তা, কলিকাতার সহচরের কোন লেখক, ইংরাজী পত্রিকা হোপ, মাদ্রাজের ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা হিন্দু, মিরর পত্রিকা, এবং মিরর পত্রিকায় পাবানার সবজজ বলরামবাবু ও নব্যভারতে পুণাপ্রবাসী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বোম্বাইর 'নেটিভ ওপিনিয়ন' উহার প্রশংসা করিয়াছেন। চারুবার্তা এই পুস্তিকা বিষয়ে অনেকগুলি প্রস্তাব লেখেন, আর হোপ্ সম্পাদক দুই তিন প্রস্তাব লিখিয়া আরও লিখিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী হিন্দু উভয় প্রকার হিন্দুর সমবেত যত্নে যদি কখন মহাহিন্দু সমিতি ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

"ইণ্ডিয়ান মিরর" "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" "Old Hindu's Hope" সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

৪ঠা আগস্ট, ১৮৮৯ সাল। ডাক সংস্করণ।

The publication of the famous pamphlet "The Old Man's Hope", has given the book under notice its present name, though the scheme of a Maha Hindu Samiti, or a great union of Hindus, which it embodies, was commenced to be written, so early as 1881. A Bengali translation of the scheme appeared in the Bengali periodical, *Navajiban*, in July, 1886. The original English is now published, and forms the subject of the present notice. The scheme is exceedingly solemn in its character and catholic in its spirit. The "Old Hindu", who has broached the idea, though physically old, is mentally, morally, and religiously more energetic and enthusiastic than most of the youngrer members of

the Hindu Community. The proposal gives rough details of how the *Samiti* is to be formed and worked, but these are subject to modifications. Patriotism of the highest type pervades every syllable of the old man's thoughts and utterances, and all who have the nation's good at heart would do well to consider the practicability of the proposal, which, if successfully carried out, is calculated to work a revolution in the temporal and spiritual economy oof the Aryan Nation. Politicians might profitably pause to inquire whether the realisation of the Old Hindu's hope will retard or advance the cause of the country which the National Congress is pledged to promote. The readers might remember the publication in these columns of some letters concerning the subject. These letters have now been incorporated into the present pamphlet. The whole production is a most valuable one, and deserves wide circulation and thorough discussion.

"বিখ্যাত পুস্তিকা 'বৃদ্ধের আশা' প্রকাশিত হইবার পর, সেই নামে পর্যালোচনাধীন এই গ্রন্থখানির বর্তমান নামকরণ হইয়াছে, যদিও মহাহিন্দু সমিতি (অর্থাৎ হিন্দুজাতির মহান ঐক্য)-র খসড়া সেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দেই লেখা শুরু হয়। খসড়াটির বাঙ্গালা অনুবাদ ১৮৮৬-র জুলাই মাসে বাঙ্গালা পত্রিকা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়। মূল ইংরাজীটি এখন প্রকাশিত হইয়াছে যাহা বর্তমান পর্যালোচনার বিষয়। খসড়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উদার-নীতির পরিপোষক। 'বৃদ্ধ হিন্দু' যিনি এই বিষয়টির সূত্রপাত করেন, তিনি শারীকি বৃদ্ধ হইলেও মানসিক, নৈতিক এবং ধর্মবিষয়ক ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের তরুণ সভ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী এবং তৎপর। প্রস্তাবে মোটামুটি পাওয়া যায় কেমন করিয়া সমিতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং পরিচালিত করিতে হইবে, যদিও এই বিষয়গুলি প্রয়োজন মত সংস্কারের অধীন। এই বৃদ্ধের প্রতিটি চিন্তায় এবং উক্তিতে মহত্তম স্বদেশপ্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে এবং যাঁহারা জাতির কল্যাণ কামনা করেন তাঁহারা যদি এই প্রস্তাবটির ব্যবহারিকতা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করেন তাহা হইলে ভাল হয়। কারণ এই প্রস্তাবটি যদি সুষ্ঠুভাবে কার্যে পরিণত হয় তাহা হইলে আর্য জাতির ঐহিক ও পারলৌকিক নীতিজ্ঞানে এক বিপ্লব ঘটাইয়া দিবে। রাজনীতিবিদগণ যদি ভাল চান তাহা হইলে এই প্রস্তাবটির প্রতি তাঁহারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন এবং বিচার করিবেন। জাতীয় কংগ্রেস দেশের উন্নতি চান। রাজনীতিবিদগণ বিচার করিয়া দেখিবেন এই প্রস্তাবটিতে দেশের উন্নতি হইবে না অবনতি হইবে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে এই বিষয়ে এই পত্রিকায়

কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রসমূহ এখন বর্তমান পুস্তিকাটির অন্তর্গত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত মূল্যবান এবং ইহার যত প্রচার ও আলোচনা হয় ততই ভাল।"

আমার দেওঘরে অবস্থিতিকালে আমি তাম্বুলোপহার ও সারধর্ম প্রণয়ন করি। তাম্বুলোপহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ভোজনের পর পঠিত হইবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করি। সারধর্ম প্রথম "আলোচনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎপরে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। উহা এতদূর আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল যে কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান পত্রিকা উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান আচার্য মহাশয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা প্রথমে আদৌ পছন্দ করেন নাই, পরে উহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য মহাশয় আমাকে এক পত্র লেখেন যে আমি উহাতে যে ধর্মের প্রস্তাবনা করিয়াছি তাহা ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রধান আচার্য মহাশয় প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে উহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের মূল শিথিল করা হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে তাঁহার আশঙ্কা দূরীকৃত হয়।

আহ্লাদের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি এই পুস্তকে ফল হইয়াছে। রামপুর বোয়ালিয়া ধর্মসভা (এই ধর্মসভা বঙ্গদেশ মধ্যে প্রধান) এই বৎসর (১৮৯০) কলিকাতায় আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে (অদ্য ১৭ই নবেম্বর) যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হইবে তাহার পর মহাহিন্দু সমিতি (আমার প্রস্তাবিত নামই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন) স্থাপন জন্য এক মহাসভা আহ্বান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন কিন্তু পরে পশ্চিমের "ভারত ধরম্ মহামণ্ডলে"র সহিত মিশিয়া যান। এই মহাসভা পশ্চিমে আজ দুই তিন বৎসর হইতেছে। প্রথম অধিবেশন হরিদ্বারে হয়। এই সভা হিন্দুধর্ম রক্ষার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে। সহার অধিবেশন হরিদ্বারে হয়। এই সভা হিন্দুধর্ম রক্ষার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার অধিবেশন গত তিন দিবস (১৪, ১৫, ১৬ই নবেম্বর) ইন্দ্রপ্রস্থে অর্থাৎ দিল্লীতে হইয়া গিয়াছে। তাহার সম্পাদক আমাকে তাহা দেখিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল দর্শক স্বরূপ নহে, হিন্দুভাবপ্রধান আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হইয়া সভার কার্যে অংশ লইতে দিবার অধিকার প্রার্থনা করি, কিন্তু যে পত্রে ঐ প্রার্থনা থাকে তাহার কোন উত্তর পাই নাই। উল্লিখিত মিলিয়া যাইবার পূর্বে বোয়ালিয়া ধর্মসভার শেষ রিপোর্টে লিখিত হয় যে সংবাদপত্রে মহাহিন্দু সমিতি সংস্থাপনের আন্দোলন হইতেছে। ঐ আন্দোলনের কারণ জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু দ্বারা প্রণীত "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" নামক পুস্তিকা। বৃদ্ধ হিন্দুর আশার সহিত তাঁহাদিগের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকুক, মহাহিন্দু সমিতি সংস্থাপনের প্রস্তাবের সহিত তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। উল্লিখিত মিশিয়া যাইবার পূর্বে উক্ত ধর্মসভার সম্পাদকের সহিত আমি পত্র লেখালেখি করি। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন,

"আপনার উৎসাহ বিশেষ আনন্দকর।" আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশা সংবাদপত্রে আন্দোলন উৎপাদন দ্বারা বোয়ালিয়া ধর্মসভা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য ধর্মসভাকে প্রথমতঃ মহাহিন্দু সমিতি সংস্থাপন করিতে অভিলাষী ও তৎপরে মহামণ্ডলের সঙ্গে যোগ দিতে উত্তেজিত করে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের সংযোগে সংরচিত অভিনব সভা আমার প্রস্তাবিত মহাহিন্দু সমিতি বলা যাইতে পারে। আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশার অন্তর্গত সকল প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কতকগুলি করিয়াছেন। ভরসা করি ভবিষ্যতে প্রায় সকল প্রস্তাবই গ্রহণ করিবেন।

ইং ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর গভর্নমেন্ট জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত (মে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত) ধর্ম ও সাহিত্য ও শিক্ষকতা কার্য সম্বন্ধীয় আমার জীবনের ঘটনা ব্যতীত অন্যান্য ঘটনাসকল বিবৃত করি নাই। তাহা পশ্চাৎ করা হইতেছে।

ইং ১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুর যাই। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবা-বিবাহ উচিত কিনা" একটি ক্ষুদ্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল; এই চটী বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গসকল উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগ্দান অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষজনক। এই সময়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কলেজে বসিয়া এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনঃপূত হইল না। কলেজ হইতে বহু বাজারের বাসায় যাইবার সময় অর্ধপথ গিয়াছেন এমন সময় উহার সন্তোষজনক মীমাংসা ভাব মনে উদিত হইল। কলেজে তৎক্ষণাৎ পুনরায় আসিয়া তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, লিখিতে লিখিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। সমস্ত ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে ছিলেন; পুনর্বিবাহিত বিধবার গর্ভজাত সন্তান যাহাতে পিতার ধনের উত্তরাধিকারী হয় এমত বিধান জন্য তাঁহারা গভর্নমেন্টে আবেদন করিয়াছিলেন। সার্ জন্ পিটার গ্র্যান্ট যিনি পরে বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেন্ট গভর্নর হইয়াছিলেন তিনি ঐ সময় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত আবেদন উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন "they are as much Hindus as the other party." "অপর পক্ষীয়েরা যেমন হিন্দু ইঁহারাও তেমনি হিন্দু"; আর ঐ বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন যে "যখন সতীদাহ নিবারণ করা হইয়াছে তখন

বিধবা-বিবাহ হইতে দেওয়া উচিত, চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা একেবারে পুড়িয়া মরা ভাল।" যেমন বিধবা বিবাহের আইন করা হইল অমনি কার্যারম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যের গতিকই এইরূপ। যিনি প্রথম প্রথম বিধবা বিবাহ করেন তাঁহার নাম পন্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েন। যেদিন তাঁহার বিবাহ হয় সেদিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টানোর ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ পাণিহাটীর মধুসূদন ঘোষ করেন। তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ বসু যখন বিধবা বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যে তাঁহার পাল্কির ভিতর মুখ দিয়া বলিল, "দুর্গা তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।" মেদিনীপুরেও কম আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তদনীন্তন গভর্নমেন্ট উকিল হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে "রাজনারায়ণবাবু জানেন না যে তিনি বাঙ্গালা ঘরে বাস করেন।" ইহার অর্থ এই যে যখন তিনি বাঙ্গালা ঘরে বাস করেন তখন আমরা তাহা অনায়াসে পুড়াইয়া দিতে পারি।

আমি ও সেকেণ্ড মাস্টার উত্তরপাড়াবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে সংস্কৃত কলেজের হেডমাস্টার হইয়াছিলেন, আমরা দুইজনে একদিন নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া দুই মোটা লাঠি কাটিয়া লইয়া আসি; যদি দাঙ্গা হয় সেই সময়ে আত্মরক্ষায় ব্যবহার করা যাইবে। বোড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে "রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আইলে আমরা ইঁট মারিব।" তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, "তাহা হইলে আমি খুসী হইব, আমি বাঙ্গালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে আমি স্থির করিব যে এক্ষণে তাঁহাদিগের বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে।" মেদিনীপুর হইতে যখন কলিকাতায় আসিতাম তখন রাত্রিকালে বোড়ালে যাইতাম এবং ভোর না হইতেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতাম। একবার বোড়ালে গিয়াছিলাম শেষরাত্রে দেখি বাটীর ভিতর হইতে কে একটি প্রদীপ হাতে করিয়া আসিতেছে। আমি বহির্বাটীতে শয়ন করিয়াছিলাম। প্রদীপহস্তে ব্যক্তি যখন আমার মশারির সম্মুখে আসিয়া বসিলেন তখন দেখিলাম যে মাতাঠাকুরাণী; তিনি বলিলেন যে "রাজনারায়ণ তোর মনে এই ছিল"; এই বলিয়া অনেক অনুযোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ

অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই বিধবাবিবাহ জন্য মাতাঠাকুরাণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ সময়ে তিনি মথুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময় বাটীতে থাকিলে আমার দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দিতে পারিতাম না। ঐ সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পশ্চিমে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবাবিবাহের সংবাদ দেওয়াতে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে "এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।" "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়" এই বাক্য এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জনসাধারণবাক্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রথম উল্লিখিত উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ হয়। সিপাহীবিদ্রোহের ভারতব্যাপি তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাটনগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের শৈশবাবস্থা। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টন ছিল তাহার নাম শেকাওয়াতী ব্যাটালিয়ন ছিল। কর্নেল ফস্টার এই পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসি দেন। একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পরে আর একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে লাগিল তেমনি মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ ফিনিক্স কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। একদিন সাহেবরা ক্যান্টনমেন্ট গিয়া সিপাহীদের ডাকিয়া একটা থালের উপর ধানদূর্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ শপথ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল মেদিনীপুরের নিকট কংসাবতী নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে, বৃষ্টি পড়িলে প্রবাহমান হয়। সাহেবরা ও কোন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মানসে রাখিয়াছিলেন যে যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টর সাহেব খানা খাইতে বসিয়াছেন এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদারী কাছারীর কোন ভৃত্য শখ করিয়া একটি বোমা ছুঁড়িল। বোমার আওয়াজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাঁটা পড়িয়া গেল ও আওয়াজের কারণ জানিবার জন্য চাপরাশীর উপর চাপরাশী পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার

সময় প্যাণ্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যাণ্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যান্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ ভয় ছিল। বিধবাবিবাহের উপর তাহাদের আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। পরিবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন এক বন্ধুর বাটীতে রাত্রে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময়ে লাল কোর্তাধারী সিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই আমরা শুনিতাম যে সিপাহীরা বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আমাদের এরূপ আশঙ্কা হইত যে বিদ্রোহের আর দেরি নাই। একদিন জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া কাওয়াজ করিতে করিতে শহরের দিকে আসিতেছিল, আমরা তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম। আমরা মনে করিলাম সিপাহীরা শহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। Ostrich (অস্ট্রিচ) পাখী যেমন চক্ষু বুজিলেই মনে করে যে সে নিরাপদ তেমনি ছাত্রেরা মনে করিয়াছিল যে বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ। আমরাও প্যান্টালুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম, এমন সময় আমরা শুনিলাম যে সিপাহীরা তাহাদিগের জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে এইরূপ ধুমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম। ম্যাজিস্ট্রেট লসিংটন সাহেব (তখন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ ভিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি দুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙ্গালীদিগের সভা ডাকিয়া বলিলেন যে-কেহ আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিবে তাহাকেই জেলে দিব। সাহেব ইহার অব্যবহিত পূর্বে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন, বাঙ্গালীর নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিতদিগের সকলে উপস্থিত আছে কিনা জানিবার জন্য যখন সভা আহ্বানকারী পত্রের লেফাপার উপরের লিখিত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন তখন জলামুঠার রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ''ড্যামীডর রায়'' এবং স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর উমাচরণ হালদারের নাম ''ওমারচন্দ হাবিলদার'' উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লসিংটন সাহেবের বগিগাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত রাত্রি শহরে এইরূপে চৌকি দিতেন। সংবাদপত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে শেকাওয়াতী ব্যাটালিয়ন মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে মেদিনীপুরে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে ঐ পল্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হইল না তাহার প্রধান কারণ কর্নেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নী। তাঁহার কথা সিপাহী বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ

করিত।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে আমি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু সে পদ প্রাপ্ত হই নাই। তৎপরে ঐ পদের স্পৃহা মন হইতে একেবারে তিরোহিত হয়।

১৮৫৬ সালে বর্ধমানের কমিশনার এবং রেভিনিউ হ্যাণ্ডবুকের প্রণেতা জে. এচ. ইয়ং সাহেব মেদিনীপুরে যখন গস্তে আসিয়াছিলেন তখন স্কুল দেখিয়া ও আমার সহিত কথোপকথন করিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে আমাকে ডেপুটি কলেক্টারের পদ প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আমাকে সেই রিপোর্টে "কৃতী ভদ্রলোক" "a gentleman of superior attainments" বলেন। আমি একটু চেষ্টা করিলে ঐ কর্ম হইত; কিন্তু মেদিনীপুরের প্রতি আমার এত অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক ছিলাম না। ১৮৬১ সালে গভর্নমেন্ট আমাকে এসেসর অফ ইনকাম ট্যাক্স পদে নিযুক্ত করেন। সেই পদ হইতে অনেকেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। আমি কিন্তু এসেসরের ঘৃণিত পদ গ্রহণ করি নাই। ঐ পদ যাঁহারা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন, আমিও হইতে পারিতাম। বিখ্যাত বাবু প্যারিচরণ সরকার হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্‌মাস্টার ছিলেন। তিনি ঐ পদ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পদে উন্নীত হওয়াতে ডিরেক্টর সাহেব আমাকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয় মেদিনীপুরের উন্নতিসাধন কার্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাহা গ্রহণ করি নাই। তৎপরে হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়াতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ পদ আমাকে দিবার জন্য অনুরোধ করাতে ডিরেক্টর সাহেব বলিয়াছিলেন ওঁর কথা বলিবেন না। উনি পাগল। মাহিনাও চান না প্রমোশনও চান না।"

ইংরাজী ১৮৬০ সালে পূজার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কতিপয় বন্ধু নৌকাযোগে রাজমহল যাত্রা করেন। আমি সেই বন্ধুগণের মধ্যে একজন ছিলাম। তখন রাজমহল রেলওয়ে সম্প্রতি খুলিয়াছে। ঐ উপলক্ষে একটি ভোজ হয়। তাহাতে লর্ড ক্যানিং একটি বক্তৃতা করেন। আমরা রেলপথে না যাইয়া নৌকায় রাজমহল গিয়াছিলাম। মহর্ষির সঙ্গে আমরা এই কয়েকজন লোক ছিলাম—কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষির পুত্রদিগের গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ও আমি। আমাদিগের এই ভ্রমণ সময়ে সর্বদা ধর্মপ্রসঙ্গ হইত ও হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান হইত, কি সুখে যে দিন যাইত তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে অষ্টাদশ বৎসর পূর্বে আমি মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে রাজমহল যাই ও তথায় নবাবদিগের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখি। অষ্টাদশ বৎসর

পরে গিয়া দেখি যে সে রাজমহল আর সে রাজমহল নাই। রেলওয়ের অনুরোধে সেই সকল বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে অথবা ভাঙ্গিতেছে। কেবল কালো মর্মর পাথরের সিঙ্গী দালান অটুট রহিয়াছে, উহা রেলওয়ে আফিসে পরিণত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ অত্যন্ত শিষ্ট। এই সময়ে কেশববাবুকে তিনি সকল অপেক্ষা ভালবাসিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু আমি পুরাতন বন্ধু বলিয়া তিনি আপনার নিকট আমাকে শোয়াইতেন, অন্য সকলে নীচে শুইত। তিনি আমাকে বলিতেন, "দেখ যুবকদিগের সহিত আমার মনের মিল হয় না।" কেশববাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, এদিকে দেবেন্দ্রবাবু বসিয়া উপনিষদ পড়িতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন। কেশববাবু তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। রামচন্দ্র মিত্র ভাল বাঙ্গালা জানিতেন না। কেশববাবু সর্বদাই তাঁহার নকল করিতেন। তাহাতে আমাদিগের বিশেষ আমোদের উদয় হইত। সেকেলে বুড়ো বাঙ্গালীরা কিরূপে ইংরেজী কহিত আমি তাহার নকল করিতাম, ইহাতেও বিশেষ আমোদের উৎপত্তি হইত। কেশববাবুর এই সময়ে ধর্ম বিষয়ে নবোৎসাহ; উৎসাহের আর সীমা ছিল না। তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের নানা উপায় বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, আমি তাহাতে যোগ দিতাম। উল্লিখিত উপায়সকলে চাতুর্য প্রকাশ না পায় এ বিষয়ে কেশববাবু বড় সাবধান হইতেন, যেহেতু ধর্মের সহিত চাতুর্য সঙ্গত হয় না। বৈদ্যজাতি ফিচেল্ বলিয়া যে অপবাদ আছে তাহা অমূলক হউক বা সমূলক হউক তাহা সত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহার ঐ জাতীয় দোষ পবিত্র ধর্মপ্রচার কার্য কখন কলুষিত করে তাঁহার সর্বদা এই আশঙ্কা হইত। আমাকে এই ভ্রমণ সময়ে একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "বৈদ্যজাতি ফিচেল্ বলিয়া অপবাদ আছে না?" আমি বলিলাম "হুঁ"।

রাজমহলে যখন যাওয়া হয় তখন দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ হয় যে সেই বৎসরের পৌষ মাসে ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞার স্বাক্ষরের সাম্বৎসরিক দিবসে আমি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মধর্মের পুরাবৃত্ত বিষয়ে একদিন বক্তৃতা দিব। এই অবধারণানুসারে আমি মেদিনীপুর হইতে আসিয়া ৭ই পৌষ দিবসে ঐ বক্তৃতা দিই। সেই দিবস কেশববাবুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্যের পর আমার বক্তৃতা হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেশববাবু সেদিন যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অগ্নিময়। তিনি বলিয়াছিলেন যে পরিবারদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করা উচিত, যেহেতু তাহারা অনেকে ধর্মপথের প্রতিরোধক হয়। সভা ভঙ্গ হইলে পর কেশববাবুর অনুপস্থিতিতে দেবেন্দ্রবাবু আমাদিগকে বলিলেন, "'পরিবার শত্রু' 'পরিবার শত্রু' 'পরিবার শত্রু' ইহা ক্রমিক বলা কিরূপ?" আমি সেদিন যে বক্তৃতা করি তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের দীর্ঘপুরাবৃত্ত বলিয়া পরিশেষে কেশববাবুর ভূয়সী প্রশংসা করি। তিনি সে প্রশংসার উপযুক্ত। দেবেন্দ্রবাবু উঠিয়া বলিলেন যে রাজনারায়ণবাবু নবযৌবন কাল হইতে এ পর্যন্ত ব্রহ্মাগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিয়া

আসিতেছেন, ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। আমি উল্লিখিত বক্তৃতা দিয়া মেদিনীপুরে যাইবার পূর্বে কবিকুলসূর্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। মধুর সহিত আমি হিন্দু কলেজে ২য় শ্রেণীতে একত্র পড়ি। মধু ২য় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই খ্রীষ্টীয়ান হইয়া বিশপস্ কলেজে পড়িতে যান, তৎপরে অনেকদিন মাদ্রাজে অবস্থিতি করেন। আমি যে সময় দেখা করিলাম তিনি তখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরচাঁদ মিত্রের অধীনে হেড কেরানীর কাজ করিতেছিলেন। এই বৎসরের কিছুদিন পূর্ব হইতে তাঁহার কবিতার বিষয়ে আমার সহিত পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। ''বিবিধার্থ সংগ্রহ'' নামক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে ঐ লেখালেখি আরম্ভ হয়। ঐ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ইন্ডিয়ান ফীল্ড নামক সংবাদপত্রে আমি সমালোচনা করি। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই তিন সর্গ আমার অভিপ্রায় জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দেন। আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি এই সময়ে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম ''কবে আমি দেখিব মধুসূদন-বদনসরোজং।'' আমি জয়দেব হইতে ঐ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমি যেদিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি সেদিন দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, ''প্রিয় রাজ, ইহা আমাকে নিশ্চয়ই অমর করিয়া রাখিবে।'' আমি বলিলাম, ''তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'' অনেক কবি আত্মশ্লাঘা দোষে দূষিত। জয়দেব বলিয়াছেন—

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং

আরো বলিয়াছেন—

যদ্যাকণ্ঠকূলা সুকৌশলমনুধ্যানং চয়দ্বৈষ্ণবং
যচ্ছদীব বিবেকতত্ত্ব রচনা কাব্যেষু লীলায়িতং।
তৎসর্ব্বং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণকতানাৎময়ঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥

হাফেজ বলিয়াছেন যে তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশমণ্ডল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার উপর মুক্তাবর্ষণ করিতেছে। মধুর আত্মশ্লাঘা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, ''ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন''। তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে, ''আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু''। তিনি বলিলেন, ''তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু; কিন্তু একটা সমাজ

ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এইজন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বন করিয়াছি তখন ঐ সমাজ ঘেঁসিয়া থাকা কর্তব্য।'' তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যেদিন আহার করিব সেইদিন ইজার চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম তাঁহার ইংরাজ স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সেইদিন তাঁহার মাদ্রাজের একটি ফিরিঙ্গী বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক্ না কেন কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।

১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে আমি সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন করি। ইহার বৃত্তান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬৪ সালে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়; তাহার বৃত্তান্তও পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬১ সালে ধর্মতত্ত্বদীপিকা ও Prospectes of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal প্রকাশিত হয়। এতদুভয়ের বৃত্তান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। ১৮৬৬ সালেব ৫ই মার্চ তারিখে শুইয়া শুইয়া মাথা ঘোরে। তাহাতে আমি ভীত হই। কিন্তু যেরূপ পীড়া তাহাতে এত ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না। মাথা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বুক দুড় দুড় আরম্ভ হয় ও আগুনের ফিন্‌কী ও মাছি দেখিতে আরম্ভ করি। এই সময় হইতে যে ঔষধ খাইতে আরম্ভ করি তাহা ৬/৭ বৎসর মাত্র হইল (অদ্য জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) স্থগিত করিয়াছি। ঔষধ খাইয়া খাইয়া শরীর খারাপ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে তজ্জন্য বড় অনুতাপ হইতেছে। Will force (মনের বল) করা ব্যতীত স্নায়ুর দুর্বলতার ঔষধ নাই। এরূপ বেতায়সা ঔষধ খাওয়া অন্যায় কার্য হইয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভে দুই মাস ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসি। পূজ্য বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলয়ে অবস্থিতি করি। সেখানে বিখ্যাত হারাধন কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকি। নিজ বাটীতে যেমন স্বচ্ছন্দে থাকিতাম সেইরূপ দেবেন্দ্রবাবুর বাটীতে থাকি। নিজ বাটীতে যেরূপ সেবা প্রাপ্ত হইতাম সেখানে সেরূপ সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ বৎসর পূজার পূর্বে মেদিনীপুরে একবার আসিয়া পূজার পর হইতে ক্রমাগত যে ছুটি লইতে আরম্ভ করিলাম সে ছুটি ১৮৬৮ সালে ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে পেন্‌সন গ্রহণ করি। ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়। বাদুড়বাগানবাসী রাজা রামমোহন রায়ের দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাটী ভাড়া করিয়া তথায় বিবাহ দেওয়া কার্য সম্পাদন করা হয়। সকল ব্রাহ্মে বলিল, ''উত্তম হইয়াছে, রাজনারায়ণবাবুর কন্যার বিবাহ রামমোহন

রায়ের বাটী হইল।'' বিবাহ ক্রিয়া আদি সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। প্রচলিত হিন্দু ধর্মাবলম্বী অনেক বিখ্যাত লোক উপস্থিত থাকেন; তন্মধ্যে মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ একজন। তিনি তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর আমার শ্যালককন্যাকে বিবাহ করেন। তাহাতে আমি তাঁহার পিস্শ্বশুর হইলাম। ইংরাজীওয়ালাদিগের নায়ক সম্মান্য বাবু রামগোপাল ঘোষ যেদিন পিস্শ্বশুর স্বরূপে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন সেদিন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হই। আমার দ্বিতীয়া কন্যা যাহার বিবাহের বর্ণনা করা যাইতেছে এই নূতন সম্বন্ধ বশতঃ সম্পর্কে তাঁহার শ্যালী হইয়াছিল। বর আসিতে দেরি হওয়াতে রামগোপালবাবু বলিলেন যে, ''বর আস্‌তে দেরি হয়, তো আমাকেই বসিয়ে দেওনা'' সেকালের বাঙ্গালীরা এইরূপ উপহাস করিতেন। এক্ষণে নব্য সমাজের লোকের মধ্যে তাহা কমিয়া যাইতেছে। আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহের পর আমরা বোড়ালে গিয়া ছয়মাস সেখানে অবস্থিতি করি। খুড়ামহাশয় বলিলেন, ''বাটীর সহিত সংলগ্ন আলাহিদা মহল তৈয়ার করিয়া তোমাকে থাকিতে হইবে। তা না হইলে তোমার সহিত অমাদিগের সংস্পর্শ জন্য জাত লইয়া গোলমাল উপস্থিত হইবে।'' আমি খুড়ামহাশয়ের পরামর্শ মত কার্য করি। উল্লিখিত ছয়মাসের মধ্যে আমার খুড়ামহাশয়ের মৃত্যু হয়, ও মাতাঠাকুরাণী ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হন। আমার সহধর্মিণী ব্যতীত আমার সমস্ত নিজ পরিবার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়েন। এই বৎসরে ম্যালেরিয়া গ্রামে প্রথম প্রবেশ করে। প্রায় সমস্ত পরিবার ম্যালেরিয়াতে মরমর হওয়াতে মাতাঠাকুরাণীর তত্ত্বাবধানের ভার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বসুর প্রতি অর্পণ করিয়া আমরা কলিকাতায় পলাইয়া আসি। মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া আসিতাম কিন্তু তিনি বাস্তুভিটা ছাড়িতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন। তজ্জন্য অভয়ের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমরা কলিকাতায় আসি। অভয়কে ম্যালেরিয়া ধরে নাই। আমরা পূজার কিছু পূর্বে কলকাতায় আসি। কলিকাতায় আসার অব্যবহিত পরেই মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। এত শীঘ্র মৃত্যু হইবে আমরা মনে করি নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে শীতকাল অবধি টেকিয়া থাকিবেন। উল্লিখিত অবস্থাতে কলিকাতায় আমার আসা উচিত ছিল কি না এখনও আমার মনে দ্বিধা আছে। একদিকে মাতৃসেবার গরীয়সীত্ব আর একদিকে প্রায় সমস্ত নিজ পরিবারের মরণাপন্ন পীড়া। কলিকাতায় দুই মাস অবস্থিতি করিয়া আমি পশ্চিমে যাত্রা করি।

কলিকাতায় দুই মাস অবস্থিতিকালে বিখ্যাত মেরী কার্পেন্টার ভারতবর্ষে প্রথম আসেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মদিগের এক সভা হয়, তাহাতে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। এই সভাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার কলেজের সমাধ্যায়ী খ্রীষ্টীয়ধর্মাবলম্বী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার সহিত আমার অনেকবার বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন ভালবাসা কোথায় যায়? তিনি আমাকে সভাতে দেখিয়াই বলিলেন, ''আমি

আশা করি নাই এখানে আমার প্রিয় রাজনারায়ণকে দেখিতে পাইব।'' এই সময়ে আমার বায়ুরোগের অত্যন্ত প্রবলতা। বায়ুরোগের ইংরাজী নাম ডিস্‌পেপসিয়া অথবা স্নায়বিক দৌর্বল্য। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আমার সম্বন্ধে কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, ''রাজনারায়ণ ধর্মের ডিস্‌পেপসিয়ায় মরমর।'' জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি কোন সভায় বক্তৃতাকালীন বলিয়াছিলেন, ''আমি ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান''। শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টারের কথা বলিতে বলিতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা আসিল। শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টার যখন কলিকাতায় আসেন তখন দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে অভিলাষের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার জমিদারির নিকটস্থ কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক; যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য আদোবে ব্যগ্র নহেন। এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে কেশববাবুর বিপরীত। কৃষ্ণনগর কলেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল লব সাহেব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, ''বৃদ্ধ দাম্ভিক লোকটি ইউরোপীয়ানদের প্রশংসা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন।'' দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজের তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন তিনি মহারাজা কে. সি. এস. আই. হইতেন। তিনি কোন উপাধি চান না কিন্তু ঈশ্বর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার স্কন্ধে একটি উপাধি চাপাইয়া দিয়াছেন। সেই উপাধি ''মহর্ষি'' উপাধি। এই উপাধি সর্ববাদিসম্মত। কি ব্রাহ্ম কি হিন্দু সকলেই তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া ডাকে।

১৮৬৭ সালের শেষে আমি পশ্চিমে প্রথম গিয়া ভাগলপুরে তথাকার তদানীন্তন এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন আমার জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষের ওখানে গিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করি। ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে (১৮৬৭) মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ ও ভক্তিভাজন বাবু রামতনু লাহিড়ীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে রামগোপালবাবু পীড়িত হইয়া জলবায়ু পরিবর্তনার্থ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় ভাগলপুর হইয়া যান। কিছুদিন পরে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। রামতনুবাবু এই সময়ে তাঁহার ভাগলপুরস্থ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

একদিন জাতিবিভেদ লইয়া রামতনুবাবুর সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বলিলাম, ''যখন সকল দেশে সকল সমাজে জাতিবিভেদ কোন না কোন প্রকারে আছে ও থাকিবে তখন আমাদের দেশের জাতিবিভেদ এতই কি দোষ করিল? আপনি কি আপনার চাকরের সহিত একত্রে খাইতে পারেন?'' তিনি বলিলেন, ''ও যদি সাবান দিয়া গা হাত পা পরিষ্কার করে তাহা হইলে আমি খাইতে পারি।'' তর্ক যখন খুব জাঁকিয়া উঠিল, তখন কুপিত হইয়া ইংরাজী

বাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় বলিলেন, "বেচারী বিধবাটির হইয়া কি দাঁড়াও নাই? আজ গালাগাল দিয়া ভূতছাড়া করিতাম?" যেদিন আমি ভাগলপুর ছাড়িয়া আসি সেদিন তাঁহার সঙ্গে কোন কারণ বশতঃ দেখা করিয়া না আসাতে বৃদ্ধ আপনি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া কথোপকথনকালে দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সাদীর গোলেস্তা হইতে এক বয়াৎ আওড়াই। তখন গাড়ী ছাড়ছাড় হইয়াছে। রামতনুবাবু পার্শী জানেন কিন্তু ভাল জানেন না। আমি যে বয়াৎ আওড়াইলাম তাহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ তিনি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার এক মিনিট দেরি আছে তথাপিও আমাকে ছাড়েন না। আমি দেখিলাম মহা মুশকিল। কোনক্রমে তাঁহার হাত এড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক গাড়ীতে ঢুকিলাম। পথে আবার একদিন অবস্থিতি করিয়া এলাহাবাদ যাই। এলাহাবাদে আমার হেয়ার সাহেবের স্কুলের সমাধ্যায়ী পুরাতন বন্ধু বাবু নীলকমল মিত্রের বাটীতে অবস্থিতি করি। তথায় তাঁহার পুত্র সপ্তদশবর্ষীয় যুবক চারুচন্দ্র মিত্র আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন। ইনি নামেও চারু কর্তব্যেও চারু। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য জন্য ঐ নামের উপযুক্ত এমত নহে। তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, সরলতা, সৌজন্য ও অতিথিসেবা জন্য ঐ নামের উপযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা থাকিতে প্রধান আচার্য মহাশয়ের জামাতা জানকীনাথ ঘোষালের মুখে ইঁহার বিবিধ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া ইঁহার প্রতি অসাধারণ স্নেহভাবের উদয় হয়। পিতৃ-স্নেহের ন্যায় স্নেহ উদিত হয়। ইঁহার গুণের কথা দেবেন্দ্রবাবুকে লেখাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "চারু যেমন দেখিতে চারু কর্তব্যেও চারু।" নীলকমলবাবুর বাটীর নাম লালকুটী ছিল। লালকুটীতে অবস্থিতিকালে পাঁচটি বস্তু আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথম একটা প্রকান্ড কাকাতুয়া পাখী। এত বড় কাতাতুয়া পাখী কখন দেখি নাই। কাকাতুয়া মহারাজ সর্বদা রেগেই থাকিতেন। দ্বিতীয় একটি ভদ্রলোক। তিনি এলাহাবাদের কটোয়াল ছিলেন। তিনি একটি বিপদে নীলকমলবাবুর প্রাণ বাঁচাইয়া দেওয়াতে তাঁহাকে নীলকমলবাবু তাঁহার কর্মচ্যুত অবস্থায় নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় হরিবোল ব্রাহ্মণ। তিনি একটি নামাবলী গায়ে দিয়া সর্বদা "হরি হরি বোল" "হরি হরি বোল" বলিয়া বেড়াইতেন। চতুর্থ একটি ঘর যাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্ম জাওয়ানো থাকিত। পঞ্চম একটি ঘর যেখানে একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন, নীলকমলবাবুর পরিবার তাহা শুনিতেন।

কিছুদিন এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া আগ্রায় যাই। তথায় স্বপ্নে দৃষ্ট কোন অপূর্ব রমণীয় স্বর্গীয় দৃশ্যের ন্যায় মনোহর তাজমহল দশর্ন করিয়া, লক্ষ্ণৌ নগরে বাবু (পরে রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্নপূর্বক কাইসার বাগস্থ তাঁহার অতি শোভনতম রাজভবনবৎ বাটীতে আমাকে ২/৩ দিন রাখেন। আমার সঙ্গে বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হেমচন্দ্র কর তাঁহার অতিথি হয়েন। একদিন

দক্ষিণাবাবুর বাটীতে আমি উপাসনা করি, সে উপাসনা শুনিয়া হেমচন্দ্র কর বলেন যে, এ উপাসনার প্রতি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টীয়ান, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন। লক্ষ্ণৌয়ে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনরায় এলাহাবাদে ফিরিয়া আসি। তথায় অবস্থিতিকালীন কানপুরের কতকগুলি ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত এক অতি বিনীত আবেদনপত্র প্রাপ্ত হই। আমি এইরূপ বিনীত আবেদনপত্রের উপযুক্ত নহি। সেই পত্রে তাঁহারা কানপুরে কিছুদিন থাকিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ অনুসারে কানপুরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগের সমাজে উপাসনা করি। তৎপরে লক্ষ্ণৌয়ে পুনরায় গমন করিয়া দক্ষিণাবাবুর আলয়ে তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করি। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে ইংরাজের পক্ষে দুই একটি প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত খ্রীষ্টীয়ান মিশনারী ডাক্তার ডফ্ লর্ড ক্যানিং এর নিকট তাঁহার গুণানুবাদ করাতে লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড বাহাদুর এক জমিদারী প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশের পুনর্জন্মদাতা বলিলে হয়। তিনি লক্ষ্ণৌতে ক্যানিং কলেজ ও আউধ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন সংস্থাপন করেন। যখন স্যার চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান লক্ষ্ণৌ দেখিতে যান তখন আউধ বিট্রিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ''ইহা আপনার পার্লামেন্ট দক্ষিণারঞ্জন!'' দক্ষিণাবাবু বিখ্যাত ডিরোজিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ইহা সকলেই জানেন যে, ডিরোজিওর ছাত্রেরা অত্যন্ত ইংরাজী-ভাবাপন্ন লোক। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় গিয়া টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি তথাকার একটি ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র উঁহার ঔরসে ও উঁহার বিবাহিত বর্ধমানের বিখ্যাত বিধবারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে হয়। আমি যে তিন সপ্তাহ তাঁহার ওখানে অতিথিস্বরূপ থাকি, আমি এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করি। ঐ ব্রাহ্মসমাজ লক্ষ্ণৌয়ে সংস্থাপিত প্রথম ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু আমি উহা ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া সংস্থাপিত করি নাই অন্য একটি নাম দিয়া উহা সংস্থাপন করি। ঐ উপলক্ষ্যে অনেক লোক আমার নিকট গমনাগমন করিত। একদিন দক্ষিণাবাবু আমাকে বলিলেন যে, ''তুমি জান তোমার উপর আমি গোয়েন্দা রাখিয়াছি। তুমি যাহা কর তাহার রিপোর্ট তাহারা আমাকে দেয়। এজন্য রাখিয়াছি পাছে পাগ্‌লা আউধে যাহা করিয়াছি তাহা পন্ড করিয়া দেয় অর্থাৎ অযোধ্যায় হিন্দু হইয়া আমি যে কাজ করিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনরূপ অহিন্দু কার্য দ্বারা পাগলা তাহার বিলোপ সাধন না করে।'' আমি তদুত্তরে বলিলাম যে ''কেবল আমি পাগল নহি, আপনিও কিঞ্চিৎ পাগল। আপনি পাগল না হইলে ক্যানিং কলেজ ও ব্রিটিশ

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন সংস্থাপন করিতে পারিতেন না।'' দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য এমন মনে করিতেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার ভ্রম ছিল। যখন আমরা সকল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থকে প্রধান ধর্মগ্রন্থ মনে করি এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদিকবাক্য অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মোপসনা কার্য সম্পাদন করি তখন আমরা কি প্রকারে অহিন্দু হইলাম? দক্ষিণারঞ্জন উপনিষদকে এত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না। লক্ষ্ণৌতে একবার কোন সাহেবের সহিত ধর্মবিষয়ে কথোপকথনের সময় তিনি গোমতীর অপর পারস্থ প্রকৃতিপটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ''ওই ওইখানে ব্রাহ্মণের বাইবেল।'' তিনি বলিতেন, ''বেদের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।'' কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া কর্তব্য এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ঔপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা দক্ষিণাবাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদরদেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন তখন তাঁহার চাপরাশীদিগকে ওঁ অঙ্কিত তকমা পরিধান করাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্যের ভার ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে লইয়া নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণাপত্র বাহির করেন। যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে ঐ ঘোষণাপত্র উদ্ঘোষিত হয় সেইদিন মহা মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণারঞ্জনবাবু ব্রাহ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্যবৃত্তান্ত ও উপাসনা যে পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল, সেই পুস্তকের একখন্ড লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতিকালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা আমি যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়াছি।

দক্ষিণারঞ্জন বলিতেন যে তিনি যেমন ধর্মসংস্কারক তেমনি সমাজ-সংস্কারক; রানী বসন্তকুমারীকে বর্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে সিভিল ম্যারেজ নামক বিবাহ করেন। ভাস্কর সম্পাদক গুড়গুড়ে পন্ডিত তাহার সাক্ষী থাকেন। গুড়গুড়ে পন্ডিতের প্রকৃত নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। লক্ষ্ণৌ অবস্থিতিকালে তিনি (দক্ষিণাবাবু) একদিন আমাকে বলিলেন যে তিনি বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সমাজসংস্কারক আর কে আছে? দক্ষিণারঞ্জন ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান করিতেন। আমি যখন লক্ষ্ণৌয়ে ছিলাম তাহার পূর্বে তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছিল, কেবল পৌত্র বিদ্যমান ছিল। তিনি উইল না করিলেও এই পৌত্রের বিষয় পাওয়ার

প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

লক্ষ্ণৌএ দক্ষিণাবাবুর ওখানে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের অব্যবহিত পূর্বে কানপুরে ফিরিয়া আসি। সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস হিন্দুধর্মসম্প্রদায়ের বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতাতে প্রমাণ করি যে ব্রাহ্মধর্ম নূতন ধর্ম নহে।

যে আট মাস কানপুরে কাটাই তাহার মধ্যে একমাস হেমচন্দ্র সিংহের বাটীতে ও আর একমাস ডাক্তার অক্ষয়কুমার দের বাটীতে থাকি, আর কয়েক মাস ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকি। হেমচন্দ্র সিংহ ব্রাহ্ম ছিলেন। অক্ষয়কুমার দে ব্রাহ্ম ছিলেন না। উভয়েই যারপরনাই আমাকে যত্ন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সিংহ বড় মজার লোক ছিলেন। হিন্দুভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের নাম তিনি "নামাবলী" রাখিয়াছিলেন। আমাকে সর্বদাই বলিতেন "নামাবলীটি ছাড়ুন।" একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাই। ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে তিনি বলিলেন যে আপনার দেরী হওয়াতে আমি মনে করিলাম যে, আপনি নৈমিষারণ্যে চলিয়া গিয়াছেন।" নৈমিষারণ্য কানপুরের পরপারে কিছুদূর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমার হিন্দুভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। একদিন কানপুরের সকল ব্রাহ্মকে লইয়া আমি বিঠুরগ্রামে বাল্মীকি-তপোবনে গমন করি। সেই বাল্মীকি-তপোবনে উপাসনা করিয়া বিকালে পরপারস্থ সীতাপরিহার মন্দিরের সম্মুখে এপারের ঘাটে বসিয়া রামায়ণ বিষয়ে বক্তৃতা করি। সমস্ত দিন আনন্দে কাটান যায়। বিঠুরগ্রামে বৎসর বৎসর একটি মেলা হয়। ঐ গ্রামের অপর নাম ব্রহ্মাবর্ত। ঐ স্থানে একটি মহারাষ্ট্রীয় উপনিবেশ আছে। ঐ স্থানে খ্যাতাপন্ন (সুখ্যাতিসম্পন্ন কি কুখ্যাতিসম্পন্ন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন) ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের নিবাস ছিল। দেখিলাম তাঁহার বাটী ইংরাজেরা সমভূম করিয়াছে। কেবল একজোড়া প্রকাণ্ড ফটক পড়িয়া আছে। বিঠুরবাসী মহারাষ্ট্রীয় কন্যাগুলি চেহারা বেশভূষায় ঠিক আমাদিগের বাঙ্গালী বালিকার ন্যায় দেখিতে। তাহাদিগকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম।

আমার কানপুরে অবস্থিতির সময় গভর্নমেন্ট স্কুল সব্-ইন্স্পেক্টর ও আমার হিন্দু কলেজের সমাধ্যায়ী বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি (তখন তিনি সি. আই ই. হন. নাই) উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী স্কুলসকল পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল স্কুলের যে সকল নিয়ম বঙ্গদেশের বাঙ্গলা স্কুলে চালাইবার উপযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবার ভার অপর্ণ করেন। তিনি সেই ভারপ্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল স্কুল পরিদর্শনার্থ গমন করেন। যখন তিনি কানপুরে যান তখন আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন কথোপকথনের সময় পিতৃভূমি অর্থাৎ কান্যকুব্জ (কনোজ) দর্শনের প্রস্তাব উঠে। কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আইসে এই জন্য উহাকে আমরা পিতৃভূমি সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। আমরা কনোজ হইতে সংকল্পারূঢ় হইলাম। ভূদেব আমাকে বলিলেন,

"যাইবে তো গাড়ুগামছা হাতে কর"। আমি বলিলাম, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে?" আর এক কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, "আমরা গাড়ুগামছা বহা জাত আগে তা প্রমাণ কর।" কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ আমার বিশ্বাস। কনোজ ফরাক্কাবাদ জেলায় স্থিত, কানপুর জেলায় স্থিত নহে। কিন্তু কানপুর জেলায় স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর পন্ডিত চূড়ামণ অত্যন্ত শিষ্টতাপূর্বক ততদূর আমাদিগের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের উৎসাহ দেখিয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি, কনোজে গিয়া পিতৃভূমির জন্য মোকদ্দমা না করেন।" কনোজের অর্ধরাস্তায় শিওরাজপুর গ্রামে সেখানকার তহশীলদার অর্থাৎ ডেপুটি কলেক্টার লালা বিহারীলালের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজী অতি যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিলেন। লালা বিহারীলাল ঘোর পৌত্তলিক হিন্দু। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "শুনিতেছি কলিকাতায় অনেকে ধর্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ।" ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "বুৎপরস্ত হোনা মোনাসেব নেহি।" তিনি উত্তর করিলেন, "বুৎপরস্ত কোন হ্যায়? হামলোক ক্যায়া মাট্টিকাবুৎকো পূজা করতে হে না উস্‌কা ভিতর দেওতাকো পূজতে?" লালাজী ভূদেবকে তর্ক মীমাংসার মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। ভূদেব অত্যন্ত গম্ভীরমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "সব আচ্ছা হ্যায়, সব আচ্ছা হ্যায়।" অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মও ভাল, পৌত্তলিক হিন্দুধর্মও ভাল। লালা বিহারীলাল এই মীমাংসায় এমনি সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার মুখে ভূদেবের "তারিফ" আর ফুরায় না। আমি ভূদেবকে বলিলাম যে, "আমি যাহা এতক্ষণ বকিয়া মরিলাম তুমি এককথায় তাহা মীমাংসা করিয়া দিলে। তোমাকে ধন্য।" তৎপর দিন সন্ধ্যাকালে কনৌজের অতি নিকট মিরাকি সরাই নামক স্থানে পৌঁছিলাম, তথায় পৌঁছিয়া প্রয়াগবাসী লালা কিশোরীলাল নামক তথাকার মুন্‌সেফের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজী উত্তরপশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সকল হিন্দুজাতির বিবরণ হিন্দিতে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। তিনি সেই বিবরণ পুস্তক এক এক খন্ড আমাদিগকে দান করিলেন। পূর্বে বলিতে ভুলিয়াছি যে এলাহাবাদের নীলকমল মিত্রের স্বসম্পর্কীয় কলিকাতাবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক কোন উৎসাহী ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের সঙ্গী ছিলেন। তিনিও একখানি পুস্তক পাইলেন। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কথোপকথনের সময় লালা কিশোরীলাল একটি আশ্চর্য কথা বলিলেন। সে কথা এই যে গত কুম্ভ মেলার সময় হরিদ্বারে মোগল পরিচ্ছধারী বোখারা ও সমরখন্দ নিবাসী হিন্দু তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমি এইমাত্র বলিলাম যে এই কথা আশ্চর্য কথা; কিন্তু তাহা আশ্চর্য নহে। আমরা ইংরাজী পুস্তকে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে ঐ সকল স্থানে হিন্দু বণিক অনেক পুরুষ অবধি বসতি করিতেছে। লালাজীর প্রণীত ঐ জাতিবিষয়ক পুস্তকে লেখা আছে যে কনোজের বীরসিংহ নামক

রাজার সময়ে তাঁহার দ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরিত হয়। যেদিন আমরা লালা কিশোরীলালের আতিথ্য স্বীকার করিলাম তৎপর দিবস আমরা কনোজ দর্শনার্থ বহির্গত হই। কনোজের শ্রীহীন দশা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হই। জয়চাঁদ ও সংযুক্তার কনোজ আর সে কনোজ নাই। যে নগরে ২৪০০০ চব্বিশ হাজার পানের দোকান ছিল ও যাহা নিত্য উৎসবসমাজ সকলের দ্বারা পূর্ণ ছিল সেখানে এক্ষণে অসংখ্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্নগৃহ ও নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। আমরা দেখিলাম জয়চাঁদের দুর্গস্থানে তামাকের চাষ হইতেছে। আমরা কনোজের হিন্দী স্কুলের পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের টোল দেখিতে গেলাম। ভট্টচার্য মহাশয়েরা আমাদিগকে অর্ঘ্য প্রদান না করিয়া মুসলমান রীত্যনুসারে আতর ও গুজরুটে এলাচ দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা টোলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ভট্টাচার্য মহাশয়েরা বলিলেন যে এমন প্রবাদ আছে যে তাঁহাদিগের কোন কোন ভাই-বন্ধুও বঙ্গদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কনোজে মীরে বাঙ্গালী নামক কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ভগ্ন বাটী আছে। তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অনেক অর্থোপার্জনপূর্বক স্বীয় জন্মস্থান কনোজে আসিয়া ঐ বাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। পিতৃভূমি কনোজ দর্শন করিয়া কি এক মনের ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। উষ্ণীষ ও বৃহৎ চর্মপাদুকাধারী পঞ্চ ব্রাহ্মণ গো-যানে ও তাহাদিগের সঙ্গে পঞ্চকায়স্থ কেহ হস্তীযানে, কেহ অশ্ব-যানে, কেহ অন্য যানে বঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন আমরা কল্পনার চক্ষে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

কানপুর অবস্থিতিকালে মেদিনীপুর নিবাসীরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে আমার স্নায়ুদৌর্বল্য পীড়া আরোগ্য হইবার আশা না থাকাতে আমি আর মেদিনীপুর ফিরিয়া যাইব না, শীঘ্র পেন্সন লইব। ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা সভা করিয়া আমাকে এক অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু

মহাশয়েষু।

মহাত্মন্‌—

আপনি ১৮৫১ খৃঃ অব্দে অত্রত্য গভর্নমেন্ট ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তদবধি প্রায় ১৭/১৮ বৎসর ঐ কার্যোপলক্ষে এখানে অবস্থান করেন। আপনি এই দীর্ঘকাল মেদিনীপুর উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আপনি এ প্রদেশের যে উপকার, যাদৃশী উন্নতি এবং তন্নিমিত্ত যতদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি আপনার পদের কার্য যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে নির্বাহ করিয়াছেন, তাহাতেই এ স্থানের মহোপকার সাধিত হইতেছে। আপনার আগমনের পূর্বে এখানকার গভর্নমেন্ট ইংরাজী বিদ্যালয় অতি হীন অবস্থায় ছিল। তৎকালে ছাত্রসংখ্যা অশীতি এবং শিক্ষক কেবল

ছয়জন মাত্র ছিলেন। তখন ইহাতে অতি সংকীর্ণ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এমন কি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা ফোর্থ নম্বর রীডর পাঠ করিত। কিন্তু আপনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। আপনি যে বৎসর আগমন করিলেন সেই বৎসরেই দুইটি ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর দিন দিন বর্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা তিন শতেরও অধিক এবং ইংরাজী শিক্ষক নয়জন ও পণ্ডিত দুইজন হইলেন। আপনার সময়ে বহু ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বস্তুতঃ আপনি বিদ্যালয়টিকে সম্যক উন্নত করিয়া এদেশের জ্ঞান ও সুনীতির বহুল বিস্তার সাধন করিয়াছেন।

আপনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন মাত্রেই আপনার সমুদায় চিন্তা বিনিয়োজিত করিয়া নিরস্ত হন নাই। যত প্রকারে মেদিনীপুরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইতে পারে, তৎসমুদায়ের উপায় উদ্ভাবনে আপনি নিয়ত যত্নশীল থাকিতেন। এবং যাহাতে সেই সকল উপায় ফলোপধায়ী হয় তজ্জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন।

অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিক বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুরাপান নিবারণী সভাও আপনারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারম্ভাবধি আপনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং সমধিক যত্ন ও উৎসাহকারে ইহার রক্ষা ও উন্নতিসাধন কারিয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাহ্মবিদ্যালয়, ডিবেটিং ক্লাব, মিউচুয়েল ইম্প্রুভমেন্ট সোসাইটি, জ্ঞানদায়িনী, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী প্রভৃতি অনেকগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক একত্রিত হইয়া পরস্পরের চেষ্টা ও আপনার মহার্থপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন।

আপনি মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা করিয়া কতই কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তথাচ আপনার অপ্রতিহত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা এখানে ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত, সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আপনার অবস্থানকালে মেদিনীপুরে যে সকল সৎকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে---রাজভক্তি বা দেশানুরাগের যে সকল উৎকৃষ্ট চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে---উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ বা গত দুর্ভিক্ষকালে অথবা তাদৃশ অন্যান্য সময়ে মোদনীপুরের অন্নরাশি ও অর্থের যে সার্থকতা হইয়াছে সে সমস্ত কেবল আপনারই উৎসাহ, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা সম্পাদিত। মেদিনীপুরের সমুদায় শুভকর কার্যে আপনি মূল ও মস্তক স্বরূপ ছিলেন।

এই সকল হিতানুষ্ঠান দ্বারা আপনি মেদিনীপুরের যে কতদূর মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনি মেদিনীপুরের একপ্রকার নতুন জীবন দান করিয়াছেন। আপনার আগমনাবধি মেদিনীপুর ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছে। কোন বিঘ্ন কোন বাধা দ্বারা তাহার গতিরোধের সম্ভাবনা নাই।

আপনি মেদিনীপুরের পরম হিতৈষী সুহৃদ্, আপনি এ স্থানকে আপনার জন্মভূমির ন্যায় ভালবাসিয়া থাকেন, মেদিনীপুরের হিতানুষ্ঠান ও হিতচিন্তা আপনার প্রিয় ব্রত। আপনি এইস্থানের শুভসাধনে জীবনক্ষেপণ সঙ্কল্প করিয়া কত ক্ষতিই স্বীকার করিয়াছেন। এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আপনি উৎকৃষ্টতর পদলাভের জন্য চেষ্টা করেন নাই। অনেক সময় উপস্থিত পদোন্নতি ত্যাগ করিয়াছেন।

আপনার গুণ ও মহত্ত্ব কেবল মেদিনীপুরেই বদ্ধ আছে, এমত নহে। আপনি যখন যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানকে আপনার গুণমালায় ভূষিত করিয়া থাকেন এবং তত্রত্য লোকদিগের হিতানুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধার আস্পদ হয়েন। আপনার উপদেশবাক্য কেবল আপনার পার্শ্ববর্তী লোকেই শ্রবণ করেন না। বঙ্গভূমির সকল স্থানেই তাহার মধুর হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে, এবং লোকে যত্নপূর্বক তৎসমুদায় অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া তাহার অনুবর্তন করিতেছে। আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মেদিনীপুর নিবাসী নহেন, তাঁহারাও এখানে আসিবার পূর্বে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনার গুণ-গরিমার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে কেন, উত্তরপশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেও আপনার গুণগ্রাম প্রচারিত হইতেছে।

এক্ষণে আপনি মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিতেছেন। হায়! এমন সুহৃদ—এমন হিতৈষীর সমাগমে বঞ্চিত হওয়া কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! আপনার বিরহ যে মেদিনীপুরের কীদৃশ দুঃখাবহ ও কতদূর ক্ষতিকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনার অভাবে মেদিনীপুর গৌরবের বস্তুবিহীন হইতেছে।

আজ যদি আপনি সুস্থ শরীরে কোন উন্নতপদে গমন করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কথঞ্চিৎ ক্ষোভ ও দুঃখের শান্তি হইত। আপনি পীড়াবশতঃ কার্যে অক্ষম হইয়া কর্ম হইতে একেবারে অবসর লইতেছেন, ইহাতে আমাদের যারপরনাই ক্ষোভ পরিতাপ হইতেছে।

আপনি এদেশের যাদৃশ উপকার ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন, আমরা তাহার কি প্রতিশোধ দিব? তাদৃশ ঋণের কিছুতেই পরিশোধ নাই। আজ আমাদের হৃদয় সর্বান্তঃকরণের সহিত আপনাকে প্রীতি-উপহার প্রদান করিতেছে। আপনি আমাদের এই কৃতজ্ঞতাসূচক পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

আমরা কখনও আপনাকে ভুলিতে পারিব না। আপনার সৌম্যমূর্তি ও অমায়িক মধুর স্বভাব আমাদের অন্তরে জাগরূক রহিল।

জগদীশ্বর আপনাকে নীরোগ ও সুখী করুন।

মেদিনীপুর
১৭ চৈত্র, ১৭৯০ শকাব্দ।
২৯ মার্চ, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ।

স্বাক্ষর

শ্রীনবীনকৃষ্ণ পালিত, শ্রীচন্দ্রনাথ দেব, শ্রীভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসর্বসুখ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারিণীচরণ গাঙ্গুলী, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী, শ্রীরামনারায়ণ মিত্র, শ্রীযদুনাথ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণলাল মজুমদার, মছলহদ্দিন মহম্মদ, শ্রীকালীনাথ মজুমদার, শ্রীনবীনচন্দ্র নাগ, শ্রীনীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাচরণ দাস, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীঈশানচন্দ্র সিংহ, মহম্মদ আলি, শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঈশানচন্দ্র বেরা, শ্রীরাধাশ্যাম বাগ, শ্রীঅযোধ্যালাল পাল, শ্রীবজ্রনাথ দাস দত্ত, শ্রীশ্যামাচরণ রায়চৌধুরী, শ্রীজগন্মোহন মাইতি, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীজগৎবল্লভ জানা, শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবচন্দ্র পাল, শ্রীআনন্দলাল সিংহ, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ নন্দী, শ্রীরঘুনাথ দে, আবদুর রব, শ্রীঅভয়চরণ বিশ্বাস, শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মারীক, চৌধুরী খয়রাত আলি, শেকের উল্লা, শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, শ্রীঅভয়চরণ বসু, শ্রীহৃদয়নাথ দাস, আবদুল বাসত, শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র, শ্রীজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীনবকৃষ্ণ আচার্য, মোজাহার হক, শ্রীকৃষ্ণকিশোর আচার্য, শ্রীদীনবন্ধু দত্ত, শ্রীগঙ্গাধর আচার্য, শ্রীগোঁসাই দাস দত্ত, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনীলকমল দে, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামাক্ষয় চট্টেপাধ্যায়, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীকেদারনাথ দাস, শ্রী রামেশ্বর নাথ, শ্রীদুর্গানারায়ণ বসু, শ্রীরামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউদয়চাঁদ পাইন, শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র, শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীরাধামাধব দত্ত, শ্রীহেমাঙ্গচন্দ্র বসু, শ্রীঈশানচন্দ্র বসু, শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়, শ্রীকরালীচরণ দে, শ্রীরামদাস মজুমদার।

উপরিলিখিত ৭৪টি নাম ব্যতীত আর ৯১টি নাম লিখিত আছে।

আমি এই অভিনন্দনপত্রের নিম্নলিখিত উত্তর দিই।

মান্যতম

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত

সভাপতি মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

অতি সমাদরে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিলাম। উহা আমার নিকট হীরক ও স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান।

মেদিনীপুর যাইয়া ৪/৫ বৎসর পরে সিপাহীদিগের বিদ্রোহের পূর্বে আমার কোন বিশিষ্ট রাজকার্য পাইবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু যদি মেদিনীপুর হইতে শীঘ্র বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাদিগের বর্তমান অমূল্য অভিনন্দন হইতে বঞ্চিত হইতাম তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে অপরিসীম ক্ষতির বিষয় হইত।

অতি সমাদরে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু

মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, তাহা ক্ষুব্ধচিত্তে গ্রহণ করিলাম।

আমি বেশ বুঝিতেছি যে মেদিনীপুরের উপকার করিয়াছি, কিন্তু আপনারা যত মনে করিতেছেন তত করি নাই। আমার কার্যসকল আপনাদিগের স্নেহের চক্ষে বর্ধিতাকারে দৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণ সুহৃদগণের সহযোগিতা প্রাপ্ত না হইলে আমি কিছুই করিতে পারিতাম না, অতএব আপনারাই অধিক পরিমাণে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দনপত্রোক্ত প্রশংসাবাদের অধিকারী।

আপনারা কখনই এমত মনে করিবেন না যে আপনাদিগের সৎ অনুষ্ঠানের ফল কেবল মেদিনীপুরেই বদ্ধ হইয়া আছে। আমরা যখন সংকীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্তিকার আলোকে জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভার কার্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে। মেলার ভাবটি নূতন, তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু মেলা সংস্থাপক মহাশয় তৎসংস্থাপন কার্যে আমাদিগের প্রকাশিত "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" প্রস্তাব দ্বারা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেলায় কোন কোন বিষয় ঐ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কার্য হইয়া থাকে ইহা তিনি স্বীয় ঔদার্য ও মহত্ত্ব গুণে অবশ্য স্বীকার করিবেন।

ইহা আমার পক্ষে অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে, যে মেদিনীপুরকে কোন প্রলোভন আমাকে পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হন নাই, তাহা পীড়াবশতঃ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি, কিন্তু কি করা যায়। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমরা ভাবি একরূপ, হয় অন্যরূপ। তাঁহার সঙ্গে কে পারিবে বলুন? তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্বক শয়ান থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি।

কে জানে ঈশ্বর ইচ্ছায় এমন হইতে পারে যে মেদিনীপুরে প্রত্যাবর্তন পূর্বক আপনাদিগের প্রীতিপূর্ণ আনন দর্শন করিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে পারি ও পুনরায় আপনাদিগের সহিত একত্রে সহবাসের অনুপম মুখসম্ভোগ করিতে পারি।

মেদিনীপুরে আমার জীবনের সার ও সুখময় অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি লোকের নিকট নিজ গ্রাম "বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু" বলিয়া পরিচিত নহি, "মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু" বলিয়া পরিচিত। মেদিনীপুরে আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে। মেদিনীপুরের সুপ্রসিদ্ধ সুন্দর রক্তিমবর্ণ রাজমার্গ ও তাহার নিকটস্থ গিরি উপবন ও স্রোতস্বতী যে তাহাকে আমার চক্ষে রমণীয় করিয়াছে এমত নহে; আপনাদিগের সুহৃদয়গণের স্নেহেই তাহা আমার চক্ষে রমনীয় করিয়াছে। আমি যেখানে থাকি না কেন, মেদিনীপুরের কুশলবার্তা, আপনাদিগের কুশলবার্তা ও তথাকার ব্রাহ্মসমাজের ও বিদ্যালয়সমূহের কুশলবার্তা আমার মনকে যেমন আহ্লাদিত করিবে

এমন আর অন্য কিছু করিতে পারিবেক না। আমার সকল স্থানের সুহৃদগণকে বলা আছে যে যদি মেদিনীপুরে আমার মৃত্যু না হয় তবে ঐ ঘটনার পরে আমার ভস্মসাৎ শরীর তথায় প্রেরিত হইবে ও আমাদের দেশের কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগের সমাধিমন্দিরের ন্যায় গোপগিরির উপরিস্থিত এক সমাধিমন্দিরে তাহা রক্ষিত হইবে ও সমাধিমন্দিরের উপর আমার জন্ম ও মৃত্যু শক এবং আমার বক্তৃতা হইতে দুই চারিটি বাক্য লিখিত থাকিবে।

আপনাদিগের যেরূপ বিশ্বাস যে মেদিনীপুরের উন্নতি আর প্রতিহত হইবার নহে, আমারও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় লোকদিগের মধ্যে একজনও লোক সেখানে থাকিতে যে তথাকার উন্নতি বন্ধ হইবে এমন আমি কখনই মনে স্থান দিতে পারি না।

আমার মূর্তি যেমন আপনাদিগের মনে জাগরূক রহিয়াছে তেমনি আপনাদিগের প্রীতিপূর্ণ আনন আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

ঈশ্বর আপনাদিগের আত্মাতে নিয়ত বিরাজ করুন ও আপনাদিগকে সর্বদা আনন্দে রাখুন! ইতি—

(স্বাক্ষর) আপনাদিগের বশম্বদ
ভৃত্য ও স্নেহশীল সুহৃদ
শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

আমার সমাধিমন্দিরে আমার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাক্য কয়েকটি লিখিত থাকিবে।

"প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্যের জীবন, প্রীতি ধর্মপ্রচারের একমাত্র উপায়।" "স্বদেশী লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতিসমূহের মধ্যে গণজাতি হইবে এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।"

উল্লিখিত অভিনন্দন ব্যতীত মেদিনীপুরবাসীরা আমাকে নগদ ৭০০ সাতশত টাকা ও অনেক ব্যয়ে আমার জন্য এক বাটী নিমার্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। সে বাটী এখনও আমার আছে। বঙ্গদেশের অন্য কোন জেলায় প্রধান শিক্ষকের প্রতি সেই জেলার নিবাসীরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে কি না আমি জানি না। আমি মেদিনীপুরবাসীদিগের নিকট যে কত কৃতজ্ঞ তাহা আমি বলিতে পারি না। ঈশ্বর তাহাদিগকে চিরকাল কুশলে রাখুন। ইহা বলা আবশ্যক যে উক্ত বাটী নির্মাণ জন্য দুই হাজার টাকার অধিক ব্যয়ের মধ্যে পূজনীয় দেবেন্দ্রবাবু সহস্রমুদ্রা আনুকূল্য করেন।

আমি যখন কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলাম তাহার পূর্বে বাবু কেশবচন্দ্র সেন

আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। কানপুরে অবস্থিতিকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও কেশববাবুর স্থাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিরোধ চলিতেছিল। আমার অবস্থিতিকালে কেশববাবুর দলের প্রচারকদিগের সর্বদা গমনাগমন হইত। কানপুরের ব্রাহ্মেরা আমাকে বলিলেন যে পূর্বে তাঁহার দলের প্রচারকেরা এত সর্বদা কানপুরে আসিতেন না, ক্বচিৎ কখন আসিতেন। এরূপ পুনঃ পুনঃ আগমন সত্ত্বেও কানপুরের ব্রাহ্মদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে অনেক পরিমাণে আমি আনিতে কৃতকার্য হইয়াছিলাম। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী আমি সর্বোত্তম জ্ঞান করি। সুমহৎ বেদ বেদান্ত অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা উচিত। এমন সময়ে কেশববাবু এলাহাবাদে আইলেন, কানপুরের ব্রাহ্মেরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, তথা হইতে কানপুরে ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহাদের ভিন্ন ভাব দেখিলাম। একদিন সমাজের দিবস উপাসনাকার্যের ভার কানপুরের কোন ব্রাহ্মের প্রতি সমর্পিত হয়। তিনি উপদেশের সময় আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন যে আমি তাঁহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উপদেশের সময় এরূপ কটাক্ষ বিলক্ষণ চলিয়া থাকে; বিশেষতঃ ঐ বিরোধের সময় খুবই চলিত। আমার প্রতি কানপুরের ব্রাহ্মদিগের এই প্রকার ব্যবহারের বিষয়ে কানপুরস্থ একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "আপনি ইহাদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে আনাতে আমি প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম; তৎপরে মনে করিলাম যে প্রচারকদিগের বশীকরণ শক্তি আছে, তন্নিবন্ধন আপনি কৃতকার্য হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে আপনি কোন মতে দুরস্ত করিতে পারিবেন না।" ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কানপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পর সমাজের দিবস ব্রাহ্মের পর ব্রাহ্ম আসিয়া বলিলেন, "আজ আপনাকে অবশ্য সমাজে যাইতে হইবে।" আমি মনে করিতে লাগিলাম যে, "অন্য দিন অপেক্ষা আজ দূতের পর দূত কেন আসিতেছে, আজ কারখানাটা কি?" সেই দিন উপাসনার পর গৌরগোবিন্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্লোক-সংগ্রহ অন্তর্গত বাইবেল ও কোরান হইতে উদ্ধৃত প্রায় সকল বচন পাঠ করিয়াছিলেন। কানপুরের ব্রাহ্মেরা মনে করিয়াছিলেন যে ঐ সকল ম্লেচ্ছ ধর্মগ্রন্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া গায়ত্রী মন্ত্র মনে মনে জপ করতঃ সমাজ হইতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইব। তৎপরে সমাজ ভঙ্গ হইলে যখন তাঁহাদিগকে বলিলাম আমি নিজে বাইবেল ও কোরান হইতে সার সংগ্রহ করিয়াছি তখন তাঁহাদিগের ভ্রম দূরীকৃত হইল। 'হিন্দু থীস্টস্ ব্রাদার্লি গিফ্‌ট'-এর দ্বিতীয় ভাগ স্বরূপ আমার সঙ্কলিত বাইবেলের সার সংগ্রহ ছাপাইবার ভার আমার জামাতা শ্রীমান কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রতি অর্পিত আছে। উহা ঠিক যেন 'হিন্দু থীস্টস্ ব্রাদার্লি গিফ্‌ট'-এর ন্যায় দেখিতে হয় এই আমার অনুরোধ। কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কানপুরে

আইলেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পর যে উপাসনা হয় তাহাতে কানপুরের গভর্নমেন্ট ডাক্তার অক্ষয়কুমার দেকে লইয়া উপস্থিত হইলাম। সেদিন এমন এক দৃশ্য দেখিলাম যাহা আর ব্রাহ্মসমাজে পূর্বে কখন দেখি নাই। উপাসনার পরে প্রত্যেক ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পা ধরিয়া কেহ বলিলেন, ''প্রভু, আমাকে পরিত্রাণ করুন'', কেহ বলিলেন, ''আমার হয়ে দুটো কথা ঈশ্বরকে বলিবেন।'' তাহার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ব্রাহ্ম আচার্যের পা ধরা হইল, স্থবির ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বাবুর পা ধরা হইল না ইহা অনুচিত কার্য হইয়াছে ইহা মনে করিয়া ব্রাহ্মেরা আমার পা ধরিতে আইলেন। আমি ''এমন করিতে নাই, এমন করিতে নাই'' বলিয়া বসিয়া বসিয়া পিছু হাঁটিতে লাগিলাম। ডাক্তার অক্ষয়কুমার দে আমার ভাব দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও বক্তৃতার সময় আমার প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলাম। এইরূপ ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার আবির্ভাব দেখিয়া আমি তাহার বিপক্ষে 'ব্রাহ্মিক এ্যাড্‌ভাইস, কশান্‌ এ্যাণ্ড হেল্‌প' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। কানপুরের ব্রাহ্মরা এই কথা শুনিয়া আমাকে তাহার রচনা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, ''আপনি পূর্বে যেমন প্রীতি বিষয়ে বক্তৃতা লিখিতেন তাহাই লিখুন, ঝগড়ার বই লেখেন কেন?'' আমি বলিলাম, ''তোমরা অতি সরল ব্যক্তি, কোন কোন প্রচারক তোমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। যখন ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা প্রবেশ করিতেছে তখন আমি তাহার বিপক্ষে না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।'' ঐ 'ব্রাহ্মিক এ্যাড্‌ভাইস, কশান্‌ এ্যাণ্ড হেল্‌প' পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি কানপুরের একজন ব্রাহ্মকে নকল করিতে দিই, তিনি নকল না করিয়া উহা আমাকে ফেরৎ দেন। তিনি উহা নকল করা অধর্মের কাজ মনে করিলেন। যেদিন কানপুর ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে আসিব, তাহার অব্যবহিত পূর্বদিনে ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বেড়াইবার সময় যাঁহাকে নকল করিতে দিয়াছিলাম তিনি অনুতাপদষ্ট হইয়া আমার নিকটে আসিয়া, অন্য ব্রাহ্ম শুনিতে না পায়, খুম মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, ''আমায় পুনরায় সেই পাণ্ডুলিপি দিন, আমি একদিনের মধ্যে নকল করিয়া দিব''; আমি বলিলাম, ''আর নকল করিতে হইবে না, আমি শীঘ্র এলাহাবাদ যাইতেছি, তথায় গিয়া উহা চারুচন্দ্র মিত্রের দ্বারা নকল করাইয়া লইব''। আমি এলাহাবাদে আসিয়া ঐ পুস্তক ছাপাই। ১৮৬৮ সালে পূজার অব্যবহিত পূর্বে এলাহাবাদে আসি। কানপুরে আট মাস অবস্থিতি করিয়াছিলাম। যে কয়েক মাস কানপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম তথাকার ব্রাহ্মেরা প্রথমে অন্তরের সহিত ও পরে বাহ্যে আমার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমার শরীর ও বাসের স্বচ্ছন্দতার প্রতি অত্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে ১৮৬৮ সালেব পূজার অব্যবহিত পূর্বে আসি। আসিয়া শুনিলাম

তথাকার আগা সাহেব নামক পারস্য দেশীয় বণিক ও হকিমের ঔষধ সেবন। মাথা ঘোরা, বুক দুড়্ দুড়্ ও অমূকল ভয় ও সন্দেহ এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম। ভাগলপুরে চারি মাস থাকিয়া ইংরাজী ১৮৬৯ সালে পূজার পূর্বে কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় বিখ্যাত রমানাথ কবিরাজের চিকিৎসায় অনেক আরাম প্রাপ্ত হই। রমানাথ কবিরাজ অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে ''বড়লোকের সবই বড়, গুণও যেমন বড় দোষও তেমন বড়।'' এই কথা সকল বড়লোকের পক্ষে না খাটুক, কোন কোন বড়লোকের পক্ষে খাটে বটে। আমি কলিকাতায় ইংরাজী ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইংরাজী ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাকি। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বক্তৃতা করি।—

(১) 'ব্রাহ্মধর্ম কি এই প্রশ্নের জবাব' নামক বক্তৃতা। তারিখ—

(২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা। বক্তৃতার তারিখ—

(৩) সেকাল একাল। বক্তৃতার তারিখ—

(৪) ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব। বক্তৃতার তারিখ—

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। বক্তৃতার তরিখ—

এবং নিম্নলিখিত পুস্তিকাসকল প্রণয়ন করি ঃ —

(১) 'আদি ব্রাহ্মসমাজ, ইহার মত ও নীতি'। প্রকাশের বৎসর—

(২) 'থীস্টিক টলারেশন এ্যান্ড্ ডিফিউজন অফ্ থীজম্'। প্রকাশের বৎসর—

(৩) 'আদি ব্রাহ্মসমাজ অ্যাজ এ চার্চ'। প্রকাশের বৎসর—

(৪) 'সায়ান্স অফ রিলিজন'। প্রকাশের বৎসর—

'ব্রাহ্মবাদ কি' নামক পুস্তিকা আমার বান্ধবী মিস্ শার্প দ্বারা বিখ্যাত ইংরাজ ব্রহ্মবাদী রেভারেন্ড চার্লস্ ভয়সি সাহেবকে উপহার স্বরূপ পাঠাই। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—''বসুবাবুর এই ভাষণ পড়িয়া আমি অনাবিল আনন্দ পাইয়াছি। ইচ্ছা করিতেছে যদি সময় থাকিত তাহা হইলে যাহা যাহা অনুভব করিতেছি তাহা বলিতাম। ইহা অপরূপ সত্য এবং জ্ঞানগর্ভ।'' বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী নিউম্যান সাহেব ঐ পুস্তিকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন— ''আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে পুস্তিকাটির ভাব ও উদ্দেশ্য আদ্যন্ত সুন্দর এবং উৎসাহ উদ্রেককারী। লেখককে আমার গভীর সহানুভূতি জানাই।'' আমার উক্ত পুস্তিকায় ব্রাহ্মধর্ম কি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে কেশববাবুর কতকগুলি মত লইয়া বিচার আছে। ঐ বিচারাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ পুস্তিকা আমার পরম বন্ধু ও হিতৈষী রেভারেন্ড চার্লস ভয়সি সাহেব কর্তৃক লন্ডনে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু থীস্টস্ ব্রাদার্লি গিফ্‌ট্ টু ইংলিশ থীস্টস্' এই নামে আমি উহা তথায় ছাপাই। ভয়সি সাহেব এই পুস্তিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।—

"I have read with the deepest satisfaction your essay on Theism. It might be called a marvel of English composition, so happy have you been in the selection of words and so admirably clear in expressing your thought. I believe it will command the assent of all Theists, though here and there on minor points there would be a slight difference of opinion. * * * Now my dear friend, will you at once send me your *photograph*? I want to place you in my gallery along with Theodore Parker, Professor Newman and Miss Cobbe. But you are a *truer theist* than any of them except Newman.

"ঈশ্বরবাদের উপর আপনার রচনাটি গভীরতম সন্তোষের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহাকে ইংরাজী রচনার এক বিস্ময়কর নিদর্শন বলা যাইতে পারে। কি শব্দচয়ন, কি চিন্তার প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী—সবকিছুই অনবদ্য। আমি বিশ্বাস করি যে, সকল ঈশ্বরবাদীই ইহা অনুমোদন করিবে। তবে স্থানে স্থানে আপনার সহিত সামান্য মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। ...এখন বন্ধুবর, আপনি কি অবিলম্বে আপনার একখানি ফটো পাঠাইয়া দিতে পারিবেন? আমি আপনাকে সেই আসনের মর্যাদা দিতে চাই যেখানে আছেন থিওডোর পার্কার, অধ্যাপক নিউম্যান এবং মিস্ কব। কিন্তু এক নিউম্যান ব্যতীত আপনি উহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরবাদী।" কেবল ভয়সি সাহেব নহেন বিলাতের অনেক ধর্মপত্রিকা উহার প্রশংসা করিয়াছেন। "দি ট্রুথ স্পীকার" বলেন—

"One of the best expositions of Theism we have yet seen; full of clear thought and fine feeling. We are promised 'Theistic Selections from the Bible' and hope to see it as an instalment of a much needed work."

"ঈশ্বরবাদের এমন ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে চোখে পড়ে নাই। উচ্চস্তরের ভাববস্তু এবং প্রাঞ্জল চিন্তায় ইহা সমৃদ্ধ। আমরা "থীস্টিক সিলেক্‌শন্‌স ফ্রম দি বাইবেল"-এর প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি এবং আশা করি অতি প্রয়োজনীয় গবেষণার প্রথম কিস্তি হিসাবে ইহা আমাদের মনোহরণ করিবে।"

"দি ইন্‌কয়্যারার" বলেন—

"We welcome this little gift from a cultured and spiritually minded Hindu Theist and would asssure the author that we have read it with unqualified approval. * * * The essay before us presents Theism in its purest and highest from, stripped of the legends amd superstitions which degrade and deform more or less all the great historical religions and the world. * * * Our own Christianity embraces the noblest sentiments contained in the essay. With its spiritualllity, its catholicity,

its high and pure morality, its universalism, we are in full sympathy." After quoting a passage from the book the reviewer remarks—"These are true and noble sentiments. Would that the mass of mankind were ready to appreciate and receive them."

"একজন সুশিক্ষিত, ধার্মিক হিন্দু ঈশ্বরবাদীর নিকট হইতে এই ক্ষুদ্র দান পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি এবং আমরা লেখককে এই কথা জোরের সহিত জানাইতেছি যে, আমরা ইহা পড়িয়াছি এবং ইহাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। এই রচনাটি ঈশ্বরবাদের শুদ্ধতম এবং উচ্চতম রূপের পরিচায়ক। কিংবদন্তি কিংবা কুসংস্কার যাহা পৃথিবীর সকল মহৎ ঐতিহাসিক ধর্মকে বিকৃত ও অপমানিত করে তাহার ছিটেফোঁটাও নাই এই রচনায়। এই রচনায় যে শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি আছে তাহা আমাদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবেই। ইহার ভাগবতধর্ম, উদার-নীতি, ইহার উচ্চ ও শুদ্ধ নৈতিকতা এবং ইহার সার্বজনীনতার প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।" গ্রন্থখানি হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক মন্তব্য করিতেছেন, "এইগুলি সত্য এবং উচ্চস্তরের ভাব। মনুষ্যজাতি যদি এইগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিত তাহা হইলে ভাল হইত।"

প্রসিদ্ধ মিস সোফিয়া ডবসন কলেট আমার এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৮৮২ সনের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক-এ লিখিয়াছেন—

"An earnest and well-written tract, in excellent English setting forth the doctrines of Theism, and its position in relation to other systems. Babu Rajnarain Bose writes in a very kindly spirit, and prefaces his tract with the following "Dedication." "To the Unitarians of England, whose church is growing from within, this work is inscribed by the author, in the hope that it may afford them some help, however feeble, in giving a character to their church more consonant to the spirit of Theism to which it is tending, and in the adoption of which that tendency must inevitably terminate."

"চমৎকার ইংরাজীতে লেখা এই প্রকৃষ্ট রচনাটিতে ঈশ্বরবাদের মতগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য মতের সহিত ইহাদের এক তুলনামূলক বিচার করা হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অত্যন্ত বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি এই রচনার ভূমিকায় নিম্নলিখিত 'উৎসর্গ'টি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"লেখক কর্তৃক প্রবন্ধটি ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ানদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইল (যাঁহাদের চার্চ ভিতর হইতে গড়িয়া উঠিতেছে) এই আশায় যে তাঁহারা ঈশ্বরবাদের অনুকূল প্রবণতা লইয়া যে চার্চ গঠন করিতেছেন তাহাতে কিছুটা সাহায্য হইবে, সে-সাহায্য যতই সামান্য হউক না কেন এবং তাঁহাদের এই প্রবণতা একদিন স্পষ্ট পরিণতি লাভ করিবে।"

"সায়ান্স অফ্ রিলিজন" সম্বন্ধে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' বলিয়াছিলেন—

The Science of Religion has a unique interest for all Brahmos. It is, in short, their Theology. Very few Brahmos have, however, sufficiently appreciated its importance or devoted their attention to it. Within the last few months, however, Babu Rajnaram Bose has published a pamphlet containing the results of his long study and thought on the subject. We most heartily welcome this little book and hope it will be extensively read by Brahmos. We may be quite proud of it as the author has not simply borrowed from Europeans but derived some of his ideas on the subject from Sanskrit sources. Indeed, this would be quite evident from the manner in which he develops his thought and ideas on the subject, even has he not told us of it in the preface. Anything written by a man of his ability and experience deserves serious study and consideration. The work before us is full of original suggestions and acute remarks. We draw to it the attention of all thoughtful Brahmos who want to study the philosophical foundation of their religion. * * * Like Geometry, Theology or the Science of Religion is a deductive science. The former begins with a few axioms and definitions and constructs from them by deductive reasoning the whole body of the science. The latter starts from certain axioms known intuitively and develops by deductive reasoning the truths which are implicitly contained in them. *** We have briefly given about the method proposed by our author for the Science of Religion in this little book. It is not a bad one so far as it goes. It is indeed quite a legitimate method in science and has been very fruitful as is well known in Geometry and other Deductive Sciences. Within its proper limits it could be equally fruitful in the Science of Religion. And the use made of it by our author seems to us to be quite legitimate; and the results arrived at quite reasonable and valid."

"ব্রাহ্মগণের নিকট 'সায়ান্স অফ্ রিলিজন'-এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ। তবে খুব সংখ্যক ব্রাহ্মই ইহার কদব করিয়াছেন। যাহা হউক, গত কয়েক মাসে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই বিষয়ে তাঁহার সুদীর্ঘ গবেষণা ও অধ্যয়ন-লব্ধ ফল একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তিকাটিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আশা করি যে, ব্রাহ্মগণ ইহা ব্যাপকভাবে পাঠ করিবেন। আমরা এইজন্য গর্ব অনুভব করিতেছি যে লেখক মহাশয় কেবল ইউরোপীয়ানদের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে কর্জ লন নাই; পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার চিন্তার উৎস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন সংস্কৃত সাহিত্যকে। ইহা সহজেই প্রমাণ করা যায় যদি দেখি কি ভাবে তিনি তাঁহার চিন্তা ও ধারণাগুলিকে পল্লবিত করিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি একথা লিখিয়া না দিলেও আমরা বুঝিতে পরিতাম। যে-ব্যক্তির ভাবিবার এবং লিখিবার ক্ষমতা এইরূপ এবং যাঁহার অভিজ্ঞতা এত সুদূরপ্রসারী, আমাদের

উচিত তাঁহার প্রত্যেকটি রচনা উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা। বর্তমান রচনাটি মৌলিক প্রস্তাব ও দুরূহ মন্তব্যে পূর্ণ। চিন্তাশীল ব্রাহ্মগণ যাঁহারা তাঁহাদের ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে পড়াশুনো করিতে চান তাঁহাদের দৃষ্টি আমরা এই পুস্তিকাটির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। জ্যামিতির ন্যায়, ধর্মতত্ত্ব কিংবা ধর্মবিজ্ঞানও অবরোহী বিজ্ঞান। জ্যামিতি প্রথমে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং সংজ্ঞাকে স্বীকার করিয়া লয় এবং অবরোহী যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানের একটি সমগ্র সৌধ নির্মাণ করে। ধর্মতত্ত্বও প্রথমে বিশেষ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধকে স্বীকার করিয়া লয়, যে-স্বতঃসিদ্ধগুলি সংজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয় এবং অবরোহী যুক্তির সাহায্যে তন্নিহিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্মবিজ্ঞানের আলোচনার জন্য লেখক মহাশয় এই পুস্তিকায় যে পদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা উপরে দিয়াছি। এই পদ্ধতি মন্দ তো নয়ই বরং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহাই যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি যাহা জ্যামিতি এবং অন্যান্য অবরোহী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইয়াছে। মোটামুটিভাবে ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি সমান ফলপ্রসূ হইতে পারে। লেখক মহাশয় যে এই পদ্ধতিটি কাজে লাগাইয়াছেন তাহা খুবই যুক্তিসঙ্গত। এবং সিদ্ধান্তগুলিও সুযুক্তিপূর্ণ এবং কার্যকরী হইয়াছে।''

''দি সানডে মিরর'' বলিয়াছিলেন—

"Babu Rajnarain Bose has acquitted himself thoroughly well. In the course of a few thoughtful pages he has shown the feasibility of a science like this. The leading tenets of Theism are drawn up on a logical basis, as we believe he has succeeded in showing that Religion as a science, is as reliable and trustworthy as other sciences."

''রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সুষ্ঠুভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কয়েকখানি সুচিন্তিত পৃষ্ঠায় তিনি এইরূপ বিজ্ঞানের ব্যবহারিকতা প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বরবাদের মূলসূত্রগুলিকে যুক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন যে, বিজ্ঞান হিসাবে ধর্মও অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।''

ভয়সি সাহেব এই পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার এই পত্রের পুনশ্চে বলিয়াছিলেন—

"P.S. August, 20 (1879) I am at home again and have read with great admiration your essay on Religion as a science. This work deserves and, if I mistake not, will receive great attention from the scientific world. If you will send me 20 copies for sale I will remit you the cost and postage when I kn... the amount."

২০শে আগস্ট, ১৮৭৯।

"বাড়ি ফিরিয়া আপনার 'বিজ্ঞান হিসাবে ধর্ম' প্রবন্ধটি পড়িয়া আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে পারি এই প্রবন্ধটি বিজ্ঞান-জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। যদি আপনি বিক্রয়ের জন্য কুড়ি কপি বই পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আমি ডাকখরচ সমেত সেগুলির মূল্য পাঠাইয়া দিব। মোট মূল্য জানাইবেন।"

কলিকাতায় অবস্থিতি কালে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদিনী মিস্ ফ্রান্সেস পাওয়ার কব তাঁহার 'এ্যালোন টু দি এ্যালোন' পুস্তক আমাকে একখণ্ড প্রদান করাতে তাঁহার সহিত আমার পত্র লেখালেখি হয়। সেই সকল পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

Calcutta,
June, 1871.

Dear Madam,

I have received your very valuable present of a copy of "Alone to the Alone." ***. The book is a little compact chest of distilled sweets, distilled from the flowers of love and veneration growing in the innermost recesses of the human heart. *** It represents all the shadows and lights of human life and all the moods of the human mind from doubt to faith, from grief and despondency to social mirth and merriment. It is adapted to all states of the mind. It will infuse strength into the weak and wavering, give consolation to the miserable and heighten the joy of the happy. It will confirm faith, increase veneration and rekindle the flame of devine love in hearts becoming cold as mine. It is, indeed, a most valuable manual of devotion of Theists. It has a mission to fulfil. May God speed that mission.

The fact of the prayers in the book having been contributed by fifteen individuals of different countries and races and trained up in the midst of different religions speaks to the identity of Theism and is an earnest of its future universal diffusion and permanence.

The preface to your book is an invaluable one. Seldom have I seen such noble thoughts expressed in such luminous and felicitous language, evincing the finest intuitions and the most delicate perceptions of the true, the good, and the beautiful.

I perfectly agree with what you say about prayer being a natural act of the human mind. As the lotus, to use a Hindu simile, opens its closed petals to the rising beams of its beloved sun, so the lark rises higher and higher in the sky towards the sun, faming a flood of melody below, so the soul of man rises higher and higher to God by means of prayer, delighting with its utterance men below. It is as natural to man to pray as for a lotus to open its petals to the rising sun and for the lark to rise in the sky and sing as it rises. Your remarks on prayer for spiritual blessings delight me much. The

invariable fulfilment of such prayer comes from an invariable spiritual law. Unless we want God, we cannot obtain Him; unless we want the aid of God to enable us to obtain Him, we cannot obtain Him. But the noblest of prayers is, I think, that to which the word prayer in its usual sense cannot apply. It is the state of "still communion which transcends the inferior offices of prayer and praise." It is the state which our Vedas call the state of full cantact with God, the state, which it declares to be the source of the gratest felicity. This state is compared by it to holding the *amalaki* fruit in the palm of the hand. The word for prayer in the Sanskrit language *(upasana)* comes from a root signifying "to sit" and literally means "sitting lowly before God." This "sitting lowly before God" at last culminates in the contact with God mentioned above.

Your expression "the Being dearer and nearer to us than a flower or star" brought to my mind the saying of the Persian Poet Said: "The Friend is nearer to me than I am to myself. This is troubling to me that I am far from Him." Our Vedas say in one place: "The wise, who see Him in the soul, enjoy everlasting peace and not others" and in another: "The wise, who see Him in the soul, enjoy everlasting felicity and others." This constant perception of God as the soul of the soul, nearer to me than I am to myself and more mine than I am mine, is, I think, the highest prayer.

Most of the prayers in the book are addressed to God as father and mother. The ideas of God as father and mother are very consoling and, at the same time, true, in as much as (to quote the beautiful words of Leigh Hunt) that side of God which touches humanity is true; but still those words only figuratively express the relation of God to us. God is not exactly our father and mother as one's earthly father and mother are. More spiritually true, therefore, is the undefinable mysterious relationship which draws us to Him as nearer and dearer to ourselves than we are to ourselves. This is well illustrated in the following song of Bishturam, one of our principal Brahmo song-makers: "I am at a loss to think what relationship is there between you and me. I find no clue of this, O Thou beyond conception, in the Vedas and Puranas! Art Thou father, mother or any near relation? This cannot possibly be said of Thee. How strange is this that there is no relationship with Thee but still I do not consider Thee as a stranger. I hear from all the Sastras that Thou art in every place but still I know Thee not. Thou must be somebody who is mine, yea, more mine than I am mine. If this be not the case, why does the mind of itself draw to Thee?" Bishturam puts in the words,

"Brother, sister, son or daughter" after "Father, mother, near relative, but as it is offensive to good (European) taste to use those words with reference to God, I have expunged them from the translation.

I quite agree with you in the opinion that there is a separate set of faculties for the attainment of religious knowledge, and the intellect or, in other words, the reasoning faculty (There is a difference between the reasoning faculty and reason) plays but an inferior part in the process, acting simply as "regulator and corroborator" of what we learn from those faculties, but, from your frequent allusions to sculpture, painting and music when treating of the existence of those faculties it seems that you think them somewhat akin to the aesthetic faculty (which does not occupy a very high rank in the classification of the faculties) and the affections. You seem to think them to be more of an emotional character than otherwise, but that this is not exactly what you mean, appears again from other words in the preface where you say that we know God by means of the three faculties of will, conscience, and affection. I, however, go to the length of saying that even these three faculties are insufficient to give us the knowledge of God. They certainly give us the idea of a Being possessed of intelligence, purity and love far higher than our intelligence, purity and love, but they do not lead us to the idea of the Absolutely Perfect Being. For that idea we must seek other sources than those three faculties. I think those sources are the intuitions of reason and judgement. Matter is not an object of sensuous perception nor is mind that of consciousness. By sensuous perception we know only the qualities of matter and not matter itself. By consciousness, we know only the qualities of mind and not mind itself. It is by an operation of reason that we know matter and mind, but that is an operation of reason in its intuitive form. As we know mind and matter by intuition of reason we know the Perfect Being, the eternal ground of all existences, upon whom matter and mind depend, by intuition of reason also, but the intuition of reason cannot give us an enlightened idea of absolute perfection. It only gives us a vague idea of the Perfect Being. It only enables us to know that the imperfect depends absolutely upon the Absolutely Perfect. But what is absolute perfection itself it does not enable us to know. For an enlightened idea of the Absolutely Perfect Being, we are indebted to the intuition of judgment which lets us know what qualities are nobler than others. It is by the intuition of judgment we perceive that one idea of absolute perfection is nobler than another until we arrive at the highest idea of God. From the intuitions of judgment also, we derive our notions of right and wrong.

In this view of the question, conscience merges into the faculty of intuitive judgment, the feelings of moral approbation and disapprobation accompanying each act of such judgment being distinct from the latter. Conscience in its usual acceptation more properly means these feelings than the judgment above alluded to ***

You seem to think that the idea of God, given by the will, the conscience and the affections, and of an intuitive character but strictly considering they are not so. The Being who has given us will must have will—the Being who has given us ideas of moral purity must himself be pure—the Being who has given us love must himself have love—are all inferences and not intuitions.

You say in one place of your preface: "Because we rejoice in these relics of ancient piety and delight to use them as often as they suggest themselves, as the genuine expressions of our feelings and love to link ourselves by their employment to the great chain of pious souls, stretching through the past, it does not therefore follow that we can confine ourselves within their limits or find in them, as a whole, the free channel wherein our faith can flow unbrokenly." This is a very sound principle. According to this principle, old and new elements should both be united in Theistic services and prayer-books. The retention of the old element aids the diffusion of Theism among the mass of mankind who has a tender fondness for the past. The acknowledgement of the merits of Christ in some of the prayers in your book, besides sounding very graceful as expressions of gratitude in the mouths of European Theists who have conscientiously greater admiration for Christ than we, Hindu Theists, have, links the past with the present and aids the diffusion mentioned above. I am very glad to mark the sacred regard and the affectionate tenderness with which you have spoken of the past everywhere in your preface.

How happy is your expression "as if the Divinity were something hidden in a lump pf quartz!" How often have I quoted this to some of my scientific friends who do not depend on the intuitional argument (if such a term can be used) for the existence of God but seek for proofs of His existence in the external world.

You say in one place of your preface: "Virtue, truth and charity are such blessed things that we cannot even think of them without being the better for it or brush past them on our way through life without carrying on our garments the smell of the field which the Lord hath loved." This brought to my mind the saying of the Persian Poet: "The company of the pious is like an otto-holder. Though it may not give us a portion of the otto of roses it contains, yet

there cometh out a smell thereof." This means in Eastern language: "Though we may not be actually pious from the company of the pious yet we may be the better for it."

You say in a certain place of your preface: "a man may or may not make rules of devotion, trusting in the latter case only to the unflagging ardours of his heart." This want of rule may suit a few truly exalted and disciplined minds like yours but in the case of the generality of men rules of devotion are required. If they be taught to "leave the generous to shape themselves", I fear they will be totally extinguished. * * *

I was literally charmed by the last paragraph of your preface and blessed the hand that indited it.

I am very glad to see the book opens with a motto from Plotinus. If any non-Hindu approached in his opinions amd character to the Rishis of ancient India, it was Plotinus of Alexandria. In fact, it is said by some historians that he borrowed his doctrines from the sages of India. Hindu ships that sailed to Alexandria imported philosophical opinions into that city as well as articles of merchandise. * * * Although the book opens with a motto from Plotinus, I am sorry to see that there is not a single prayer in the book which properly illustrates its charming title and which can be called truly Plotinian in character —one which Plotinus himself, refined by the influence of Theism, would have composed at your request had he been living. I have attempted to supply the deficiency in the following prayer. Although I am but a worm compared with the Great Alexandrian, I was led to write it out as my personal opinions on the subject of divine communion and my personal feelings towards God are akin to his. Had this not been the case, I would not have writen it, for prayer should come out from the heart. I also send you another prayer expressing my gratitude to God for the many mercies He has shown me in my own life.

I hope the strictures I have maade above are not of such a nature as to merit the censure which you have justly pronounced upon "as our burden and bane." How bitterly we are feeling the truth of this remark in our Calcutta Society. * * *

I remain, Dear Madam, with the deepest respect, your Hindu fellow-theist, (Sd.) Rajnarain Bose.

কলিকাতা

জুন, ১৮৭১।

সুচরিতাসু,

আমি আপনার 'এ্যালোন টু এ্যালোন'-এর ('একার প্রতি একা') এক কপি উপহার পাইয়াছি। এই উপহার বহু মূল্যবান। গ্রন্থখানি মাধুর্যের খনি, যে-মাধুর্য মানবহৃদয়ের গহনতম প্রদেশে জাত ভক্তিপূর্ণ প্রেমপুষ্প হইতে পরিস্রুত হইয়াছে। ইহার মানবজীবনের সকল আলো-ছায়া, মানবমনের সকল বৈশিষ্টাকে (সন্দেহ হইতে বিশ্বাস পর্যন্ত, দুঃখ ও হতাশা হইতে সামাজিক আনন্দ ও স্ফূর্তি পর্যন্ত) ব্যক্ত করিয়াছে। ইহা দুর্বল ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে শক্তি যোগাইবে, দুঃখীকে দিবে সান্ত্বনা এবং সুখীর সুখ বৃদ্ধি করিবে। ইহা বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবে, ভক্তি বৃদ্ধি করিবে এবং আমার ন্যায় যাঁহাদের হৃদয় উদাসীন হইয়া যাইতেছে, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমের শিক্ষা পুনঃপ্রজ্বলিত করিবে। এই বহু মূল্যবান গ্রন্থখানি ঈশ্বরবাদীদের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি করিবে। ইহার একটি ব্রত আছে। ঈশ্বর করুন এই ব্রত যেন অচিরে সফল হয়।

গ্রন্থের অন্তর্গত উপাসনাগুলির তথ্য যাহা বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন ধর্মে প্রতিপালিত পনেরজন ব্যক্তি দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, তাহা একবাক্যে ঈশ্বরবাদকে প্রমাণিত করে এবং ইহা ভাবী সার্বজনীন ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্বের এক মহামূল্যবান সম্বল।

আপনার গ্রন্থের ভূমিকাটি অমূল্য। এমন মহৎ চিন্তা, চিন্তার এমন প্রাঞ্জল ও দীপ্ত প্রকাশ আমি খুব কমই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি মহত্তম স্বজ্ঞা এবং সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির সাক্ষ্য দেয়।

আপনি বলিয়াছেন যে উপাসনা করা মানবমনের একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। আমি আপনার সহিত একমত। হিন্দুদিগের একটি উপমার অনুসরণে বলা যায়, যেমন করিয়া পদ্ম তাহার নিমীলিত পাপড়িগুলিকে প্রিয় সূর্যের প্রথম আলোকে উন্মীলিত করে, তেমনই উপাসনার দ্বারা মানবহৃদয় নিজেকে ঈশ্বরের নিকট বিকশিত করে। যেমন করিয়া লার্ক পক্ষী মর্তে সুরের বন্যা বহাইয়া সূর্যের উদ্দেশ্যে আকাশের উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে উড়িয়া যায়, তেমনই মানুষের মন আত্মস্থ মর্তবাসিগণকে আনন্দ পরিবেশন করিতে করিতে উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে ছুটিয়া চলে। নবীন সূর্যের আলোকে পদ্মের পাপড়ি উন্মীলন যেমন স্বাভাবিক, আকাশে আরোহণ করিতে করিতে লার্ক পক্ষীর গান গাওয়া যেমন স্বাভাবিক, উপাসনা করাও মানবের পক্ষে ঠিক তেমনই স্বাভাবিক। স্বর্গীয় আশীর্বাদের জন্য উপাসনা সম্পর্কে আপনার মন্তব্যগুলি আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়াছে। এমন উপাসনার অনিবার্য তৃপ্তি আসে অপরিবর্তনীয় স্বর্গীয় নিয়ম হইতেই। আমরা যদি ঈশ্বরকে না চাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে পাইব না। তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে যদি সাহায্য ভিক্ষা না করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে পাইব না। কিন্তু আমার মতে শ্রেষ্ঠ উপাসনা হইল তাহাই যাহা উপাসনার অতি সাধারণ অর্থের

সহিত যুক্ত নয়। এই উপাসনা হইল সেই নীরব বিনিময় যাহা উপাসনার সুলভ আবিলতা এবং অহংকারকে ছাপাইয়া ব্যক্ত হয়। ইহা হইল সেই অবস্থা আমাদের বেদে যাহাকে বলে ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ মিলন। এই অবস্থায় অন্তর ঈশ্বরের সাবলীল সার্বভৌমিকতাকে উপলব্ধি করে। এই অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, হাতের চেটোয় আমলকী ফলকে ধারণ করার সহিত। সংস্কৃত 'উপাসনা' শব্দটি আসিয়াছে 'আসন গ্রহণ করা' হইতে এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ হইতেছে ঈশ্বরের সম্মুখে নিরহংকার হইয়া উপবেশন করা। আর ঈশ্বরের সম্মুখে নিরহংকার হইয়া উপবেশন করাই পরে ঈশ্বরের সহিত মিলনে পর্যবসিত হয়।

'পরমসত্তা ফুল কিংবা নক্ষত্র হইতেও আমাদের নিকট প্রিয়তর এবং নিকটতর'— আপনার এই কথাটি ইরানী কবি সাদির একটি উক্তি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে ঃ 'আমার নিকট আমি যতটা নিকট, তাহার চেয়েও বন্ধু (ঈশ্বর) আরও নিকট। আমার কষ্ট হয় এই জন্য যে আমি তাঁহার নিকট হইতে অনেক দূরে।' আমাদের বেদের একস্থানে আছে ঃ 'প্রকৃত জ্ঞানী যিনি তাঁহাকে আত্মার ভিতরে দেখেন তিনিই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি উপভোগ করেন, অন্যেরা নহে।'' অন্য একস্থানে আছে ঃ ''প্রকৃত জ্ঞানী যিনি তাঁহাকে আত্মার ভিতরে দেখেন, তিনিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন, অন্যেরা নহে।'' ঈশ্বর আত্মার আত্মা—সর্বদা এই অনুভূতি, আমার নিকট আমি হইতেও তিনি নিকট এবং আমি যতটা নিজের তিনি তাহা হইতেও আমার নিজের ইহাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

গ্রন্থের বেশির ভাগ উপাসনাই ঈশ্বরকে পিতৃরূপে এবং মাতৃরূপে কল্পনা করিয়াছে। ঈশ্বরকে পিতৃরূপে এবং মাতৃরূপে কল্পনা করার ধারণা অত্যন্ত যৌক্তিক এবং সান্ত্বনাপ্রদ। উপরন্তু ইহা সত্য। লে হান্টের কথায়, ঈশ্বরের যে সত্তা মানবহৃদয়কে স্পর্শ করে সেই সত্তা সত্য। তথাপি এই কথাগুলি কেবল আলংকারিক তাৎপর্যে আমাদের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক ব্যক্ত করে। ঈশ্বর ঠিক পার্থিব মাতাপিতার ন্যায় নহেন। সুতরাং এই অনির্বচনীয় রহস্যময় সম্বন্ধ (যাহা আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যায় এবং যাহার জন্য আমরা নিজেদের নিকট যতটা প্রিয় এবং নিকট তিনি তাহা অপেক্ষাও আমাদের প্রিয় এবং নিকট) আধ্যাত্মিকভাবে সত্যতর। ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আমাদের অন্যতম প্রধান ব্রাহ্ম গীতিকার বিষ্টুরামের এই গানে ঃ 'তোমার আমার মধ্যকার সম্পর্ক কি তাহা আমি ভাবিয়া কূল পাইনা। বেদে এবং পুরাণে — 'ওগো ধারণাতীত'—ইহার কোন সন্ধান-সূত্র আমি পাই না। তুমি কি পিতা? তুমি কি মাতা? কিংবা কোন নিকট আত্মীয়? খুব সম্ভব তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় না। কি আশ্চর্য, তোমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি আমি তোমাকে পর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রে আছে শুনি তুমি সর্বত্র বিরাজ কর, কিন্তু তথাপি আমি তোমাকে চিনি না। তুমি নিশ্চয়ই এমন

কেহ হইবে যে আমার, হ্যাঁ, আমি যতটা নিজের তাহা হইতেও যে আমার। তাহা যদি না হয়, তবে কেন মন স্বেচ্ছায় তোমার দিকে ছুটিয়া যায়?'' পিতা, মাতা, নিকট আত্মীয় ব্যতীত বিষ্টুরাম ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র কিংবা কন্যা নামও দিয়াছেন; কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে ইহা (ইউরোপীয়) সুরুচিকে আঘাত করিতে পারে, সেইহেতু অনুবাদ হইতে আমি এগুলি বাদ দিয়াছি।

আপনি যে বলিয়াছেন, ধর্মজ্ঞানের উপলব্ধির জন্য পৃথক কতকগুলি শক্তির প্রয়োজন, তাহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। ইহা ব্যতীত, বুদ্ধি অর্থাৎ যুক্তি প্রয়োগের শক্তি (যুক্তি এবং যুক্তি প্রয়োগশক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে) যে ইহাতে গৌণভাবে অবস্থান করে, এই শক্তিগুলি হইতে যাহা আমরা শিখি তাহাতে ইহার কাজ যে শুধু 'নিয়ামক এবং পোষক বা সমর্থক'-রূপে—তাহার সহিতও আমি একমত; কিন্তু এই শক্তিগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আপনি যে পুনঃ পুনঃ ভাস্কর্য, চিত্র এবং সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে আপনি ইহাদের কিছুটা স্নেহপ্রবণতা ও কান্তশক্তির সগোত্র করিয়া ভাবেন। মনে হয়, আপনি ভাবেন যে ইহারা স্বভাবে অপেক্ষাকৃত প্রক্ষুব্ধ, কিন্তু আপনি যে ঠিক এই মত পোষণ করেন না তাহা আপনার ভূমিকার অন্যান্য কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়—যেখানে আপনি বলিয়াছেন যে আমরা ঈশ্বরকে জানি তিনটি উপায়ে—বুদ্ধি, বিবেক এবং স্নেহপ্রবণতার শক্তির দ্বারা। আমি বলি কি, এই তিনটি শক্তিও ঈশ্বর-জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইহারা অবশ্য আমাদের সেই সত্তার ধারণা করাইতে পারে, যে সত্তা আমাদের বুদ্ধি, শুদ্ধতা ও প্রেমের চেয়েও যে পরিপূর্ণ বুদ্ধি, শুদ্ধতা ও প্রেম আছে, তাহার অধিকারী; কিন্তু ইহারা আমাদের সেই সত্তার খোঁজ দিতে পারে না যে-সত্তা পরম ও পরোৎকৃষ্ট। এই সত্তার ধারণার জন্য উল্লিখিত তিনটি শক্তি ছাড়াও, আমাদের অন্যান্য শক্তির সন্ধান করিতে হইবে। আমার মতে এই শক্তিগুলি হইল যুক্তি ও বিচারের স্বজ্ঞা। পদার্থ যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষতার বস্তু নয়, তেমনই মনও চেতনার বস্তু নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষতা দ্বারা আমরা কেবল পদার্থের গুণাবলী জ্ঞাত হই। কিন্তু পদার্থকে জানিতে পারি না। চেতনার দ্বারা আমরা কেবল মনের গুণাবলী জ্ঞাত হই, কিন্তু মনকে জানিতে পারি না। যুক্তির দ্বারা আমরা পদার্থ ও মনকে জানিতে পারি, কিন্তু এই যুক্তির ক্রিয়া স্বজ্ঞাসঞ্জাত। যুক্তির স্বজ্ঞা দ্বারা আমরা যেমন পদার্থ ও মনকে জানিতে পারি, তেমনই যুক্তির স্বজ্ঞা দ্বারা আমরা পরম সত্তাকেও জ্ঞাত হই, যে পরম সত্তা সকল অস্তিত্বের শাশ্বত ভিত্তি এবং যাহার উপর পদার্থ ও মন নির্ভর করে; কিন্তু যুক্তির স্বজ্ঞা পরম পরোৎকর্ষের কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের দিতে পারে না। ইহা কেবল আমাদের পরম সত্তার একটি অবচ্ছা ধারণা দেয়। ইহা কেবল আমাদের জানিতে সক্ষম করে যে যাহা অপূর্ণ তাহা একান্তভাবে পরম পরোৎকৃষ্টের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পরম পরোৎকর্ষ

যে কি তাহা ইহার দ্বারা জানা সম্ভব নয়। পরম পরোৎকৃষ্ট সত্তার সুস্পষ্ট ধারণার জন্য আমরা বিচারের স্বজ্ঞার নিকট ঋণী যাহা আমাদের জানিতে সক্ষম করে কোন্ গুণ মহৎ এবং কোন্ গুণ মহত্তর। বিচারের এই স্বজ্ঞা দ্বারাই আমরা অনুভব করি যে পরম পরোৎকর্যের একটি ধারণা অন্যটি হইতে অধিকতর মহৎ এবং এইভাবে আমরা ঈশ্বরের পরম সত্তা সম্পর্কে এক চরম পর্যায়ে উপনীত হই। বিচারের স্বজ্ঞা দ্বারা আমরা ভালমন্দের ধারণা করি। এই দিক দিয়া বিবেক স্বজ্ঞাজনিত বিচারশক্তির সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যেকটি বিচারের সহিত যুক্ত থাকে নৈতিক অনুমোদন এবং অনুমোদনের ভাব এবং একটি বিচার অন্যটি হইতে ভিন্ন। সাধারণতভাবে বিবেক বলিতে আসলে বুঝায় এই ভাবগুলিকে। উল্লিখিত বিচার সম্ভবতঃ বিবেক নয়।

মনে হয়, আপনি ভাবেন যে ইচ্ছাশক্তি, বিবেক এবং স্নেহপ্রবণতাদত্ত ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাগুলির স্বভাবে স্বজ্ঞাসঞ্জাত; কিন্তু গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহারা তাহা নয়। যে-সত্তা আমাদের ইচ্ছাশক্তি দিয়াছে, সেও নিশ্চয়ই ইচ্ছাশক্তির অধিকারী; যে-সত্তা আমাদের নৈতিক শুদ্ধতার ধারণাগুলি দিয়াছে, সে নিজেও নিশ্চয়ই শুদ্ধ; যে-সত্তা আমাদের প্রেম দিয়াছে, সে নিজেও নিশ্চয়ই প্রেমের অধিকারী;—এইগুলি অনুমিতি, কিন্তু স্বজ্ঞা নয়।

আপনি আপনার ভূমিকার একস্থানে লিখিয়াছেজকন্ঃ "যেহেতু আমরা প্রাচীন ধর্মবুদ্ধির অভিজ্ঞানে উৎফুল্ল হই, যেহেতু ইহাকে আমাদের অনুভূতিগুলির যথার্থ অভিব্যক্তিরূপে ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাই এবং যেহেতু অতীতের পুণ্যাত্মাদের সহিত নিজেদের যুক্ত করিতে আমরা ভালবাসি, সেইহেতু ইহা প্রমাণ হয় না যে আমরা তাঁহাদের সীমায় আবদ্ধ থাকিব কিংবা সমগ্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে আমাদের বিশ্বাসের চরম স্ফূর্তি দেখিতে পাইব।" এই নীতি অতি উত্তম। এই নীতি অনুসারে, ঈশ্বরবাদী ক্রিয়াকলাপে এবং উপাসনা গ্রন্থগুলিতে প্রাচীন এবং নবীন উপাদানের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সত্য স্বীকৃত হয। প্রাচীন উপাদানগুলির সংরক্ষণ মনুয্যজাতির মধ্যে ঈশ্বরবাদের বিস্তারে সহায়তা করে—যে মনুষ্যজাতি অতীতের প্রতি সহানুভূতিশীল। আপনার গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি উপাসনায় খ্রীষ্টের গুণাবলীর যে স্বীকৃতি রহিয়াছে তাহা একদিকে যেমন ইউরোপীয় ঈশ্বরবাদিগণের কৃতজ্ঞতাব অভিব্যক্তি হিসাবে রমণীয়, (হিন্দু ঈশ্বরবাদিগণ অপেক্ষা খ্রীষ্টের প্রতি ইউরোপীয় ঈশ্বরবাদিগণের উক্তি অধিকতর) অন্য দিকে তাহা প্রাচীনকে নবীনের সহিত যুক্ত করিয়াছে এবং ঈশ্বরবাদের বিস্তারে সহাযতা করিযাছে। আপনার ভূমিকায সর্বত্র আপনি যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লইয়া অতীতের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি।

"দিব্যত্ব যেন এমন কিছু যাহা একখণ্ড শিলাস্ফটিকের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে"—আপনার এই উক্তিটি যে কত সুন্দর তাহা আর কি বলিব!

আমি কতবার আমার কয়েকজন বিজ্ঞানী বন্ধুর নিকট ইহার উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বজ্ঞাসঞ্জাত যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া বাহ্যজগতে তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ সন্ধান করেন।

আপনার ভূমিকার এক স্থানে আপনি লিখিয়াছেনঃ "ধর্মনিষ্ঠা, সত্য এবং দাক্ষিণ্য এত মধুর যে নিজেদের উন্নত না করিয়া আমরা ইহাদের সম্বন্ধে এমন কি ভাবিতেও পারি না; শুধু তাহাই নহে, জীবনের যাত্রাপথে ইহাদের বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও ঈশ্বরের প্রেমপূত পথের গন্ধ আমাদের পোযাকে লাগিবেই লাগিবে।" এই প্রসংগে আমার মনে পড়িতেছে সেই ইরানী কবির কথাঃ "পুণ্যবান ব্যক্তির সংগ আতরদানির ন্যায়। গোলাপের আতরের কোন অংশ ইহা আমাদের নাও দিতে পারে, তথাপি গন্ধটুকু বাহির হইবেই।" প্রাচ্য ভাষায় ইহার অর্থঃ "পুণ্যবানের সংগে থাকিয়া আমরা প্রকৃত পুণ্যবান নাও হইতে পারি, তথাপি আমরা ইহার জন্য নিজেদের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি।"

আপনার ভূমিকার কোন এক স্থানে আপনি বলিয়াছেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি আপন হৃদয়ের অবিচল বিধান নিষ্ঠার উপর বিশ্বাস রাখে, তাহা হইলে সে ভক্তির বিধান নির্মাণ করিতেও পারে, নাও করিতে পারে।" বিধানের এই অনুপস্থিতি আপনার ন্যায় কয়েকজনের পক্ষে খাটিলেও খাটিতে পারে যাঁহাদের মন সত্যই উন্নত এবং সুশৃঙ্খল; কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ভক্তির বিধানের প্রয়োজন আছে। যদি সাধারণ মানুষকে বলা হয় যে ভক্তি আপনা হইতেই হইবে, বিধানের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে আমার মনে হয় ইহাতে প্রভূত ক্ষতি হইবে।

আপনার ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদটি পড়িয়া আমি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছি। যে হস্ত ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে সেই হস্ত ধন্য।

গ্রন্থখানি প্লটিনাসের একটি বচন দিয়া আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণকে যদি কোন অহিন্দু ঠিকমত বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আলেক্সান্ড্রিয়ার প্লটিনাস। বলিতে কি, কয়েকজন ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে ভারতের ঋষিগণ হইতেই তিনি তাঁহার মতগুলি ধার করেন। যে সকল হিন্দু জাহাজ আলেক্সান্ড্রিয়ায় গিয়াছিল তাহারা বাণিজ্যদ্রব্য ব্যতীত দার্শনিক মতগুলিও ওই নগরীতে লইয়া গিয়াছিল।

যদিও গ্রন্থখানি প্লটিনাসের একটি বচন দিয়া শুরু হইয়াছে, তবুও এই দেখিয়া আমি দুঃখিত হইলাম যে গ্রন্থখানিতে এমন একটিও উপাসনা নাই যাহা বাস্তবিকই প্লটিনিয়ান কিংবা যাহা গ্রন্থের সুন্দর নামটিকে সার্থকভাবে প্রতিভাত করিতে পারে, কিংবা যাহা স্বয়ং প্লটিনাস (যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন) ঈশ্বরবাদের প্রভাবে নিখুঁত করিয়া আপনার অনুরোধে লিখিয়া দিতেন। নিম্নলিখিত উপাসনাটিতে আমি এই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যদিও ঐ বিরাট আলেক্সান্ড্রিয়ানের তুলনায়

আমি কীট মাত্র। তবুও ইহা লিখিয়া ফেলিলাম এই জন্য যে, দিব্য উপাসনা সম্পর্কে আমারও কতকগুলি ব্যক্তিগত ধারণা আছে। ইহা ব্যতীত ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি তাঁহার অনুরূপ। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে আমি লিখিতাম না, কারণ উপাসনা একান্ত করিয়া অন্তরের সামগ্রী। আমার জীবনে ঈশ্বর যত কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ আর একটি উপাসনা আমি আপনার নিকট পাঠাইলাম।

আমি আশা করি, উপরে যে প্রতিকূল মন্তব্যগুলি করিলাম, তাহা নিশ্চয়ই আপনার নিকট গুরুভার এবং ক্ষতিকর মনে হইবে না। আমাদের 'ক্যালকাটা সোসাইটি'-তে এই 'গুরুভার এবং ক্ষতিকর' মন্তব্যটির সত্য যে কিভাবে অহরহ অনুভব করিতেছি তাহা আপনাকে আর কি বলিব!

মহাশয়া, আমার গভীরতম শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি।

আপনার সহ-হিন্দু অস্তিত্ববাদী

(স্বাঃ) রাজনারায়ণ বসু।

উপরের প্রতিলিপিতে উক্ত প্রার্থনা দুইটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

O Thou the Alone who dwellest in the awful depths of Thy inaccessible Majesty! Leaving the cares and distractions of the world behind me, I now approach Thee alone. O Thou all-calm! with a calm heart art Thou to be worshipped; make now my heart calm. Place me now above the storms of passion and the waves of emotion. Shed the beam of Thy most Holy place over my mind. Let not the fever of worldly ambition oppress me now that I come to worship Thee in the inner temple of the heart.

Mysterious and incomprehensible Being! The mind cannot fathom Thee. Speech with the mind desist in their attempt to grasp Thy infinite nature. This we know that we knew Thee not. They, who say they know Thee, know Thee not and they, who say they do not know Thee, know Thee. It is neither that I know Thee not nor is it that I know Thee. This only I know, O God! That Thou art Truth, Unity, Infinity, Intelligence, Goodness, Peace and Felicity itself.

O Thou the Light of lights that dwellest in light ineffable! Lead me from darkness into light. Dispel the darkness of ignorance and worldly illusion from my mind. Reveal Thy blessed to me, O Thou Revealer of divine knowledge! It is Thou that sendest down thoughts to men. Engage me in thoughts that lead only to good—in thoughts that lead to Thee and the life eternal.

O God! Thou only art true, Thou art the Truth of truth. The world exists through Thee. To nothing is it reduced if Thou withdraw Thyself

from it. The world is not real, Thou only art real. Thou who art Reality itself! Lead me forth from the unreal to the real. Let not be deceived by the mirage of life. Centre all my hopes and aspirations in Thee and in Thee only.

Thou who art Life and Immortality itself! Lead me forth from death to immortality. It is death not to know Thee and love Thee. Surrounded are we on all sides by death—by forgetfulness of Thee. Release me from the bondage of death. Quicken me with Thy life, O Life of life! Life eternal without Thee is no life. Make me begin life proper here. Infuse life into me now to be continued and heightened beyond conception in the life to come.

Thou who art All-free! Free me from ignorance, prejudice and the knots of worldly illusion that blind my soul. Free me from the world. Being in the world, let me live free from it. Free me from the thraldom of vice and make me Thy servant now and for-ever. It is freedom to be under Thee and with Thee and it is slavery to be free of, and far from Thee.

O Thou the Alone! Man's concern is with Thee alone and with others for Thee only. Man is born alone, alone doth he die, alone doth he bear reward and punishment. For succour in the next world father and mother and dear relative remain not, Thou only remainest. Thou art my best goal, Thou art my best wealth, Thou art my best world to live in, Thou art my best felicity. O Thou my portion for eternity! Make me wholly Thine. I am Thine alone, O Thou who art the alone!

O Thou the Alone who art the soul of the soul, the being nearer and dearer to me than I am to myself! When now I witness Thee within Thy temple, the soul I am transported with felicity inexpressible. I lose sight of the world, I lose my individual existence, I am absorbed by Thee. I now feel that Thou, O infinite spirit, and myself, the finite spirit, are one. It is now I feel that Thou alone existest, O Thou the alone!

হে নিঃসঙ্গ যাঁহার অধিষ্ঠান আপন অগম্য মহিমার নিভৃততম গভীরতায়! পৃথিবীর সকল আসক্তি উৎকণ্ঠাকে পশ্চাতে রাখিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া আমি তোমার দিকে এখন অগ্রসর হইতেছে। হে সুধীর! স্থিরপ্রজ্ঞ হইয়া তোমার পূজা করিতে হয়: এইবার আমার হৃদয় শান্ত কর। এইবার আমাকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও প্রক্ষোভ-তরঙ্গের ঊর্ধ্বে স্থাপন কর। তোমার অতি পবিত্র আবাসের আলোকশিখা আমার মনের উপর বর্ষিত কর। পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাকে যেন আর জর্জরিত না করে, কারণ হৃদয়ের গোপন মন্দিরে এখন আমি তোমার পূজা করিতে আসিয়াছি।

হে অতীন্দ্রিয় ও রহস্যময় পুরুষ! মন তোমার নাগাল পায় না। নিছক যুক্তি দিয়া তোমার অনন্ত স্বভাবের কূল পাওয়া যায় না। আমরা এইটুকু জানি যে আমরা তোমায় জানি না। যাহারা বলে তোমায় জানে, তাহারা তোমায় জানে না এবং যাহারা বলে তোমায় জানে না, তাহারা তোমায় জানে। যদি বলি তোমায় জানি না, তাহা হইলে ভুল বলা হইবে; আবার যদি বলি তোমায় জানি, তাহা হইলেও ভুল বলা হইবে। হে ঈশ্বর! শুধু এইটুকু জানি যে, তুমি সত্য, ঐক্য, অনন্ত, বুদ্ধি, কল্যাণ, শান্তি এবং আনন্দ।

হে আলোর আলো, যাঁহার অধিষ্ঠান অনির্বচনীয় আলোকে! আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে লইয়া চল। আমার মন হইতে অজ্ঞতার এবং পার্থিব মায়ার অন্ধকার দূর কর। হে দিব্যজ্ঞান প্রকাশ! তোমার পূত স্বভাব আমার নিকট বিকশিত কর। তুমিই মনুষ্যকে ধ্যান-চিন্তা দান করিয়া থাক। আমাকে সেই ধ্যান-চিন্তায় ব্যাপৃত কর—যে ধ্যান-চিন্তা কেবল কল্যাণের উপাসক, যাহা তোমার দিকে এবং অনন্ত জীবনের দিকে মনকে পরিচালিত করে।

হে ঈশ্বর! তুমিই কেবল সত্য, তুমি সত্যেরও সত্য। জগতের অস্তিত্ব তোমার কারণে। তুমি যদি ইহার প্রতি অপ্রসন্ন হও, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিহ্ন হইবে। জগৎ বাস্তবসত্য নয়, তুমিই কেবল বাস্তবসত্য। হে পরম বাস্তব! আমাকে অবাস্তব হইতে বাস্তবের দিকে লইয়া চল। আমাকে জীবনের মরীচিকায় প্রবঞ্চিত হইতে দিও না। আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে, কেবল তোমার মধ্যে, কেন্দ্রীভূত কর।

হে পরম জীবন, হে চিরন্তন! আমাকে মৃত্যু হইতে অমরতার দিকে লইয়া চল। তোমাকে না জানা বা না ভালবাসাই তো মৃত্যু। আমরা চতুর্দিকে মৃত্যুবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি, তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। মৃত্যুর নাগপাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর। হে জীবনের জীবন! তোমার জীবনস্পর্শে আমার জীবনকে ত্বরান্বিত কর, ধন্য কর। তোমাকে বাদ দিয়া যে অনন্ত জীবন সে-জীবন জীবনই নহে। আমাকে সত্য জীবনের প্রতি অনুরক্ত কর। আমার জীবনে এইবার তোমার জীবন অনুপ্রবিষ্ট কর, যাহাতে আমার ভাবী জীবন কল্পনাতীতভাবে উন্নত হইয়া উঠে।

হে নির্বিকার! অজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও পার্থিব অভ্যাস-গ্রন্থি যাহা আমার আত্মাকে অন্ধ করে—তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর। জগৎ হইতে আমাকে মুক্ত কর। জগতে অবস্থান করিয়াও যেন নির্বিকার থাকিতে পারি এই আশীর্বাদ কর। আমাকে পাপমুক্ত কর এবং চিরদিনের জন্য আমাকে তোমার দাস করিয়া লও। তোমার অধীনে এবং তোমার সহিত থাকার অর্থ স্বাধীন হওয়া। তোমার নিকট হইতে দূরে থাকা কিংবা তোমাকে ছাড়া জীবনযাপন করাই দাসত্ব।

হে নিঃসঙ্গ! মানুষের সম্বন্ধ শুধু তোমার সহিত; অপরের সংগে থাকিলেও

শুধু তোমার সহিতই তাহার সম্বন্ধ। মানুষ নিঃসঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, নিঃসঙ্গ হইয়াই সে পৃথিবী হইতে বিদায় লয় এবং নিঃসঙ্গ হইয়াই সে পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করে। পরজীবনে সাহায্য করিবার জন্য মাতাপিতা প্রিয় আত্মীয় কেহই থাকে না; শুধু থাক তুমিই। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অবস্থান করিবার জন্য তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ জগৎ। তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ আনন্দ। হে আমার অমরতার অংশ! আমাকে সম্পূর্ণ তোমার করিয়া লও। আমি কেবল তোমার, তোমারই, হে নিঃসঙ্গ!

হে নিঃসঙ্গ, আমার আত্মার আত্মা, আমি যতটা নিজের তাহা হইতেও যে আমরা আপন ও নিকট! এইবার যখন আমি তোমাকে তোমার মন্দিরে, আত্মার মন্দিরে দেখিতে পাইতেছি, তখন আমার আনন্দ হইয়া উঠিয়াছে অনির্বচনীয়। আমি জগৎকে দেখিতে পাইতেছি না, আমার অস্তিত্ব আমি হারাইতে বসিয়াছি, আমি এখন তোমার মধ্যে বিরাজ করিতেছি। আমি এখন অনুভব করিতেছি যে অনন্ত তুমি আর সান্ত আমি এক। এখন আমি অনুভব করিতেছি যে, হে নিঃসঙ্গ, কেবল তোমার অস্তিত্বই সত্য!

God of my life! When I mark Thy fingers in the events of my past life, I am transported with wonder and gratitude. Oft did it happen when I asked for anything thinking it to be good for myself, Thou didst not give it to me and when I did not ask for a thing, thinking it to be bad for me, Thou didst give it. In those events I clearly mark the truth of what men say that man proposeth but God disposeth. At one time in my youth the seductions of sensual pleasure proved too strong for me but Thou didst draw me away from them with the violence of parental love. Worldly dignity and powers then attracted me; I was on the point of being placed on the fair road to their attainment when Thou suddenly blasted my prospects and compelled me to undertake what has ever since proved to me to be the source of the greatest haappiness—the task of communicating the blessings of knowledge religious and secular to my fellowmen. Lord! I heartily thank Thee for these disappointments. I heartily thank Thee for bringing me to the blessed path of religion. I heartily thank Thee for raising me above surrounding ignorance and superstition to the saving light of Theism. I heartily thank Thee for the instruction I have received from the friend who first taught me its truths. I heartily thank Thee for the instruction I have received from the wise men of distant countries. Above all I thank Thee for what I have obtained from my ancestors who meditated on Thy sublime essence in deep Himalayan retreats beside the tall rhododendron,

the lord of the forest and the sounding water-fall, whose lives and hearts were wholly devoted to Thee, who were always cheerful, having obtained Thee the all-cheering, whose enjoyment and pleasure were only Thou. These have made me what I already am but how short does it fall of what I should be! The fascinations of fame and the allurements of pleasure have still a distant charm for me; Thou art not yet to me so real as the objects of the world. Lo! my words have instructed many but still myself am weak. Lord! when I see the fervent faith of men without any learning or eloquence and compare it with mine, tears come to my eyes. Shall I, O Lord! provide others with sweets all my life and be deprived of them myself? Father! Take compassion on me; make me firm in my faith and unwavering in my holy resolves. Show Thyself to me. Thy poor and lonely son afflicted by sorrow, afflicted by disease and afflicted by mental gloom.

হে আমার জীবনেশ্বর! আমি যখন আমার অতীত জীবনের ঘটনাসমূহে তোমার স্পর্শ দেখিতে পাই, তখন আমার বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। এমন প্রায়ই ঘটিয়াছে যে নিজের ভাল হইবে ভাবিয়া তোমার কাছে কিছু চাহিলে তুমি দাও নাই; আবার নিজের মন্দ হইবে ভাবিয়া তোমার কাছে কিছু না চাহিলে তুমি দিয়াছ। ঐ অবস্থাগুলি হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আর। এক সময় যৌবনে ঐন্দ্রিয় পুলক আমাকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু তুমি আমাকে স্নেহশীল, পরম কর্তব্যপরায়ণ পিতার ন্যায় আমাকে বক্ষা করিয়াছিলে। অতঃপর পার্থিব ক্ষমতালিপ্সা ও অহংকার আমাকে আকৃষ্ট করে; আর একটু হইলে আমি হয়তো সেই পথেরই পথিক হইতাম। কিন্তু তখন তুমি হঠাৎ আমার তথাকথিত উচ্চাশায় বাদ সাধিয়া আমাকে বাধ্য কর সেই পথে চলিতে, যে-পথকে আমি সেই অবধি শ্রেষ্ঠ আনন্দের পথ বলিয়া জানিয়া আসিতেছি। এই পথে আমার কর্তব্য হইল মনুষ্যগণের মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের মহিমা বিতরণ করা। প্রভো! এই হতাশার জন্য আমি তোমাকে কায়মনোবাক্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ধর্মের পবিত্র পথে আমায় স্থাপন করিবার জন্য তোমায় শত সহস্র ধন্যবাদ। চতুর্দিকস্থ অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হইতে আমাকে মুক্তি দিয়া ঈশ্বরবাদের আলোকে আমাকে স্থাপন করিবার জন্য তুমি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ কর। বন্ধুদিগের যে উপদেশে সর্বপ্রথম আমি ঈশ্বরবাদের সত্য সম্বন্ধে সচেতন হই, তাহার জন্য আমি তোমায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সুদূর দেশের জ্ঞানী বন্ধুগণের নিকট হইতে যে উপদেশ পাইয়াছি তাহার জন্য তুমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর। সর্বোপরি আমার পূর্বপুরুষগণ, যাঁহারা বৃক্ষশ্রেষ্ঠ উচ্চ রডোডেনড্রন তলে ধ্বনিময় জলপ্রপাতের পার্শ্বে হিমালয়ের গভীর আশ্রয়ে বসিয়া তোমার প্রশান্ত স্বরূপের ধ্যান করিতেন,

যাঁহাদের জীবন এবং অন্তর পরিপূর্ণভাবে তোমাতেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, যাঁহারা তোমার উদার প্রফুল্ল সত্তাকে লাভ করিয়া চির-সুখী হইয়া থাকিতেন, যাঁহাদের নিকট তুমিই ছিলে আনন্দ ও উপভোগ—তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহার জন্য তুমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর। তাঁহাদের কৃপায় আমি আজ বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হইয়াছি, কিন্তু যে-পর্যায়ে আমার উপনীত হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে আজও আমি কত দূরে! যশ এবং আকাঙ্ক্ষা আজও আমাকে দূর হইতে প্রলুব্ধ করে। পার্থিব বস্তু আমার নিকট যত বাস্তব, এখনো পর্যন্ত তুমি আমার নিকট তত বাস্তব হও নাই। ভাবিয়া দেখ, আমি কত মানুষকে দীক্ষিত করিয়াছি কিন্তু নিজে আজও দুর্বল। প্রভো! যখন আমি অতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও জ্বলন্ত বিশ্বাস দেখি এবং ইহার সহিত নিজ বিশ্বাসের তুলনা করি, তখন আমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। প্রভো! সারাজীবন ধরিয়া অপরকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিব কিন্তু আমি নিজে উহা হইতে কি বঞ্চিত হইব? হে পিতঃ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর কর। আমার পবিত্র ব্রতে আমি যেন অবিচল থাকি। আমার সম্মুখে তুমি প্রকাশিত হও—হতভাগ্য নিঃসঙ্গ পুত্রের সম্মুখে, যে-পুত্র দুঃখ, ব্যাধি এবং মানসিক যাতনায় ক্লিষ্ট।

মিস্ কবের প্রত্যুত্তরের প্রতিলিপি।

26, Hereford Square,
London S. W.
September, 26th, 1871.

MY DEAR SIR,

I have been longer than I purposed in replying to your long and very kind and interesting letter and I fear now I shall be able it answer to only very imperfectly. My eye-sight has become so bad from over-work that I write little more than I am obliged to do in the way of business. It gives me sincere pleasure to find that you liked my little book so much and think it likely to be of use. The way in which you can blend the religious feelings of the East and West and trace identity between the expression of them is proof (if needed it) of the way in which Theism is the great unit underneath all multiform shapes of human religion. With regard to your very acute criticism of the faculties from which we derive our knowledge of God, I hardly feel I could do justice to it or to my own views on the subject in a much longer letter than I can attempt to write. My object in drawing a parallel between religious and aesthetic knowledge is not to place

them by any means on a level, for I entirely and heartily agree with you (as my book on intuitive morals shows) in considering our knowledge of morals and religions transcendental and intuitive. I wished only to makegood the point that as we admit the (lower) faculty of aesthetic taste to bear testimony in its own realm so we ought in fairness to permit the religious sentiment to bear testimony in that wherein it is concerned. Perhaps you will be interested in hearing what the wisest and most respected of our men of science, Sir Charles Lyell, said to me in reference to this; "I entirely agree with you that the religious sentiment has just as good a right to be trusted as the intellect or any other faculty of our nature and I think those who dispute it are altogether wrong. It is one of the deepest and most universal of human feelings and grows stronger with the progress of the race and is clearest in the noblest minds." After all I believe we rather involve ourselves in needless and artificial difficulties when in such matters we talk too much of the various parts of our minds which in truth form a simple personality. To that personality even in its innermost abysmal depths, God directly reveals Himself, spirit to spirit, will to will. We know we can know nothing more.

I thank you heartily, Dear Sir, for the beautiful prayers which you enclose in your letter and which it will give me great pleasure to print in another edition of my book, should I find one called for. You and I would perhaps differ over some details were we to meet. You might think me to be too hastily progressive and I might think that venerable as is the piety of the past, the danger of losing any one of its relics is less than that of embalming its errors. But whatever we might find to discuss I am quite sure we should find more on which most cordially to join. Believe me then with sincere regards, your friend and fellow-theist.

(Sd.) Frances Power Cobbe.

২৬, হিয়ারফোর্ড স্কয়্যার
লন্ডন, এস. ডব্লিউ.
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭১।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার দীর্ঘ, মনোরম এবং অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, যদিও সত্বর উত্তর দিবার বাসনা ছিল। ভয় হইতেছে আমার উত্তর হয়তো সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে না। অতিরিক্ত কাজের জন্য আমার চোখের অবস্থা এত খারাপ হইয়া গিয়াছে যে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত আর কিছুই লিখি না। আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যে আপনার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে এবং উহা যে কাজে লাগিবে—ইহাতে আমি আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যেভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মভাবগুলির মধ্যে সঙ্গতিবিধান করিয়াছেন এবং একসূত্রতার সন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরবাদই সেতুস্বরূপ। যে-শক্তিগুলি হইতে আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মে সেই শক্তিগুলি সম্পর্কে আপনার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার মনে হয়, যত বড় চিঠি অমি লিখিতে যাইতেছি তাহার চেয়ে বড় চিঠি লিখিলে আপনার সমালোচনা বা এই বিষয় সম্পর্কে আমার মতগুলির প্রতি এমন একটা কিছু সুবিচার করা হইবে না। ধর্মজ্ঞান ও কলাজ্ঞানের যে সমান্তরাল বিচার আমি করিয়াছি তাহার অর্থ এই নয় যে আমি এই দুইটিকে একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করি; কারণ আপনার ন্যায় আমিও মনে করি যে নীতিজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান হইল তুরীয় এবং স্বজ্ঞা-সঞ্জাত। (ইহার প্রমাণ স্বজ্ঞা-নীতি সম্বন্ধে আমার গ্রন্থখানি।) আমি কেবল ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, কান্তবোধশক্তিকে যেমন আমরা ইহার নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লই, তেমনই ধর্মবোধশক্তিকেও ইহার নিজস্ব ক্ষেত্রে আমাদের স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে স্যার চার্লস ল্যেল আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া আপনি হয়তো খুশী হইবেন। গুণে এবং মানে স্যার চার্লস আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাকে বলেন ঃ

"বুদ্ধি কিংবা আমাদের স্বভাবজ যে কোন শক্তির ন্যায় ধর্মবোধও সমান বিশ্বাসযোগ্য। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। ধর্মবোধ গভীরতম এবং সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন মানবিক অনুভূতিগুলির অন্যতম। ইহা জাতির অগ্রগতির সহিত দৃঢ়তর হয় এবং ইহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-মানসে।"

যাহা হউক আমার স্থির ধারণা এই যে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় আমরা মনের বিভিন্ন উপাদানগুলি সম্বন্ধে এত বেশি কথা বলি যে, অনর্থক এবং কৃত্রিম সংকটে জড়িত হইয়া পড়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না; কিন্তু মনের এই উপাদানগুলি আসলে একটি সহজ ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করে। আর এই ব্যক্তিত্বের গোপনতম, গহনতম প্রদেশেও ঈশ্বর নিজেকে সরাসরি প্রকাশিত

করেন ;—আত্মার সহিত আত্মার মিলন হয়, ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার। মহাশয়, আপনার চিঠির সহিত আপনি যে সুন্দর উপাসনাগুলি পাঠাইয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যদি কখনও আমার গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ হয় তাহা হইলে আমি সানন্দে এই উপাসনাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত করিব। আমাদের মধ্যে যদি সাক্ষাৎ হইত তাহা হইলে কতকগুলি খুটিনাটি বিষয়ে হয়তো আমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিত। আপনি হয়তো ভাবিতেন আমি বড় বেশি দ্রুত প্রগতিপন্থী এবং আমি অতীত-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও, হয়তো ভাবিতাম যে অতীত ধ্বংসচিহ্নের দুই একটিকে হারানো যতটা বিপজ্জনক তাহা হইতেও বিপজ্জনক হইল ইহার ভুলগুলিকে মনে পুষিয়া রাখা। যাহাই হউক, অধিকাংশ বিষয়েই যে আমরা সানন্দে একমত হইতাম তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি।

আপনার বন্ধু ও সহ-ঈশ্বরবাদিনী
(স্বাঃ) ফ্রান্সেস পাওয়ার কব।

এই সময়ে আর একটি ইংরাজ ব্রহ্মবাদিনীর সঙ্গে পত্র দ্বারা আমার আলাপ হয়। মিস কব যেমন কখন ভারতবর্ষে আসেন নাই তিনিও সেইরূপ আসেন নাই। তিনি মিস্ কব-এর ন্যায় বিখ্যাতা নহেন, কিন্তু সৌজন্য ও ভদ্রতায় লক্ষ্মী ও বিদ্যাবত্তায় বাগেদবী স্বরূপা। তাঁহার নাম মিস্ এলিজাবেথ শার্প। তাঁহার নাম ব্রাহ্ম কাগজে দুই একবার মাত্র দেখি। আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ যখন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান তখন কৃষ্ণধনকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজিতে চারিটি চতুর্দশপদী কবিতা লিখি। সেই চারিটি চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে একটিতে মিস্ শার্প-এর নাম ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া উল্লেখ ছিল। যখন আমার জামাতা বিলাত যান তখন ঐ চারিটি মুদ্রিত চতুর্দশপদী কবিতার একখণ্ড তাঁহার দ্বারা মিস্ শার্পকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করি। তিনি সেই উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এক পত্র লেখেন। এই সামান্য সূত্রে তাঁহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা স্থাপিত হয় ও অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি হয়। উল্লিখিত চারিটি চতুর্দশপদী কবিতার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১)

Go, son belov'd! as pilgrim bold to lands
Beyond the stormy ocean's wide domain,
Where Commerce, Art and Science freely rain
On freemen blessings rare with liberal hands.
Thou art not tied by false religion's bonds,
Her chains are not round thee; thou'rt nobly free:
Thou art not one who fears to cross the sea,

And on the beach by her spell-bound stands.
Thy freedom I esteem though thy excess
I check oft. Go, but still as ours remain.
Be not like apes who change their manners, dress
And language, of their trip becoming vain.
Thy England for their home do shameless call,
And reckon mother-land and tongue as gall.

(২)

Go, son belov'd! ad pilgrim bold to lands,
Where nature's servant and interpreter,
Man, wields over elements a God-like pow'r
As slavish tools in his controlling hands.
Go, vent'rous youth! where Goddess Science' bands
Most wondrous feats perform on land and sea;
There monuments of art thou rapt will see,
A marvel in itself each tow'ring stands.
Go there, and feast your eyes on men as things;
Great Herschel, Mill and Tennyson divine;
And others too whose fame in India rings,
Bright lights that in far England's firm'ment shine,
Go, losing not yourself, learn from the west
And come back to your weeping father's breast.

(৩)

My son! when thou reach England thou shalt see
Our kin in faith who, not adoring man
And book, lead boldly true religion's van
Proclaiming Theism's creed in discourse free:
Strong Newman, superstition's enemy
Uncompromising, kinder e'en to doubt
And doubters than the hero-making rout;
Him and our sisters[1] on whom blessing be,
The Brahamavad'nis[2] of the Islands far,
Known as the White[3] in our Puranas old,
Who, like our Maitreyi[4] Old India's Star,
Such noble truths in noble words have told
As by her said: "From things that do not give
Eternal life, what joy can I derive?"

(৪)

When thou to England go, our brethren greet
Of Wakefield[5] tell them they do well to preach
Theistic truths in Christian dress, to teach

Our countrymen those truths we think it meet
To clothe them in a Shastric garb. To Seat
Celestial truth in hearts of people weak,
We should this plan pursue, until we break
The ranks of error strong and her defeat,
Our faith the same though vested different;
As Englishman and Hindu both are men
Though diff'rent clad. Religion true at end
Will win the fight, such forms need perish then,
But now let us all work, though slow yet sure.
As God Himself does work, to end secure.

(1859)

1. Miss Cobbe and Miss E. Sharpe.
2. Female discoursers of God, so called in the Vedas.
3. Colonel Wilford in the Asiatic Researches conjectures the British Isles to be the *Sweta Dwipa* or the White Isles of the Puranas.
4. See the story of Maitreyi and Yajnavalkya in the Brihadaronyaka Upanishad.
5. The Free Unitarian Church or rather the Theistic Congregation of Wakefield.

(১)

যাও প্রিয় বৎস, সাহসী তীর্থযাত্রীর ন্যায় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের বিপুল ব্যাপ্তিকে অতিক্রম করিয়া সেই দেশে যাও, যে-দেশে বাণিজ্যলক্ষ্মী, শিল্পদেবী এবং বিজ্ঞানলক্ষ্মী মুক্তপুরুষগণের উপর মুক্তহস্তে দুর্লভ কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন। তুমি কৃত্রিম ধর্মের নাগপাশে বন্দী নও, ইহার শৃঙ্খল তোমাকে বাঁধিতে পারে নাই। তুমি একান্তভাবে মুক্ত। যাহারা সাগর অতিক্রম করিতে ভয় পায় এবং মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সাগরসৈকতে কালহরণ করে, তুমি তাহাদের কেহ নও। তোমার স্বাধীন মনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, যদিও ইহার অতিরেক ঘটিতে দেখিলে আমি প্রায়ই বাধা দিই। যাও বৎস, কিন্তু তথাপি তুমি আমাদেরই একজন হইয়া থাকিও। তুমি সেইরূপ নির্বোধ অনুকারদের একজন হইও না যাহারা আচারে-ব্যবহারে, সাজসজ্জায় এবং ভাষায় বিজাতীয় হইয়া যায়, নির্লজ্জভাবে ইংলন্ডকে স্বদেশ বলিয়া গণ্য করে এবং নিজ মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে বিষবৎ বিবেচনা করে।

(২)

যাও প্রিয় বৎস, সাহসী তীর্থযাত্রীর ন্যায় সেই দেশে যাও, যে-দেশে প্রকৃতির ভৃত্য ও ব্যাখ্যাতা মানুষ নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে ঈশ্বরোপম প্রভাবে হেলায় নিয়ন্ত্রিত

করে। যাও সাহসী যুবক, সেই দেশে যাও, যে-দেশে বিজ্ঞানদেবীর পূজারিগণ জলে-স্থলে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। সেখানে তুমি আত্মহারা হইয়া যে শিল্পবস্তুগুলিকে দেখিবে সেগুলি যেমন বিস্ময়কর তেমনই বিপুল। কেবল বস্তু নয়, সেখানে তুমি মহৎ ব্যক্তিদেরও দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবে। সেখানে আছেন মহান হারশেল, মিল এবং অনুপম টেনিসন। সেখানে আরও অনেকে আছেন যাঁহাদের যশের প্রতিধ্বনি ভারতবর্ষে শ্রুত হয় এবং যাঁহারা সুদূর ইংলন্ডের আকাশে উজ্জ্বল আলোকস্বরূপ। যাও বৎস, প্রতীচ্যের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া বসিও না; এবং পাঠ সমাধা হইলে তোমার রুদ্যমান পিতার বক্ষে ফিরিয়া আসিও।

(৩)

বৎস আমার, ইংলন্ডে পৌঁছিয়া তুমি দেখিবে সেখানে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আমাদের মতে বিশ্বাস করেন এবং যাঁহারা বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সত্য ধর্ম ও ঈশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন। সেখানে আছেন তেজস্বী নিউম্যান, যিনি কুসংস্কারের শত্রু, আপোষ-বিরোধী এবং যিনি সন্দেহ ও সন্দেহবাদীদের প্রতিও দয়া করেন কিন্তু দম্ভ ও বাচালতাকে প্রশ্রয় দেন না। সেখানে তুমি তাঁহাকে এবং আমাদের ভগিনীস্থানীয়া ব্রহ্মবাদিনীদের দেখিবে যাঁহারা আমাদের পুরাণোক্ত সুদূর শ্বেত-দ্বীপে বাস করেন এবং যাঁহারা প্রাচীন ভারতের নক্ষত্রস্বরূপা মৈত্রেয়ীর ন্যায় মহান সত্য প্রচার করিয়াছেন—সেই মৈত্রেয়ীর ন্যায় যিনি বলিয়াছিলেনঃ "যে বস্তু অনন্ত জীবন প্রদান করে না, সেই বস্তু হইতে আমরা কোন্ আনন্দের আশা করিতে পারি?" এই ব্রহ্মবাদিনীদের মঙ্গল হউক।

(৪)

ইংলন্ডে পৌঁছিয়া আমাদের ওয়েকফীল্ডের বন্ধুগণকে নমস্কার জানাইও। তাঁহাদের বলিও তাঁহারা ঈশ্বরবাদের যে সত্য খ্রীষ্টধর্মের মধ্য দিয়া প্রচার করিতেছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য এবং আমাদের দেশবাসিগণকে যে সেই সত্যে দীক্ষিত করিতেছেন তাহা আমরা নিজ শাস্ত্রীয় মতে গ্রহণ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। দুর্বল ব্যক্তিগণের হৃদয়ে দিব্য সত্য স্থাপন করার কর্মে ততদিন আমরা অগ্রসর হইয়া চলিব যতদিন পর্যন্ত না ভ্রান্তি দূর করিতে পারি এবং ভ্রান্তিকে পরাজিত করিতে পারি। পথ বিভিন্ন হইলেও আমাদের মত এক। পোষাকে পৃথক হইলেও কি ইংরাজ কি হিন্দু দুইজনই মানুষ। সত্য ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। ভ্রান্তির পরাজয় ঘটিবেই। এস, সকলে মিলিয়া কাজ করি; আমাদের ব্রত একদিন সফল হইবেই। বিলম্ব দেখিয়া আমরা যেন শংকিত না হই। জয় সুনিশ্চিত। স্বয়ং ধীরস্থির হইয়া কর্মপথে অগ্রসর হই, যাহাতে পরিণতি নিরাপদ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। (১৮৫৯)

আমার প্রেরিত উপহারদত্ত চতুর্দশপদী কবিতা পাইয়া প্রিয়বাদিনী ব্রহ্মবাদিনী আমাকে লিখিলেন—

28 *August*, 1870

My Dear Sir

I should feel that I was not fulfilling my duty if I did not send you a few lines to tell you how much pleasure the poem which you wrote to your son-in-law on going to England has given me. Mr. Ghosh, as we call him here, must forgive us for anglicizing his name, you know we practical English, do every thing that takes least trouble, and is most convenient to us, gave me the poem now some weeks past, and it was with surprise and pleasure that I learnt my name was known by one so far away, and a stranger to me, and that it was mentioned in such a manner. I have received many advantages and very great pleasure from the visit here of your friend Babu Keshub—his name I will not anglicize, he is only a bird of passage amongst us— and one of the greastest of those advantages has been, the strong proof he has given us, that men of all nations are of one spirit, however different they may be in some ways; and that they are able in many things to sympathise with, and understand each other, to an extent in which I hardly believed before. Your Poem in which I am called your "sister" makes me also realise the same truth. It seems a very glorious thing that seperated by so many thousands of miles, people may yet feel a true bond of union of between them. It does, indeed, help me to realise that all men God's children. Two lines of Tennyson's will, I think, express my feeling as well as anything.

"For so the whole round earth's every way.
Bound by gold chains, at the feet of God."

He (Keshub) has indeed helped many others here, by helping us from his own ardent religious spirit, and fervent faith, to put warmth, and fervour and reality, into our perhaps less vivid faith. Enthusiasm is a glorious thing, it must enkindle flame in other souls. I might not be correct if I were to say he has done this for the greater proportion of those who come in contact with him, but in very many cases it is undoubtedly true, in more cases I feel sure than he is himself aware, or than we ourselves are, but I trust in the course of time the fruits of his visit will be more seen throughout England, in a growth towards a purer theism, a wider, warmer-hearted religious faith. As a social reformer we must also honour him highly. When I think of what courage he must have—what courage many of you have—in breaking through time-honoured customs and ceremonies.

I wonder and admire; though we have not the same difficulties to overcome, yet many of us here would fall far below, in our courage in overcoming our "idolatrous" customs.

Sorry indeed are we to lose him, but we know his work lies in India, for that he must be best fitted; thought in some ways he could not have done for us what he has, had he been European, yet I think one not brought up amidst it, is not so well-fitted to *permanently* influence European life, in these days an exceedingly complex thing.* * *

Yours in theistic fellowship.
(Sd.) Elizabeth Sharpe.

P. S.—I cnnnot help wishing to tell you that one of the things we greatly admire in Babu Keshub is his strong wish that his country shall not be denationalised, but that it shall be elevated and improved according to its own nature; it seems to us India can thus only be truly reformed, having life of its own as the basis of reformation, not adopting in all things foreign ways and habits.

২৮শে আগস্ট, ১৮৭০।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার জামাতার বিলাতযাত্রা উপলক্ষে রচিত আপনার কবিতাটি আমাকে যে কী আনন্দ দিয়াছে তাহা জানাইয়া আপনাকে কয়েক ছত্র না লিখিলে, আমার মনে হয়, কর্তব্যের প্রতি আমার অবহেলা করা হইবে। আপনার জামাতাকে আমরা এখানে বিলাতী কায়দায় মিঃ ঘোষ বলিয়া ডাকি। আপনি তো জানেন আমরা ইংরাজরা কাজের লোক। যাহাতে ক্লেশ অত্যল্প এবং সুবিধা অত্যধিক আমরা সেইরূপ কর্মই করিয়া থাকি। মিঃ ঘোষ কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমাকে ঐ কবিতাটি দেন এবং এই জানিয়া আমি অবাক ও আনন্দিত হই যে এমন একজন ব্যক্তিও আমাকে জানেন এবং আমার প্রশংসা করেন যিনি আমার অজানা, অচেনা। এই প্রসঙ্গে আমি আপনার বন্ধু কেশববাবুর উল্লেখ করিতে চাই। তাঁহার নামের বিলাতী সংস্করণ করিব না। তিনি আসিয়াছিলেন, আবার চলিয়া গেলেন এই পর্যন্ত। যাহা হউক তিনি যখন আসেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত হই। তাঁহার একটি কথায় আমার সর্বাধিক উপকার সাধিত হইয়াছিল। তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে মানুষের পথ বিভিন্ন হইলেও আত্মার ক্ষেত্রে সর্বজাতি, সর্বমানব এক ও অভিন্ন, এবং পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়, একে অপরকে বুঝিতে সাহায্য করে। তিনি এই সত্যটি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে উহা বিশ্বাস না

করিয়া পারি নাই। যেটুকু অবিশ্বাস ছিল তাহাও যেন দূর হইয়া যায়। আপনার কবিতায় আপনি আমাকে 'ভগিনী' সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা হইতেই আমি সেই একই সত্য উপলব্ধি করি। এই দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হয় যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একটি মানুষ অপর একটি মানুষের সহিত নিবিড় আত্মীয়তার ঐক্য অনুভব করে। ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারি যে সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। টেনিসনের দুইটি লাইনে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছেঃ

'পৃথিবীর যত পথ স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা সব—
চরণে ঈশ্বরের, করি অনুভব।''

কেশববাবু বাস্তবিকই এখানকার অনেককে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত ধর্মনিষ্ঠা এবং জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদের অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়, আরও একান্ত এবং আরও বাস্তব করিয়াছে। উৎসাহ ভাল। ইহা অপরের আত্মায় জ্ঞান ও ভক্তির শিখা প্রজ্বলিত করিবেই। আমি যদি বলি যে যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই কেবল উপকৃত হইয়াছেন তাহা হইলে হয়তো আমার ভুল বলা হইবে, কারণ নানা ক্ষেত্রে তাঁহার সহায়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। একদিন আসিবে যেদিন সমগ্র ইংলণ্ডে তাঁহার এই আগমন ফলপ্রসূ হইবে, তাঁহার উপদেশ ঈশ্বরবাদকে আরও উন্নত করিবে এবং মানবের মন এক ব্যাপকতা এবং সুকুমার ধর্মবিশ্বাসের দিকে নিবদ্ধ হইবে। সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিব। তাঁহার সাহস, (সে-সাহস আপনাদের অনেকেরই আছে) গতানুগতিক রীতি ও অনুষ্ঠানের নিগড় ভাঙিয়া নূতনকে আলিঙ্গন করিবার স্পৃহা—এইগুলি বিস্ময়কর হইলেও প্রশংসনীয়। আমি প্রশংসা করি এবং অবাকও হই। আমাদের পথে এই ধরনের কোন বাধাবিঘ্ন না থাকিলেও এখানে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আমাদের 'পৌত্তলিক' প্রথাগুলি কাটাইয়া উঠিবার জন্য এতদূর সাহস প্রদর্শন করিতে পরিতেন না।

* * *

তাঁহাকে হারাইয়া আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু আমরা জানি তাঁহার কাজ ভারতবর্ষে, কারণ ভারতবর্ষই তাঁহার কর্মক্ষেত্র। যদি তিনি ইউরোপীয় হইতেন তাহা হইলে আমাদের জন্য যাহা তিনি করিয়াছেন তাহার খানিকটা হয়তো করিতে পারিতেন না, তথাপি আমার মনে হয়, দিন-কাল যেমন পড়িয়াছে, যিনি ইউরোপীয় চিন্তাধারায় মানুষ হন নাই তাঁহার পক্ষে ইউরোপীয় জীবনে স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করা হয়তো ততটা সম্ভব হইবে না। ইতি।

* * *

আপনার সহ-ঈশ্বরবাদিনী
(স্বাঃ) এলিজাবেথ শার্প।

পুনশ্চঃ আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কেশববাবুর মধ্যে আর একটি বিশেষ প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার দেশের বিজাতীয়করণের ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন যে তাঁহার দেশকে উন্নত এবং মহিমান্বিত করিতে হইবে ইহার স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। আমাদেরও মনে হয় একমাত্র এই পথেই ভারতবর্ষের যথার্থ সংস্কার সম্ভব। এই সংস্কারের ভিত্তি হইবে ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রাণবস্তু, বিজাতীয় রীতিনীতি নয়।

বিদুষী জাতীয় জীবনকে পত্তনভূমি করিয়া সংস্কার কার্য সম্পাদন করা সম্বন্ধে উপরে বলিয়াছেন দেখ! তিনি আর এক পত্রে (১৫ই মার্চ, ১৮৭১) লিখিয়াছেন—

"The four pamphlets you have so kindly sent to me have very greatly interested me. I think it would please you to hear a remark made by a lady to whom I lent 'A Defence of Brahmoism and the Adi Brahmo Samaj'. 'I am surprised and pleased to see how strongly its writer feels that there is indigenous Indian life and thought on which to plant new efforts after regeneraation. I was not aware the Indians felt their own nationality so strongly or at least I thought all those who seeking reform are also turning towards the European civilization.' I can give you another instance of how strongly we English respect those who honour their own country and national life. Another friend of mine was struck with pleasure by nothing so much in Keshub Babu's speech in London as by his saying "I came here an Indian and return a confirmed Indian." "I do not know if it will sound strange to you that your pamphlets strike me, if I may say so, as being more English, more European in tone, than other Brahmo writings I have read. This seems curious when you are wishing to adhere more to Hindu life than some others do, but I think, perhaps, it is because your tone is calmer, more 'business-like' if I may use the expression, more scientific perhaps than some writers who have more religious enthusiasm. This made your writings valuable to me."

দয়া করিয়া আপনি যে চারখানি পুস্তিকা আমায় পাঠাইয়াছেন তাহা আমাকে অত্যন্ত প্রীত করিয়াছে। আপনার 'ব্রাহ্মধর্ম ও আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষে' নামক পুস্তিকাখানি আমি এক ভদ্রমহিলাকে পড়িতে দিয়াছিলাম। তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা শুনিয়া আপনি আনন্দিত হইবেনঃ 'নবজীবনলাভের পর একমাত্র ভারতীয় জাতীয় জীবন ও চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তরের উপরই যে নব নব প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে, লেখকের এই গভীর বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। আমি পূর্বে জানিতাম না যে ভারতবাসিগণের স্বদেশানুভূতি এত গভীর। মোটামুটি ইহাই জানিতাম যে সংস্কারের জন্য তাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতার মুখাপেক্ষী।' যাঁহারা স্বদেশ ও জাতীয় জীবনকে শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদের প্রতি আমরা ইংরাজরা যে কত শ্রদ্ধাশীল তাহার

আর একটি নমুনা আমি আপনাকে দিতে পারি। আমার আর একটি বন্ধু লন্ডনে কেশববাবুর শেষ বক্তৃতায় যতটা অভিভূত হইয়াছিলেন তদপেক্ষা অভিভূত হইয়াছিলেন তাঁহার এই কথায়ঃ 'আমি এখানে আসিয়াছিলাম ভারতীয় হইয়া, ফিরিতেছি আরও ভারতীয় হইয়া।'

কি জানি, শুনিয়া হয়তো আপনি অবাক হইবেন, অপরাপর যে ব্রাহ্ম লেখাগুলি আমি পড়িয়াছি তাহার মধ্যে আপনার পুস্তিকাগুলির সুর আমার নিকট অধিকতর ইংলন্ডীয় এবং ইউরোপীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা আপনি হিন্দু জীবনে অধিকতর বিশ্বাসী। তবে এইরূপ মনে হইল কেন? আমার মনে হয় ইহার জন্য দায়ী আপনার স্থিরচিত্ত বৈজ্ঞানিক মনোধর্মিতা এবং বাক্-সংযম। আরও লেখক অবশ্য আছেন কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তাঁহাদের উৎসাহ যত বেশি, উপরি-উক্ত গুণাবলী সম্পর্কে তাঁহাদের চেতনা তত গভীর নয়। এই গুণাবলীর জন্যই আপনার লেখাগুলি আমার নিকট মূল্যবান।

মিস্ এলিজাবেথ শার্প মহাশয়াকে আমার কৃত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার দৃষ্টির জন্য পাঠাইয়া দিই। তিনি তাহা পাঠ করিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন (৮ই আগস্ট, ১৮৭১):—

"This little book has given me a better insight into the Hindu Shastras than I have before been able to have. How much I shall look forward to one day seeing the book you say are preparing*. I am much struck with the great spirituality in many of the passages. It is very wonderful the intense realization those old Rishis had of the omnipresence of God. How beautiful that is 'He who seeth all in God and God in all despiseth not any.' How full of wisdom is the sentence, 'If you think you have known God well, then you know but little of the nature of God.' That has dwelt much in my mind since I read it in your book. To me, nothing in religious thought is more grand, more awful, more impressing, than the thought how infinitely beyond any knowledge and conception of ours is God. It is even comforting to me some times to think how much of Him we do not know. Then I feel how right it is to be humble and patient, to wait in trust, not to dogmatize as the orthodox do, nor as the materialist, who will dogmatize in declaring there is nothing beyond things present to be known. It never harmonize with my feeling when people speak with great certainty of the nature of God. Still that does not in any way weaken my *knowledge* that *he is.* 'It is neither that I know not

---

* Selections from the Hindu Shastras. ইহা আমার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার ইংরাজী অনুবাদের শেষে আছে। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (১৮৮৯)

God, nor is it, that I know Him. But while our knowledge of His nature seems sometimes undefined, how strong, how vivid, is our feeling of His love, our sense of our constant nearness to Him, our trust in His infinite kindness."

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িয়া হিন্দু শাস্ত্রগুলিকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইলাম। জানিতে পারিলাম আপনি আর একখানি পুস্তক প্রণয়নে রত আছেন। কবে ইহা দেখিব এই আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি! গ্রন্থখানির বহু অংশে যে মহৎ আধ্যাত্মিকতা ছড়াইয়া আছে তাহা দেখিয়া আমি অতীব চমৎকৃত হইয়াছি। প্রাচীন ঋষিরা ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতা সম্বন্ধে যে গভীরতম উপলব্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই উপলব্ধি কি অসীম বিস্ময়ের, তাই না? 'যিনি ঈশ্বরের মধ্যে সকলকে দেখেন এবং সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না'—এই সত্যটি কি চমৎকার। 'তুমি যদি মনে কর যে ঈশ্বরকে তুমি ভালরূপে জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে কিছুই জান না'—এই বাক্যটি কি জ্ঞানগর্ভ! আপনার গ্রন্থখানি পড়ার পর মুহূর্ত হইতেই এই কথাগুলি আমার বার বার মনে পড়িতেছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞানের অতীত, সর্ব ধারণার ঊর্ধ্বে। আমার মতে, ইহার চেয়ে সুন্দর, বিপুল এবং মর্মস্পর্শী সত্য ধর্মভাবধারায় আর একটিও নাই। এমন কি মাঝে মাঝে আমি এইটুকু জানিয়া সান্ত্বনা পাই যে তাঁহার কতটুকু অংশ আমরা জানি! তখন আমি বুঝিতে পারি, আমাদের আরও কতটা ধীরস্থির হওয়া প্রয়োজন, ঈশ্বরে মতি রাখিয়া আমাদের আরও কতটা অপেক্ষা করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে বুঝিতে পারি, গোঁড়ামি এবং যাঁহারা বলেন যাহা আছে তাহাই কেবল জানা যায়, তাহার বাহির কিছুই জানা যায় না, তাঁহারা কত ভ্রান্ত! ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে যাঁহারা সবজান্তার ন্যায় কথাবার্তা বলেন, তাঁহাদের সহিত আমি একাত্ম হইতে পারি না। তথাপি, তিনি যে আছেন, আমার এই জ্ঞানকে ইহা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। আমি ঈশ্বরকে জানি ইহা যেমন সত্য নয়, তেমনই আমি যে তাঁহাকে জানি না ইহাও সত্য নয়। মাঝে মাঝে আমাদের জ্ঞান ঈশ্বরের স্বভাবের নাগাল পায় না সত্য, তবু তখনও তাঁহার প্রেমের অনুভূতি, তাঁহার সহিত আমাদের নিত্য নৈকট্য বোধ এবং তাঁহার অসীম দয়ায় আমাদের বিশ্বাস কি দৃঢ়, কি স্পষ্ট ইহাই না আমাদের মধ্যে দেখা দেয়!"

আমি বিদুষীকে সংস্কৃত শাস্ত্র ও পারস্য কবির গ্রন্থ হইতে উত্তম উত্তম বচন নির্বাচন করিয়া তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ পূর্বক তাঁহার দৃষ্টির জন্য প্রেরণ করিতাম, তাহাতে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদ ও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত যে সকল শ্লোক অনুবাদ করিয়া পাঠাই তাহার মধ্যে নিম্নে লিখিত শ্লোক একটি :—

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়েষ্বনুতৎপরোপি।
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং॥
সঙ্গীত নৃত্যকতিতান বশংগতাপি।
মৌলিস্থকুম্ভ পরিরক্ষণধীর্নটীব॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত ভাগবতের টীকা।

যেমন সুধীরা নটী সঙ্গীত, নৃত্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়াও মস্তকস্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না।

তাঁহার ১৮৭১ সালের ২৮এ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে এই শ্লোক সম্বন্ধে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন----

"I have a sonnet to quote to you by a favourite English Poet of mine, Elizabeth Baarret Browning, it so much agrees in sentiment with this passage you quoted to me; 'As the woman that dances with a pitcher full of water on her head, dances regularly but has her mind upon the pitcher to prevent it from falling, so a pious man should perform worldly business but have his mind at the same time set upon God.'

The woman singeth at her spinning-wheel
A pleasant chant, ballad, or bar carolle,
She thinketh of her song, upon the whole,
Far more than of her work, and yet the reel
Is full, and artfully her fingures feel
With quick adjustment provident control,
The lines too subtly twisted to unroll
Out to a perfect thread. I hence appeal
To the dear Christian Church, that we may do
Our Father's business in these temples mirth,
Thus swift and steadfast thus intent and strong,
The whole apart from toil, our souls pursue
Some high, calm, spheric tune, and prove our work
The better, for the sweetness of our song.

"আমার প্রিয় কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ্-এর একটি চতুর্দশপদী কবিতা আপনাকে শুনাইতে ইচ্ছা করি। আপনি যে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সহিত ইহার মিল আছে। 'যেমন সুধীরা নটী জলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া তালে তালে নৃত্য করিবার সময় মস্তকস্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, তেমনই ধীর ব্যক্তির উচিত বিষয়কর্মে মনোযোগ দিয়াও ঈশ্বরের পদারবিন্দে মতি রাখা।'

"চরকায় সুতা কাটিতে কাটিতে নারী গান গাহিছে----কোন মধুর গীত, গাথা কিংবা খেয়া বাহিবার গান। তাহার নিকট কাজ বড়, কিন্তু কাজের চেয়েও বড়

তাহার এই গান। গানের সঙ্গে সঙ্গে পাকানো সূতাগুলি অপরূপ লালিত্যে এবং সুনিপুণ শিল্পপ্রতিভার স্পর্শে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সূতায় পরিণত হয়। আমি খ্রীষ্টান চার্চের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিতেছি যে আমরা ভবমন্দিরের পরম পিতার কাজ ক্ষিপ্রতা অথচ দৃঢ়তার সহিত নিষ্ঠা এবং আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিব; কিন্তু কাজের কথা ছাড়াও আমাদের আত্মা যেন ধীর, সারগর্ভ এবং সুমহান এক সঙ্গীতের সাধনায় রত থাকে। তাহাতে কাজও ভাল হইবে এবং গানও মধুর হইবে।''

আমি বিদুষীকে আমার প্রণীত নিম্নলিখিত কয়েকটি পুস্তিকা উপহার স্বরূপ পাঠাই।

(১) ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্ম-সমাজের স্বপক্ষে

(২) আজিকার ব্রাহ্ম প্রশ্নগুলির জবাব

(৩) ব্রাহ্ম উপদেশ, সাবধানবাণী এবং সাহায্য

(৪) আদি ব্রাহ্ম-সমাজ এবং ইহার নীতিসমূহ

'ব্রাহ্ম উপদেশ, সাবধানবাণী এবং সাহায্য' পুস্তিকার শেষে আমি বলি ''ব্রাহ্মধর্ম ঐক্যের ধর্ম''। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ১৮৭১ সালের ১৫ই মার্চের পত্রে লেখেনঃ

'I am so very much pleased with what you say in one of your pamphlets: 'Brahmoism is the religion of harmony.' 'The law of harmony is the test by which we should examine whether any religious doctrine really agrees with Brahmoism.' Those words have helped me much. They expressed a thought I was trying, just before I read them, to arrive at more clearly than before. Our Theism should indeed try to make into one great harmonious whole all we find in God's wonderful world, for is not all, save our sin from God? And this, to me, is the great beauty and strength of theism that it helps me to feel how all science, all knowledge, all social improvement, all we do or learn, may partake of God. We are to develop harmoniously all parts of our nature in due proportion, not to dwarf one for the other's sake, for has not God endowed us with all these qualities? An exclusive religion, one that made something specially holy, and other less so, could never comfort me. I long for harmony: yet we know while there is humanity there must be some warring; warring at least with evil. Do you know Tennyson's beautiful lines?

> Let knowledge grow from more to more,
> But more of reverence in us dwell,
> That mind and soul, according well,
> May make one music as before,
> But vaster,'

We want our whole lives 'to make one music' before God, our Father. Only to-day I was reading a passage from the Roman Marcus Aurelius, which agrees with this thought. 'Everything harmonizes with

me which is harmonious to Thee O Universe. Nothing for me is too early or too late which is in due time for Thee. Everything is fruit to me which Thy seasons bring. O Nature! From Thee are all things, in Thee are all things, to Thee all things return'', Of course, nature to me is not separated from God. Nature's ways are His ways, though how great and infinitely beyond and above nature He may be, we cannot tell."

আপনার একখানি পুস্তিকায় আপনি লিখিয়াছেনঃ 'ব্রাহ্মধর্ম ঐক্যের ধর্ম।' ইহা আমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। 'কোন ধর্মমত আসলে ব্রাহ্মধর্মের সহিত একাত্ম কি না তাহা নির্ভর করে সেই ধর্মমত ঐক্যের নিয়ম মানিয়া চলে কি না, তাহার উপর।' এই কথা আমাকে অত্যন্ত উপকৃত করিয়াছে। আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, ইহা সেই সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করিয়াছে। ঈশ্বরের পরম সুন্দর পৃথিবীতে যাহা কিছু আমরা দেখি সেই সেই সবকিছুর মধ্যে

* যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিরজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।
তৈত্তরীয় উপনিষৎ।

ঐক্য স্থাপন করা এবং সবকিছুকে এক সূত্রে গ্রথিত করাই আমাদের ঈশ্বরবাদের প্রকৃত কর্তব্য হওয়া উচিত। কারণ, এক পাপ ছাড়া আর সমস্তই কি আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে পাই নাই? উপরন্তু আমার মতে ঈশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য হইল এই যে, ইহা আমাদের বুঝিতে সাহায্য করে যে, আমরা যাহা কিছু করি কিংবা শিখি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন—সবকিছুই ঈশ্বরের অনন্ত স্বভাবের সহিত যুক্ত। আমাদের স্বভাবের সকল অংশকেই সুসমঞ্জস করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—এক সুরে বাঁধিতে হইবে। কোন অংশকে বড়, কোন অংশকে ছোট করিলে চলিবে না। কারণ, ঈশ্বরের নিকট হইতেই না আমরা সকল প্রকার গুণ প্রাপ্ত হইয়াছি! যে ধর্ম নিজেকে বড় এবং পবিত্র ঘোষণা করিয়া অপর ধর্মকে ছোট করে, সেই ধর্ম আমাকে কখনও আনন্দ দিতে পারে না। আমি ঐক্যের উপাসিকা; তথাপি আমরা জানি যতদিন মানুষ আছে ততদিন অল্পবিস্তর সংগ্রাম থাকিবেই—অন্তত অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। টেনিসনের সুন্দর ছত্রগুলি কি আপনার জানা আছে?

"জ্ঞানের সীমানা উত্তরোত্তর বিস্তৃত হউক, কিন্তু ভক্তির জ্ঞানই যেন আমাদের অন্তরে বেশি করিয়া বিরাজ করে; কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মন এবং আত্মা যেন একটি সঙ্গীত রচনা করিতে পারে—যে সঙ্গীত পূর্বেরই ন্যায় কিন্তু আরও বিরাট।"

আমরা চাই আমাদের জীবন যেন আমাদের পিতা ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া 'এমনই একটি সঙ্গীতে' পরিণত হয়। এই আজই আমি রোমক মার্কাস অরেলিয়াসের একটি অনুচ্ছেদ পড়িতেছিলাম। ইহার সহিত তাহার মিল আছে। 'হে বিশ্ব, যাহার সহিত তোমার ঐক্য আছে, তাহার সহিত আমারও ঐক্য আছে। তোমার সময় হইলেই আমারও সময় হইবে, মহাকাল তোমারই করায়ত্ত। হে প্রকৃতি, তোমার ঋতুসমূহ যাহা সৃষ্টি করে, তাহাই আমার নিকট ফল স্বরূপ; তোমা হইতেই সকল বস্তুর জন্ম, তোমারই মধ্যে সকল বস্তু বিরাজ করে এবং তোমারই নিকট সকল বস্তু ফিরিয়া যায়।' অবশ্য আমার মতে প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নয়। প্রকৃতির লীলা তাঁহারই লীলা, যদিও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় তিনি প্রকৃতির কত ঊর্ধ্বে, কারণ তিনি অনন্ত এবং মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা।''

বাঙ্গালীর ইংরাজী লেখা এবং তাঁহার নিজের বাঙ্গলা শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ পত্রে বলিয়াছেন—

"I am struck by the perfectly correct English in which you write. You Hindus are indeed proficient in our language. You say you wish I could read Bengali, the best works on Brahmoism being in that language; indeed I should like to read them. I have been lately trying to learn Bengali from my interest in your country. Babu Prasanna Kumar Ray has been helping me in this study. I feel that it would take me a very long time to become at all accustomed to the language, but I have with the help of good Dictionary (Sir C. Houghton's) been able to translate some of the sentences from Keshub Babu's little compilation of Theistic texts, those from the Hindu Scriptures, being only in Sanskrit and Bengali, were until now sealed to me. Some of them delighted me much, I show them also to my friends. I know they should properly be rendered into English from the Sankrit rather than Bengali, still I am glad to reach through the Bengali. Could you tell me if I could procure any other Bengali work of spiritual passages selected from the Hindu Shastras? I see you mention one in your 'Defence of Brahmoism' (that pamphlet specially pleased and interested me). Is that compilation called 'Brahma Dharma' out of print? If you have other English pamphlets like those you sent me I should be much interested to see them. I wish I had some true theistic work to return to you, but none now occurs to me. If there is any English book you wish to see I could procure and send to you. I should be most pleased to send it to you, if you will tell me of it. It may sometimes be difficult to procure European

works you want in Calcutta. I am very sorry to hear your physical sufferings. I hope it is consolation to you to feel you have laboured for the right and true. Your account of how health must give way before mental labour in India is not encouraging to Europeans who might wish to visit your country. I could say much more to you on many subjects, but my letter is long enough."

"আমি অবাক হইয়া ভাবি আপনি কি আশ্চর্যরকম শুদ্ধ ইংরাজী লেখেন। আপনারা হিন্দুরা আমাদের এই ভাষায় বাস্তবিকই সিদ্ধহস্ত। আপনি বলিয়াছেন, আমি যদি বাঙ্গালা পারিতাম তাহা হইলে আপনি খুশী হইতেন; কারণ ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি সবই বাঙ্গালা ভাষায়। পড়িতে পারিলে আমি সত্যই সৌভাগ্য মনে করিতাম। আপনার দেশের প্রতি অনুরাগবশতঃ আমি কিছুদিন হইল বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে চেষ্টা করিতেছি। এই বিষয়ে প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় আমাকে সাহায্য করিতেছেন। এই ভাষার সহিত সামান্য পরিচিত হইতেই আমার অনেক দিন লাগিবে; তবে একখানি ভাল অভিধানের (স্যার সি. হাউটনের) সাহায্যে কেশববাবুর সংকলন-গ্রন্থ হইতে (যাহাতে ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি পাঠ আছে) কয়েকটি বাক্য অনুবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এই পাঠগুলি কেবল সংস্কৃতে এবং বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ থাকায় এতদিন পর্যন্ত আমার নিকট দুরূহ ছিল। ইহার কতকগুলি আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়াছে। এইগুলি আমি আমার বন্ধুদেরও দেখাই। আমি জানি যে মূল সংস্কৃত হইতেই এইগুলির ইংরাজী অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবুও বাঙ্গালার মাধ্যমে যে এইগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি ইহাতে আমি আনন্দিত। আপনি কি বলিতে পারেন, হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংকলিত আধ্যাত্মিক অংশগুলির আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব কি না? আপনার 'ব্রাহ্মধর্মের স্বপক্ষে' পুস্তিকায় একখানির উল্লেখ দেখিয়াছি। (এই পুস্তিকাখানি বিশেষ করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিয়াছে।) 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক সংকলন-গ্রন্থখানি কি আর ছাপা নাই? যেমন পাঠাইয়াছিলেন সেই ধরনের আর কোন ইংরাজী পুস্তিকা আমাকে পাঠাইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইব। ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে কোন ভাল লেখা আমার নিকট থাকিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিতাম। যদি কোন ইংরাজী পুস্তক আপনি পড়িতে চান, উহার নাম জানাইলে, আমি তাহা সানন্দে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। প্রয়োজন মত কলিকাতায় ইউরোপীয় বইগুলি পাওয়া সবসময় সম্ভব না-ও হইতে পারে। আপনি অসুস্থ জানিয়া দুঃখিত হইলাম।"

মিস্ শার্প ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ চাহিবাতে তাহার ইংরাজী অনুবাদ একখণ্ড আমি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিই। তাহা পাইয়া তিনি যে আনন্দ প্রকাশ করেন তাহা পূর্বে উদ্ধৃত এক পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অনুবাদ এক্ষণে (১৮৮৯) পাওয়া যায় না। ইহা ইংরাজী ১৮৫১ সালের পূর্বে প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

উপরে উল্লিখিত যে চারিখানি পুস্তিকা মহাশয়াকে পাঠাইয়া দিই তাহা তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ঐ ভাষায় অসাধারণ বিদ্বান সুবিখ্যাত জর্মন পন্ডিত গোল্ডস্টুকার সাহেবকে দেখান; তাহাতে তিনি যে পত্র মিস্ শার্পকে লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেল। পাঠকবর্গ উহা পাঠ করিয়া দেখিবেন যে আমি ধর্ম প্রচারের যে প্রণালী সমর্থন করি গোল্ডস্টুকার সাহেব তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছেন।

14 St. George Square,
Primrose Hill, London.
August 7, 1871

DEAR MADAM,

I feel very much obliged for your kindly sending me the letter of Babu Rajnarain, and having read it with great interest I beg to return it to you with my best thanks.

I quite agree with the Babu's views of the best, I not the only, means of effecting a sound reform of Hinduism. The Hindus must be shown that the present forms of their religion have nothing in common with the Vedic teaching, on which they assume them to be founded; but that they are the work of late ages, of ignorance and an interested priesthood. But to understand this, the Hindus must go back to their ancient Sanskrit literature of which they have all reason to be proud, they must remove ignorance by dint of hard study. As a long time, however, would be required in working out such a result, I believe that much might be gained by the establishing of religious councils composed of good and learned Hindus in whom the people had confidence and whose exposition of the old doctrine would have weight with them. In former times single individuals like Sankaracharya effected such reforms by the same means; but as India has at present no man of this stamp, the combined action of several learned men should supply their place.

Mere general talking, preaching and moralising, without positive knowledge would have no effect; for, if ignorant of interested priests persuaded the masses that such preachng is not in the spirit of the old religion, they would believe them, and abide by their superstitions.

I am extremely glad also to find Babu Rajnarain regrets all kinds of foreign proselytism; for I have never doubted that even its best and sincerest intentions must remain useless, while too often only they have proved positively mischievous.

I beg to remain,
Dear Madam.

Your obedient Servant,
(Sd.) Th. Goldstucker.

১৪, সেন্ট জর্জ স্কয়্যার
প্রিমরোজ হিল, লন্ডন,
৭ই আগস্ট, ১৮৭১

সুচরিতাসু,

দয়া করিয়া রাজনারায়ণবাবুর পত্রখানি আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত বাধিত হইলাম। আমি ইহা অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত পড়িয়াছি। এক্ষণে ধন্যবাদের সহিত তাহা আপনার নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিতেছি।

হিন্দুধর্মের প্রকৃত সংস্কার সাধন করিবার জন্য রাজনারায়ণবাবু যে পথনির্দেশ দিয়াছেন তাহা যদি একমাত্র না হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ তো বটেই। ইহাতে আমি সম্পূর্ণ একমত। হিন্দুদের দেখাইয়া দেওয়া উচিত যে তাঁহারা বর্তমানে যে ধর্মগুলির চর্চা করিয়া থাকেন, তাহার সহিত বৈদিক ধর্মের কোনই মিল নাই, যদিও তাঁহারা ধরিয়া লন যে, তাঁহাদের ধর্ম বেদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে পরবর্তীকালে অজ্ঞতা এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার জন্যই বৈদিক ধর্মের এমন রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইহা সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে হিন্দুদের ফিরিয়া যাইতে হইবে তাঁহাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে—যে সাহিত্যের জন্য তাঁহারা সত্যই গর্ব অনুভব করিতে পারেন। শ্রমসাধ্য অধ্যয়নের সাহায্যে তাঁহাদের এই অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। কিন্তু ইহা প্রচুর সময়-সাপেক্ষ। তাই আমার মনে হয়, এমন সং হিন্দু পন্ডিতদের লইয়া যদি কতকগুলি ধর্মসভার সৃষ্টি করা যায়, যাঁহাদের কথা এবং প্রাচীন ধর্মব্যাখ্যা লোকে বুঝিবে এবং মানিয়া চলিবে, তাহা হইলে সুফল ফলিবার আশা আছে। পূর্বে ঠিক এই উপায়ে শঙ্করাচার্যের ন্যায় কয়েকজন ব্যক্তি একাই এমন সংস্কার সাধন করিতে সক্ষম হন। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে যখন তেমন ব্যক্তি নাই, তখন সেই স্থান পূর্ণ করা উচিত কোন পন্ডিতমন্ডলীকে দিয়া।

কাজের কাজ না করিয়া কেবল বক্তৃতা এবং উপদেশ বর্ষণ করিলে ফল ভাল হইবে না। যাহা প্রয়োজন তাহা হইল সঠিক জ্ঞান। কারণ অজ্ঞ কিংবা স্বার্থপর পুরোহিতগণ যদি জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হন যে, এই বক্তৃতা এবং উপদেশ প্রাচীন ধর্মের পরিপন্থী, তাহা হইলে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবে এবং কুসংস্কারগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবে।

আমি আরও একটি বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সে বিষয়টি হইল এই যে, রাজনারায়ণবাবু সকল প্রকার বৈদেশিক ধর্মান্তর প্রচেষ্টার ঘোরতর বিরোধী। আমি নিঃসন্দেহ যে এই সকল প্রচেষ্টা যতই ভাল হউক না কেন, যতই সদিচ্ছাপ্রণোদিত

হউক না কেন, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবেই। উপরন্তু এই প্রচেষ্টাগুলি যে অত্যন্ত ক্ষতিকর তাহাও প্রমাণিত হইবে। ইতি।

বিনীত

(স্বাঃ) গোল্ডস্টুকার

মহাশয়ের সঙ্গে যে প্রগাঢ় আত্মীয়তা হয় এবং পরস্পর যে স্নেহ জন্মে তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার প্রণীত একটি ক্ষুদ্র কবিতার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

(1)

How wonderful is life, how strange and new!
Things are, I know, I never thought could be,
I know that far across the southern sea,
Are hearts that beat in kindness to me:
How wonderful is life, how strange but true.

(2)

What thought men speak their thoughts with different tongue,
What thought they move far different scenes among,
The language of the heart is still the same,
All spirits understand love's sacred name,
Blest be the land from whence to mine it came.

(3)

How can I ever thank my stranger friend?
His life and mine must lie in different ways,
But he has sunshine brought within my days,
By knowing how his thought with mine to blend,
And shown the common goal to which we tend.

(4)

What can I do, dear Father, but stoop low,
In true and loving gratitude to Thee,
Thou hast made posssible these things should be,
'Tis Thou that leadest all where we should go,
Thy hand it is from whence these blessing flow.

(১)

জীবন কত সুন্দর, কত বিস্ময়কর এবং কত নূতন! আমি জানি অসম্ভবও সম্ভব হয়; আমি জানি সুদূর দক্ষিণ সমুদ্রের ওপারে এমন অনেকেই আছেন যাঁহাদের হৃদয় আমার প্রতি কৃপা-সহানুভূতিতে স্পন্দিত হয়। জীবন কত সুন্দর, কত বিস্ময়কর কিন্তু কত সত্য।

(২)

নানা লোকের নানা চিন্তা, নানা ভাষা; কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? নানা লোক নানা পরিবেশে লালিত-পালিত; কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? হৃদয়ের

ভাষা তবু যে এক ও অভিন্ন। প্রেমের পবিত্র নামে সকলেই মিলিত হয়। যে-দেশ হইতে প্রেমের বাণী আসিয়াছে সেই দেশ ধন্য হউক।

(৩)

আমি কি ভাবে আমার অজানা বন্ধুকে ধন্যবাদ দিব? তাঁহার জীবন এবং আমার জীবন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইবে; তিনি জানিতেন কেমন করিয়া আমাদের উভয়ের চিন্তা একসূত্রে গ্রথিত করিতে হয়; উপরন্তু তিনি সেই অভিন্ন লক্ষ্যের সন্ধান দিয়াছেন যে লক্ষ্যের দিকে আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি।

(৪)

হে পিতঃ, সত্য ও সপ্রেম কৃতজ্ঞতায় তোমার সম্মুখে নতজানু হওয়া ব্যতীত আমি আর কি করিতে পারি? তুমি সকলই সম্ভব করিয়াছ। যে লক্ষ্যে আমাদের সকলের উপনীত হওয়া উচিত, সেই লক্ষ্যের দিকে তুমিই আমাদের পরিচালিত কর। তোমার হস্তই সকল আশীর্বাদের উৎস।

মিস্ শার্প-এর সঙ্গে অনেক পত্র লেখালেখি হয়। তাঁহার বিবাহের পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। বিবাহ করিবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

1 Highbury Terrace,
London,
18th July, 1872

MY DEAR SIR,

I have two letters for which to thaank you, dated 16th April and 18th May; both of them were very interesting to me, and I thank you much for your kind expression towards me. I have also received safely your beautiful present of the silver butterfly; I think I must thank both you and your wife for sending it. It has been much admired by all my friends as well as by me especially. I shall always value it very much as a specimen of beautiful Indian workmanship, as rare and precious coming from so distant a country, but more than all because it will speak to me of the kind feelings of distant and unseen friends. I shall like very much to wear it in my hair. My sister Letitia is writing to your wife to send thanks also for her present. I am very glad to hear that you received Mr. Martineau's book[1] safely, and that you are pleased with it. Since I received your letters and presents, a packet of your pamphlets arrived by the last mail, and I have despatched some, and will some send all to their several destinations.

---

1. Martineau's Endeavours after the Christian Life.

I should have written to you before this, but I have been extermely engaged, and all my time and thoughts have been occupied in deciding a matter which will influencc and indeed change all my future life. Perhaps you may have heard about this from some of my Calcutta friends. It is this, I am going to be married. This will change my life completely from what I thought it might have been. I shall never come to India now, which I thought I might possibly have been able to do, indeed I shall be able to do very little for your country, though I shall always care very much for her welfare, for I shall be so much occupied in my own home, and shall feel it my first duty, to spend all my best energies there. An English lady at the head of a household, has seldom much time or thought for objects beond her home. I have hiterto had an unusual amount of leisure-time, living in a quiet home, well-ordered by my good mother, and sharing with my sisters the small domestic duties. In my new home I shall be more than usually occupied. Mr. Henry Cobb, to whom I am now to be married in a few weeks, is a London lawyer. He has been married before, and has four little children, to whom I am to supply the place of the mother they have lost so early. I am very happy in the thought of my new and life-long duties. It is, of course, impossible to leave any old course of life and enter a new one without some regrets, but I believe I am doing what is right, and as God would have me do. I cannot but regret that I shall be much cut off from my Indian friends, I shall have little leisure for writing or anything, but I shall always think with pleasure of the kindness *you* håve shown to me, and shall value your letters, and the many interesting quotations from the oriental mines of treasure, I so much admire you have sent me. I am sorry I cannot answer your letters fully and properly. Will you tell your wife with my love I received and was much pleased to read her printed poem? One of my Indian friends, Babu Srinath Dutt translated it for me. I also was much pleased to receive her letter. If you still like to make us of use for your publications in London, I will do what I can. If I am very busy, one of my sisters will help me. Will you thank your son very much with my kind regards for copying for me the extracts from Sadi? I must not now write more, but remain always with feelings of respect and regard.

Yours in theistic fellowship,
(Sd.) Elizabeth Sharpe.

১, হাইবারি টেরেস
লণ্ডন,
১৮ই জুলাই, ১৮৭২

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৬ই এপ্রিল ও ১৮ই মে-র পত্র দুইখানির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দুইখানি পত্র পড়িয়াই আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমার প্রতি আপনি যে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সুন্দর উপহার রৌপ্য প্রজাপতিটি নিরাপদে আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা পাঠাইবার জন্য আপনাকে এবং আপনার পত্নীকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। উপহারটি আমার তো ভাল লাগিয়াছেই, আমার বন্ধুগণেরও অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। ভারতীয় কারিগরির সুন্দর নমুনা হিসাবে ইহা চিরদিন আমার নিকট মূল্যবান হইয়া থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, সুদূর এক দেশ হইতে এই উপহারটি আসিয়াছে সেইজন্যও ইহা অমূল্য। কিন্তু সর্বোপরি ইহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে আমার সুদূরের বন্ধুগণ আমাকে কত ভালবাসেন যাঁহাদের আমি দেখিও নাই। আমার ভগিনী লেটিসিয়া-ও আপনার পত্নীকে তাঁহার উপহারের জন্য ধন্যবাদ পাঠাইতেছে। মিঃ মার্টিন্যু-র গ্রন্থখানি যে নিরাপদে আপনার নিকট পৌঁছিয়াছে এবং গ্রন্থখানি যে আপনার মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছে, ইহার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনার দুইখানি পত্র এবং উপহারগুলি পাইবার পর গত ডাকে আপনার কতকগুলি পুস্তিকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার কতকগুলি উপযুক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছি। বাকিগুলিও সত্বর যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব।

অত্যন্ত ব্যস্ত না থাকিলে আপনার পত্রের জবাব আগেই দিতাম। আমার সমগ্র চিন্তা ও সময় এমন একটি বিষয়ের মীমাংসায় ব্যাপৃত ছিল যাহা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে প্রভাব বিস্তার করিবে এবং সত্যই পরিবর্তন আনিয়া দিবে। আমার কলিকাতাস্থ বন্ধুগণের কাহারও কাহারও নিকট এ সম্বন্ধে কিছু হয়তো শুনিয়া থাকিবেন। ব্যাপারটি এই—আমি বিবাহিতা হইতে চলিয়াছি। ইহা আমার জীবনে পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাইয়া দিবে। আমার পক্ষে এখন ভারতবর্ষে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভাবিয়াছিলাম হয়তো যাইতে পারিব, কিন্তু তাহা হইবার নয়। আপনার দেশের জন্য আমি বোধ হয় আর কিছুই করিতে পারিব না, যদিও ইহার মঙ্গলচিন্তায় আমার মন সর্বদা পূর্ণ হইয়া থাকিবে। ইহার কারণ হইল এই যে আমার নিজের সংসারে আমাকে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকিতে হইবে এবং আমার প্রথম কর্তব্য হইবে সংসারের কাজগুলিতে সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দেওয়া। একজন ইংরাজ গৃহকর্ত্রীর পক্ষে সংসারের বাহিরের কাজগুলিতে সাড়া দেওয়া প্রায় একেবারেই অসম্ভব। এতদিন আমার প্রচুর অবসর ছিল। বাড়ির কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন আমার স্নেহময়ী মাতা। জীবন ছিল নিরুপদ্রব।

গৃহস্থালির ছোটখাটো কাজগুলি আমার ভগিনীদের সহিত ভাগাভাগি করিয়া লইতাম। আমার নূতন সংসারে সেই অবসর থাকিবে না, সর্বদাই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিব। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মিঃ হেনরী কবের সহিত আমার বিবাহ হইবে। তিনি লন্ডনের একজন উকিল। আগে একবার তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার চারিটি ছোট ছোট সন্তান আছে। আমাকে তাহাদের মা হইতে হইবে। জীবনব্যাপী নূতন জীবনে প্রবেশ করিবার সময় কিছুটা দুঃখ হয় সত্য, কিন্তু আমি জানি যাহা করিতেছি তাহা ঠিক এবং তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি দুঃখ না করিয়া পারি না যে আমার ভারতীয় বন্ধুগণ হইতে আমি যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব, লিখিবার বা অন্য কাজের অবসরই থাকিবে না; কিন্তু আপনি আমার প্রতি যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্য আমি চিরদিন বাধিত থাকিব। আপনার পত্রগুলি এবং উদ্ধৃতিগুলি আমার নিকট অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে। আপনার পত্রগুলি পূর্ণ জবাব দিতে পারিব না বলিয়া দুঃখিত। আপনার পত্নীকে আমার ভালবাসা জানাইয়া বলিবেন যে তাঁহার প্রকাশিত কবিতাটি পড়িয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমার একজন ভারতীয় বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত ইহা আমার জন্য অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। আপনার পত্নীর পত্র পাইয়াও আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আপনি যদি এখনও মনে করেন যে লন্ডনে আপনার পুস্তক প্রকাশে সহায়তা করিতে পারি, তাহা হইলে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি যদি ব্যস্ত থাকি, আমার কোন ভগিনী আমাকে সাহায্য করিবে। সাদি-র কিছু অংশ নকল করিয়া আমার নিকট পাঠাইবার জন্য আপনার পুত্রকে দয়া করিয়া আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। আজ এই পর্যন্ত। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরদিন অটুট থাকিবে। ইতি।

আপনার সহ-ঈশ্বরবাদিনী

(স্বাঃ) এলিজাবেথ শার্প।

মহাশয়ার শেষ পত্রের প্রতিলিপি যেমন দেওয়া গেল তেমনি আমারও শেষ পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে দিতেছি। উপরের পত্র এই পত্রের উত্তর।

Calcutta,—May, 1872

MY DEAR MISS SHARPE,

After the despatch of my letter, dated the 16th ultimo and the parcel containing my wife's gifts to yourself and আনন্দময়ী* I received your very kind and valuable present of a copy of Mr. Martineau's "Endeavours after the Christian Life." I have not yet read the whole of the book but I am extremely pleased with what I have read. I have been literally charmed with certain passages replete with the most beautiful poetry and the strongest logic fused together. It is indeed a very precious gift. I have not seen you personally. It seems to me as if an invisible hand is sending these precious gifts to me

and that hand becomes at times dearer than those that are visible and near. Distance is of no reckoning in the case. "There were giants in those days"—the Taylors, the Barrows, the Hookers, the Miltons, the Leightons, the Latimers, the Cud-worths and the Baxters. Mr. Martineau evidently belongs to this race and not the present, but surpasses even that race in clearer perception of truth and the deeper feeling of love. A thousand pity it is that he did not publish his magnificent sermons on the foundation of religious knowledge! If my feeble voice can add any weight to those of the respected 600 who signed the petition you speak of in your letter. I would certainly add mine.* The more I am learning of the causes of the schism† in the Samaj of India mentioned in my last, the more I am coming to the conclusion that the Great Man Theory, as propounded in Keshub Babu's lecture, has much to do with it. The seceders highly disapprove of that Theory. The diagrams in my last must have provoked a smile. I must admit that I had thought as well as entertainment in view.

The other day a thought occured to me we are in the house of our Father both in this life and the next but that this life is the first floor, and the first stage of existence in the next, the second floor of the house and so on. We can see Him if we but turn our eyes towards Him just as a child can see its earthly father in its home by turning its eyes towards him, but there is the difference between the physical sight and the spiritual that a child is born with the former in a perfect condition while the latter is susceptible of improvement both in this life and the next. This is His will—we cannot help.

I have given you extracts from Hafiz, I am sorry poor Sadi has been neglected. I send you herewith some passages from his works. They have been copied out for me by my eldest boy, Jogindra Nath Basu. I have nearly exhausted my stock of Persian poetry. As the stock is small I could not comply with your request of publishing a volume of selections from Persian poetry. If I can learn more of the language, I shall try, but the nervous debility is a great drawback.

Yours affectionately,
(Sd.) Ranjnarain Bose.

* [illegible] Letitia [illegible]।
* সম্প্রতি (১৮৯১) এই সকল "সর্মন" "[illegible]" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।
† [illegible]।

EXTRACTS FROM SADI.

(1)

The rain of His mercy extends to every place.

১৫. আমি ঐ পত্রে নিম্নে অঙ্কিত ত্রিভুজ দ্বারা প্রমাণ করি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক আত্মপ্রত্যয় চিরকাল সমান থাকে কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরপ্রেম যেমন বাড়িতে থাকে তেমনি শান্তি ও আনন্দ বাড়িতে থাকে।

কোণ 'ক' ঈশ্বরের শ্রদ্ধা 'ক' 'খ' ঈশ্বরজ্ঞান 'ক' 'গ' ঈশ্বরপ্রেম।
ক্রমবর্ধমান ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নিত্য আনন্দের পরিচায়ক।

বিভিন্ন ভূমি শান্তির পরিচায়ক।

(2)

When every act of inspiration and respiration shows His mercy, who is there that can ever release himself from the obligation of constantly praising Him?

(3)

Man, His servant, committeth sin; He is ashamed.

(4)

Cloud, wind, moon,, sun and sky are constantly engaged so that you may bring a bread into your hand. All are employed for thee; it is not just that thou shouldst not labour.

(5)

O thou bird of the morning*! Ask what is love from the moth. It burns itself to death but not a groan issues from its lips. These pretenders to the love of God have not received His news in His search. Of him to whom His news has come, news are not received. [That is, he sacrifices his life for His love.]

(6)

O Thou beyond conception, imagination, inference and comprehension! The festal assembly of life is drawing to a close, but still I am at the *beginning* of Thy praise.

* The nightingale, the lover of the rose. This bird is a mere babbler of love compared with the moth.

(7)

Sadi, being asked whether the world is real or a delusion, replied: 'I asked the glow-worm why dost thou not shine in the day?" It eplied: "Because of the superior lustre of the sun." This means hat the world appears real as long as God does not appear to the oul. When He does so, the world's petty light is lost in His.

This was a favourite passage of Rajah Rammohan Roy.

(8)

He, who has not made thee rich, knows thy happiness better than hyself.

(9)

I am vexed with the company of friends. They see my defects is merits, they see my thorn as roses and jessamine. I long for the juick-eyed sharp enemy who can point out my defects to myself.

(10)

Eating is for the purpose of living and glorifying God but thou hinkest that living is for the purpose of eating.

(11)

It is better to lick the wall than dip the fingers in the *pilau* of a rich man.

কলিকাতা। মে, ১৮৭২

প্রিয় মিস্ শার্প,

আমার গত মাসের ১৬ তারিখের চিঠি এবং আপনার ও আনন্দময়ীর নিকট আমার পত্নীর উপহারগুলির মোড়ক পাঠাইবার পর, আপনার সুন্দর ও মূল্যবান উপহার মিঃ মার্টিন্যুর 'খ্রীষ্টান জীবনের সাধনা' নামক গ্রন্থখানি পাই। বইখানি এখনও শেষ হয় নাই। তবে যেটুকু পড়িয়াছি তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। কতক অংশ পড়িয়া একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছি। এই অংশগুলি শ্রেষ্ঠ কাব্য ও অনতিক্রম্য যুক্তির সমন্বয়। উপহারটি সত্যই মূল্যবান। আমি আপনাকে চোখে দেখি নাই ; তবে আমার মনে হয় একখানি অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে এই মূল্যবান উপহারগুলি পাঠাইতেছে এবং এই হাতখানি অনেক সময় কাছের হাতগুলি অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠে। এ-ক্ষেত্রে দূরত্বের সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। "এককালে বিরাট অতিমানবরা ছিলেন"—টেলর, ব্যারো, হুকার, মিল্‌টন, লেটন, ল্যাটিমার কাড্‌ওয়ার্থ এবং ব্যাক্‌স্টারের ন্যায় মনীষীরা। মিঃ মার্টিন্যু সেই শ্রেণীর মানুষ, বর্তমান শ্রেণীর নয় ; কিন্তু তাহা হইলেও সত্যের স্পষ্টতর অনুভূতিতে এবং প্রেমের গভীরতর উপলব্ধিতে তিনি সেই শ্রেণীকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে ধর্মজ্ঞানের ভিত্তি সম্পর্কিত তাঁহার অনবদ্য উপদেশগুলি তিনি প্রকাশিত করিলেন না! আপনার

উল্লিখিত আবেদন যাহা ছয় শত সুধীর স্বাক্ষরে গৌরবান্বিত, আমার সামান্য স্বাক্ষরে যদি তাহার কোন গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আমিও আমার স্বাক্ষর দিব। ভারতের সমাজে দলাদলির কারণগুলি সম্বন্ধে যতই অবহিত হইতেছি ততই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে কেশববাবুর বক্তৃতায় প্রস্তাবিত মহামানব থিয়োরির সহিত ইহার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। দলত্যাগীরা এই থিয়োরির সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার গত পত্রের চিত্রগুলি নিশ্চয়ই কৌতুকের উদ্রেক করিয়াছে। অবশ্য আমি স্বীকার করিতেছি যে ইহা রচনা করিবার সময় চিন্তার খোরাকের দিকে যেরূপ নজর দিয়াছিলাম, আমাদের খোরাকের দিকেও তদ্রূপ দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম।

সেদিন ভাবিতেছিলাম ইহজীবনে এবং পরজীবনে আমরা আমাদের পিতার (ঈশ্বরের) গৃহেই থাকি; কিন্তু ইহজীবন হইল এই গৃহের দ্বিতল এবং পরজীবন হইল ত্রিতল, ইত্যাদি। ইহজীবন এই ত্রিতল অস্তিত্বেরই প্রথম স্তর। যেমন কোন শিশু চোখ তুলিলেই তাহার পার্থিব পিতাকে দেখিতে পায়, তেমনই আমরাও যদি চোখ তুলি তাহা হইলে আমাদের দিব্য পিতাকে দেখিতে পাইব। তবে এই দৃষ্টির পার্থক্য আছে। একটি স্বাভাবিক দৈহিক অন্যটি আধ্যাত্মিক। শিশু যখন জন্মায়। তাহার দৈহিক চক্ষু লইয়াই জন্মায়, সে-চক্ষুর পরিবর্তন ঘটে না; কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক চক্ষুটি ইহজীবনে ও পরজীবনে আরও উন্নত হইবার আশা রাখে। ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা,—ইহার অন্যথা নাই।

আমি আপনাকে হাফিজের কবিতার কতক অংশ দিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাদি বাদ গিয়াছে। আজ সাদির কাব্যের কতক অংশ আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি। আমার হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু এইগুলি নকল করিয়া দিয়াছেন। পার্শিয়ান কবিতা আমার নিকট আর একটিও নাই। সংগ্রহ এত সামান্য যে নির্বাচিত পার্শিয়ান কবিতার কোন সংকলন-প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যদি আরও ভাল করিয়া এই ভাষা শিখিতে পারি তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। কিন্তু স্নায়বিক দুর্বলতা ইহার বিরাট অন্তরায়। ইতি।

সপ্রীতি আপনার

(স্বাঃ) রাজনারায়ণ বসু

সাদির কাব্যের কতক অংশ

(১)

তাঁহার (ঈশ্বরের) কৃপা সর্বত্র বর্ষিত হয়।

(২)

যখন প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাস তাঁহার কৃপার সাক্ষ্য দেয়, তখন কে এমন আছে

যে তাঁহার নিত্য গুণগান করিবার কর্তব্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে?

(৩)

তাঁহার ভৃত্য মানুষ পাপ করে; তিনি লজ্জিত হন।

(৪)

মেঘ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য এবং আকাশ সর্বদাই কর্মে ব্যাপৃত যাহাতে তুমি অন্ন হাতে পাও। তোমার জন্য সকলেই কর্মে নিযুক্ত; তুমি কাজ করিবে না, ইহা ঠিক নয়।

(৫)

ওগো ভোরের পাখি! পতঙ্গকে জিজ্ঞাসা কর প্রেম কি। ইহা পুড়িয়া ছাই হয়, তবু এতটুকু আর্তনাদ করে না। ঈশ্বরপ্রেমেব অধিকারী বলিয়া যাহারা ভণ্ডামি করে তাহারা তাঁহাকে সন্ধান করিবার সময় তাঁহার সংবাদ পায় নাই। যাহার কাছে তাঁহার সংবাদ আসিয়া পৌঁছায়, তাহার সংবাদ আর পাওয়া যায় না। (অর্থাৎ, সে তাঁহার ভালবাসার জন্য জীবন বলি দেয়।)

(৬)

ধ্যান, ধারণা, কল্পনা ও অনুমিতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত হে পরম পুরুষ! জীবনের উৎসব শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু তোমার প্রশংসা আমি আজ সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছি।

(৭)

সাদিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল জগৎ সত্য না মিথ্যা, তিনি বলিলেনঃ "আমি জোনাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি দিবসে আলো দাও না কেন?" জোনাকি বলিলঃ "দিই না কারণ সূর্যের আলো আরও উজ্জ্বল।" ইহার অর্থ এই যে আত্মায় যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তিনি যখন আবির্ভূত হন, তখন জগতের ক্ষীণ আলোক তাঁহার আলোকে বিলীন হইয়া যায়।

এই অংশটি রাজা রামমোহন রায়ের প্রিয় ছিল।

(৮)

যিনি তোমাকে ধনী করেন নাই, তোমার চেয়েও তিনি তোমার সুখ সম্বন্ধে বেশি বুঝেন।

(৯)

বন্ধুদের সঙ্গ আমার ভাল লাগিতেছে না। তাহারা আমার দোষগুলিকে গুণ হিসাবে দেখে, আমার কাঁটাটিকে গোলাপ এবং জুঁই ভাবে। আমি সেই ক্ষিপ্রদৃষ্টি প্রবল শত্রুটির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি যিনি আমাকে আমার দোষগুলি দেখাইয়া দিবেন।

(১০)

বাঁচার জন্য এবং ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিবার জন্যই খাওয়া; কিন্তু তুমি ভাব যে খাওয়ার জন্যই বাঁচা।

(১১)

ধনীর পোলাও-এর মধ্যে আঙুল ডুবানো অপেক্ষা দেয়াল চাটা ভাল।

মিস্ শার্প-এর বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার পত্র হইতে নিম্নে লিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল:—

"শ্রীমতী বসুজায়াকে আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার দিবেন। তাঁহাকে বলিবেন, আমি আশা করি, তিনি আমার নিকট একটি পত্র পাঠাইবেন।"

আমার কলিকাতায় অবস্থিতির সময়ে ১৮৭২ সালে প্রচলিত ধর্ম সকলের বহির্ভূত ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের হিতার্থে সিভিল ম্যারেজ বিল বিধিবদ্ধ হয়। ব্রাহ্মবিবাহ বৈধবিবাহ, তাহার জন্য বিশেষ আইন করিবার আবশ্যক ছিল না। যখন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠীবদল বিবাহ এবং অত্যন্ত আধুনিক শিখসম্প্রদায় কোকাদিগের বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ আইন না হইলেও ব্রাহ্মবিবাহ গ্রাহ্য হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেশববাবু আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ব্রাহ্মবিবাহ একটি সাম্প্রদায়িক প্রথা দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহা আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত। কিন্তু কেশববাবুর সকল কার্যই তিন তাড়াতাড়ি। ব্রাহ্মবিবাহের আইনের আন্দোলনের সময় কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অসবর্ণ বিবাহ কখন বৈধ হইতে পারে না। তাঁহার স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা যখন অসবর্ণ বিবাহ দিয়া থাকেন তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সে কথার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছিল অসবর্ণ বিবাহ যদি হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত নহে তবে নিজ কেশববাবুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? তবে একথা যথার্থ বটে যে বিলোম অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নহে। উপরে বলা হইয়াছে যে কেশববাবুর কার্য তিন তাড়াতাড়ি। কেশববাবু ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা বিষয়ে এ্যাডভোকেট জেনারেল কাউই সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কাউই সাহেব যেমন অবৈধ বলিলেন অমনি ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ করণার্থ চেষ্টা করিতে লাগিয়া গেলেন। কালব্যাজ নাই। ১৮৬৮ সালে গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থা সচিব মোন সাহেব হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্মত্যাগী সকল ব্যক্তির হিত জন্য বর্তমান সিভিল ম্যারেজ বিল-এর ন্যায় একটি সিভিল ম্যারেজ বিল প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এই দোষ ছিল যে যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্য কোন ধর্মে জন্মিয়া সেই ধর্মে অবিশ্বাস করে এবং সেই ব্যক্তি ঐ ধর্ম প্রকাশ্যরূপে পরিত্যাগ না করিয়া ঐ ধর্মের বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ না করে এবং প্রস্তাবিত আইন অনুসারে বিবাহ করে তাহা হইলেও সে বিবাহ বৈধ বলিয়া আদালতে গণ্য

হইবে। ইহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিল। তাহারা এই কথা বলিল যে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা প্রচলিত ধর্ম অমান্য করা কার্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ইহাতে মেন সাহেবের পরবর্তী ব্যবস্থাসচিব স্টিফেন সাহেব প্রস্তাবিত আইনকে ভারতবর্ষস্থ একটি সম্প্রদায় মাত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নাম দিয়া এবং এদিক ওদিক পরিবর্তন করিয়া উক্ত আপত্তি খন্ডনপূর্বক ব্রাহ্ম বিবাহ বিল নামে উহা বিধিবদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে এক অলক্ষিত প্রদেশ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইল। সেই অলক্ষিত প্রদেশ আদি ব্রাহ্মসমাজ। যে দিন আইন বিধিবদ্ধ হইবে তাহার পূর্বদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি ব্রাহ্ম স্টিফেন সাহেবকে তাঁহাদিগের আপত্তি জানাইলেন। তাঁহারা এই কথা বলিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্ম বিভিন্ন নহে এবং আদিসমাজের ব্রাহ্মেরা "আমি ব্রাহ্ম" কপালে এইরূপ টিকিট মারিতে চাহেন না; হিন্দুসমাজে থাকিয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন, অতএব প্রস্তাবিত আইনকে ব্রাহ্ম বিবাহ বিল সংজ্ঞা দিলে তাঁহাদিগের হানি হয়। এই অপ্রত্যাশিত বিপক্ষতাচরণে স্টিফেন সাহেব এক প্রকার হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ কতকগুলি সংশয়বাদী স্টিফেন সাহেবের কাছে এইরূপ আবেদন করিলেন যে ব্রাহ্মদিগের জন্য যদি আইন করা হয় তাহা হইলে সংশয়বাদীরা যদি কোন ধর্মের সঙ্গে সংশ্রব না রাখিয়া বিবাহ করেন তাহা হইলে সেই বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমত আর একটি আইন করা উচিত। এই কথাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্মসকল পরিত্যাগকারী সকল লোকের হিতের নিমিত্ত একটি সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করিবার মানস করিলেন; গভর্নর জেনারেল-এর সিমলা যাইবার সময় উপস্থিত হওয়াতে তাহা বিধিবদ্ধ হইল না। তিনি ও স্টিফেন সাহেব প্রভৃতি কাউন্সিলের মেম্বরগণ সিমলা যাইলে পর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নবগোপাল মিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত স্টিফেন সাহেবকে প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিবার জন্য সিমলায় প্রেরিত হন। সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা। নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের ফাদার অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন অর্থাৎ যুবকদিগের ব্যায়ামচর্চার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত। [ইনি ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলন সময়ে আমাদিগের বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। লোকটি অতিশয় বুদ্ধিমান।] সিমলায় স্টিফেন সাহেবের সহিত সারদাবাবু ও নবগোপালবাবুর সাক্ষাৎ হইবার সময় সাহেব বলিলেন, "তোমাদের প্রচারপ্রণালী আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, প্রচারকার্যে তোমরা ইংরাজের কিছুমাত্র সহায়তা চাও না (ইউ ডু নট ওয়ান্ট দি এইড্ অফ ইংলিশম্যান)। কেশববাবু হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোনরকম সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না। সিমলায় আসিবার কিছু পূর্বে কেশববাবুকে আমি বলিলাম, "তোমরা যদি বল যে হিন্দু নই তাহা হইলে আমার পক্ষে আইন করিবার সুবিধা

হয়; যেহেতু প্রচলিত ধর্মত্যাগকারী সকল লোকের জন্য ধর্মসম্পর্কশূন্য একটি সাধারণ সিভিল বিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ করিতে আমরা মানস করিতেছি।' কেশববাবু উত্তর করিলেন, 'আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত আছি' ইহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম।'' আশ্চর্য হইবার কথাই বটে! যে দিন কেশববাবু বলিলেন ''আমি হিন্দু নই'' সেদিন কি শোচনীয় দিবস! সে দিন দুই ভাই-এর ছাড়াছাড়ি হইল। এক ভাই পৈতৃক নিবাস স্বরূপ হিন্দুসমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। সিমলা হইতে যখন সাহেবরা ফিরিলেন তখন কলিকাতায় ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। উহা ১৮৭২ সালে প্রথমে বিধিবদ্ধ হয়। তখন গভর্নর-জেনারেল লর্ড মেয়ো সাহেবের আণ্ডামান দ্বীপে হত্যার পর মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড নেপিয়ার অফ এট্রিক গভর্নর-জেনারেলের কাজ করিতেছিলেন। যেদিন আইন বিধিবদ্ধ হয় সেদিন আমি দর্শক স্বরূপ কাউন্সিল গৃহে উপস্থিত ছিলাম। গৃহটি অতি গম্ভীরভাববিশিষ্ট; প্রাচীরে লম্বমান পূর্বতন গভর্নর-জেনারেলদিগের চিত্র ঐ গম্ভীরতা বর্ধন করিয়াছিল। গলদেশে লম্বমান ও বক্ষদেশে স্থাপিত শোভন উপাধি চিহ্নধারী মেম্বারগণ যখন একের পর এক ঢুকিতে লাগিলেন তখন দেখিতে বড় সুন্দর হইয়াছিল। সকল মেম্বর অপেক্ষা প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ার অফ ম্যাগডালার উপাধিচিহ্ন অধিক, তিনি দেখিতেও অতি সুশ্রী। স্টিফেন সাহেব প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে পর অন্যান্য মেম্বরগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এই সমস্ত সময়ে একজন দীর্ঘগুম্ফধারী মেম্বরকে নাসিকার শব্দযুক্ত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত দেখিলাম। তিনি স্যার রিচার্ড টেম্পল। দেখিলাম অর্থসচিব চ্যাপমান সাহেব স্টিফেন সাহেবের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি নিজ বক্তৃতাতে স্টিফেন সাহেবের প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষ ও শ্লেষ করিলেন। স্টিফেন গভর্নর-জেনারেলের নিকট চ্যাপমান সাহেবের অভদ্র ইঙ্গিত সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম কাউন্সিল গৃহেও বিলক্ষণ বালকতা চলে। চ্যাপমান সাহেবের কটাক্ষের কোন খবর না লওয়াই স্টিফেন সাহেবের উচিত ছিল। চ্যাপমান সাহেব দেখিতে 'হায়েনা ব্যাঘ্রের' ন্যায় ছিপ্‌ছিপে ও বড়ই চালাক। স্টিফেন সাহেব একটু ভোঁদা। মেম্বর সকল বসিয়া বক্তৃতা করিলেন ইহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে প্রত্যেকে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবেন।

নূতন আইন সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় ছাপাইয়া কেশববাবুর ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে বিতরণ করা হইয়াছিল। কেশববাবুর অনুবর্তীরা সন্তোষের সহিত উক্ত বিতরণ কার্য সমাধা হইতে দেন নাই। উহা ব্রাহ্মদিগের প্রতি একটি উদ্দীপনা-পত্রীর আকারে লিখিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেল:

An Appeal

To The Brahmos of India.

Dear Brethren,

I took up my pen once when you were going to plunge yourselves into the errors of Avatarism. I now take it up again on the present momentous occasion when the merits of the Brahmo Marriage Bill are undergoing public discussion. The Bill in question imposes a new form of marriage in the presence of the Registrar which bears on its face an implication that that form is indispensably necessary for the validity of Brahmo marriage whether they had been previously solemnized according to Brahmic rites or not. It is therefore plain that the Bill considers the solemnization of Brahmo marriages according to Brahmic rites a non-essential point. What ! Are Brahmic nuptial rites nothing, and form of marriage imposed by the Legislature everything ? Is not this a plain insult to our religion ? I do not condemn the Legislature for this but those who applied for the law. What could the Legislature do when they were implored to make such law ? How could the applicants for the law, being religious men, act in this way I am at a loss to conceive. Had the bill ordained the simple registration of marriages previously solemnized according to Brahmic rites only, it would have been a different thing, but when the Legislature is going to impose a civil form of marriage contrary to the spirit of the Brahmic form, how can you, I ask, being true Brahmos, submit to the same ? You must have lost every sense of respect towards our holy religion, if you can do so. You deceive yourselves with the thought that the civil form is a mere superaddition to the religious. How can this be, when the religious rites are non-essential, and the civil form the essential thing in the matter ! Moreover, how can a Brahmo say before the Registrar that he *takes* a woman as his wedded wife, when he *has already done so (or will do so)* in the solemn presence of God and the ministers of religion ! Will not this be a plain lie ?

*　　*　　*

There is another point to be taken into consideration in connection with the Bill and that is the most important one. For the first time in the history of India, the Government is going to interfere with the religion of a class of Her Majesty's Indian subjects, by rendering a civil ceremony essential for the validity of a religious one. Who is to be blamed for this ? Not Government, but we ourselves who are going to surrender our religious rights into its hands of our own accord. The former Mahomedan Government as well as the present English Government have all along allowed Mahomedans or Hindoos

differing from the orthodox faith to determine their own rites, manners and customs, and never questioned the legal validity of those rites and customs. The Sikhs, the Nanak-panthees, the Kubeer-panthees, the Sadhs, the Chaitanya Vaishnavas, the Ferazees, the newly sprung up Kokas of the Punjab as well as numerous other bodies of heterodox Hindoos or Mahomedans have all along enjoyed this privilege, as a spiritual patrimonial right handed down from generation to generation. Why should we only, Brahmos, be deprived of it? Never before this time did the Government interfere with this privilege. In the case of the abolition of the Sutee rite, the Government did not act contrary to the dictates of the Shastras which were plainly proved by the illustrious founder of our religion, the Raja Ram Mohan Roy, as not sanctioning that rite. In that of the Widow Marriage Act, the Government simply enforced the ordinance of the Rishi Parasara. In these two cases, Government did not interfere with the religion of any class of Her Majesty's Indian subjects. Now for the first time it is going to take away from us the right which all heterodox Hindoos and Mahomedans have all along enjoyed. If Government take away this privilege from our hands, we shall be obliged at every step in future to solicit government-interference in our religious and social concerns. Just consider the calamitous consequences that will flow from the same. Better that our sons be deprived of their patrimonial inheritance than part with our religious independence. Never before in the history of India did any such instance occur of a body of religious men surrendering their religious rights into the hands of the Government of their own accord in the way we are doing. Ever in its pages will this stain remian over our memory. How can we professing a religion higher and nobler than all others commit such an ignoble act? Have we got less religious spirit than the followers of other religions? If so, we should not vaunt any more of our religion being the highest of all. Many in India suffered martyrdom before for the sake of religious independence. Are we Brahmos so base as to part with it of our own will? You will gradually lose all spirit and energy if you conduct yourselves in this way from this time, and I assure you that no nation—no religious denomination in the world—will look upon you in future with any feeling of respect. Awake, therefore, Brahmo brethren of India! to the danger of your present position. Arise to assert your religious independence or leave the Brahmo name at once.

"Will do so" [illegible]

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মগণের প্রতি আবেদন

প্রিয় ভ্রাতৃগণ!

আমি একবার লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম যখন আপনারা অবতারবাদের ভ্রান্তিতে নিজেদের নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আজ আবার এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি লেখনী ধারণ করিতেছি যখন ব্রাহ্মবিবাহ আইনটি লইয়া জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। আলোচ্য আইনটি এক নূতন ধরনের বিবাহ আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছে, যে বিবাহ সম্পন্ন হইবে রেজিস্ট্রারের সম্মুখে। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্ম ধর্মপ্রথা অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়া থাকুক আর না-ই হইয়া থাকুক, ইহার বৈধতার জন্য নূতন আইনটি অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্ম ধর্মসম্মত হইল কি না, তাহা লইয়া এই আইনটির এতটুকুও মাথাব্যথা নাই। তবে কি বুঝিব যে ব্রাহ্ম বৈবাহিক প্রথাগুলির কোনই মূল্য নাই, আর যত মূল্য আছে এই নূতন বিবাহরীতির যাহা আইনসভা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছে? ইহা কি আমাদের ধর্মের অপমান নয়? আমি ইহার জন্য আইনসভাকে দোষ দিতেছি না, দোষ দিতেছি তাঁহাদিগকে যাঁহারা এই আইনের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি এমন আইনের জন্য আইনসভাকে পীড়াপীড়ি করেন, আইনসভাই করিবেনই বা কি? যাঁহারা এই আইন লইয়া মাতামাতি করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধার্মিক ব্যক্তি। আমি ভাবিয়া পাইতেছি না এই সকল ধার্মিক ব্যক্তি কি করিয়া এমন কার্য করিলেন! এই আইনটি যদি ব্রাহ্মসম্মত বিবাহের কেবল রেজিস্ট্রেশন হইত, তাহা হইলে ব্যাপার অন্য রকম হইত; কিন্তু যখন আইনসভা ব্রাহ্মবিবাহ-বিরোধী সিভিল বিবাহ চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, প্রকৃত ব্রাহ্ম হইয়া আপনারা এই বিধান কেমন করিয়া নীরবে সহ্য করিবেন? আমার মনে হইতেছে, আমাদের পবিত্র ধর্মের প্রতি আপনাদের যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা আপনারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আপনারা এই বলিয়া নিজেদের সান্ত্বনা দিতেছেন যে সিভিল বিবাহ ধর্মবিবাহের উপর আর একটি সংযোজন মাত্র। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব যখন ধর্মানুষ্ঠানগুলির কোন মূল্য দেওয়া হইতেছে না, অথচ সিভিল রীতিটিকে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হইতেছে? উপরন্তু, কেমন করিয়া একজন ব্রাহ্ম রেজিস্ট্রারের সম্মুখে বলিবেন যে একজন নারীকে তিনি তাঁহার বিবাহিত পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, যখন তিনি ইতোমধ্যেই ঈশ্বর ও ধর্মযাজকদের সম্মুখে রাখিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন (কিংবা করিবেন)? ইহা কি নিছক মিথ্যা হইবে না?

* * *

এই আইনটি সম্পর্কে আরও একটি বিষয় বিবেচ্য এবং এই বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল ধর্মানুষ্ঠানের বৈধতার জন্য

সিভিল অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করিয়া সরকার মহারানীর ভারতীয় প্রজাবৃন্দের কোন সম্প্রদায়ের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? সরকার নন, আমরা। আমরাই তো স্বেচ্ছায় আমাদের ধর্মাধিকারগুলিকে সরকারের হস্তে তুলিয়া দিতেছি। প্রাক্তন মুসলমান সরকার কিংবা বর্তমান ইংরাজ সরকার কোনদিনই হিন্দু কিংবা মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেন নাই; হিন্দু কিংবা মুসলমানের ধর্মানুষ্ঠান, প্রথা এবং আচারগুলি যাহাতে সেই সেই ধর্মবিশ্বাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে সরকার তাহাতে অনুমতি দিয়া আসিয়াছেন। উপরি-উক্ত সরকার দুইটির কোনটিই ঐ ধর্মানুষ্ঠান এবং প্রথাগুলি সম্পর্কে কোনদিন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। শিখ, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, সাধ, চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব, ফেরাজী, পাঞ্জাবের নবোদ্ভূত কোকা সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরিয়া পৈত্রিক উত্তরাধিকারসূত্রে এই সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তাহা হইলে আমরা ব্রাহ্মরাই বা কেন এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব? ইহার পূর্বে সরকার আর কখনও এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সতী প্রথার উচ্ছেদের কথাই ধরা যাউক। সরকার এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রের অনুশাসনের বিরুদ্ধে যান নাই। আমাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায় দেখাইয়া দিয়াছেন যে শাস্ত্রে সতী প্রথার অনুমোদন নাই। বিধবা বিবাহ আইনের ক্ষেত্রে সরকার আসলে ঋষি পরাশরের নির্দেশই মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং দেখিতেছি যে এই দুইটি ব্যাপারে সরকার মহারানীর ভারতীয় প্রজাবৃন্দের কোন সম্প্রদায়ের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সরকার আজ সর্বপ্রথম আমাদিগকে এমন একটি অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে যাইতেছেন যাহা সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু এবং মুসলমান চিরদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। একবার যদি সরকার আমাদের হস্ত হইতে এই অধিকার ছিনাইয়া লন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি ধর্মসম্বন্ধীয় কি সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই আমরা সরকারের হস্তক্ষেপ ভিন্ন কোন কাজই করিতে পারিব না। ইহার ফল যে কি বিপজ্জনক হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। আমাদের পুত্রগণ যদি পৈত্রিক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় তাহাও শ্রেয়, কিন্তু তাহারা যেন ধর্মস্বাতন্ত্র্য হইতে বঞ্চিত না হয়! ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ নাই যখন ধার্মিক ব্যক্তিগণের কোন সংস্থা তাঁহাদের ধর্মাধিকারগুলিকে আমাদের ন্যায় সরকারের হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। ইহা চিরদিন আমাদের স্মৃতিকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। আমরা বলি যে আমাদের ধর্ম অপরাপর সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম। তবে আমরা কিরূপে এমন জঘন্য কর্ম করিতে সমর্থ হইলাম? তবে কি আমাদের আত্মিক ধর্মশক্তি অন্যান্যদের অপেক্ষা অল্প? তাহাই যদি হয় তবে আমরা যেন আর গর্ব না করি যে আমাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ভারতের অনেকেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। আমরা ব্রাহ্মরা কি এতদূর অবনত

হইয়াছি যে স্বেচ্ছায় তাহা বিসর্জন দিব? এমন হইতেই আপনারা যদি এইভাবে চলেন তাহা হইলে আপনাদের সাহস বীর্য—সমস্ত কিছুই ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইবে; এবং আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, পৃথিবীর কোন জাতি, কোন ধর্ম ভবিষ্যতে আপনাদের দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে চাহিবে না। সুতরাং হে ভারতীয় ব্রাহ্মগণ! জাগিয়া উঠুন। আপনারা বিপন্ন। হয় আপনারা আপনাদের ধর্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করুন আর নয় তো এই মুহূর্তে ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করুন।

উপরোক্ত উদ্দীপনা-পত্রীতে আমি লিখিয়াছি যে ধর্ম বিষয়ে একবার গভর্নমেন্টের হাতে যাইলে পুনঃ পুনঃ যাইতে হয়। আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইয়াছে। কিছুদিন হইল সাধারণ ব্রাহ্মেরা সিভিল বিবাহ আইনের দোষ সংশোধন জন্য গভর্নমেন্টে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট তাঁহাদিগের আবেদনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেন নাই এবং দিবার সম্ভাবনাও নাই। সিভিল বিবাহ আইনের প্রতি আমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রহ্মের সম্মুখে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মের সম্মুখে যে বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সন্তান সুজাত বলিয়া গণ্য হইবে না, যে পর্যন্ত না এমন এক ব্যক্তি, যাহার ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই অর্থাৎ রেজিস্ট্রার, বলেন ঐ বিবাহ বৈধ। ধার্মিক ব্যক্তিরা এই বিবাহ পদ্ধতির কি প্রকারে অনুমোদন করেন তাহা বুঝিতে পারি না।

১৮৭১ সালের শেষে আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। আমি আমার ইংরাজীতে লিখিত চতুর্দশপদী কবিতাতে এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি বোধ হয় বিলাতে অবস্থিতি নিবন্ধন দেশীয় ভাব হারাইবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিলাত হইতে তিনি সম্পূর্ণ ইংরাজ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি একজন নিষ্ঠাবান উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, বিলাত হইতে আসিবার পর তাঁহার বিপর্যয় দেখিলাম। দেখিলাম সংশয়বাদিতা তাঁহার মনে কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ধর্মতত্ত্বদীপিকা তাঁহাকে আমি উৎসর্গ করি, সে উৎসর্গপত্রে এমত আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি ডাক্তার স্বরূপে যেরূপ লোকের শারীরিক রোগ দূর করিবেন সেইরূপ ধর্মোপদেশ দ্বারা লোকের আধ্যাত্মিক রোগ নিবারণ করিবেন। আমার আশা বিফল হওয়াতে আমি মর্মাহত আছি। যাহা হউক ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি যেখানে থাকেন যেন সুখেই থাকেন। তাঁহার অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তিনি যারপরনাই ভদ্র, অমায়িক ও পরোপকারী। বিলাতে অবস্থিতি জন্য এই সকল গুণ তিনি হারান নাই। তাঁহার মন অতিশয় মধুর। সেই মাধুর্য তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমি যখন কানপুরে ছিলাম তথাকার ইংরাজী পল্টনের পাদরী রেভারেন্ড মিন্স সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, ''তাঁহার ন্যায় এমন মাধুর্যমণ্ডিত মুখ আমি আর একটিও দেখি নাই।'' সেই পাদরী সাহেব আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করি নাই। ভদ্রতাপূর্বক তাহা রক্ষা করিতে

অস্বীকার পাই। পূর্বে যাহা হউক, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজের সঙ্গে নানা কারণবশতঃ আহার করি না; কেবল ফল ও চা খাইয়া থাকি।

এক্ষণে (ইংরাজী আগস্ট, ১৮৮৯) সিভিলিয়ান বীম্স সাহেবের নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি দেনা করার জন্য গভর্নমেন্ট হইতে কিছুদিনের জন্য পদাবনতি শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি বাঙ্গালী-বিদ্বেষী সাহেব বলিয়া বিখ্যাত! বীম্স সাহেবের যেমন দোষ আছে তেমনি কতকগুলি গুণও আছে। ইনি একজন নিপুণ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানী। ইনি ১৮১৭ সালে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনার্থ ফরাসীস্ দেশের ফরাসী একাডেমি ন্যায় একটি একাডেমির সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই একাডেমির সভ্যেরা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ প্রয়োগের শুদ্ধতা বিষয়ে যাহা অবধারণ করিবেন তাহা আমাদিগের সকলকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদপত্রে ও ছাপান পরিপত্রে এই প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। আমি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে জাতীয় সভায় (ন্যাশনাল সোসাইটিতে) বক্তৃতা করি, সেই বক্তৃতার সারমর্ম 'ন্যাশনাল পেপার'-এ প্রকাশিত হয়। তাহা দেখিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন "ইট ইজ এ সেটলার" অর্থাৎ বীম্স সাহেব ইহার কোন উত্তর দিতে পারিবেন না। যদিও বীম্স সাহেব বলিয়াছিলেন "আমি মহাশয়ের সকল যুক্তি খণ্ডিত করিব", কিন্তু তাহার পরে তাহা আর করিলেন না অথবা পারিলেন না। ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিকেরা ভাষাকে প্রথমে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি অট্টহাস্য করিয়া আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা স্বেচ্ছাচারবিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় চিরকাল থাকে আমার এমত মত নহে। একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহাকে নিয়মিত করা কর্তব্য।

—শকে ইংরাজী—সালে আমি ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা সংস্থাপন করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজ কেবলমাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসী এস উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও। রামমোহন রায়ের ট্রাস্ট ডীড অনুসারে উহা কোন দস্তুর মোতাবেক সভায় পরিণত হইতে পারে না। মন্দির রক্ষা জন্য ট্রাস্টিগণ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের অধীনে মন্দিরের কার্য সুনির্বাহ হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লোকসভার কার্য নির্বাহ জন্য দাতব্য দিতেন। সভা একজন প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি দক্ষিণ বারাসত নিবাসী। ইনি দিনকতক খুব উৎসাহের সহিত দেশীয়ভাব রক্ষাপূর্বক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পর নানা কারণ বশতঃ আর অধিক দিন সভা টেকিল না। সেই সকল কারণের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔদাসীন্য একটি কারণ। কেশববাবু আদি সমাজের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা অবধি তিনি কেমন একরকম ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদা আমাদিগকে বলিতেন আমাদিগের এক্ষণে দুইমাত্র কার্য—আদি ব্রাহ্মসমাজ

গৃহে প্রতি বুধবার নিয়মিত উপাসনা করা এবং প্রতি মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা।

১৮৭২ সালের শেষে মিস্ শার্প মহাশয়া মিস্ এ্যাক্রয়েড-এর দ্বারা আমার সহধর্মিণীর জন্য কোন উপহার দ্রব্য পাঠান। যে দিন মিস্ এ্যাক্রয়েড কলিকাতায় পৌঁছেন তাহার পর দিন কোন প্রয়োজন উপলক্ষ্যে বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। কথোপকথনের পর তিনি বলিলেন "আপনি মিস্ এ্যাক্রয়েড-এর সঙ্গে দেখা করিবেন? তিনি আপনার পরিবারের জন্য মিস্ শার্প প্রেরিত উপহার আনিয়াছেন।" আমি বলিলাম "আহ্লাদপূর্বক দেখা করিব।" তৎপরে তিনি আমাকে দোতলায় লইয়া গিয়া মিস্ এ্যাক্রয়েড-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। পরিচয় করিয়া দিয়া তিনি বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। মিস্ এ্যাক্রয়েড-এর সঙ্গে আমাদিগের সামাজিক অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি বলিলাম "যদি আমরা ইংলন্ড জয় করিয়া তথাকার লোক দ্বারা আমাদিগের রীতি-নীতি অনুকরণ কার্যে যদি আমরা উৎসাহ প্রদান করিতাম তাহা হইলে আপনারা কি পছন্দ করিতেন?" তিনি বলিলেন "না"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন সাহেব যদি ধুতি পরিয়া লন্ডনের রাস্তায় বেড়ান তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে কি করেন?" মিস্ এ্যাক্রয়েড তাহাতে উত্তর করিলেন "উই ইনস্টেন্টলি ক্ল্যাপ হিম টু বেডল্যাম" অর্থাৎ "আমরা তাহাকে পাগলা গারদে দিই।" তাহাতে আমি বলিলাম "আপনারা যেমন ঐ কার্য ঘৃণা করেন, আমরাও সেইরূপ বিলাতফেরৎ বাঙ্গালী দ্বারা ইংরাজ পরিচ্ছদ ব্যবহার সেইরূপ ঘৃণা করি।" স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়ে কথা হওয়াতে আমি বলিলাম "বিনা সুশিক্ষায় স্ত্রী-স্বাধীনতা অনিষ্টকর।" তিনি বলিলেন "ঠিক বলিয়াছেন, বিনা শিক্ষায় স্ত্রী-স্বাধীনতা অত্যন্ত অনিষ্টকর।" তিনি এইরূপ আমার সকল কথা মানিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ভিতর ভিতর রাগিতেছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বলিলাম "আপনি ইংরাজী আদব-কায়দাগুলিকে শ্রেষ্ঠ ভাবেন।" এই কথা বলাতেই তিনি টেবিল চাপড়াইতে লাগিলেন, গৃহের মেজেতে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাঁহার চক্ষু হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল আমাকে বা প্রহার করেন। আমি কম্পিত কলেবর হইয়া বলিলাম "ক্ষমা করিবেন মহাশয়া, আমি খারাপ ভাবিয়া কিছু বলি নাই।" এমন সময়ে মনোমোহনবাবু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দুজনে মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখেন দাঙ্গা উপস্থিত। আমি তৎপরে বিদায় লইলাম। বিদায় লইবার সময়ে মিস্ এ্যাক্রয়েড আমাকে একটি নমস্কার করিলেন, কিন্তু যখন প্রথম দেখা হয় তখন শেকহ্যান্ড করিয়াছিলেন। নমস্কার করিবার অর্থ এই যে "যখন আপনি জাতীয় ভাব এত ভালবাসেন তখন আপনাদিগের জাতীয় প্রথানুসারে আপনাকে নমস্কার করা উচিত।" আমি হারিবার পাত্র নহি, আমি

মনোমোহনবাবুকে বলিয়া আসিলাম "ম্যাম্ সাহেবকে বলিবেন যে তাঁহার নমস্কারটি অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল।" মিস্ এ্যাক্রয়েড কোপনস্বভাবা স্ত্রীলোক। কেশববাবু একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাহাতে তর্ক উপস্থিত হইয়া দুইজনে রাগারাগী হয়। কেশববাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময় সিঁড়িতে নামিতেছিলেন এমন সময়ে মিস্ এ্যাক্রয়েড সিঁড়ি পর্যন্ত আসিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত আর একবার ঝগড়া করিয়া গেলেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর মিস্ এ্যাক্রয়েড কলিকাতায় বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয় কি প্রকারে চালান কর্তব্য সে বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি অন্যান্য পরামর্শের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত পড়াইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহার পর ম্যাম সাহেব আমি এত জাতীয়ভাবানুরাগী হইয়া পত্র লিখিবার সময় বাঙ্গালা কাগজ ব্যবহার না করিয়া ইংরাজী কাগজ ব্যবহার করি কেন এরূপ খুঁটিনাটি ধরাতে আমি একেবারে পত্র লেখা বন্ধ করিলাম। তৎপরে একদিন মিস্ এ্যাক্রয়েড আমার বাটীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মিস্ এ্যাক্রয়েড এক্ষণে (১৮৮৯) আলিপুরের জজ বেভারিজ সাহেবের স্ত্রী। তিনি এক্ষণে বধির হইয়াছেন শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

কুচবিহার বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে আত্মবিরোধ উপস্থিত হয় তাহার সূত্রপাত তাহার ৫/৬ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। ১৮৭২ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষম পক্ষ কতকগুলি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে পর্দার ভিতরে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন সেই পর্দার বাহিরে আপনাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে বসাইবার অধিকার জন্য সমাজমন্দিরের অধ্যক্ষদিগের নিকট আবেদন করেন; কিন্তু অধ্যক্ষেরা সম্মত না হওয়াতে উক্ত সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। এই দলের নেতা ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরি, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি ছিলেন এবং ইঁহাদিগের সহিত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীও যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শমতে আমি দিনকতক এই নূতন সমাজের আচার্যের কার্য করি। দেবেন্দ্রবাবু ও আমি, আমাদিগের মধ্যে এই কথা স্থির হইল যে আদি ব্রাহ্মসমাজে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে রক্ষণশীল, তথাপি যে আমাদিগকে উপাসনা করিতে ডাকিবে আমরা অবশ্য যাইব, তাহাতে আমাদের আপত্তি করা উচিত হয় না। নূতন সমাজে আমার অব্যবহিত সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকৃতির আকারে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন, তাহার পেছনে পুরুষেরা বসিতেন। বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে প্রতি রবিবারে ঐ সমাজ হইত। স্ত্রীলোকেরা সমস্বরে গান করিতেন। বরিশালের নিকটস্থ লাখুটিয়ার জমিদারবাবু রাখালচন্দ্র রায়ের প্রথম সহধর্মিণী প্রধান গায়িকা ছিলেন। তিনি ধর্মপরায়ণা ছিলেন। এই সমাজ ৬/৭ মাসের পর উঠিয়া গেল। রাখালবাবুর বর্তমান (১৮৮৯) সহধর্মিণীর শুনিতে পাই

বাক্‌পটুতা ও ধর্মপ্রচারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরির প্রথমা কন্যা কুমারী সৌদামিনী উপরিবর্ণিত সমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁহার পিতা সমাজসংস্কার বিষয়ে এত অগ্রসর হইলেও ধর্মসংস্কার বিষয়ে তত অগ্রসর ছিলেন না। তিনি সৌদামিনীর বিবাহ প্রচলিত হিন্দুমতে দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাবু ও আমি, দুইজনে স্থির হইল যে বিবাহ ক্রিয়া সকলই প্রচলিত হিন্দুমতে হউক, কেবল শালগ্রামশিলা না আনিলেই আমরা বিবাহে উপস্থিত থাকিব। খাস্তগিরি মহাশয় বলিলেন যে শালগ্রামশিলা আনা হইবে না। প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান বিলাতফেরৎ বিহারীলাল গুপ্তের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে বিষম জনতা হইয়াছিল লোকে লোকারণ্য। এই জনতার কারণ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম খাস্তগিরি প্রচলিত হিন্দুমতে বিবাহ দিতেছেন ও প্রসিদ্ধ বিলাতফেরৎ বিহারীলাল গুপ্ত সেইমতে বিবাহ করিতেছেন, এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সকল লোকে সমুৎসুক হইয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সকল প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকও উপস্থিত ছিলেন। এই জন্য খাস্তগিরির বিপক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখ স্বরূপ 'মিরার' শ্লেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ঐদিন বিবাহের বাটী 'হল্ অব অল্ নেশন্‌স্' হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেল-এর ঐ নাম। দিনকতক এমন হইল যে প্রায় প্রত্যহ মিরার খুলিলেই খাস্তগিরি ও আমার এই দুইজনের গালাগালি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমাকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা জন্য গালাগালি দিত। বাটীর যে ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, সেই ঘরে কতকগুলি বাছা বাছা লোককে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দেবেন্দ্রবাবু ও আমি ছিলাম। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লোক ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন।

ইং ১৮৭৩ সালে (১৭৯৪ শকে মাঘ মাসে) শ্রীমৎ প্রধান আচার্য প্রাচীন উপনয়ন পদ্ধতি যতদূর ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত করা যায় তাহা করিলেন। পূর্বে যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশিত হয় তাহাতে উপনয়ন বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্রাহ্ম উপদেষ্টার নিকটে কোন বালককে আনিয়া তাঁহার উপর তাহার ধর্ম শিক্ষার ভার অর্পণ করা। কিন্তু নূতন প্রবর্তিত উপনয়ন পদ্ধতিতে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্বক উপবীত গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। যদি অন্য দেশের অভিজাত ব্যক্তিরা সম্মুখের পা তোলা সিংহের প্রতিকৃতি ব্যবহার আভিজাত্যের চিহ্ন স্বরূপ জ্ঞান করেন, তবে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব ব্রাহ্মেরা প্রাচীন ঋষিদিগের সন্তান বলিয়া পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া উপবীত আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি কোন হানি দেখি না। জাতিবিভেদ প্রথা কোন না কোন আকারে সকল জাতীয় মনুষ্য সমাজে থাকিবেই থাকিবে, যদি আমাদিগের দেশের মতন জাতিবিভেদ প্রথা না থাকে তথাপি ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ করা প্রথা থাকিবে। সেও এক প্রকার জাতিবিভেদ

প্রথা। আমরা কেবল এইমাত্র দেখিব যে পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব না থাকে, যেহেতু অপরিমিত দেবতার পরিবর্তে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মের পক্ষে নিষিদ্ধ। নূতন প্রবর্তিত প্রথানুসারে দেবেন্দ্রবাবু সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ দুই পুত্রের উপনয়ন দেন। পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যেদিন উপনয়ন ক্রিয়া হয় তাহার দুই তিন দিন পূর্বে আমি নিবাঁধই দত্তপুকুরে আমার দ্বিতীয় জামাতা দীননাথ দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। যেদিন উপনয়ন হয় সেইদিন যে দালানে ক্রিয়া হইতেছিল আমি নিবাঁধইয়ের ফেরতা একেবারে সেই দালানে গিয়া বসি। আমি জানিতাম না যে শূদ্রে তথায় বসিতে পারিবে না এমন নিয়ম হইয়াছে। এরূপ নিয়ম হইয়াছে জানিলে আমি তথায় বসিতাম না। যেহেতু সমাজনায়কেরা ভালরূপ বিবেচনা করিয়া যে নিয়ম অবধারিত করেন তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা আমার স্বভাব নহে, তাহা পালন করা কর্তব্য মনে করি। প্রথমে আমি নূতন উপনয়ন প্রথার বিপক্ষ ছিলাম, কিন্তু এরূপ উপনয়ন ব্যতীত আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতি সর্বায়ব সম্পন্ন হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম।

পূর্বে একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'ফ্রেন্ড, অফ্ ইন্ডিয়া' সম্পাদক রুটলেজ সাহেব নিজে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও আমার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম বিবাহ আইন আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি বিলাত গমন করেন। তিনি ভারতবাসীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া 'ফেন্ড্ অফ্ ইন্ডিয়া' কাগজে লেখাতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য উত্তরপাড়ার জমিদারবাবুরা উত্তরপাড়ায় এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন, তাহাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত লোক উপস্থিত ছিলেন। আমরা আদি সমাজ হইতে কতকগুলি লোকে এই সভায় উপস্থিত থাকি। আমি সকলের পেছনে বসিয়াছিলাম, তাহাতে জমিদারবাবুদিগের একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন, ''আপনি আমাদের জাতীয়-ধর্মের সমর্থক, আপনার পেছনে বসা উচিত হয় না, চলুন আপনাকে সম্মুখে লইয়া বসাই।'' এই বলিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি যেখানে বসিয়াছিলেন সেখানে লইয়া গিয়া তিনি আমাকে বসাইলেন। রুটলেজ সাহেব বিলাতে গিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আমার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তাঁহার প্রণীত 'ইংলিশ রুল অ্যান্ড নেটিভ ওপিনিয়ন ইন ইন্ডিয়া' বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'In September 1852 the walls of Calcutta were placarded with an advertisement of a lecture to be given by the minister of the elder body of the Brahmists (termed the 'Adi Samaj'—Adi Church) on the superiority of Hinduism to all other religions. Reference has been

made in an earlier chapter to one essential and vital difference between the two Brahmist Churches both professing to follow the great first Brahmist, Rajah Ram Mohan Roy. The younger body, the body of Keshub Chandra Sen, may be said to be very nearly akin to the Unitarian Christiantity. The elder believe that Hinduism, although overgrown with excrescences, has for its germ and origin the worship and unity of the One True God and that a return to the teaching of the Vedas would be a return to a pure though a poetical deism. I had at this time been in India about two years and had sent home what I must term strictly and rigorously accurate, though not unquestioned, pictures of what may be seen at the festival of Durgah and Jagannath and I had also in those two years formed an impression that Englishmen do not rightly comprehend the faiths, or the men influenced by the faiths of India. The advertisement, however, was a startling one. Did the minister of the Adi Samaj (a scholar and a gentleman I afterwards found) actually mean to assert in the face of the missionaries and educated English of Calcutta, that Hinduism is superior to Christianity ? I found he did; and before the controversy which this lecture caused had ended, I had come to the conclusion that the Hindus, may, in God's good providence, and without an absolute adherence to Christian channels of faith and form, find their way backward to the key of all truth, the oneness of the most High God. I did not think, and do not now think, of defending Hinduism. I did, and do, desire to show somewhat of the character of any Hindu scholars and thinkers who still claim to be actuated and guided by Hinduism.

Since that time I have endeavoured in different ways to draw attention to the literature of these two Brahmist bodies—a literature so marvellously devotional and so imbued with a spirit of love to God and man, that one might seek far for a parallel to it, save in the most devotional works of the old Catholic divines. I find such passages as these: "Is not progress to be perceived in the sacred writings of the Christians also ? Was it not a great transition from the Elohim of Moses to the God of the New Testament ? A change passes over the Jewish religion from fear to love, from power to wisdom, from the justice of God to the mercy of God, from the nation to the individual, from this world to another, from the visitation of the sins of the father upon the children to every soul shall bear its own iniquity; from the fire, the earthquakes and the storms to the 'stil small voice'....Let us be pure and holy in our lives. Let us make sacrifices for our religion. Lord God, our Father, our Saviour,

our Redeemer! To Thee we look up for succour, for we are weak. Always grant the light of Thy countenance, for that light alone is our only consolation amid the darkness and danger of our situation. Forsake us not, but infuse patience, firmness and fortitude into our souls, so that we may stand as withnesses of Thy glory to generation to come." (ইহা আমার "Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj" হইতে উদ্ধৃত)।

In the same spirit, a writer of the same body claims for Brahmoism the words of Abou Ben Adhem's dream—"Write me as one who loves his fellow-men." This literature is ever growing and its newspaper, its societies for moral and social, as well as religious progress. Both alike disown Christianity, save as one of the good systems of religion which "the education of the world" has produced from age to age.

The Minister of the Adi Samaj undertook prove, in the face of the younger Brahmo body as well as of Chrisian Missionaries:

"That Hinduism is superior to all other religions, because it owes the name to no man; because it acknowledges no mediator between God and man; because the Hindu worships God as the soul of the soul and can worship in every act of life—in business, in pleasure and in social intercourse; because while other scriptures inculcate worship for the rewards it may bring or the punishment it may avert, the Hindu is taught to worship God and practise virtue for the love of God and of virtue alone, because, being unsectarian and believing in the good of all religions, Hinduism is non-proselytising and tolerant, as it also is devotional to an entire abstraction of the mind from time and sense, and possessses an antiquity which carries it back to the fountain head of all thought."

These are some of the points which the lecturer endeavoured to illustrate from history, and by well-put references to existing facts.

His position was disputed by a genial and accomplished missionary, the Rev. Dr. Murrty Mitchell, and several members of the younger Brahmo body. Dr. Mitchell claimed to include the Tantras among the sacred books of the Hindoos, and adduced from them immoral passages, which the minister of the Adi Samaj, Babu Rajnarain Bose, promptly disowned. "I am not", he said, "a Tantrist, and therefore decline to enter into a discussion on the merits and de-merits of any of the Tantras. The position which I took up in my lecture on the superiority of Hindooism was this, that even the lowest Shastras the Tantras, not to mention the Vedas, the Upanishads, the Smrities, and the Puranas, contain monotheistic sentiments of the most exalted

description." The younger Brahmo body maintained that the church represented by Babu Rajnarain Bose had drifted from the teachings of Raja Ram Mohan Roy, and of his successor, Debendra Nath Tagore, neither of whom confined his search for truth to any one system, and the latter of whom claimed all great and good men as teachers, all 'nature as revelation' and 'pure reason as minister.' Baboo Jotendra Nath Tagore (a notable Calcutta Zemindar, kinsman and successor of Raja Ram Mohan Roy's disciple, Dwarkanath Tagore) maintained that Hinduism is an illimitable fount of truth, and in confirmation of this view produced many beautiful passages from the Shastras.

This controversy produced little effect in India, so far as making known the tenets of the two Brahmist Churches was concerned; but it was valuable to me, and it may be so to the reader in two ways. First, it shows that while the church of Baboo Keshub Chunder Sen is drifting further from Hindooism, the older body is coming nearer to Hindooism while, at the same time, endeavouring to raise it from idolatry to a philosophy and a monotheistic faith. Secondly, that the younger body in drifting from Hindooism is not drifting any the nearer to Christianity. The forms of worship of both Churches are thoroughly, and at festive times markedly Hindoo in the apparent intensity of the devotion, and in the appeals to the senses by music and flowers. An 'Inquirer from the outside' during this controversy having asked some questions indicating his view of the greater simplicity, solemnity, devotion, charity, and purity of the Gospel of Christ, the *National* (Adi Somaj) Paper replied with some fine instances of Hindoo charity, of honour paid to parents, and much besides; facts which may be freely admitted, while, at the same time, a glimpse into these ancient writings, as into the Koran, is sufficient to show what a marked contrast they present to the New Testament. I cannot see whether the spirit of inquiry now abroad in India is tending, but I venture to ask the reader to view it in a generous and kindly spirit."

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার প্রাচীরে প্রাচীরে এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন ঘোষিত হয় যে, ব্রাহ্মগণের অগ্রজ গোষ্ঠীর ('আদি সমাজ' নামে অভিহিত) যাজক, সকল ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে এক বক্তৃতা দিবেন। পূর্বের এক অধ্যায় বলা হইয়াছে যে, দুইটি ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ভ পার্থক্য বিদ্যমান, যদিও উভয় গোষ্ঠীই বলেন যে, তাঁহারা সেই প্রথম ও মহান্ ব্রাহ্ম রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্তী। তরুণ গোষ্ঠী অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেনের গোষ্ঠীটির ধর্মমত প্রায় ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান ধর্মমতেরই ন্যায়। অগ্রজ গোষ্ঠীটি বিশ্বাস করে যে, ভিতরে বাহিরে নানা উদ্‌গত দলে ভারাক্রান্ত হইলেও হিন্দুধর্মের 'আদর্শ

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের ঐক্যানুভূতি ও উপাসনা; এবং বেদের শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন করার অর্থ শুদ্ধ (যদিও কবিত্বময়) ঈশ্বরবাদে প্রত্যাবর্তন করা। আমি এই সময় দুই বৎসর ভারতবর্ষে ছিলাম এবং দুর্গাপূজা ও জগন্নাথ পূজা উৎসবগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র স্বদেশে পাঠাইয়াছিলাম। তবে এই চিত্রগুলি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমি ইহাও অনুভব করিয়াছিলাম যে, ইংরাজগণ ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসগুলিকে এবং সেই ধর্মসমূহে বিশ্বাসী মানুষগুলিকে সঠিকভাবে বুঝিতে পারেন না। যাহাই হউক, বিজ্ঞাপনটি বিস্ময়ের উদ্রেক করিল। এখন কথা হইল এই যে, আদি সমাজের এই যাজক (পরে জানিলাম ইনি একজন সজ্জন পন্ডিত) কলিকাতার মিশনারীগণের এবং শিক্ষিত ইংরাজগণের মুখের উপর কি ইহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা আরও উন্নত? দেখিলাম, তিনি তাহাই করিলেন এবং এই বিতর্কের পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে হিন্দুগণ, ঈশ্বরের কল্যাণে এবং খ্রীষ্টধর্মের বিনা সহায়তা সেই অখন্ড সত্যে উপনীত হইতে পারেন—যে সত্য বলে যে, ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমি হিন্দুধর্মের হইয়া কোন কথা বলিতে চাহি নাই বা বলিবও না। বহু হিন্দু পন্ডিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি যাঁহারা আজও দাবি করেন যে হিন্দুধর্ম তাঁহাদের ধ্রুবতারা, তাঁহাদের মননধারার কিছুটা পরিচয় দেওয়াই হইল আমার উদ্দেশ্য।

সেই অবধি আমি নানাভাবে এই দুই ব্রাহ্মগোষ্ঠীর লেখাগুলি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। এই লেখাগুলি এমন আশ্চর্য ভক্তিমূলক, এবং ঈশ্বর ও মানবপ্রেমে এমনই সিঞ্চিত যে ইহার তুলনা মেলাই ভার। ইহার তুলনা মিলিতে পারে একমাত্র প্রাচীন ক্যাথলিক ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞগণের অপরূপ ভক্তিমূলক লেখায়। এমন এমন অংশও আমার চোখে পড়িয়াছে যেমন:

"খ্রীষ্টান লেখকগণের পূত রচনাগুলির মধ্যেও কি প্রগতি উপলব্ধ হয় না? মোজেস্-এর এলোহিম হইতে নূতন টেস্টামেন্টের ঈশ্বর পর্যন্ত এই যে রূপান্তর, ইহা কি বিরাট নয়? ইহুদীয় ধর্মে এক পরিবর্তন আসিল—ভয় হইতে প্রেমের দিকে, শক্তি হইতে প্রজ্ঞার দিকে ঈশ্বরের সুবিচার হইতে ঈশ্বরের করুণার দিকে জাতি হইতে একক ব্যক্তির দিকে, এই জগৎ হইতে অন্য জগতের দিকে, পিতার পাপ পুত্রে বর্তিত হওয়া হইতে প্রতিটি আত্মা নিজের পাপ নিজে নিজে বহন করিবার দিকে এবং অগ্নি, ভূমিকম্প ও ঝঞ্ঝা হইতে 'ক্ষুদ্র শান্ত ধ্বনি'র দিকে।.....এসো আমাদের জীবনকে শুদ্ধ ও পবিত্র করি। এসো, আমরা আমাদের ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করি। হে ঈশ্বর, প্রভু, পিতা, আমাদের ত্রাণকর্তা ও কর্ণধার! আমরা দুর্বল, তাই সাহায্যের জন্য তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া আছি। সর্বদা তোমার জ্যোতিঃ দান করিও কারণ এই অন্ধকার ও বিপদের মধ্যে ওই জ্যোতিঃই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আমাদের ত্যাগ করিও না; আমাদের আত্মাকে আরও ধীর, স্থির ও সুরক্ষিত

কর, যাহাতে আমরা যুগ যুগ ধরিয়া তোমার মহিমার সাক্ষ্য বহন করিয়া যাইতে পারি।'' (ইহা আমার 'ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিরক্ষার্থে' হইতে উদ্ধৃত।)

ঠিক এইভাবে ওই একই গোষ্ঠীর একজন লেখক ব্রাহ্মধর্মের জন্য আবু বেন আধেমের স্বপ্ন-কথাগুলিকে দাবি করেন: ''আমি মানুষকে ভালবাসি এইভাবে আমাকে লিখিয়া রাখুন।'' এই সাহিত্য ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হইতেছে এবং ইহা উভয় ব্রাহ্মগোষ্ঠীর সহিতই সম্পৃক্ত। প্রত্যেকটির নিজস্ব পুস্তিকা আছে, সংবাদপত্র আছে, নৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় উন্নতির জন্য সভাসমিতি আছে। উভয় গোষ্ঠীই একযোগে ঘোষণা করেন যে, খ্রীষ্টধর্মের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, এবং যুগে যুগে সভ্যতা যে সকল সৎ ধর্মকে জন্ম দিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম সেগুলির অন্যতম, ইহার অধিক কিছু নহে।

আদি সমাজের যাজক তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠী এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের সম্মুখে প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে,

''হিন্দুধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ (১) কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে ইহার নামকরণ হয় নাই; (২) ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ইহা কোন মধ্যস্থ মানে না; (৩) হিন্দুগণ ঈশ্বরকে পূজা করেন আত্মার আত্মা হিসাবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে—কি বিষয়কর্মে, কি আনন্দে, কি সামাজিক আলাপ-আলাপনে; (৪) অপরাপর শাস্ত্রগুলির মতে উপাসনা পুরস্কার-সাপেক্ষ, কিন্তু হিন্দুগণ ঈশ্বরের উপাসনা এবং ধর্মচর্চা করেন কোন পুরস্কারের অপেক্ষা না করিয়া, ঈশ্বরপ্রেম এবং ধর্মচর্চাই এই উপাসনার প্রথম ও শেষ কথা; (৫) ইহা অসাম্প্রদায়িক এবং সকল ধর্মের কল্যাণে বিশ্বাসী; (৬) ইহা কাহাকেও ধর্মান্তরিত করে না, ইহা সহনশীল এবং এতদূর ভক্তিমূলক যে ইহা সম্পূর্ণভাবে কাল ও বোধনিরপেক্ষ; (৭) ইহা সকল জ্ঞানের আদি উৎস।''

ইতিহাস ও বর্তমান তথ্যের সমন্বয় সাধন করিয়া বক্তা যে যুক্তিগুলি খাড়া করেন তাহার কতকগুলি উপরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই মতের বিরোধিতা করেন রেভারেন্ড ডাঃ মারে মিচেল নামক এক সুশিক্ষিত ভদ্র মিশনারী এবং তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠীর কয়েকজন সভ্য। ডাঃ মিচেল বলেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ হিন্দুদিগের পবিত্র ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। এবং তিনি তন্ত্রশাস্ত্র হইতে এমন এমন অংশ উদ্ধৃত করেন যাহা যাহা নীতিবিগর্হিত। আদি সমাজের যাজক মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন ''আমি তান্ত্রিক নই, সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রের দোষগুণ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করিতে আমি অসম্মত। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল ইহাই প্রমাণ করা যে, বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও পুরাণগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিকৃষ্টতম শাস্ত্র যে তন্ত্র তাহার মধ্যেও একেশ্বরবাদিতা সম্বন্ধে সুমহান বর্ণনা আছে তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠী এই বলিয়া

অভিযোগ করেন যে, বাবু রাজনারায়ণ বসুর গোষ্ঠীটি রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার অনুবর্তী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন; উপরন্তু, রাজা রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যের সন্ধানকে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, যে ব্যক্তি মহৎ ও সজ্জন, সে-ই শিক্ষক; সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এবং বিশুদ্ধ যুক্তিই সার্থক যাজক। বাবু যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (যিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত জমিদার এবং রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের আত্মীয় ও অনুবর্তী) বলেন যে, হিন্দুধর্ম সত্যের অফুরন্ত উৎস। শাস্ত্র হইতে সুন্দর সুন্দর অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান।

উভয় ব্রাহ্মগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ধর্মমতগুলিকে সাধারণ্যে পরিচিত করা, কিন্তু এই বিতর্ক ভারতবর্ষে বিশেষ কোন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। তবে আমার লাভ হইয়াছে এবং দুই দিক দিয়া পাঠকদেরও লাভবান হইবার সম্ভবনা আছে। এক—এই বিতর্ক দেখাইয়া দিয়াছে যে, একদিকে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সমাজ যেমন হিন্দুধর্ম হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, অন্যদিকে অগ্রজ সমাজটি হিন্দুধর্মের নিকটতর হইতেছেন এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিকতা হইতে একেশ্বরবাদী দর্শনে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দুই—তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠীটি হিন্দুধর্ম হইতে দূরে সরিয়া গেলেও, খ্রীষ্টধর্মের এতটুকু নিকটতর হইতেছেন না। উভয় সমাজেরই উপাসনা-পদ্ধতি ও উৎসব-অনুষ্ঠান ভক্তির গভীরতায় এবং সঙ্গীত ও পুষ্পের সাহায্যে মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াসে বিশেষভাবে হিন্দুধর্মী। এই বিতর্কের সময় বাহিরের কোন এক উৎসুক ভদ্রলোক খ্রীষ্টোপদেশের আরও সারল্য, নিষ্ঠা, গভীরতা, ভক্তি, দাক্ষিণ্য এবং বিশুদ্ধতার নজির দেখাইয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলে, ন্যাশনাল (আদি সমাজ) পেপার ইহার জবাবে হিন্দুদাক্ষিণ্য, মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আরও অনেক কিছুর কতকগুলি সুন্দর নজির প্রদর্শন করেন। তথ্যগুলি অনায়াসে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহা হইল এই যে, যদি এই সকল প্রাচীন লেখা এবং কোরাণের মধ্যে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিব যে নূতন টেস্টামেন্টের সহিত এইগুলির পার্থক্য অসীম। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, ভারতবর্ষের এই অনুসন্ধিৎসা কোন্ লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইয়াছে, তবে আমি পাঠকদের এই বলিয়া অনুরোধ করিব, তাঁহারা যেন সহানুভূতি ও সহৃদয়তার দৃষ্টিতে ইহাকে দেখেন।''

ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সম্মিলন (college Reunion) হয়। আমি উহা প্রথম বিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রস্তাব করি। জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বপ্রথম জেলা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হন। যখন আমি তাঁহার নিকট ঐ প্রস্তাব করি, তখন তিনি বালেশ্বরের জেলা

পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। আমি প্রথম এই প্রস্তাব করি কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কোন উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ করেন। জগদীশনাথ রায় আমার প্রস্তাবকে প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের ছাত্রদিগকে তাহার অন্তর্ভূত করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকত নিকুঞ্জ" নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি সেই সম্মিলনে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। উহা আমার বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খন্ডে আছে। আমি যে ঘরে উহা পাঠ করিতেছিলাম সেই ঘরে ঢুকিয়া কি হইতেছে দেখিতে একটি দর্শক উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু এই বলিয়া বারণ করিলেন যে "ও-ঘরে আর কি দেখিবে? ও-ঘরে 'সেকাল একাল' হইতেছে।" আমার কলেজের সমাধ্যায়ী ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিতের প্রতি বাঙ্গালা পুস্তক হইতে বাছা বাছা স্থান পড়িবার ভার ছিল। তিনি একটি অশ্লীল স্থান খানিক পড়িয়াছেন এমন সময় জগদীশনাথ রায় তাঁহাকে একটি ধমক ও তৎপরে একটি উপহাস দ্বারা তাহা হইতে বিরত করিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচর্যা করিয়াছিলেন। এই সামান্য বেশ ধারণ জন্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকল তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরে কলেজ-সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল। এ সম্মিলনও "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। বিখ্যাত "শকুন্তলাতত্ত্ব" প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বসু, এম. এ. এইবার সম্মিলনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও গানের শেষে কতকগুলি নাটকের বাছা বাছা স্থান অভিনীত হইয়াছিল ও কতকগুলি মূক অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপরে কলেজ সম্মিলন তিন-চারি বৎসর বন্ধ থাকিয়া ১৮৮১ সালে পুনরায় "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। সেবার কোন বে-বন্দোবস্ত বশতঃ উপস্থিত জনসমূহ ক্ষেপিয়া উঠিয়া অত্যন্ত গোলমাল করাতে রাজভ্রাতৃদ্বয় (যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন) তাঁহাদের বাগানে সম্মিলন হওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তাহার পর বৎসর হইতে লাহাভ্রাতৃদ্বয়, রাজা দুর্গাচরণ ও বাবু শ্যামাচরণ, উক্ত সম্মিলন করাইবার ভার গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর উহা তাঁহাদিগের উদ্যানে হইয়া একেবারে বন্ধ হয়। বড় দুঃখের বিষয় যে কলেজ সম্মিলন আর হয় না। উহা একটি মনোহর ব্যাপার ছিল। সম্বৎসরের পর বৃদ্ধ ও যুবক কলেজিয়ান একত্রিত হইয়া পরস্পর মিষ্টালাপ করিতেন। তাহাতে বড় আনন্দের উদয় হইত। কি প্রকার আনন্দের উদয় হইত তাহা আমার হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধের শেষ কয়েক পংক্তিতে বিবৃত আছে। কলেজ সম্মিলন জ্ঞানাহার ও সৌহার্দরসামৃতপানে (Feast of reason and flow of soul) অথবা জ্ঞানের ভোজ ও আত্মার ঢলাঢলি করিবার একটি প্রধান উপায় ছিল। উল্লিখিত কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"অদ্যকার সম্মিলন অতি শুভ ঘটনা। ইহার দ্বারা অন্য কোন উপকার যদি না হয়, অন্ততঃ এই উপকার হইল যে, আযৌবন পরিচিত সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী অদ্য আমরা দেখিতে পাইলাম। সেই সকল মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া জীবনের সেই অতি সুখদ পরম মনোহর কাল স্মরণ হইতেছে, যখন আমরা এক বেঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিতাম। ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। এই সম্মিলন প্রকাশ করিতেছে যে, আমাদের চিত্ত কেবল সামান্য অর্থচিন্তায় বদ্ধ নহে,—তাহা কেবল সামান্য অন্নপানের জন্য ব্যস্ত নহে। ইহাতে প্রদর্শন করিতেছে যে, আমাদিগের জ্ঞানের জন্য ক্ষুধা ও সৌহার্দ্যরস পানের জন্য পিপাসা আছে। বৎসর বৎসর এই প্রকার সম্মিলন দ্বারা ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে কে বলিতে পারে? এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইলে যে-কোন সৎপ্রসঙ্গ ও সৎপ্রস্তাব উত্থিত হইবে না, ইহা অতি অসম্ভব। সেই সকল সৎপ্রসঙ্গ সৎপ্রস্তাব হইতে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে তাহা কে জানে?"

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার" অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দুমেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় "জাতীয় সভা" সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার" আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। প্রথম যে বৎসর (১৮৬৭ সাল) হিন্দুমেলা হয় আমি মস্তকের পীড়া জন্য মেদিনীপুর হইতে ছুটী লইয়া বোড়ালে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমি এবং আমার বোড়ালবাসী কতকগুলি বন্ধু একত্রিত হইয়া বঙ্গের পূর্ব মহিমা বিষয়ে এক কবিতা রচনা করিয়া মেলায় পাঠার্থ প্রেরণ করি। উপহাসচ্ছলে আমি বলিয়াছিলাম যে উহার শিরস্থ স্থানে "বোড়াল কবিবৃন্দ কর্তৃক বিরচিত" এই বাক্য লিখিয়া দেওয়া যাউক। ঐ কবিতার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল:— "বঙ্গের পূর্ব মহিমা বর্ণন"

(বোড়ালের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত ও মৎ কর্তৃক সংশোধিত।)

(১)

দেখিয়া উৎসব-সভা পুলকিত প্রাণ।
জাতীয় উন্নতি চিহ্ন যা'তে বিদ্যমান॥
বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল।
ভ্রাতৃভাবে পুত্র তাঁর সকলে মিলিল॥
এই উপলক্ষে মন চাহে বলিবারে।
বঙ্গের মহিমা পূর্ব বঙ্গীয় মাঝারে॥

(২)

পুরাকালে যুধিষ্ঠির যজ্ঞের কারণ।
দিগ্বিজয় হেতু ভীমে করেন প্রেরণ॥
সমুদ্র ও চন্দ্রসেন বঙ্গে নৃপদ্বয়।
সমরে নিপুণ দোঁহে সাহসী নির্ভয়॥
উভয়ে সমর করে বৃকোদর সনে।
ভারতীয় সভাপর্বে বিস্তারিত ভণে॥

(৩)

বিজয় নামেতে বীর বিজয়ী প্রধান।
বঙ্গের নৃপতি সিংহবাহুর সন্তান॥
কি কারণে অভিমানে ত্যজি পিত্রালয়।
সমুদ্র ভ্রমণ আশে চলিলা বিজয়॥
সহচরগণ তাঁর যে যে ছিল বঙ্গে।
পত্নীগণ সহ তাঁরা চলিলেক সঙ্গে॥
পথের প্রয়োজন যা সকলি লইয়া।
আরোহি অর্ণবপোতে চলিল বাহিয়া॥
বিষম বিপদ পথে ঘটে অকস্মাৎ।
মেঘে আঁধারিল দিক ঘনবজ্রাঘাত॥
উঠিল প্রবল বায়ু জলধি মাঝার।
চির অরি সনে দ্বন্দ্ব লাগিল তাহার॥
নাচিল সাগর বক্ষে তরঙ্গ নিচয়।
গর্জিল অপার সিন্ধু দেখে লাগে ভয়॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে ঝড় প্রলয় আকার।
সমুদ্র আকাশ উভে হয় একাকার॥
কামিনীর যান দ্বীপ মহেন্দ্রে লাগিল।
কুমার সহিত তরী সিংহলে পড়িল॥
বিজয় উঠিল গিয়া সিংহদ্বীপ তীরে।
কত লোক জীবন ত্যজিল সিন্ধুনীরে॥
অবশিষ্ট ক'টি বন্ধু লইয়া বিজয়।
প্রবেশিলা দেশমধ্যে নির্ভয় হৃদয়॥
তথাকার অধিবাসী যক্ষ যোধগণে।
দমিলা বিজয় সিংহ ঘোরতর রণে॥
পড়িল যক্ষের নাথ কে যোধে কুমারে।

বিবাহ্ করিয়া যক্ষরাজ তনয়ারে॥
স্থাপিলা নূতন রাজ্য শাসি' যক্ষদলে।
সিংহল করিলা সভ্য নিজ বুদ্ধিবলে॥
উজলিলা চারি দিক সুধাধৌত ধামে।
রাখিলা সিংহল নাম আপনার নামে॥
বঙ্গজ পুরুষ কেহ্ করিলা এ সব।
কেহ্ যেন ইহা নাহি ভাবে অসম্ভব॥
ইহার প্রমাণ আছে জানিহ্ নিশ্চিত।
মহাবংশ ইতিবৃত্তে পালিতে লিখিত॥

(৪)

বহুকালব্যাপী বঙ্গ না ছিল অধীনা।
মগধ রাজ্যের বশে হইয়া শ্রীহীনা॥
তৎপরে কয়েকজন জন্মেন ভূপাল।
স্বাধীন সাহসী যোদ্ধা পদবীতে পাল॥
কলিঙ্গ পর্যন্ত রাজ্য করেন্ বিস্তার।
প্রকাশিয়া শৌর্য বীর্য নাহি যার পার॥
তার পর সুবিখ্যাত বৈদ্য রাজগণ।
অধিকার করে বঙ্গ রাজসিংহাসন॥
কেমনে হইবে বল সে বংশ কীর্তিত।
বাহুবলে ইন্দ্রপ্রস্থ হল পরাজিত॥

(৫)

প্রতাপে আদিত্যসম যশোরে সদন।
প্রতাপ আদিত্য নাম সেনা অগণন॥
বঙ্গজ কায়স্থ জাতি সেই নৃপবর।
জেহাঙ্গীর সনে ঘোর করেন সমর॥
ভারত ভারত কবিকুলের প্রধান।
অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে যাঁর যশোগান॥

(৬)

নওয়াব মহাবেত জঙ্গের সময়।
মনওয়ারুদ্দিন খাঁ লয়েন আশ্রয়॥
মুর্শিদাবাদ নগরে নবাব নিকট।
ভ্রাতৃসনে রণে হারি ত্যজিয়া আরকট।
কটকের সুবেদারী পরে তিনি পান।

লইলেন সঙ্গে তিনি করি দেওয়ান॥
৺রামচরণ দে ব্যবহর্ত্তা মহামতি।
যাহার প্রপৌত্র হিন্দু সমাজের পতি॥
সুবিখ্যাত সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব।
যাঁহারে সম্মান করে হিন্দু কি সাহেব॥
পথিমধ্যে পিণ্ডারিরা আসি আক্রমিল।
তাহাদের সঙ্গে ঘোর সমর বাজিল॥
নাশিয়া অনেক শত্রু ব্যবহর্ত্তা বীর।
ত্যজিলা সম্মুখে রণে সার্থক শরীর॥

(৭)

হায়! হায়! কোথায় আমাদের সে দিন।
সেই বঙ্গবাসী মোরা দিন দিন ক্ষীণ॥
সাহস সহিত গেল আমাদের বল।
হেরিয়া কালের গতি হ'লাম বিকল॥
থাকিত মোদের যদি যে শুভ সময়।
তা হ'লে এ অপমান সহিতে কি হয়?
ইউরোপীয়েরা বলে ভরসা বিহীন।
মেঘ সম বাঙ্গালীরা বলবীর্য্য হীন॥

(৮)

সম্প্রতি সুযোদ্ধা, মুন্সেফ্ মহাশয়।
বিদ্রোহ সময়ে দেন বীর্য্য পরিচয়॥
গবর্নমেণ্ট তুষ্ট হয়ে দিলা জায়গীর।
সাহস বাড়িবে বলে ভীরু বাঙ্গালীর॥
শুন ভাই বঙ্গবাসী মম নিবেদন।
লভিতে এরূপ যশ করহ যতন॥

(৯)

নাটোরের রাজপুত্র অতি বীর্য্যবান।
মহৎ বংশেতে জাত কুমার* প্রধান॥
সাহসের পরিচয় প্রদান কারণ।
সেনাপতি পদ জন্য করে আবেদন॥
কি জন্য যে গবর্নমেণ্ট না দেন তাঁহায়।
বুঝিতে নারিনু মোরা এর অভিপ্রায়॥

সকলের মুখে এই কথা শুনা যায়।
পিতামহ ছিলা মম বলবান্ কায়॥
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ছিল প্রচারিত।
বাঙ্গলার প্রতি গ্রামে ব্যায়ামের রীত॥
প্রত্যেক উৎসবে যত মল্লগণ আসি।
তুষিত দর্শকমন নৈপুণ্য প্রকাশি॥
রায় বাঁশ বর্শা আনি আপন আপন।
লইয়া করিত ক্রীড়া জিনিবারে পণ॥
মুদ্গর লইয়া হস্তে ভদ্র যুবজন।
ভাঁজিতেন প্রতিদিন করিতেন ডন্॥
এখন সে সব চর্চা দেখা নাহি যায়।
গ্রন্থের চর্চায় শুদ্ধ সময় কাটায়॥
বিদ্যালয়ে ছাত্র শুদ্ধ মানসিক শ্রম।
করিয়া দেহকে করে নিতান্ত অক্ষম॥
যৌবন সময়ে তারা অকর্মণ্য হয়।
পীড়ায় পীড়িত হয়ে চির কষ্ট সয়॥
অর্থলোভী পিতামাতা অর্থের কারণ।
পুস্তক পেষণী যন্ত্রে করিয়া পেষণ।
সুকুমার শিশুবৃন্দে কি কহিব হায়।
কেবল অর্থের জন্য পরকাল খায়॥
কাঁচা বাঁশে ঘুণ যথা সারহীন করে।
চিন্তা ঘুণে সেইরূপ নাশে কলেবরে॥
ষোড়শ বৎসরাবধি ইংরাজ তনয়।
খেলিয়া পড়িয়া সুখে সময় কাটায়॥
ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যত।
ছোট কি বড় সকলে হয় ক্রীড়ারত॥
বঙ্গ বিদ্যালয়ে তার বিপরীত প্রথা।
দেখিয়া স্বদেশপ্রেমী মনে পায় ব্যথা॥
বয়স্ক বালকগণ বিধি প্রতিবাদী।
বসিয়া পড়য়ে যেন প্রবীণের গাঁদী॥

*কুমার চন্দ্রনাথ রায়।

বিভিন্ন প্রথার ফল বিভিন্ন প্রকার।
ক্ষীণতনু দীন আত্মা বঙ্গজ কুমার॥
সবল শরীর মন ইংরাজ যুবার।
ইংরাজ তনয়বর ছাড়ি বিদ্যালয়।
সাহসী উদ্যমশীল দৃঢ়ব্রত হয়॥
পাঠান্তে উদ্যমহারা বঙ্গসুত যত।
শরীর লইয়া তারা সদাই বিব্রত॥
এ রোগের প্রতিকার কর নির্ধারণ।
নিবেদি বিনীত ভাবে স্বদেশীয় জন॥

১৮৬৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর হিন্দুমেলা খুব জাঁকের সহিত করা হইত। কলিকাতায় অনেক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি এই মেলায় যোগ দিতেন এবং ঐ মেলায় প্রদর্শন জন্য নানাপ্রকার জিনিষ পাঠাইতেন। নানাপ্রকার ফলমূল ও পুষ্প এবং শিল্পকার্য প্রদর্শিত হইত। আমার স্মরণ হয়, বস্ত্র বয়নের এক নূতন যন্ত্র একবার মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে যে প্রকার যন্ত্র তাহা সাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। মেলা উপলক্ষে ব্যায়াম ক্রীড়া ও পাইকদিগের খেলা হইত এবং কবিতাও পঠিত হইত। কেহ কেহ বক্তৃতা করিতেন। ১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য আমি সম্পাদন করি। ঐ মেলা কলিকাতার পার্সীর বাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয় এবং যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রায়চরণ ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতি স্বরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীতক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ সালে ৩০শে জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্নর সার্ রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য-সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হই। ঐ সান্ধ্য-সম্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সার্ রিচার্ড টেম্পলের যাহা দোষ থাকুক না কেন, তাঁহার একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি বাঙ্গালী জাতিসাধারণের প্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেন। আমি যে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বেলভিডিয়ারে যাই, সেই গাড়ীতে প্রসিদ্ধ নাটককার মনোমোহন বসু ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিব তাহা প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন"। আমরা যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন ছোটলাট অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সাহেবের সহিত আহার করিতেছিলেন। আমরা গিয়া চাপরাশী প্রদত্ত আসনে বসিলাম। সাহেবেরা আহারের পর যে ঘরে আমরা ছিলাম সেই ঘরে আসিলে আমরা চাপরাশী শ্রেণীর ন্যায় দুই লাইনে কাতার দিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার মধ্য দিয়া ছোটলাট ও ছোটলাট-পত্নী প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করতঃ সকলের

প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। তিনি এমন সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিলেন যে তাঁহাকে আমি মনে মনে পিসীঠাকুরাণী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ছোটলাট যখন চলিয়া যাইতে লাগিলেন এই কথা বলিবার সময় সগুম্ফ চলিয়া যাইতে লাগিলেন আমার বলা উচিত ছিল। এমন জমকাল গোঁফ কখন দেখি নাই। সার্ রিচার্ড টেম্পলের নিকট তাঁহার গোঁফ বড় শ্লাঘার বিষয় ছিল। লোকে বলিত যে তাঁহার গোঁফ নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ন্যায় ছিল। যেমন তিনি আমাদের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের কর স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন গভর্নমেন্ট বঙ্গানুবাদক রবিনসন্ সাহেব (টৌনসেণ্ড ও রবিনসন্কে বুড়ো শিব মার্শমেনের নন্দী ভৃঙ্গী বলিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণন করিয়াছিলেন) আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় তাঁহার নিকট দিতে আরম্ভ করিলেন। সকল গ্রন্থকর্তা অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন। অতএব ছোটলাট সাহেবের নিকট কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সে বিষয়ে আমাদের নিকট হইতে তাঁহার আর কোন শিক্ষা লইতে হইল না। বরং তিনি যদি আমাদিগের প্রতি নেক্ নজর করিতে লাট সাহেবকে অনুরোধ করিতেন তাহা হইলে শোভা পাইত। হেয়ার সাহেবের স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত "বঙ্গের সুখাবসান" নাটকের কথা পাড়িয়া ছোটলাট তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সেই নাটকে হরলালবাবু কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতাস্পৃহা প্রকাশ করাতে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। হরলালবাবু এক্ষণে (অক্টোবর ১৮৮৯) হিন্দু স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য করিতেছেন। উল্লিখিত সান্ধ্য-সম্মিলনে মাদ্রাজের (ঐ সময়ে ভাবী) গভর্নর গ্রাণ্টডফ্ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারত ভ্রমণ জন্য ঐ সময় বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন। উক্ত মজলিসে বঙ্গহিতৈষী যশস্বী কটন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ইনি মেদিনীপুরে যখন অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন আমার নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। এই মজলিসে মুঁসে মিনায়ফ্ উপস্থিত ছিলেন। ইনি রুশ দেশীয় পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাল জানেন। ইনি একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে গিয়া আমার প্রণীত ইংরাজী পুস্তিকাসকল ক্রয় করিয়াছিলেন। ইনি আগ্রহের সহিত আমার করমর্দন করিলেন। ইনি এই সময়ে ভারত ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সমভিব্যাহারে ইনি ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের টোলসকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরিদর্শন সময়ে তিনি কেবলই ইংরাজের নিন্দাবাদ ও রুশের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। সার্ রিচার্ড টেম্পল তাঁহার রোটস্ নামক বিলাস-তরণীস্থ সম্মিলনে (আগস্ট, ১৮৭৫ সাল) নদীভ্রমণে উল্লিখিত গ্রন্থকর্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। সেদিন অনেক বড়মানুষদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সেইদিন গরীব গ্রন্থকর্তা ও বড়মানুষ লইয়া এক চমৎকার মিশ্র দৃশ্য হইয়াছিল। বড়মানুষদিগের মুখশ্রীতে বিস্ময়ের চিহ্ন আমরা অনুভব করলাম। তাঁহারা মনে মনে কহিতেছিলেন, "এ বেটারা কোথা হইতে আইল"? সার্ রিচার্ড টেম্পলের পর

ইডেন্ সাহেব লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্নর হইলে আমাদিগের নাম বেলভিডিয়ার রাজভবনে নিমন্ত্রণীয়দিগের নামের ফর্দ হইতে উঠাইয়া দেন। বিলাসতরণীতে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের জলযোগ জন্য ছোটলাট বিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্বদিন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সহকারী সেক্রেটারী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলিয়া তাঁহার পরিবারদিগের দ্বারা এক হাজার পানের খিলি প্রস্তুত করান হইয়াছিল। সোডাওয়াটার, লেমনেড, আইস্‌ক্রিম, সন্দেশ ও নারিকেল যথেষ্ট ছিল। দেখিলাম পরলোকগত রাজা নার্সিং-এর বিখ্যাত কৃপণ পুত্র বিনাব্যয়লব্ধ রাজবাটীর আইস্‌ক্রিম্ বেগল্‌গস্ ভক্ষণ করিতেছিলেন। আমি কিছু আহার করিতে মানস করিয়াছিলাম কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রকাশ্যরূপে ইংরাজের তরণীতে জলযোগ করিতে নিষেধ করাতে আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম। ইংরাজের তরণীতে আমার প্রকাশ্যরূপে জলযোগ করাতে কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু বৃদ্ধের কথা শুনা কর্তব্য বোধ করিলাম। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় আমার পরলোকগত পিতার ও আমার পরম সুহৃদ্ ছিলেন। প্যারীচাঁদবাবু অপ্রকাশ্যরূপে যবনস্পৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন কিন্তু প্রকাশ্যরূপে খাইতে বিহিত বোধ করিতেন না। যে স্টীমার রোটসকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল সেই স্টীমারে যখন ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল ও নদীর স্নিগ্ধ বায়ু গায়ে লাগিতে লাগিল তখন মনে বড় আনন্দের উদয় হইল। সগুম্ফ সার্ রিচার্ড টেম্পল সহাস্যবদনে প্রত্যেক ব্যক্তির করমর্দন করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। একদিন বেলভিডিয়ারের হাতায় তাঁবু গাড়িয়া তাহার ভিতর আমাদিগকেও পোলাও খাওয়াইতে ছোটলাট সাহেব সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ তিনি শীঘ্রই বোম্বাইয়ের গভর্নর হইয়া যাওয়াতে সে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি

২০ আশ্বিন [১২৮৬]॥ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০ অদ্য এইস্থানে [দেওঘর] অতি প্রত্যুষে পৌঁছি। বৈকালে এই স্থানের অনেকগুলি ভদ্র ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। দেবগৃহ পর্বত ও বনাকীর্ণ স্থান কিন্তু এখানে কতকগুলি ভদ্র লোক বিষয়কমার্নুরোধে বাস করেন এবং তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অথবা জলবায়ু পরিবর্তন জন্যও অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হয়।

২১ আশ্বিন॥ অদ্য হ-বাবু প্রাতঃকালে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন, সেই সময় দন্ত-বেদনায় অস্থির ছিলাম। উক্ত বাবুকে বলিলাম, "Even a philsopher can not bear toothache, far less myself" জ্ঞানী ব্যক্তি দন্তবেদনা সহ্য করিতে পারেন না, আমি কোথায় আছি?" অদ্য ব্যাপ্টিস্ট খ্রীষ্টীয়. সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় Westminster Review নামক সাময়কি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করি। যাবজ্জীবন মানসিক পরিশ্রম জন্য শরীর ও মন উভয়ই অতিশয় অপটু হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি প্রত্যহ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন না করিয়া ও কিঞ্চিৎ না লিখিয়া থাকা যায় না। কোন ব্যক্তি কয়লার ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধনোপার্জন পূর্বক পরিশেষে কার্য হইতে অবসৃত হইয়াছিল; অবসৃত হইয়াও, প্রত্যহ দাঁড়ি পাল্লা লইয়া কয়লা ওজন করিত; বলিত এরূপ না করিলে আমি ভাল থাকি না। অভ্যাসের এমনি চমৎকার গুণ।

২২ আশ্বিন॥ অদ্য বয়েসি সাহেব প্রণীত 'Sermon' এবং "Mystery of Pain, Death and Sin" পাঠ করি। "Family love Versus the love of Christ" শিরস্ক সর্মনে বয়েসি সাহেব এই কথা বলেন যে বর্তমান সময়ে বাণিজ্যের দুরবস্থা জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের আয় ক্রমে হ্রাস হইতেছে তথাপি পরোপকারজনক কার্যের সাহায্যার্থ যথাসাধ্য সমাজ হইতে আনুকূল্য করা উচিত। এই কথা জন্য বয়েসি সাহেবকে মনে মনে সহস্র সাধুবাদ করিলাম।

২৩ আশ্বিন॥ অদ্য ইংরাজী ১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসের "ওয়েস্টমিনস্টার রিবিউয়ে" প্রকাশিত ফারাড়ে নামক বিখ্যাত রাসায়নিকের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করি।

২৪ আশ্বিন॥ অদ্য সন্ধ্যার পর শ্যা-বাবুর বাসায় একটি হিন্দুস্থানী "কথকের" গান শুনি এই ব্যক্তি একজন বৈদ্যনাথের যাত্রী। তিনি অন্যান্য গানের মধ্যে কতকগুলি পারসী গান গাইলেন। এই সকল পারসী গীতের মধ্যে "সম্‌সতাবরেজ্‌" নামক বিখ্যাত সূফী ব্রহ্মজ্ঞানী কবির রচিত দুইটি ধর্মসঙ্গীত ছিল। তাহার অর্থ অতি প্রগাঢ়।

২৫ আশ্বিন॥ অ-বাবু তাঁহার স্বদেশ হুগলী যাইবার সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। কিন্তু তাঁহার অদ্য বাটী যাওয়া হইল না, তাঁহার অত্রত্য বন্ধুরা আমার বাসাতে আসিয়া গুরু মহাশয়ের পলাতক বালকের ন্যায় তাঁহাকে পাক্‌ড়িয়া লইয়া যান এবং আর একদিন আটকিয়া রাখেন।

২৭ আশ্বিন॥ অদ্য "Brother Help or Deeds of Benevolence" নামক পুস্তক পাঠ করি। এই পুস্তকে বর্ণিত সহস্র বিঘ্ণবাধা অতিক্রম পূর্বক এক একটি

পরোপকারজনক কার্যের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে রোমাঞ্চ হয়। ঈশ্বরের প্রিয় কার্যসাধন কি সুন্দর জিনিস।

(উপরের যাহা প্রকাশিত হইল তাহা প্রথমে ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছিল)

৩১ আশ্বিন।। অদ্য হইতে দেশীয় ভাষায় প্রাত্যহিক বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করি। এতদিন ইংরাজীতে লিখিয়া আসিতেছিলাম, তাহা অন্যায়। নিজের উপদেশের বিপরীত কার্য করা উচিত নহে। অদ্য প্রাতে ষ্টেশনের রাস্তায় ধাড়ওয়া নদীতীর পর্যন্ত গিয়াছিলাম। সেইখানে একটি প্রস্তরের উপর রুমাল পাতিয়া বসিলাম। সম্মুখে ধাড়োয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। চতুর্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ঈশ্বরচিন্তায় মন নিমগ্ন করিলাম।

২ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে—বাবুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" পুস্তকের বিষয় অনেক কথা হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে পরব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্মের সার। আমি দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার বলিয়া যেমন প্রচারিত হইতে পারে, এমন অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। উহাকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার বলিলে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ করা হয় না। বস্তুই উহা হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার।

৫ কার্তিক।। অদ্য বৈকালে দুর্বলতা প্রযুক্ত পালকী করিয়া দাতা জঙ্গল দেখিতে যাই। জঙ্গল দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহা একটি বৃহৎ উদ্যান। বনের ভিতর রাস্তা ও বৃক্ষতল সকল এমনি পরিষ্কার বোধ হইল যেন সেই উদ্যানের মালী আছে, সে কোথায় লুক্কায়িত আছে, ইচ্ছা হইল তাহাকে একবার চেঁচাইয়া ডাকি। বনটি স্থানে স্থানে অতি নিবিড়, দেখিয়া ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা সর্বশুদ্ধ ১২ জন লোক ছিলাম।

৭ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে খ—বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত ধর্ম বিষয়ে অনেক কথা হইল। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় নির্জন বাসের শ্রেয়স্করতা বিষয়ে অনেক বলিলেন। অদ্য আফ্রিকা পর্যটক স্টানলী সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করি।

১১ কার্তিক।। অদ্য আমার পুরাতন পরিণতবয়স্ক বন্ধু ঈ—মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়া আমার এখানে অতিথি হয়েন। স্টেশনে প্রত্যাগমন সময়ে তাঁহাকে ধাড়োয়া নদী তীর পর্যন্ত পৌঁছিয়া দিই। সেইখানে আমরা উভয়ে প্রস্তরের উপর উপবিষ্ট হইয়া সূর্যাস্ত দেখিতে লাগিলাম। ঐ সময়ে তাঁহাকে বলিলাম যে যদি আকাশবাণী হয় যে এই যে সূর্য অস্ত যাইতেছে ইহা আর উদিত হইবে না তাহা হইলে পৃথিবী শুদ্ধ লোক কি আগ্রহের সহিত তাহার শেষ দেখা একবার দেখিয়া লয়। ঈ—মহাশয় কলিকাতায় যৌবনকালে আমার নিকট মিল্টন পড়িয়াছিলেন। ঈ—বাবু গোপনে পরোপকার করিতে যেমন পটু এমন অল্প লোক দৃষ্ট হয়। তাঁহার সাধু

অনুসরণযোগ্য।

১৩ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে দূর হইতে বেণুরব শুনিয়া নিজের রোগ শোক বিস্মরণ পূর্বক বোধ হইল যেন সুদৃশ্য দেবগৃহে আমার অবস্থিতির সুখ তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ হইল। তাহা শুনিয়া এই গান আপনা আপনি আমায় মন হইতে নিঃসৃত হইল "কতই করুণা হতেছে বর্ষণ তোমার।" অদ্য প্রাতে কলিকাতা হইতে কা—বাবু এইখানে আইসেন। তিনি এখানে জলবায়ু পরিবর্তন জন্য কিছুদিন অবস্থিতি করিবেন। কা—বাবু একজন পুরাতন শ্রদ্ধাবান হৃদয়বান পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম। অদ্য বয়েসি সাহেব প্রণীত "Mystery of Death, Pain and Sin" পাঠ করি। স্থানে স্থানে নূতন ভাব দেখিলাম।

১৪ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে কা—বাবুর বাসায় যাই সেখানে তাঁহার সহিত ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করি।

১৬ কার্তিক।। অদ্য আমার আলয়ে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হয় কা—বাবু উপাসনা করেন ও তাঁহার পুত্র গান করেন।

১৮ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে কা—বাবুর সঙ্গে ধাড়োয়া নদী তীরে যাই। এই সময়ে নদীতে অতি অল্পই জল থাকে। ঝির্ ঝির্, ঝির্ ঝির্, ঝির্ ঝির্, ক্রমাগত যাইতেছে। কি অপূর্ব দর্শন। আমি কা—বাবুকে বলিলাম "Now lit up your thoughts to the Eternal! "এক্ষণে সেই নিত্য পুরুষের প্রতি আপনার মনকে উঠান।" তখনই তিনি মনের উচ্ছ্বাস বাহির করিলেন—একটি অপূর্ব প্রার্থনা করিলেন। তিনি আমার অগ্রেই মনকে উঠাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় পরলোকগত হেড পাণ্ডার পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজানন্দ দত্তঝা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। "ঝা" মৈথিলী ব্রাহ্মণের পদবী। উহা "ওঝা" শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার। এখানকার পাণ্ডারা মৈথিলী ব্রাহ্মণ। গিরিজানন্দবাবু ব্রাহ্মধর্মানুরাগী।

১৯ কার্তিক। অদ্য প্রাতে কা—বাবুর সঙ্গে ধাড়োয়া নদী তীরে যাওয়া যায়। তৎপরে তাঁহার সঙ্গে যা—বাবুর বাটীতে যাওয়া হয়। তথায় ঊষাপান, মধুপান প্রভৃতি প্রক্রিয়ার উপকারিত্ব বিষয়ে কথা হয়। মধুর মধ্যে বিশেষ বিশেষ পুষ্পের মধু আরও উপকারী। Sir John Sinclair তাঁহার "Code of Health and Longivity" নামক পুস্তকে মধুপানে স্বাস্থ্য রক্ষা ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয় বলিয়াছেন। আমাদিগের আয়ুর্বেদ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে "মধুশীতং মৃদু স্বাদু ত্রিদোষেং ব্রণাপহং কষায়ানুরসং রুক্ষং চক্ষুস্যাং শ্বাসকাশনুৎ।" মধু শীতল, কোমল, স্বাদু ত্রিদোষঘ্ন ব্রণনাশক, কষায়রস, রুক্ষ, চক্ষের হিতকারী, শ্বাসকাশ নষ্ট করে।" ত্রিদোষঘ্ন অতি মহৎগুণ বলিতে হইবে। "শীতল" শব্দে শীত বীর্য বুঝায় না। স্বাদে শীতল বুঝায়। অদ্য "এডিনবরা রিবিউ" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত Miss Edgeworth জীবন বৃত্তান্ত পাঠ সমাপন করা যায়।

২০ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে ও বৈকালে বেড়াইবার সময় কা—বাবু ব্রাহ্মসমাজের

পূর্ব ঘটনার বিষয় অনেক কথা বলেন।

২৪ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে কা—বাবু, আমি ও কা—বাবুর পুত্র আমরা "ভোলা আড়া" নামক উদ্যানে অথবা কাননে (তাহাকে কি বলিব তাহা বুঝিতে পারি না) বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিলাম। "অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি" এবং "গাও তাঁরে গাও সদা" ইত্যাদি। সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকাল, শীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত; ঈশ্বর হৃদয়ে বিরাজিত; অতি অপূর্ব আনন্দ লাভ করা গেল।

২৬ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে কা—বাবু ও আমি ও যো—, আমরা বাজারে যাইলাম। কা—বাবু দোকানদারদিগের সঙ্গে সাহেবআনা ধরনে হিন্দীতে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি অতিশয় আমোদিত হইলাম। দোকানদারেরা জড়সড়; কা—বাবু, এই প্রক্রিয়া নিবন্ধন দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সস্তা পাইলেন।

২৭ কার্তিক।। অদ্য প্রাতে—সাহেবের বাটীর নিকট আমি ও কা—বাবু উভয়ে বেড়াইলাম। বৈকালে বেড়াইবার সময় কা—বাবুকে বড় অপ্রসন্ন দেখিলাম, কারণ তাঁহার ভৃত্য স্কুলের কূপের সুমিষ্ট জল আনে নাই, অন্য কূপের জল আনিয়া মিথ্যা করিয়া স্কুলের কূপের জল আনিয়াছি বলিয়াছিল। তাহার মিথ্যাচরণে বিরক্তি জন্য তাঁহার মেজাজটা বড়ই খারাপ দেখিলাম। অধিক কথা হইল না। অদ্য বয়েসি সাহেব বিরচিত লংম্যান হলের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৪ সংখ্যক উপদেশপাঠ করি। তিনি এই উপদেশে বলিয়াছেন যে বিশ্বাস ও কোন তত্ত্বে সম্মতি এই দুই ভিন্ন পদার্থ। বিশ্বাস সম্মতি অপেক্ষা গাঢ়।

২৮ কার্তিক।। অদ্য আমি সপরিবারে নন্দন পর্বত দেখিতে যাই। নন্দন পর্বত ক্ষুদ্র তথাপি নিম্নের বায়ু ও পর্বতের উপরের বায়ু এই দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ বোধ হইল। উপরের বায়ু সেবন করিয়া অতিশয় স্ফূর্তি লাভ করিলাম। ঐ বায়ু কি পবিত্র। কি লঘু! কি স্নিগ্ধ! পর্বতের উপরেএকটি ভগ্ন একটি দেবমন্দির দেখিলাম। লোকে বলে তথায়, একজন "সাধু" বাস করেন। কিন্তু সাধুকে দেখিতে পাইলাম না। নন্দন পর্বত বেশী দূর নহে তথাপি প্রত্যাগমন সময়ে দুর্বলতা জন্য অতিশয় কষ্ট বোধ হইল।

৩০ কার্তিক।। বৈকালে বেড়াইবার সময় কা—বাবুর সঙ্গে—বাবুর যোগপরায়ণতার কথা হয়। কা—বাবু বলিলেন আমরা যে ঈশ্বরে মন অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্নিবিষ্ট করিতে পারি না তাহার নিগূঢ় কারণ আমাদিগের মস্তকের পীড়া অর্থাৎ মস্তিকের ক্ষীণতা নিবন্ধন শিরোভ্রমণ ও উক্ত ক্ষীণতা জনিত মনের অকারণ কিন্তু দুর্দমনীয় উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য। বাবুর তাহা নাই। আমি বলিলাম—বাবু মস্তকের পীড়া কি তাহা তিনি মনেতেও কল্পনা করিতে পারেন না; তিনিই সুখী। বৈকালে বেড়াইবার অগ্রে আমি সপরিবারে উপাসনা করি। কা—বাবু পুত্রের পীড়া প্রযুক্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

৩ অগ্রহায়ণ।। অদ্য প্রাতে কোন ভদ্রব্যক্তির নিকট যাই। তাঁহার সহিত উদ্বাহ-প্রথা ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা হইল। লোকটি সংশয়বাদী, কিন্তু পরে জ্ঞাত হইলাম তিনি অতি সদাশয়, উদার ও সচ্চরিত্র। সংশয়বাদী হইলেই যে লোক মন্দ হয় তাহা নহে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, "Men are better than their creeds of opinions." "ব্যক্তিরা তাহাদিগের মত অপেক্ষা ভাল।"

৫ অগ্রহায়ণ।। অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে আহারাদি করিয়া বৈদ্যনাথের মন্দির দেখিতে যাই। বর্তমান হেড পাণ্ডার খুড়া গিরিজানন্দবাবু আমাকে লইয়া গিয়া মন্দির দেখান। গিরিজানন্দবাবু সভ্য ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি। মন্দিরের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র মনে একটি গম্ভীর ভাবের উদয় হইল। এই প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে অনেক দেব-দেবীর মন্দির আছে, কিন্তু বৈদ্যনাথের মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রধান। উহার চূড়া অতি উচ্চ। যে প্রকোষ্ঠে বৈদ্যনাথ আছেন তার দ্বারের উপরিস্থিত দেবনাগর অক্ষরের চিত্রফলক পাঠ করিয়া অবগত হওয়া গেল যে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে গিধোড়ের রাজা পুরাণমল্লের দ্বারা ঐ মন্দির বিনির্মিত হয়। এখন যে স্থানে বৈদ্যনাথ আছেন তিনি এ স্থানে পূর্বে ছিলেন না; অন্য একস্থান হইতে এইখানে তাঁহাকে আনা হয়। এই মন্দিরের চতুর্দিকে অসংখ্য দেব-দেবীর মন্দির আছে বলিয়া এই উপনগরের নাম দেবগৃহ। মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া হেডপাণ্ডার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ হইল। উপনিষদ ও ভগবদ্গীতার কতকগুলি শ্লোকের অর্থ লইয়া আলাপ হইল।

৬ অগ্রহায়ণ। অদ্য প্রাতে কা—বাবু ও আমি আমরা উভয়ে নন্দনপর্বতে যাই এবং তাহার শৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গান করি।

৭ অগ্রহায়ণ।। দুই প্রহর তিন ঘটিকার সময়ে আমার আলয়ে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হয়।

১১ অগ্রহায়ণ।। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে ক্ষণেক বেড়াই। সুন্দর চন্দ্রালোকে বেড়াইবার সময় ঈশ্বরকে কি সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। "সুগভীর নিশীথে চন্দ্র সুন্দর মধুর, শোভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনোহরণ।"

১২ অগ্রহারণ।। বৈকালে শ—বাবু ও খ—বাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন। উভয়ের সহিত নানা বিষয়ে বিশেষতঃ ডারউইনের (Darwin) মতের বিষয়ে কথপোকথন হয়। এতৎ সম্বন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে আমি বলিলাম যে, ডারউইন্ সাহেবের পিতৃপুরুষ বানর হইতে পারে, আমরা প্রকৃত আর্য জাতি, আমাদিগের পিতৃপুরুষ বানর হইবে কেন?

১৪ অগ্রহারণ।। অদ্য কা—বাবু দেবগৃহ শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করেন।

১৮ অগ্রহায়ণ।। অদ্য প্রাতে কা—বাবু, তাঁহার পুত্র ও আমি ধাড়োয়া নদী

তীরে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাই। প্রত্যাগমন সময়ে ধর্ম বিষয়ে অনেক কথা হইল তাহাতে কা—বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অন্যান্য বিষয়ে আমি বলিলাম যে, শারীরিক আহার সম্বন্ধে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক আহার সম্বন্ধে তাহা কখনই হইতে পারে না। ইহার অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হয়।

১৯ অগ্রহায়ণ।। অদ্য প্রাতে আমার পরলোকগত পিতাঠাকুরের স্মরণার্থে উপাসনা হয়। উপাসনা সময়ে এই স্থানের অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেন। আমি উপাসনা ও প্রার্থনা করি, কা—বাবু একটি প্রার্থনা করেন, তাঁহার পুত্র গান করেন। আমি আমার প্রতি পিতাঠাকুরের করুণরসোদ্দীপক স্নেহের কতকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহার আত্মাকে সম্বোধন পূর্বক প্রার্থনা করিলাম। উপাসনার পর সকালে জলযোগ করিলাম।

২০ অগ্রহায়ণ।। অদ্য হইতে প্রাতঃকালে খালি পেটে তেতো জিনিস খাইতে আরম্ভ করি ;

"আঁতে তেতো দাঁতে লুণ,
পেট ভরবে তিন কোণ্,
এ বেলা ও বেলা শৌচে যায়,
তার কড়ি কি বদ্দি খায় ?"

২১ অগ্রহায়ণ।। অদ্য প্রাতে কা—বাবু ও আমি আমরা উভয়ে ধাড়োয়ার দিকে গমন করি। রাস্তায় কা—বাবু চতুর্দিকস্থ সৌন্দর্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ দৃশ্য সুরুচির সহিত অতি বাগ্মিতা পূর্বক বর্ণনা ও তাহার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৈকালে ভ্রমণের সময় আমরা "শ্রীযুতের" সম্মুখে পড়ি। "শ্রীযুত" কোন মনুষ্য নহেন ; তিনি একটি চতুষ্পদ। বৈদ্যনাথের প্রকাণ্ড ষাঁড়ের নাম আমি "শ্রীযুত" রাখিয়াছি।

২৩ অগ্রহায়ণ।। বৈকালে বেড়াইবার সময় কা—বাবুর সঙ্গে অনুষ্ঠান লইয়া ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বলিলাম যে যখন প্রত্যেক ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্ম এখনও শ্রাদ্ধ বিবাহাদি গৃহ্য ক্রিয়ায় পৌত্তলিকতা ত্যাগ করতে পারেন নাই তখন ব্রাহ্মধর্মের যে কোন বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে না। তিনি বলিলেন যে বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলে কি হইবে? কাম ক্রোধাদি রিপুর উপাসনারূপ আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা ত্যাগই আসল পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ। ভিতরের উন্নতিই আসল উন্নতি। আমি বলিলাম যাহার ভিতরে সম্পূর্ণ উন্নতি হইয়াছে সে ব্যক্তি বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ না করিয়া কখন থাকিতে পারে না। সে ভিতরের উন্নতি অসম্পূর্ণ উন্নতি বলিতে হইবেক যাহাতে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতার সঙ্গে বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ হয় না।

২৬ অগ্রহায়ণ।। অদ্য প্রাতে কা—বাবু, আমি ও আ—সকালে কোন গোপের কুটীরের সম্মুখস্থিত উপবনের মধ্যে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত করি।

২৭ অগ্রহায়ণ।। অদ্য প্রাতে হে—বাবু ও সে—বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহাদিগের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব বিষয়ে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। কা—বাবু তখন উপস্থিত ছিলেন। হে—বাবু ও সে—বাবু উভয়ে সংশয়বাদী। সে—বাবু বলিলেন যে পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন এক্ষণে আর ব্রাহ্ম নহেন, এক্ষণে তিনি সংশয়বাদী। সে—বাবুকে আপনার মতে রাখা হে—বাবুর চেষ্টা; আমারদিগের উভয়ের চেষ্টা পুনরায় তাঁহাকে ব্রাহ্ম করা। আমি হে—বাবুর সম্মুখে সে—বাবুকে বলিলাম যে আপনাকে আহরিমান একদিকে টানিতেছে আর ওর্মস্‌জদ অন্যদিকে টানিতেছে। কা—বাবু বলিলেন যে মনুষ্য কেবল যুক্তি-শক্তি-সমন্বিত জীব নহে, তাঁহার সুখ কেবল যুক্তিবৃত্তির পরিচালনার প্রতি নির্ভর করে না। তাঁহার প্রকৃতির ভাববিভাগের উন্মেষের উপর তাঁহার সুখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ধর্ম যেমন মনুষ্যের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে পারে, এমন অন্য কিউ পারে না। এই কথাটি সে—বাবুকে বড় লাগিল। মিল সাহেব তাঁহার জীবনের শেষভাগে মানব প্রকৃতির ভাব বিভাগের পরিচালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া ছিলেন।

২৮ অগ্রহায়ণ।। অদ্য বৈকালে ধাড়োয়া নদীর দিকে বেড়াইবার সময় কা—বাবুর সঙ্গে অনুষ্ঠান বিষয়ক পুনরায় ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। তিনি বলিলেন পুত্রকন্যা স্বাধীন জীব। তাহাদিগের জ্ঞানের অপরিণত অবস্থায় তাহাদিগকে অনুষ্ঠানে ফেলা উচিত হয় না। পশ্চাৎ তজ্জন্য তাহারা অনুশোচনা করিয়া পিতাকে অভিসম্পাত করিতে পারে। আমি কিয়ৎ পরিমাণে এই কথার যথার্থতা স্বীকার করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিলাম। আমি বলিলাম সন্তানদিগকে যথার্থ পথে সংস্থাপন পিতার কর্তব্য। তাহার পর তাহারা যদি অন্য বিবেচনা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন?

১ পৌষ।। প্রাতে শ্যা— ও হ—বাবুদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বেন্থাম মিল ও জনসন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গল্প ও অন্যান্য অনেক কথোপকথন হয়।

৩ পৌষ।। অদ্য প্রাতে কা—বাবু ও আমি ও আ—, ও সে—, আমরা কয়জনে "জলসর" নামক কমল-কুমুদ-কহ্লার শোভিত বিস্তীর্ণ সরোবরের নিকটস্থ উপবনে উপাসনা করিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাই।

৪ পৌষ।। অদ্য বৈকালে কা—বাবু ও আমি আমরা উভয়ে ধারওয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। পথিমধ্যে কা—বাবু আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং অনধিকার-প্রশ্ন করার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আমি আমার অন্তরের অবস্থা অতি জঘন্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। কৃত্রিম বিনয়বশত বলিলাম না, যথার্থই বলিলাম।

৬ পৌষ।। অদ্য কা—বাবুর কলিকাতায় প্রত্যাগমন উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনার সময় তিনি দেওঘরে আমার সহবাস হইতে যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রার্থনা করেন, আমি আমার প্রার্থনাতে তাহার উত্তর দিলাম। আমি এই প্রার্থনাতে বলি যেখানে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ সেই প্রকৃত দেবগৃহ। অদ্য বৈকালে বেড়াবার সময় তাঁহার সহিত এই কথা হয়। "mens sana ia corpore Sano" healthy mind in a healthy body জন্য Sir Phillip Sydney যাহা বলিয়াছেন তাহা আবশ্যক।

"Great temperance open air
Easy labor, little care"

আর মনের সুস্থতা সম্পাদনজন্য ইন্দ্রিয়-দমন ও ধর্মানুষ্ঠান আবশ্যক।

৮ পৌষ।। অদ্য প্রাতে বালসার নামক সরোবরতটে ব্রহ্মসঙ্গীত হয়। আ—গান করেন। এই সময়ে শীত প্রযুক্ত সরোবরের পদ্মপুষ্পের বিশীর্ণ অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল।

অদ্য বয়েসী সাহেবের প্রণীত Langham Hall pulpit ii 39th Sermon পাঠ করি। এই সর্মণে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে নিউটেস্টেমেন্টে এমন ভাল কথা নাই যাহা ওল্ড টেস্টেমেন্টে নাই। এই "সর্মণটি" অতি কৌতূহলজনক প্রস্তাব।

৯ পৌষ।। অদ্য প্রাতে কা—বাবুর সঙ্গে ধাড়ওয়ার দিকে যাওয়া যায়। অদ্য তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাগমনের দিবস। তজ্জন্য তিনি মনের অসুখ প্রকাশ করিলেন, এস্থান পরিত্যাগ করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক দেখিলাম। প্রায় কাঁদো কাঁদো হইলেন, আর বলিলেন এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কলিকাতায় কোথায় দেখিতে পাইবেন। সেই নরকের ভিতর আবার যাইতে হইতেছে। বৈকালবেলা উহার কলিকাতা-যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলাম। তিনি অত্যন্ত কষ্টের সহিত আমার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। লোকটি অত্যন্ত হৃদয়বান। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একটি সংক্ষেপ পুরাবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। পুনরায় তাহা সংশোধন ও পরিবর্ধনপূর্বক তাঁহার ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।

১১ পৌষ।। অদ্য আমার কলিকাতার কোন স্থবির প্রিয় ব্রাহ্ম বন্ধু প্রণীত কোন গ্রন্থ তাঁহার প্রার্থনানুসারে সংশোধন করি।

১৩ পৌষ।। অদ্য বৈকালে শ্যা—বাবু ও হ—বাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। হ—বাবু আমার Common Place Book No vi হইতে Viscount Amberly's Analysis of Religious Belief নামক গ্রন্থ হইতে আমা দ্বারা উদ্ধৃত স্থান সকল ও কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহা উক্ত পুস্তকে প্রতিলিপিকৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। Viscount Amberly অজ্ঞতাবাদী (Agnostic) ছিলেন। তাঁহার পুস্তকের যে সকল অংশ আমার মতবিরুদ্ধ

নহে এবং যাহার লেখা উৎকৃষ্ট তাহা উক্ত Commoo Placc পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর নানা ধর্মের প্রকৃতি আলোচনায় ও তাহার পরস্পর তুলনা করণে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে তৎসম্বন্ধে অপক্ষপাতসূচক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

২০ পৌষ।। অদ্য আমি নিজ পরিবার ও প্রচলিত ধর্মানুসরণকারী একটি অতি নিকট সম্পর্কীয় ধনাঢ্য পরিবারের সঙ্গে দেবগৃহ হইতে তিন ক্রোশ দূরে তপোগিরি দেখিতে যাই। তথায় শিবমন্দিরের সম্মুখস্থিত অশোকবৃক্ষমূলে উপাসনা হয়। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম আমরা যেন ধর্মরূপ অশোকবৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া শোকরহিত হই। উপাসনার পর পর্বতের উপরিভাগের এক পার্শ্বস্থিত বাটীতে চিদঘন চৈতন্য নামক এক অশীতিপর বৃদ্ধ যোগীর সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের আলাপ হয়। হস্তামলক গ্রন্থ লইয়া অনেক কথা হইল। তপোগিরি দেখিতে অতি রম্য। যোগীর আশ্রম দেখিয়া বোধ হইল ঋষি ও মুনি এখনো ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হন নাই। আশ্রমটি অতীব শান্তিরসাস্পদ। দেখিলাম যোগীর শিষ্যেরা সেইকালের ঋষিদিগের শিষ্যের, ন্যায় যোগীর উপজীবিকার জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ ও গোপালন করেন।

২৮ পৌষ।। অদ্য প্রাতে "সর্কিটহৌসের" দিকে সপরিবারে বেড়াইতে যাই। তথাকার একটি ক্ষুদ্র পর্বতের উপর আমরা উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকস্থ অতি মনোহর দৃশ্য দর্শন করি। ছেলেরা "নিমাই, নিমাই" এই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চস্বরে বলিয়া প্রতিধ্বনি জাগরিত করিতে লাগিল। অদ্য বৈকালে হ—বাবুর জাতীয় সঙ্গীত গাওনা শুনিতে যাই। এই গাওনা হইবার পূর্বে ১৭৯৮ শকের কার্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত আমার রচিত "ভারতের প্রাচীন কীর্তি" শিরস্ক প্রবন্ধ পাঠ করি। সকলেই তাহা শুনিয়া আর্দ্র হইলেন। বলিলেন ঐ প্রস্তাবের উপসংহার অংশ শুনিয়া তাহাদিগের চক্ষে জল পড়িল। ইহার পর হ—বাবু জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন। তিনি যে সকল গীত গাইলেন যমুনার প্রতি উক্ত আগ্রার গোবিন্দবাবুর বিচরিত গীতটি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হইল।

২৯ পৌষ।। অদ্য সন্ধ্যার সময় যা—বাবুর সঙ্গে বেড়াই। যা—বাবুর কথোপকথন হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার বিলক্ষণ কথোপকথনের ক্ষমতা আছে। কথোপকথনের ক্ষমতা একটি স্বতন্ত্র ক্ষমতা। অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যাঁহাদিগের অন্য বিষয়ে ক্ষমতা আছে কিন্তু এ বিষয়ে নাই।

৩০ পৌষ।। অদ্য প্রাতে শ্যা—বাবু ও চ—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। চ—বাবুর নিকট "রামজী উল্‌টো বুঝিলেন" এই গল্প করা হয়, তাহলে বিলক্ষণ হাসি হয়। কোন ব্যক্তি একটি ঘোড়ার জন্য রাস্তায় বসিয়া রামজীর তপস্যা করিতেছিল। সেই সময়ে ফৌজ যাইতেছিল। সেই ফৌজের কোন সিপাহীর ঘোটক পীড়িত হইয়া চলৎশক্তি রহিত হয়, সিপাহী সেই ঘোড়া তপস্বীর ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়া যায়, তাহাতে সে ব্যক্তি বলিল "রামজী উল্‌টো বুঝিলেন, কোথায় আমি ঘোড়ার উপর যাইব তা না হইয়া ঘোড়া আমার উপর চলিল"। (*এই গল্প করা অবধি "রামজী উলটা বুঝিলেন" এই বাক্য এখানকার

ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একপ্রকার জনসাধারণ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে।)

২ মাঘ।। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া দীনতীরে গিয়া তাহার উপকূলস্থ শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল ঈশ্বর-চিন্তা করি। অদ্য বয়েসী সাহেবের একটি "সার্মণ" পাঠ করি। এই সার্মণে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রকৃত ধর্মভাবসম্বন্ধে নিউটেস্টেমেন্ট অপেক্ষা ওল্ডটেস্টেমেন্ট উৎকৃষ্ট।

৩ মাঘ।। অদ্য বয়েসী সাহেবের সার্মণ Langham Hall Pulpit Vol ii, No. 1.41.42 পাঠ করি। ৪২ সংখ্যক সার্মণে প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) দিককে বিলক্ষণ আড়ে হাত লওয়া হইয়াছে।

৫ মাঘ।। অদ্য মধ্যাহ্নে মাস্টারদিগের বাসায় দেবগৃহের অনেকের সঙ্গে একত্রে আহার করি। বৈকালে কথোপকথন সভা হয়। এই সভা নানা বিষয়ে কথোপকথন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপাতত সামাজিক বিষয়ে কথোপকথন হইতেছে। কিন্তু ক্রমে ধর্মপ্রসঙ্গ আনিবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি উক্ত সভায় জাতিত্বের উপাদান বিষয়ে বলি। আমি বলিলাম যে (১) শারীরিক লক্ষণ (২) পরিচ্ছদ (৩) দেশ (৪) রাজনৈতিক অবস্থা (৫) মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতি (৬) আচার ব্যবহার (৭) ধর্ম (৮) ভাষা (৯) অতীত পুরাবৃত্ত জাতিত্বের উপাদান। কিন্তু ইহার মধ্যে ভাষা সর্বাপেক্ষা স্থায়ী তাহা বিলুপ্ত হইলে জাতিত্বের কোন চিহ্নই থাকে না।*

(* এই বক্তৃতার মর্ম ৫০ ব্রাহ্মসম্বতের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালী জাতি" এই শিরস্কে প্রকাশিত হইয়াছে।)

৭ মাঘ।। অদ্য Theosophist পাঠ করি। এই সাময়িক পত্রিকাটি অতি চমৎকার। ছেলেবেলা ঠাকুরমার মুখে যেরূপ মহাপুরুষের ও ভূতের গল্প শুনিতাম সেইরূপ ইহাতে দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক, যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত যোগীর অলৌকিক ক্ষমতাতে আমার কিছু বিশ্বাস আছে। ভূকৈলাসের যোগী তাহার প্রমাণ। কর্ণেল অল্কট্ কিছু উৎকেন্দ্র (eccentric) ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার ভারতবর্ষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও তাহার উন্নতিসাধন জন্য যত্নকে প্রশংসা করিতে হইবে। আর তিনি যোগের ও মেস্মর তত্ত্বের মাহাত্ম্য বিষয়ে যাহা বলেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে অমূলক নহে।

১১ মাঘ।। অদ্য বৈকালে ১১ মাঘ উপলক্ষে আমার আলয়ে উপাসনা হয়। তাহাতে নগরস্থ সকল বাঙালী ভদ্রলোক ও পাণ্ডাবংশীয় গিরিজানন্দবাবু উপস্থিত থাকেন। এই উপাসনা উপলক্ষে যে বক্তৃতা করি সেই বক্তৃতাতে প্রথমে ১১ মাঘ দিবস রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহপ্রবেশের দিবস বলিয়া উক্ত মহাত্মার গুণ কীর্তন করি। তৎপরে ব্রাহ্মধর্মের অভাবাত্মক মত ও ভাবাত্মক মত সকল বিবৃত করি। অত্রত্য অনেকে ব্রাহ্মধর্মের মত বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া এইরূপ করি। ব্রাহ্মধর্মের অভাবাত্মক মত—

(১) সকল প্রকার পৌত্তলিকতার অভাব, নানা কল্পিত দেবদেবীর উপাসনার অভাব, শিখদিগের ন্যায় গ্রন্থপূজার অভাব, অবতারে বিশ্বাসের অভাব, প্রত্যাদেশে বিশ্বাসের অভাব।

(২) ঈশ্বর বিষয়ে ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক মত এই যে ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার, অনন্তদেশব্যাপী, অনন্তকালস্থায়ী, অনন্তজ্ঞানবিশিষ্ট, অনন্তশিক্তিবিশিষ্ট এবং অনন্তকরুণাবিশিষ্ট। পরকাল বিষয়ে তাহার মত এই যে আত্মার অনন্তকাল ক্রমশ উন্নতি হইবে এবং আত্মপ্রসাদই স্বর্গ, আত্মগ্লানিই নরক। কর্তব্য বিষয়ে ঐ ধর্মের মত এই যে ঈশ্বরে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করা কর্তব্য। ঈশ্বরে প্রিয়কার্য সাধন বিষয়ে বলিবার সময় একটি গল্প করি। ইটালী দেশীয় কাউন্ট উপাধিকারী কোন ব্যক্তি নানাকারণে মানব জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মহত্যা-মানসে, নদীর সেতু হইতে নদীতে যেমন পড়িতে যাইবেন পশ্চাদ্দেশ হইতে কোন দরিদ্র বালক তাঁহার কোর্তার কিনারা ধরিল টানিল ও আর্তস্বরে বলিল, "আমার পিতামাতা অদ্য দুই দিবস কিছু খাইতে পান্ নাই আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু দিউন।" "কোথায় তোমার পিতামাতা দেখাইয়া দাও" এই বলিয়া বালকের সঙ্গে কাউন্ট চলিলেন। বালকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাহার পিতামাতা অনাহারে যথার্থই মৃতকল্প। তিনি তাহাদিগের দুঃখমোচনার্থে কিছু অর্থ প্রদান করাতে তাহারা সকলে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এই উপকার কার্য সাধন করিয়া কাউন্ট অপরিসীম বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিলেন এবং কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন, "আমি কী নির্বোধ! এমন সুখের আকর পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলাম।" পরোপকার বিষয়ে বলিয়া সাধারণত ধর্মের দুঃখ-সান্ত্বনাকারী গুণ, মানব প্রকৃতির ভাবাংশ অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির চরিতার্থতা ব্যতীত মনুষ্য কখন সুখী হইতে পারে না এবং তাহাদের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন কেবল ধর্মেতেই হয় এবং যেমন আমাদিগের সকল নৈসর্গিক অভাব মোচন জন্য নৈসর্গিক বিধান আছে, ক্ষুধার বিষয় যেমন অন্ন আছে, তেমনি প্রীতি ও ভক্তিবৃত্তি ও পূর্ণ নিত্য সুখের ইচ্ছা-পরিতৃপ্তিকারী—ঈশ্বর ও পরকাল আছে এই সকল বিষয়ে বলি, পরিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ দ্বারা আশীর্বাদ করি বক্তৃতা সমাপন করি।

"ধর্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাম্।
সহ্যেক-এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা
নৈবাত্মভাবমু পযান্তি ন চ স্থিরত্বং॥"

"সতত উদ্‌যোগী শীল তোমাদিগের ধর্মে মতি হউক, পরলোক-গমন কালে সেই ধর্মই একমাত্র বন্ধু। অর্থ এবং স্ত্রী অতি নিপুণতার সঙ্গে সেবিত হইলেও কখনও আপনার হয় না; তাহাদের কোন স্থিরতাও নাই।"

১২ মাঘ।। অদ্য সাম্বৎসারিক উৎসব উপলক্ষে ভোজ দেওয়া যায়। অদ্য ভারতীয় ও হিন্দুধর্ম বিষয়ে ঢাকার জজবাবু গঙ্গাচরণ সরকারের বক্তৃতা পাঠ করি। এই বক্তৃতাতে হিন্দুধর্ম বিষয়ে জ্ঞান বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখাও বাগ্মিতাসূচক।

১৪ মাঘ।। অদ্য ''নববিভাকর'' ''এডুকেশন গেজেট'' ''তত্ত্বকৌমুদী'' ও ''ধর্মতত্ত্ব'' পাঠ করি। এক্ষণে ''তত্ত্বকৌমুদী'' ও ''ধর্মতত্ত্বে'' বিলক্ষণ বিবাদ চলিতেছে।

''প্রথমে বিবাদ ছিল, বিবাদ ব্রাহ্মধর্মের সহিত ছিল, বিবাদই ব্রাহ্মধর্ম।''

১৫ মাঘ।। অদ্য ''কলিকাতা গেজেটে'' প্রকাশিত নূতন প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠ করি। তাহারি মধ্যে দেখিলাম আমার প্রণীত একটি পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের সংক্ষেপে সমালোচনা আছে। এই পুস্তক লর্ড নর্থব্রুকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে; তিনি উহা ইংরাজিতে তর্জমা করাইয়া লয়েন।

১৮ মাঘ।। অদ্য প্রাতে স্কুল গৃহে যাই। অনেক প্রধান শিক্ষক মহাশয়দিগের সঙ্গে ও অ—বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। রামমোহন রায় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে কথা হয়। অ-বাবু গল্প করিলেন যে তিনি তাঁহার পিতা সবর্ডিনেট জজ সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছেন যে হুগলি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সদারলণ্ড সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় যে-জাহাজে বিলাতে গিয়াছিলেন সেই জাহাজে আমি ছিলাম। রামমোহন রায় জাহাজে দুইটি গরু সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাহেবদের সঙ্গে খানা না খাইয়া তাহাদের দুধ খাওয়াইতেন। রামমোহন রায় বিলাতে প্রথম গিয়া সাহেবদিগের সঙ্গে খানা খাইতেন না। পরে নানা কারণে খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থাতে নানা, পরোপকারজনক কার্য সম্পাদন জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন।

১৯ মাঘ।। অদ্য প্রাতে ধাড়োয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। অদ্য অপরাহ্নে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাসায় কথোপকথন সভা হয়। তাহাতে কথোপকথনের পূর্বে তাহার সাহায্য স্বরূপ বাঙালির জাতিত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ ছিল। দুর্বলতা প্রযুক্ত অধিক বলিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম গতবারের সভায় সাধারণত জাতিত্বের যে সকল উপাদান বিবৃত করি তাহাতে বাঙালি জাতি অতি হীন, দেশ মেলেরিয়া আক্রান্ত, শারীরিক প্রকৃতি দুর্বল, মানসিক প্রকৃতি সাহস ও রোক জেদ্‌বিহীন, রাজনৈতিক অবস্থা পরাধীন। আমি ধর্ম বিষয়ে বলিলাম যে আমাদিগের দেশের সাকারবাদিদিগের ধর্মে, বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে এবং ব্রাহ্মেরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছেন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে বলিলাম যে সমাজ-সংস্কারে হিন্দুভাব রক্ষা করা কর্তব্য কিন্তু তাহা হইতেছে না। সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার হিন্দুভাব যাইতে পারে। এমন কি জাতিবিভেদ প্রথা পর্যন্ত হিন্দুভাবে সংস্কার করা যাইতে পারে। আচার ব্যবহারের বিষয়ে বলিবার সময় বলিলাম সকল জাতির একটি নির্দিষ্ট

পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু বাঙালি জাতির কোন নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোন মজলিশে যাও নানা প্রকার পোষাক দেখিতে পাইবে। ভাষার বিষয় বলিবার সময় বলিলাম যে বর্তমান বাংলাসাহিত্য কেবল ইংরাজি অনুকরণে পরিপূর্ণ।

সকলের হতাশ হইবার বিষয় কিন্তু হতাশ হওয়া কর্তব্য নহে। অধ্যবসায় সহকারে উক্ত প্রতিবন্ধক সকাল নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য।

গবর্নমেন্টকে মেলেরিয়ার কারণ দূর করিবার বিষয়ে সর্বদা উত্তেজিত কর্তব্য। এ বিষয়ে ক্রমাগত তাঁহাদিগের পিছু লাগিয়া থাকা কর্তব্য। ইহার প্রতি অবশেষে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু মনোযোগ নামমাত্র। এ বিষয়ে ক্রমান্বয়িক আন্দোলন আবশ্যক।

বাঙালির দুর্বলতা নিরাকরণ জন্য পুষ্টিকর দ্রব্যভক্ষণ ও ব্যায়ামাগার সংস্থাপন আবশ্যক। তাহাদিগের মানসিক প্রকৃতির উন্নতি সাধন জন্য তাহাদিগকে সাহস অবলম্বন ও অধ্যবসায় অভ্যাস করিতে সর্বদা উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য ইংলণ্ডে স্থায়ী প্রতিনিধি রাখিয়া তথাকার নগরে নগরে আন্দোলন করা কর্তব্য। ধর্মবিষয়ে অবস্থা উন্নতি জন্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার আবশ্যক। প্রকৃত হিন্দুধর্মই ব্রাহ্মধর্ম। হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া সকল প্রকার সমাজ সংস্কার করা কর্তব্য। সাহিত্য রচনাতে ক্রমে ক্রমে ইংরাজি অনুকরণ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এই সকল বিষয়ে বলিয়া বাঙালির অতীত জাতীয় গৌরবের ও ভাবী উন্নতির বিষয় বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি। বাঙালীর অতীত জাতীয় গৌরবের বিষয় বলিবার সময় বঙ্গরাজ দেবপাল দেবের দিগ্বিজয়, বঙ্গরাজ কুমার বিজয়সিংহ দ্বারা সিংহলবিজয় বঙ্গদেশের বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় বাঙালীদিগের সমুদ্রযাত্রা ও তাহাদিগের দ্বারা নানা উপনিবেশ সংস্থাপন ইত্যাদির উল্লেখ করি।* (*এই বক্তৃতার মর্ম ৫১ ব্রাহ্মসম্বতের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ''জাতিত্বের উপাদান ও বাঙালি জাতি'' শিরস্ক প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে।)

২১ মাঘ।। অদ্য ইংরাজী সংবাদপত্রে Trades Association সভার খানার বক্তৃতা পাঠ করি। সেগুলি অতি ঔৎসুক্যজনক ও উৎকৃষ্ট। ইংরাজের প্রাণ যেমন আহারের পর খুলে এমন অন্য সময়ে নহে।

২২ মাঘ।। অদ্য সন্ধ্যার সময় শিক্ষকদিগের বাসায় যাই, তথায় উত্তম বিষয়ে কথোপকথন ও গল্প হয়। অ-বাবু গল্প করিতে বিলক্ষণ পটু। গল্প গুছাইয়া করার জন্য বিশেষ পটুতা চাই। বলিবার দোষে গল্প খারাপ হইয়া যাই।

২৩ মাঘ।। অদ্য ডেপুটি মেজিস্ট্রেট বান্ধববর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্তের প্রণীত ''শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা'' পাঠ করি। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকর্তা আমাদিগের পুরাণ হইতে সত্য পুরাবৃত্ত উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছেন। এই চেষ্টা অতীব প্রশংসাযোগ্য। আমার বিশ্বাস এক একটি বৃক্ষ যেমন একটা এরূপ লতায় পরিবেষ্টিত থাকে যে নিজবৃক্ষকে দেখা যায় না

সেইরূপ আমাদিগের পুরাণে সত্যপুরাবৃত্ত রূপক-লতাপুঞ্জ দ্বারা আবৃত আছে। সেই লতা ছাড়াইয়া সত্য পুরাবৃত্তে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কেদারবাবু পূর্বে ইউনিটেরিয়ান ছিলেন। এক্ষণে একান্ত বিশ্বাসের বাধ্য হইয়া চৈতন্যমতাবলম্বী হইয়াছেন। যিনি একান্ত বিশ্বাসের বাধ্য হইয়া আপনার ধর্মমত পরিবর্তন করেন তিনি সম্মানের উপযুক্ত। আমাদিগের বর্তমান গর্বনর জেনেরেল লর্ড রিপন এজন্য যথেষ্ট সম্মানযোগ্য।

২৬ মাঘ।। অদ্য অপরাহ্নে স্কুলগৃহে কথোপকথন সভা হয়। আমি কথোপকথনের সাহায্য স্বরূপ তাহার পূর্বে হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন বিষয়ে বলি। আমি ধর্ম বিষয়ের ঐক্যসাধন রাজনৈতিক বিষয়ের ঐক্যসাধন এবং সামাজিক বিষয়ে বলি। ধর্ম বিষয়ের ঐক্যসাধন বিষয়ে বলি যে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচলিত সংশয়বাদ সাধারণ ধর্ম হইতে পারে না। উহা ধর্ম নহে। একটি ধর্ম আবশ্যক। হিন্দু সমাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা। হিন্দু সমাজের বিদ্বান লোক ব্রাহ্ম হইতে ও অবিদ্বান লোক পৌত্তলিক থাকিতে পারে কিন্তু দুই সমাজের বিদ্বান লোক ব্রহ্ম হইতে ও অবিদ্বান লোক পৌত্তলিক থাকিতে পারে কিন্তু দুই শ্রেণীই হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে ঐক্য রক্ষা করিতে পারেন। বস্তুত ব্রাহ্ম ধর্ম ও সাকার উপাসনা উভয়ই হিন্দু ধর্ম। ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দুদিগের সার ধর্ম। ধর্ম বিষয়ে ঐক্য সকল ঐক্য স্থাপনের মূল। কতকগুলি ব্রাহ্ম যে আপনাদিগকে হিন্দু বলেন না ইহা আমাদিগের দেশের সম্বন্ধে একটি মহাবিপদ জ্ঞান করা কর্তব্য। সামাজিক ঐক্য সাধন বিষয়ে বলি যে আমাদিগের মধ্য হইতে প্রদেশীয় বিদ্বেষ ভাব দূরীভূত হওয়া কর্তব্য। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে বাঙালী হিন্দুস্থানীকে, হিন্দুস্থান বাঙালীকে, এমনকি বঙ্গদেশের এক অংশের লোক আর অংশের লোককে যেমন বিক্রমপুরের লোক মৈমনসিংহের লোককে কলিকাতার লোক মেদিনীপুরের লোককে ঘৃণা করে। এই বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইয়া প্রীতিভাব সঞ্চারিত হওয়া কর্তব্য। এই প্রীতি ভাবের সঞ্চারের প্রথম উপায় পরস্পরের মানসিক অভাব পরস্পরের দ্বারা মোচন করা এবং দ্বিতীয় উপায় উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হওয়া। বাঙ্গালী জাতির দুর্বলতা হিন্দুস্থানীর বলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ দ্বারা নিরাকৃত ও হিন্দুস্থানীর নিশ্চেষ্টতার ও আন্দোলন-প্রিয়তার অভাব বাঙ্গালীর আন্দোলন-প্রিয়তার (বাঙ্গালী অতি হুজুকে জাতি) দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং হিন্দুস্থানী লালা ও বাঙ্গালী কায়স্থের মধ্যে বিবাহ হওয়া কর্তব্য। এই প্রকার অসবর্ণ বিবাহ অত্যন্ত প্রার্থনীয়। হিন্দুজাতির ঐক্য সাধনের অমূল্যফল ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। এই বিষয় বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি।* (*এই বক্তৃতার মর্ম ৫১ ব্রাহ্ম সম্বতের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে হিন্দু জাতির ঐক্য সাধন শিরস্ক প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে।)

২৯ মাঘ।। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে

অ-বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তাঁহার সহিত "Pantheism" অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বিষয়ে কথোপকথন হয়। আমি বলিলাম যে আমি নিজে Pantheist নহি, তথাপি এ বিষয়ে "আমার বক্তব্য এই যে Pantheism-কে আমরা এত ভয় করি কেন? যেন ষাঁড় গুঁতুতে আসিতেছে। যদি Pantheism সত্য হয় তবে কেন আমরা Pantheist হইব না? খ্রীষ্টিয়ান মিসনারিরা আমাদিগের মধ্যে এই ভয়ের প্রথম সঞ্চার করেন কিন্তু বাইবেলও তাঁহারা যাহা Pantheism বলেন তাহা আছে। "In Him we live, move and have our being." "Who filleth all in all." এইরূপ Pantheism-এ এবং আমাদিগের উপনিষদের Pantheism-এ আমার বিশ্বাস আছে কিন্তু বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদে আমার বিশ্বাস নাই।

২ ফাল্গুন।। অদ্য সন্ধ্যার সময় প্রধান শিক্ষকের বাসায় যাই। সেইখানে অনেক বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। ইঁহারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এইখানে জমেন। ইহার মধ্যে পূর্বে অনেকে ব্রাহ্মণ ছিলেন। যাঁহারা পূর্বে ব্রাহ্ম ছিলেন এক্ষণে ব্রাহ্ম নহেন তাঁহাদিগকে আমি ফেরার ব্রাহ্ম বলিয়া থাকি। অ-বাবু পরলোকগত কাশীশ্বর মিত্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অ-বাবুর বাটী চুঁচুড়া। কাশীশ্বর বাবু তখন হুগলী সদরআলা ছিলেন। অ-বাবু বলিলেন, তিনি সকল সমাজে যাইতেন কিন্তু কখন চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই। চ-বাবু বলিলেন যে তিনি পাটনায় বাবু ঈশানচন্দ্র সিংহের ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন। শ্যা-বাবু বলিলেন যে তিনি কেশববাবুর সংকীর্তনে বাহির হইতেন ও দুই একবার উৎসব দিবসে উপবাসও করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম যে বঙ্গদেশে প্রায় এমন কৃতবিদ্য ব্যক্তি নাই কখন এক সময় সংস্রব না ছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে সে সংস্রব স্থায়ী হয় না।

৪ ফাল্গুন।। অদ্য দুই প্রহর তিনটার সময় প্রধান শিক্ষকের গৃহে কথোপকথন সভা হয়। তাহাতে Pope's Essay on Criticism হইতে কিয়দংশ Dryden's Alexander's Feast সম্পূর্ণ এবং Shakespeare's Macbeth খানিক পাঠ করি। আমারদিগের শিক্ষক পুরাতন হিন্দু কলেজের Captn Richardson যেমন এই সকল কবিতা পাঠ করিতেন সেইরূপ পাঠ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। Captn Richardson-কে স্মরণ হইলে মন কি উদ্বেলিত হয়। অমন ইংরাজি কবিতা পাঠক ও ব্যাখ্যাতা ও অমন অমায়িক লোক আমরা কখন দেখি নাই। সভায় হুগলির একটি উকিল উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে ছ আনা সংশয়বাদী ও দশ আনার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কিন্তু সে বিশ্বাস অবিশ্বাস মাত্র। মুসলমানদিগের মধ্যে নিরূপিত সময়ে নমাজ প্রথা থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে কেমন একটি ধর্মবন্ধন আছে, এরূপ ধর্মবিশ্বাস আমাদিগের মধ্যে না থাকা কি দুঃখের বিষয়। কি প্রকারে ধর্মবন্ধন হইতে পারে ইহা ভাবিয়া আমি আকুল। আমি বলিলাম যে উপাসনা প্রণালী ও ধর্মবন্ধনের অন্যান্য উপায় আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা নির্দেশিত

হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিলেই হয়। অদ্য বৃষ্টি হয়। কর্ণরোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ কর্ণে কিছু শুনিতে পাই না। একমাস হইল পুনর্বার কর্ণরোগ হইয়াছে।

১০ ফাল্গুন।। অদ্য মধ্যাহ্নে "সাধারণী"র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এবং "কল্পতরু" প্রণেতা ও "পঞ্চানন্দ" সম্পাদক সুযোগ্য উকিল ও লেখক শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন।

১৪ ফাল্গুন।। অদ্য প্রাতে চ-বাবু ও ডা-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। চ-বাবুকে কথায় কথায় বলিলাম যে যাত্রীরা যখন "বাবা বৈদ্যনাথ" বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া উঠে তখন আমার বুক ঝনাৎ করিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সকল মনুষ্যর পিতা (the all Father) ঈশ্বরের প্রতি মন যায়। এই কথা বলিবার উপলক্ষে তাঁহার সহিত ধর্ম বিষয়ে অনেক কথা হয়। আমি বলিলাম যে ধর্মের প্রতি এক্ষণকার কৃতবিদ্যদিগের কিছুমাত্র আস্থা নাই এবং গোঁড়া হিন্দুদিগের মধ্যেও ধর্ম বিষয় অতি শিথিল হইয়া আসিতেছে, বিশেষত বঙ্গদেশে এইরূপ হইতেছে। ইহা অতি শোচনীয় ব্যাপার। তৎপরে ডা-বাবুর ওখানে যাই তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময় তিনি বলিলেন যে আমরা সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার কার্য সম্পাদন করিব কিন্তু হিন্দু নাম কখনও পরিত্যাগ করিব না। তিনি বলিলেন হিন্দু ভাব পরিত্যাগ না করিয়া অসবর্ণ বিবাহ পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। তিনি কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করিলেন। তখন বলিলেন যে এইরূপ অসবর্ণ বিবাহ দিতে দিতে ইংরাজীদিগের সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহা হইলে হিন্দু জাতি উভয় জাতির দোষের অধিকারী একটি ঘৃণাকর ফিরিঙ্গি জাতিতে পরিণত হইয়া একেবারে হিন্দু জাতির মর্যাদার বিলোপ সাধন করিবে। যদি অসবর্ণ বিবাহ একান্ত ঠিক হয় তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দু রীত্যনুযায়ী অনুলোম পদ্ধতি অনুসারে দেওয়া কর্তব্য কিন্তু তাহা করিবার পূর্বে এইরূপ বিবাহ আমাদিগের শাস্ত্রসম্মত তাহা স্বদেশীয় লোকদিগকে দেখাইয়া তাহাদিগের মধ্যে এই বলিয়া প্রথমে একটি সাধারণ আন্দোলন উৎপাদন করা কর্তব্য। তাহা হইলে সাধারণ হিন্দু সমাজে ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইবার সম্ভবনা নতুবা খ্রীষ্টানী দলের মতন কেবল নব্য ব্রাহ্মদলে তাহা বদ্ধ হইয়া থাকিবে।

১৯ ফাল্গুন।। অদ্য প্রাতে চ-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, সেখানে চ-বাবুর স্বগ্রামবাসী ভাগলপুর প্রবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল। লোকটির কথোপকথনে ও চিকিৎসা প্রণালীতে নতুনত্ব আছে। তিনি চিকিৎসা করিয়া বিলক্ষণ ধনোপার্জন করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া বিশেষ আমোদিত হইলাম। ধর্মমতে বাউল ও দরবেশদিগের সঙ্গে তাঁহার অনেক সহানুভূতি আছে। বাউল ও দরবেশাদিগের গানে স্থানে স্থানে অতি চমৎকার চমৎকার ভাব আছে।

২২ ফাল্গুন।। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। সন্ধ্যার সময়

চ-বাবুর বাসায় যাওয়া যায়। সেখানে পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে পানদোষের প্রাবল্য ও মদ্যপান জন্য সভ্যতাভিমান ও ইংরাজি ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে আমাকর্তৃক সুরাপাননিবারণী সভা সংস্থাপন ও তজ্জন্য তথাকার মাতালদিগের দ্বারা আমার বিলক্ষণ পীড়ন এই সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গল্প হইল। ঐ সভা বঙ্গদেশে সংস্থাপিত প্রথম সুরাপাননিবারণী সভা। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার কর্তৃক কলিকাতায় এরূপ সভা সংস্থাপন হইবার পূর্বে উহা সংস্থাপিত হয়। ঐ সভার অনুষ্ঠান পত্রে লিখিত ছিল যে পরিমিত মদ্যপান করা কেমন, না বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা। ঐ ছিদ্র ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া সর্বনাশ সাধন করে। মেদিনীপুরে এই সুরাপাননিবারণী সভা জন্য আমার যত পীড়ন হয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য তত হয় নাই। এক্ষণকার কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল সভার সভাপতি হারিসন সাহেব তখন মেদিনীপুর ও অন্যান্য দেশের স্কুল ইনিস্পেকটার ছিলেন। মেদিনীপুরের মাতালেরা তাঁহার নিকট আমার দুর্নাম করিয়া একটি দরখাস্ত করে। তাহাতে আমার সম্বন্ধে একটি চমৎকার ইংরাজী প্রয়োগ ছিল "He is a fanatic" অর্থাৎ তিনি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি। মাতালেরা এ দরখাস্তে বলিয়াছেন আমি সমস্ত দিন স্কুলে ছাত্রদিগকে না পড়াইয়া কেবল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করি কিন্তু বস্তুত একথা সম্পূর্ণ রূপে অমূলক। স্কুলের সময় আমি ধর্ম বিষয়ে কোন প্রসঙ্গই করিতাম না। ঐ সময়ের কলিকাতাবাসী পরলোকগত তখনকার হিন্দু সমাজ চূড়ামণি বঙ্গদেশের প্রথম কে.সি.এস.আই-এর পৌত্র মেদিনীপুরে ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাকে আমার দলে আনাতে মাতালেরা আমার উপর বিশেষ চটিয়া ছিল, যেহেতু তাঁহার বাসা তাহাদিগের বিশেষ আড্ডা ছিল। তিনি যখন মদ্যপান পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া আপনার সহধর্মিণীকে তাহা অপর্ণ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে তুমি আমাকে লাখ টাকা দিলে যত না আমি সুখী হইতাম এই ক্ষুদ্র কাগজটি দেওয়াতে আমি তদপেক্ষা সুখী হইলাম।

২৫ ফাল্গুন।। অদ্য সন্ধ্যার সময় গ-বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, সেই সময়ে পাণ্ডাবংশীয় কৃতবিদ্য ও ব্রাহ্মধর্মানুরাগী গিরিজানন্দবাবু উপস্থিত ছিলেন। বৈদ্যনাথ ও বৈদ্যনাথের মন্দিরের প্রাচীনতা বিষয়ে অনেক কথা হইল। গ-বাবু বলিলেন যে উক্ত মন্দির প্রথমে বৌদ্ধ মন্দির ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গিরিজানন্দবাবু আমাকে বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আমার দৃষ্টি জন্য পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন।

২৮ ফাল্গুন।। অদ্য প্রাতে নিকটস্থ গ্রাম রোহিণীর দিকে বেড়াইতে যাই। পথিমধ্যে দেখিলাম একজন বৈদ্যনাথের যাত্রী প্রতি পদনিক্ষেপে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যাইতেছে। শুনিতে পাইলাম সে বহু দূর হইতে এইরূপ করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মধর্মের জন্য ব্রাহ্মদিগের এইরূপ কষ্ট স্বীকার যদি শতাংশের একাংশ থাকিত তাহা হইলে

কি না হইত। মধ্যাহ্নে কল্যকার "Statesman" পাঠ করি। তাহাতে বিলাত হইতে মেং লালমোহন ঘোষের প্রত্যাগমনের পর অভিনন্দনার্থ টৌনহলে যে সভা হয় তাহাতে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয় এরূপ যুক্তিযুক্ত এবং প্রকৃত বাগ্মিতা ও স্বাধীন ভাবসূচক অথচ সকল দিকরক্ষাকারী বক্তৃতা পরলোকগত রামগোপাল ঘোষ ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালী দ্বারা দেওয়া হইয়াছে কি না সন্দেহ। শুনিলাম লালমোহন বাবুর বলিবার ধরনও চমৎকার। সাধারণতঃ আমাদিগের দেশের বক্তারা কেবল চেঁচানো প্রকৃত বক্তৃতা মনে করেন। এরূপ বক্তাদিগকে কম্বক্তা বলিলে হয়। অদ্য বয়সী Voysey সাহেবের "Peternoster" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা পাঠ করি। ঐ বক্তৃতার যেখানে ঈশ্বরে আত্মার্পণ যথার্থ প্রার্থনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে সেই স্থান পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। সকল প্রার্থনা অপেক্ষা "তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক" এই প্রার্থনা সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন আত্মার এইরূপ অবস্থা হয় যে এই প্রার্থনা অহরহ তাহা হইতে স্বতঃই উত্থিত হয় তখন আর কোন প্রার্থনার আবশ্যক করে না। কিন্তু কয়টি লোকের আত্মার অবস্থা এইরূপ? কেবল এই প্রার্থনার উপর নির্ভর করিতে সাধারণ লোককে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না। তাহাদিগের জন্য, আমাদিগের সকলেরই জন্য, সচরাচর প্রার্থনা যাহাকে বলে তাহা আবশ্যক।

৩০ ফাল্গুন।। অদ্য ডাক্তারদের ওখানে ভোজে উপস্থিত থাকি। তিনি আমার প্রফুল্ল স্বভাবের কথা উল্লেখ করিলেন। আমি বলিলাম আমার প্রকৃত স্বভাব বিষাদময়। দেখিতে প্রফুল্ল মাত্র। বিষাদ রূপ মেঘের উপর প্রফুল্লতা রূপ বিদ্যুৎ খেলা করে। আমি প্রকৃত ব্রাহ্ম নহি। যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম তাঁহারা সদানন্দ স্বভাব। "সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ।" "সেই আনন্দকর পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সদাই আনন্দিত থাকেন।" যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম অথচ বৃদ্ধ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পারশ্য কবি সেখ সাদির কথা খাটে।

"বার্দ্ধক্যের তুষার আমার মস্তকের উপর স্থান অধিকার করিয়াছে কিন্তু আমার স্বভাব যৌবন-সুলভ আনন্দ করিতেছে।"

অদ্য "Statesman" পত্রে "Anglo Indian Grievance" শিরস্ক প্রস্তাব পাঠ করি। উহা একটি সাহেবের লিখিত। প্রস্তাব-লেখক বলেন যে বালকদিগকে পিতা মাতার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধান হইতে দূর করিয়া বিলাতে শিক্ষার্থে পাঠানো ভাল রীতি নহে।

২ চৈত্র।। অদ্য Theosophist পত্রিকার "A Turkish Effendi on Christendom and Islam" শিরস্ক একটি অতি কৌতূহলজনক প্রস্তাব পাঠ করি। তাহাতে তুরস্ক দেশীয় উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেন যে ইউরোপের বর্তমান ধর্ম

"not christianity but Anti Christianity" খ্রীষ্টিয় ধর্ম নহে, অখ্রীষ্টিয় ধর্ম, ইউরোপের এক্ষণকার ধর্ম স্বার্থপরতা ও ধনলিপ্সা। মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা এত অর্থগৃধ্নু নহে আর তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট। "Developing the resources of the country" "দেশের অর্থোৎপাদন ক্ষমতার উন্মেষসাধন" এই রাজ্য পুরাতন নিবাসীদিগের বিলোপসাধন করা ও সেই নিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা দৈব ঘটনা ক্রমে বাঁচিয়া যায় তাহাদিগকে স্বার্থপর ও অধার্মিক করা এই মত অনেক অনেক পরিমাণে সত্য।

৫ চৈত্র।। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদীপার হইয়া অপর পারস্থিত গ্রাম দর্শন করি। বেড়ানোর বিষয় যেমন উন্নতি হইতেছে তেমন যদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি হইত তাহা হইলে কি ভাবনা ছিল।

৯ চৈত্র।। অদ্য "Indian deligate Fund" নামক চাঁদার নিমিত্ত টাকা উঠাইবার চেষ্টা করা যায়।

১২ চৈত্র।। অদ্য "Paternoster" বিষয়ে বয়সী সাহেবেরে উপদেশ (sermon) পাঠ করি। "Let not the sun go down upon your wrath". "অস্তমান সূর্য যেন তোমার ক্রোধ স্থায়ী হইতে না দেখে" এই বিষয়ে তিনি উত্তম লিখিয়াছেন।

১৫ চৈত্র।। অদ্য প্রাতে পোষ্ট আফিসের দিকে যাইবার সময় একজন গেরুয়া কাপড় পরা গাঁট্রাগোট্রা হিন্দুস্থানীকে দেখে বোধ হইল কোন প্রতারক দণ্ডী হইবে। এমন ভয়ানক অসৌম্য মূর্তি কখন দেখি নাই। সে আমাকে দেখিবামাত্র থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া আরক্ত লোচনে কি বিড়ির বিড়ির বকিতে লাগিল। আমারও তাহার প্রতি সাধারণ বিদ্বেষ ভাবের উদয় হইল। কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ লোক বলিয়া বোধ হয়। আমারও তাহাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত বিরুদ্ধ লোক বলিয়া বোধ হইল, তাহারও আমাকে দেখিবামাত্র ঐ রূপ বোধ হইল। আত্মায় আত্মায় কেবল আকর্ষণ বিয়োজন আছে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম ইহা সত্ত্বেও সকল লোককে ভালবাসিতে বলেন। এইরূপ অসঙ্কুচিত ভালবাসা ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিরূপ।

১৭ চৈত্র।। অদ্য "বঙ্গদর্শন" পাঠ করি। "তৈল" শিরস্ক প্রস্তাব অতি সরল। অদ্য আমি এখানকার লোক দ্বারা আগামী রবিবার "পরকাল" বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হই।

১৯ চৈত্র।। অদ্য সন্ধ্যার সময় হেডমাষ্টারের বাসায় কোন ব্যবসায়ী বিদূষক অন্যান্য বিষয়ের অনুকরণ মধ্যে বিবিধ ভাষায় কথোপকথনের অবিকল অনুকরণ করে। ঐ সকল ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়া সে যেরূপ ঠিক অনুকরণ করিল তাহাতে তাহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইল।

২২ চৈত্র।। অদ্য অপরাহ্ন তিনটার সময় ঝড় হয়। আমি যে বাঙ্গালায় বাস করিতেছি তাহার বৈঠকখানার দিকের চাল উল্টিয়া পড়ে। ঝড় কিছু শীঘ্র থামিয়া

গেল। তিন চারি মিনিট মাত্র স্থায়ী ছিল। চালার বন্ধন কাষ্ঠ সকল ভিতরে পড়িলে আমার প্রাণের হানি অথবা গুরুতর আঘাত লাগিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। কত সময় আমরা ঈশ্বরের করুণায় আসন্ন বিপদ হইতে আশ্চর্যরূপে রক্ষা পাই।

২৩ চৈত্র।। অদ্য সন্ধ্যার সময় স্কুল গৃহে কথোপকথন সভা হয়। তথায় কথোপকথন হইবার পূর্বে তাহার সাহায্যের স্বরূপ পরকাল বিষয়ে বক্তৃতা করি। আমি বক্তৃতাতে প্রজাপতি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নৈসর্গিক সাদৃশ্যমূলক যুক্তি কত দূর পরকালের মত পোষণ করে তাহা দেখাই। তৎপরে আত্মার স্বরূপমূলক যুক্তি অবলম্বন করিয়া পরকাল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি। কি কি কারণে আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র ইহা সিদ্ধান্তীকৃত হয় তাহা দেখাই। তৎপরে পরকাল বিষয়ের মূল তত্ত্বে সকল মনুষ্যের বিশ্বাসের সমানতা প্রদর্শন করি। তৎপরে জিজীবিষা, বিবিদিষা, উন্নতীচ্ছা, ধর্মোন্নতি সংসাধনের ইচ্ছা এবং সুখৈষণা প্রভৃতি বৃত্তি নিচয়ের অস্তিত্ব পরকাল কিরূপ প্রমাণ করে সে বিষয়ে বলি। প্রকৃতির সকল কার্যের সম্পূর্ণতা আছে কিন্তু এ সকল বৃত্তির চরিতার্থতা বিষয়ের নাই কেন? ইহার সামঞ্জস্য ইহকালে হইতেছে না পরকালে হইবে এইরূপ বলি। বাহ্য জগতে কি সামঞ্জস্য! মনুষ্যের আত্মার ভিতর কি গোলযোগ। ইহার সামঞ্জস্য কি কখন হইবে না? তৎপরে ঈশ্বরের করুণা, ন্যায় প্রভৃতি লক্ষণমূলক যুক্তি পরকাল কি সুন্দররূপে প্রমাণ করে তাহা দেখাই। পারলৌকিক অবস্থা বিষয়ে মনুষ্যের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না, সে ঐ অবস্থা বিষয়ে কেবল এই মাত্র জানিতে সক্ষম হয় যে (১) পরকাল আছে (২) পরলোকে দণ্ড পুরস্কার আছে (৩) পরলোকে আত্মার ক্রমশ উন্নতি হইবে দণ্ড পুরস্কার বিষয়ে বলিবার সময় এই কথা বলি যে আত্মপ্রসাদ স্বর্গ ও আত্মগ্লানি নরক। পারলৌকিক অবস্থা বিষয়ে মনুষ্য সাধারণের বিশেষ জ্ঞান নাই কিন্তু প্রত্যেক জাতির অথবা ব্যক্তির ঐ বিষয়ে নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ মত আছে। ঐ বিষয়ে আমার নিজের বিশেষ মত কি বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি।

২৯ চৈত্র।। অদ্য সন্ধ্যার পর যা—বাবুর বাসায় উপাসনা করি তথায় হে—, চ—, ক—বাবু উপস্থিত ছিলেন। ইনি রেজিস্ট্রেশন বিভাগে গবর্নমেন্টের একজন অতি উচ্চ কর্মচারী। সরকারী কার্য উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়াছেন। ইঁহারই অনুরোধবশতঃ উপাসনা করি। ইঁহার সঙ্গে বারো বৎসর পূর্বে আমি আগ্রা পর্যন্ত যাই। ইনি একবার লক্ষ্ণৌ নগরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে আমার উপাসনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে আপনাদিগের উপাসনা অতি উত্তম, ইহাতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান সকলেই যোগ দিতে পারেন। ইনি উক্ত উপাসনা সময়ে রামমোহন রায়ের যে গীতের আদিতে "ভাব সেই একে" বাক্য আছে সেই গীতটি উত্তমরূপে গাইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষা ঠিক ইংরাজের মতন বলিতে পারেন, ইংরাজী খানা বড় ভাল বাসেন।

৩০ চৈত্র।। অদ্য সন্ধ্যার পর স্কুল গৃহে "আর্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার" বিষয়ে বক্তৃতা করি। এই বক্তৃতাতে ইউরোপবাসী জাতিদিগের ও হিন্দুজাতির ভাষার শব্দ-সাদৃশ্য, উক্ত জাতিদিগের পুরাণের সাদৃশ্য, তাহাদিগের রীতি নীতি, উৎসব ও ধর্মক্রিয়ার সাদৃশ্য, এমন কি নামের সাদৃশ্য দেখাইয়া আমি প্রমাণ করি যে আর্যজাতি একসময়ে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও তাহারা সকল স্থানে গমনাগমন করিত। নামের সাদৃশ্যের সময় বলিলাম যে ইটালি ভাষায় "ডাওডাটি" নাম ও আমাদিগের সে কালের "দেবদত্ত" নামের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। এই বক্তৃতাতে আমি বলি যে এক সময়ে পৃথিবীতে সুবিস্তীর্ণ আর্য সাম্রাজ্য ছিল এবং তাহার রাজধানী হিন্দুকুষ পর্বতের উত্তরে স্থিত ছিল। সে রাজধানীর নাম ইন্দ্রালয় ছিল (Johnstone's Wall Map of Asia দেখ।) উক্ত সাম্রাজ্যের সম্রাটদিগের উপাধি তাহাদিগের প্রধান দেবতার নাম অনুসারে ইন্দ্র ছিল। অসুর অর্থাৎ তুরবংশীয় রাজদিগের সহিত যুদ্ধের সময় উক্ত সম্রাটেরা তাহাদিগের অধীনস্থ ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। সেই সকল অধীনস্থ রাজারা স্বয়ং গিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে সাহায্য করিতেন। উক্ত রাজধানী ও চতুর্দিকস্থ দেশ দেবলোক নামে খ্যাত ছিল। উহা আর্যদিগের প্রধান স্থান ছিল। ঐ দেশ হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে উপনিবেশ প্রেরিত হইত। উক্ত দেবলোকনিবাসীরা অতি সুসভ্য ও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। অর্জুন প্রভৃতি ভারতবর্ষবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তথায় অস্ত্র বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতেন। এক্ষণে যেমন ইংলণ্ডে লোকে বিদ্যা শিক্ষার্থে যায় সেইরূপ যাইতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ প্রচলিত ছিল তদপেক্ষা উক্ত দেবলোকে তা অধিকতর প্রচলিত ছিল এই জন্য লোকে বলিত যে, অমুক গ্রন্থের এত অধ্যায় মর্ত্যলোকে প্রচলিত আছে, আর তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক অধ্যায় দেবলোকে প্রচলিত আছে।

৩ বৈশাখ—ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১ [বঙ্গাব্দ ১২৮৭, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮০ এপ্রিল]।। অদ্য বৈকালে চ--বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সাঁওতালের নাচ দেখি। এই নাচে কেমন একটু বন্য মধুরতা আছে। নর্তক ও নর্তকীরা একটি বিশেষ নাচে সাঁওতালেরা বৃক্ষের নিম্নে ছড়ানো মৌলফুল কেমন করিয়া তোলে তাহার অনুকৃতি দেখাইল। সেটি অতি মনোরম।

৬ বৈশাখ।। অদ্য "মিরর" পত্রে পাঠ করিলাম যে ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা লার্ড লিটনকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। যে লার্ড লিটন তাঁহাদিগকে একবার গবর্ণমেন্ট হৌসে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি তাঁহারা এরূপ সম্মান প্রকাশ করিলেন। ইংরাজ হইলে এমন করিত না। আমাদিগের দেশের লোক ঠিক স্ত্রীলোকের ন্যায়। Athenian women! no longer Athenian men (Demosthenes). "হে এথেন্সবাসী স্ত্রীলোকগণ। তোমাদিগকে আর পুরুষ বলিয়া

সম্বোধন করা যাইতে পারে না।" ডিমাস্থি—নিজের একটি বক্তৃতার প্রারম্ভ। কোন্ কালেই বা আমাদিগের পুরুষ পুরুষ তাহা বলা যায় না।

৭ বৈশাখ।। গত কাল্যের Sunday Mirror পত্রিকায় এই বাক্য দেখিলাম "When you rise in the morning from a resolution to make the day a happy one to a fellow creature. It is easily done; a left off garment to the man who need it, a kind word to the sorrowful, an encouraging expression to the striving." "যখন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবে তখন দিনটিকে মনুষ্য সম্বন্ধে সুখকর করিবার চেষ্টা করিবে। ইহা অনায়াসে করা যাইতে পারে। যাহার বস্ত্র নাই তাহাকে একখানি পুরাতন বস্ত্র দেওয়া; শোকাকুল ব্যক্তিকে একটি সান্ত্বনা বাক্য বলা; যে ব্যক্তি আপনার অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করে তাহাকে একটি উৎসাহকর বাক্য বলা ইত্যাদি।"

১৯ বৈশাখ।। অদ্য বৈকালে শ্যা-বাবু হ-বাবু ও কা-বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। শ্যা-বাবু বলিলেন যে হ-বাবু সংশয়বাদ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে হিন্দু হইয়াছেন। প্রত্যহ আসনের উপর বসিয়া জপ করেন। হ-বাবু বলিলেন তিনি নিরাকার ভাবে গায়ত্রী জপ করেন। আমি বলিলাম অতি উত্তম; এক্ষণে আপনি যে ধর্ম যাজন করিতেছেন তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম। বিশুদ্ধ ধর্মই ব্রাহ্ম ধর্ম।

২১ বৈশাখ।। অদ্য প্র-বাবুর নূতন গবর্ণর জেনারেল লার্ড রিপনের ধর্ম মত বিষয়ে কথোপকথন হয়। আমি সে সম্বন্ধে বলিলাম প্রটেস্টান্ট ধর্ম অপেক্ষা রোমন ক্যাথলিক ধর্ম অধিকতর ভক্তি ভাব উপধর্মযুক্ত হইলেও অধিকতর ** বিশিষ্ট বলিয়া আমার সংস্কার আছে।

২৮ বৈশাখ।। অদ্য বয়সী সাহেবের জন্য রামপ্রসাদী গীতের ইংরাজী অনুবাদ সংশোধন করি।

৩০ বৈশাখ।। অদ্য বয়সী সাহেবকে পাঠাইবার জন্য বাইবেল হইতে সারসংগ্রহ পুনর্দৃষ্টি করি।

৩১ বৈশাখ।। বাইবেলের সারসংগ্রহ লইয়া বড় ব্যস্ত থাকি।

১ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য স্কুলগৃহে কথোপকথনের সময়ে তারকেশ্বর মহান্তের বিষয় কথা হয়। শঙ্করাচার্য যখন গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি কয়েক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্থাপন করেন তখন অবশ্য তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বরাবর সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে কিন্তু এক্ষণে সেই সন্ন্যাসীগণ বড় বড় বিলাসী ও কুচরিত্র জমিদার হইয়া পড়িয়াছে। লোকে শ্রদ্ধাবশতঃ সন্ন্যাসীদিগকে ধন দান করে, সেই ধন পাইয়া সন্ন্যাসীরা বিলাসী হয়। ধর্ম ক্রমে কেমন বিকৃতাকার ধারণ করে। আশ্চর্য তারকেশ্বরের মহান্ত বাহিরে দেখিতে গেলে সন্ন্যাসীর ন্যায়, গৈরিক বস্ত্র পরিধানকারী ও হবিষ্যাশী, কিন্তু চরিত্র সেরূপ নহে। অদ্যও বাইবেলের সারসংগ্রহ লইয়া ব্যস্ত

থাকি।

৩ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য বয়সী সাহেবকে রামপ্রসাদী গীতের অনুবাদ ও বাইবেল হইতে সারসংগ্রহ প্রেরণ করি।

৮ জ্যৈষ্ঠ।। আমি যেখানে অবস্থিতি করি তাহা দেবগৃহ নগরের বাহিরে। অদ্য নগর ভ্রমণ সময়ে একটি কাপড়ের দোকানে দেখিলাম দোকানদার কোন ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতেছে "ও ধরম সে অর্থকো বড়া বোল্‌কে মান-না হ্যায়।" আমি মনে মনে ভাবিলাম যে হিন্দু জাতির মধ্যে সামান্য দোকানদারদিগেরও ধর্ম বিষয়ে কি উচ্চ ভাব। কেবল কল্পিত দেবদেবীতে বিশ্বাস উঠিয়া গেলে এই জাতি কি উৎকৃষ্ট জাতি হইয়া পড়ে।

১২ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য আউইদা (Ouida) নামক ইংরাজ রমণী প্রণীত একটি উপন্যাস হইতে ইংরেজ বিবিদিগের নিন্দা অদ্যকার স্টেটসম্যান পত্রে উদ্ধৃত দেখিলাম। আউইদা উক্ত উপন্যাসে বিবিদিগকে বিখ্যাত দুশ্চরিত্রা ক্লাইটেমনেষ্ট্রা অপেক্ষাও মন্দ বলিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন "taking their passions as absenthe before dinner, tired of living yet afraid of dying & C" "আহারের পূর্বে লোকে যেমন এবসেন্থী মদ্যপান করে তেমনি তাহারা রিপুর চরিতার্থতা সাধন করে, জীবনে বিরক্ত কিন্তু এদিকে মরণে ভয়।" বিলাতের একটি সম্বাদপত্র ইহাকে "A series of impudent libels" "অতি উদ্ধত ভাবের অমূলক নিন্দাবলী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে সাধ্বী স্ত্রীলোকের অভাব নাই কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে এ বিষয়ে কোন্ দেশ শ্রেষ্ঠ, ভারত না ইংলণ্ড?

"রূপবতী সাধ্বী ভারত ললনা—
কোথা দিবে তাদের তুলনা।"

১৩ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য বাবু প্যারিচাঁদ মিত্রের প্রণীত "আধ্যাত্মিকা" নামক উপন্যাস পাঠ করি। হিন্দু নারী কিরূপ ধর্ম পরায়ণ করা উচিত তাহার একটি আদর্শ এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদ্যপি এক্ষণকার কালে এরূপ আদর্শানুসারে কার্য করা দুঃসাধ্য তথাপি ইংরাজী সভ্যতার যেরূপ স্রোত পড়িয়াছে তাহাতে এইরূপ আদর্শ পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হওয়া কর্তব্য। অদ্য "Langham Hall Pulpit vol1, Nos,13-15" পাঠ করি। ইহা বয়সী সাহেবের উপদেশ। নিষ্কাম ভবে ধর্ম সাধন করা কর্তব্য, পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কারের ভয়ে অথবা আশায় করা কর্তব্য নহে, এই তত্ত্ব ইহার মধ্যে একটি উপদেশে বিবৃত আছে। হিন্দুরা কতকাল পূর্বে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমস্ত শাস্ত্রে এই উপদেশ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

১৯ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য কল্যকার অর্থাৎ ১৮৮০ সালের ৩০ মে'র "Sunday Mirror" পত্রিকা পাঠ করি। এই সংখ্যা মিররে ধর্ম বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আছে। পরিশেষে উহাতে বানরের পাখাটানার বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে।

২০ জ্যৈষ্ঠ।। ১৫ই জ্যৈষ্ঠের "ভারতী" পাঠ করি। "ইউরোপ যাত্রী" শিরস্ক প্রস্তাবটি সুরসিকতা ও মনোরম চটুলতায় উপছিয়া পড়িতেছে। লণ্ডনের কশাই-এর দোকান, দরজির দোকান, নাপিতের দোকান,

২১ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য প্রাতে ভাগলপুরের শা-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। ইনি সরকারী কার্য উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন। ইনি ইঁহার বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। এই বিবাহ নিবন্ধনে ইঁহাকে অনেক পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি আমার অতি নিকট সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ রীতি প্রবর্তিত করিবার জন্য যে পীড়ন সহ্য করিয়াছি তাঁহার নিকট তাহার গল্প করিলাম।

২৫ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য প্রাতে বেড়াইবার সময় আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলাম যে চতুর্দিকস্থ প্রকৃতির শোভা একবার অবলোকন কর। যিনি প্রকৃতিকে সর্বদা উপভোগ করেন তিনি কি সুখী। কবি প্রকৃতি-প্রেমী ব্যক্তি সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন—

"His was the Breathing balm
His the silence and the calm
Of mute insensate things."
"তারই প্রকৃতির সুগন্ধ নিশ্বাস,
নিস্তব্ধ শান্তির মনোহর বাস"

২৭ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য "Dictionary Appendix" পাঠ করি। "Dictionary Appendix" আর কিছু নহে কতকগুলি participle অর্থাৎ ইংরাজী অসমাপিকা ক্রিয়াসংগ্রহ। লেখকদিগের participle বানান জন্য কষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে, সেই কষ্ট নিবারণ জন্য এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। ইংরাজেরা সকল বিষয়ে কি সুবিধা করিয়াছে। আশ্চর্য। অদ্য ঈশারচরিতাখ্যায়ক ফরাসিস্ গ্রন্থকর্তা রেণার (Renan) বিষয়ক বয়সী সাহেবের উপদেশ পাঠ করি। ঈশার জীবনচরিত সম্বন্ধে রেণা একতান কি মনোহর "কবি" ঝাড়িয়াছেন।

২৮ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য "জ্ঞানীবাক্য—অধুনাতন" এই শিরস্কে বত্রিশ বৎসর পূর্বে পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রধান আচার্য মহাশয় কথোপকথন সময়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য ভাল করিয়া লেখাই। ঐ সকল উপদেশ আমার "মিমোর্যাণ্ডম্" পুস্তকে তখন লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

২৯ জ্যৈষ্ঠ।। অদ্য আমার মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত ক-আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। ইনি এখানকার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। পুরাতন ছাত্রদিগকে দেখিলে কি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়, অধিক বয়স্ক হইলেও বোধহয় যেন তিনি সেই অল্প বয়স্ক আছেন। বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকর্তা গোল্ডস্মিথ তাঁহার যৌবনকালে একটি স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। অনেক দিন পরে তাঁহার একটি পুরাতন ছাত্রকে রাজপথে দেখিয়া বলিয়াছিলেন

"আমার বাসায় আইস কমলালেবু দিব।" তিনি তাঁহাকে ছাত্রাবস্থায় যে কমলালেবু দিতেন তাহা এত দিন পরে তাঁহাকে বাসায় লইয়া পুনরায় দিতে চাহিলেন। কত যুগ যুগান্তর যে মধ্যে গত হইয়াছে ও তাঁহার ছাত্রটি কত বড় হইয়াছে তাহা তাঁহার কিছুমাত্র অনুধাবন হইল না।

১ আষাঢ়।। অদ্য বৈকালে ধাড়াওয়া নদীর বান দেখিতে যাওয়া যায়। এই নদী এত শুষ্ক ছিল; হঠাৎ পর্বত হইতে বান আসিয়া তাহা জলে পরিপূর্ণ হইল। স্রোত কি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে ঈশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বরপ্রেমে শুষ্ক মনে প্রবল বেগে আসিয়া তাহাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপ প্রবলবেগে ঈশ্বরপ্রেমে পরিপূর্ণ মনসকল পাপ ও সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার সত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হয়।

৩ আষাঢ়।। অদ্য শেষ সংখ্যক "বান্ধব" পাঠ করি। "মানিনী ও অভিমানিনী" প্রস্তাবটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিলাতের পত্র ও চিন্তাশীলতা কিন্তু স্বদেশের প্রতি বিরাগতা প্রকাশ করিতেছে। এই বিরাগতা অতীব শোচনীয়।

৬ আষাঢ়।। অদ্য পাপচিন্তা ও সাংসারিক দুঃখে অধৈর্য দুর্দমনীয় ইহা মনে কবিয়া মন অতিশয় ব্যথিত হইল। "ধৈর্য দেহ, বীর্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ, বিবেক ও বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয় নেই।"

৯ আষাঢ়।। অদ্য Statesman কাগজে James Thomson's City of the Dreadful Night শিরস্ক কবিতার সমালোচনা পাঠ করি। ইহা পাঠ করিয়া বোধ হইল যে বৌদ্ধ ধর্ম Pessimism অর্থাৎ বিশ্বনৈরাশ্যবাদের আকারে ইউরোপখণ্ডে প্রবেশ করিতেছে। ঐ কবির আর একটি কবিতা হইতে নিম্নস্থ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"He knew the blood-red sweetness of the vine
Yet did not at the revel sit;
But straining out the very wine of wine,
Lived calm and pure and glad in drunkenness Divine..."

"তিনি দ্রাক্ষার রক্তাভ মধুরতা বিষয়ে অবগত ছিলেন তথাপি মদ্যপায়ীদিগের উল্লাসক্ষেত্রে উপবিষ্ট থাকিতেন না কিন্তু, সুরার সুরা নিঙ্গড়াইয়া পান করত দেবতাদিগের মত্ততাতে পূর্ণ হইয়া প্রশান্ত পবিত্র ও আনন্দচিত্ত থাকিতেন।" ঈশ্বরমত্ত (old-intoxicated) ব্যক্তি প্রেমসুরা পান করিয়া সর্বদা প্রশান্ত ও পবিত্র ও আনন্দচিত্ত থাকেন; আর দ্রাক্ষার সুরা পান করিয়া লোকে অশান্ত অপবিত্র ও নিরানন্দ হয় এই জন্য হাফেজ বলিয়াছেন, "প্রকৃত প্রেমের মত্ততা তোর মস্তকের ভিতর নাই, তুই আমার নিকট হইতে চলিয়া যা, যেহেতু তুই দ্রাক্ষারসে মত্ত।"

১৪ আষাঢ়।। অদ্য শেষ সংস্কৃত "আর্যদর্শন" পাঠ করি। "অতীত ও বর্তমান ভারত" শিরস্ক বিলক্ষণ ক্ষমতাসূচক প্রস্তুত অতি সঙ্গত ও অতি অসঙ্গত মত সকলের

সম্পত্তিসাম্য (Communism) এবং স্ত্রীলোকদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সমর্থিত হইয়াছে। যে সকল অত্যুন্নত রীতিনীতি বিলাতও এক্ষণে গ্রহণ করিতে অক্ষম লেখা আছে তাহা ভারতবর্ষে চালাইতে চান। ইহার লাভ এই হইবে যে কোন সংস্কারই এখানে সুসিদ্ধি লাভ করিবে না। "Vaulting ambition overleaps itself."

১৫ আষাঢ়।। অদ্য "বেঙ্গলী" (Bengalee) পত্রে দেখিলাম কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা বৎসর পূর্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা এক্ষণে অনেক মন্দ হইয়াছে। ইহার কারণ ঢাকা নরদমা—সম্পাদক এইরূপ মনে করেন।

১৬ আষাঢ়।। অদ্য "Progress" কাগজ পাঠ করি। "Progress" কাগজ মাদ্রাজে মিসনরীদিগের দ্বারা প্রকাশিত। তাহার অংশে খ্রীষ্টীয় ধর্মের গোঁড়ামি আছে তাহা বাদ দিলে তাহা অতি উৎকৃষ্ট কাগজ বলিতে হইবে সদুপদেশ ও ভাল ভাল গ্রন্থোদ্ধৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে ও গল্পে পরিপূর্ণ।

১৯ আষাঢ়।। অদ্য যমুনা লাল মুখোপাধ্যায়কৃত—"শরীর পালন" পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদিগের দেশের দরিদ্র লোক এই পুস্তকে বর্ণিত এরূপ সহজ উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে ইহা আমি পূর্বে মনে করিতে পারি নাই। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বার বার বলিয়াছেন যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ব্যবস্থিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন না করাতেই আমাদিগের বড় বিপদ ঘটিতেছে।

২৩ আষাঢ়।। অদ্য "বিশ্ববিষ চিকিৎসা" ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পার্সিদিগের বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ করি। এই বক্তৃতাটি অতিশয় কৌতূহল জনক; তাহাতে পার্সিদিগের বিষয়ে বিবিধ সংবাদ আছে। পুস্তিকাকার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অসাধারণ ক্ষমতা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশ করিযাছেন।

২৫ আষাঢ়।। অদ্য প্র-বাবুর বাসায় বসিয়া কথোপকথন করি। প্র-বাবু সামান্য পদস্থ লোক কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিমান ও সুরসিক লোক বলিয়া বোধ হইল। মহানগরের লোকে মনে করেন যে তাঁহাদিগের ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক জগতে নাই। গ্রাম্য আত্মশ্লাঘা (Mofussil conciet) প্রসিদ্ধ কিন্তু যেমন গ্রাম্য আত্মশ্লাঘা আছে তেমনি নাগর আত্মশ্লাঘা (City conceit) আছে।

১ শ্রাবণ।। অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সর্মণ পাঠ করি তাহাতে লিখিত আছে—

"Oh! What a dull world would this be but for the light that lighteth everyman that cometh into the world, the light of conscience, the moral sense which demands first and foremost " the judge of all the earth shall do what is right."

যে আলোকে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ প্রত্যেক মনুষ্যের পথ উজ্জ্বল করে, সেই বিবেকের আলোক, সেই কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান যাহা প্রধানত ঘোষণা করে যে সমস্ত ভূমণ্ডলের

বিচারপতি ঈশ্বর যাহা ন্যায় তাহাই করিবেন। এই বিবেকের আলোক যদি না থাকিত তবে পৃথিবী কি ঔৎসুক্য শূন্য স্থান হইত।" বয়সী সাহেবের কথা ঠিক। আমাদিগের বিবেকবৃত্তি পরিচয় দিতেছে যে ঈশ্বর যিনি ঐ বৃত্তি আমাদিগের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নিজে ন্যায়বান ও ধর্মবহ পুরুষ। এই বিশ্বাস না থাকিলে পৃথিবী কেবল ঘন বিষাদের আলয়।

১৩ শ্রাবণ।। অদ্য "বঙ্গদূতে"র শেষ সংখ্যা পাঠ করি। তাহাতে প্রকাশিত "আধ্যাত্মিক তাড়িৎ" অথবা "ব্রহ্মতেজ" বিষয়ে প্রস্তাব উত্তম দেখা হইয়াছে। ব্রহ্মসহবাস নিয়ত করিতে করিতে মনের তেজস্বিতা অতিশয় বর্ধিত হয় ইহা অতি যথার্থ কথা।

২১ শ্রাবণ।। অদ্য চ-বাবু, প্র-বাবু ও আমি, আমরা হাজারিবাগের সরকারি উকিল শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। লোকটি বিচক্ষণ, গম্ভীর প্রকৃতি ও অমায়িক বলিয়া বোধ হইল। ইনি তথাকার ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণস্বরূপ। হাজারিবাগে বিলক্ষণ একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে।

২৩ শ্রাবণ।। অদ্য শেষ সংখ্যক "আর্য্যদর্শন পাঠ করি। "আর্য্যদর্শনে" "অতীত ও বর্তমান ভারত" শিরস্ক প্রস্তাবের অনুবৃত্তি উত্তম লেখা হইয়াছে।

২৪ শ্রাবণ।। অদ্য "আর্য্যদর্শনে" "রাজার ক্ষমতা কে দিল" এই প্রস্তাব পাঠ করি। ইহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় স্পষ্ট বুঝা যায় রাজার ক্ষমতা কে দিল?

২৮ শ্রাবণ।। অদ্য নূতন প্রকাশিত "পঞ্চানন্দ" পাঠ করি। এই নাম ইংলণ্ডের "পঞ্চ" হইতে লওয়া কেবল তাহাতে আনন্দ শব্দ যোগ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ইংলণ্ডের "পঞ্চ" যেমন উৎকৃষ্ট ইহা সেরূপ নহে, ক্রমে হইবার সম্ভবনা। উহার কোন কোন ঠাট্টা অনেক ভাবিয়া বুঝিয়া হয়। ঠাট্টা ভাবিয়া বুঝিতে গেলে চলে না। আমাদিগের দেশে একটি রহস্যের কাগজ উত্তমরূপে সম্পাদিত হইলে তদ্বারা দেশের অনেক সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। ধর্মের দিকে নিয়োজিত বিশুদ্ধ রসিকতার প্রভাব অনেকে বুঝেন না।

২৯ শ্রাবণ।। অদ্য একটি ভাব মনে উদিত হয়। "সুরসিকতা জীবনের চাটনি।" বিশুদ্ধ হুলবিহীন রসিকতা প্রতি পদে পদে আবশ্যক করে, উহা এই বিষাদময় জীবনকে উজ্জ্বল করে। সর্বদা বিষণ্ন থাকিতে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। ঈশ্বর নির্দোষ হাস্যের ঈশ্বর। তিনি দিব্যলোক ও আশার ঈশ্বর। সরস সাধু জীবনই সুখের একমাত্র কারণ।

৩ ভাদ্র।। অদ্য Contemporary Review for November 1879" পাঠ করি। ইহাতে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাঠ করি। ইংরাজেরা অল্প পুঁজি অবলম্বন করিয়া কেমন ফেনাইয়া ফেনাইয়া লিখে। বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের

নিকট হইতে এই বিদ্যা শিখিতেছে।

৮ ভাদ্র।। অদ্য আমার সহধর্মিণীর সঙ্গে কন্যাদিগকে প্রাক কার্যে বিলক্ষণ নিপুণ করিবার আবশ্যকতা বিষয়ে কথা হয়। আমাদিগের জ্ঞানীদিগের কথা দূরে থাকুক, পার্কর বলিয়াছেন—"I cannot take that woman as my wife who cannot make my bread." "যে স্ত্রীলোক আমার রুটি প্রস্তুত করিতে পারে না তাহাকে আমি আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।" এখন দেখিতেছি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিবাহপ্রার্থী ব্যক্তিরা পাত্রী উত্তম পাক করিতে পারে কিনা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইহা শুভ চিহ্ন বলিতে হইবেক।

১০ ভাদ্র। অদ্য প্রাতে বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সহকারী সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি দেবগৃহের সন্নিকট রোহিণী গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। ইনি আমার "সেকাল আর একাল" গ্রন্থ সম্বন্ধে অতি সদয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য রোহিণী হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পর্বত, বন, উপবন ও দূর্বাদল-পরিশোভিত প্রশস্ত প্রান্তর দেখিয়া হঠাৎ ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গে মন একীভূত হইয়া গেল। যত দুঃখ আমাদিগের মনের সঙ্কুচিত ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। সংসাররূপ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে মন বদ্ধ থাকিলেই উহা দুঃখ ভোগ করে। দুঃখের সময় একবার উজ্জ্বলরূপে ভাব দেখি, চতুর্দিকে অনন্ত আকাশ, আবার সেই আকাশ আনন্দ স্বরূপের দ্বারা পূর্ণ, তাহা হইলে দেখ দেখি কেমন করিয়া তোমার দুঃখ থাকে। মন যতই প্রশস্ত হইবে ততই সুখ, আর যত মুষড়িয়া থাকিবে ততই দুঃখ। অনন্তের দিকে মনকে প্রসারিত করিয়া দেও আর ক্ষুদ্র সংসারকে তুচ্ছ কর, দেখিবে তোমার সুখের অভাব হইবে না। "যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

১২ ভাদ্র।। অদ্য "সাধারণী" পাঠ করি। এবারের "সাধারণী"তে পল্লীগ্রামের অবস্থা বিষয়ক একটি অতি উত্তম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। মেলেরিয়া ও দরিদ্রতা প্রযুক্ত পল্লীগ্রামের অবস্থা শোচনীয়। আমাদিগের দেশে নানা কারণে ক্রমশঃ দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে।

১৫ ভাদ্র।। অদ্য গৃহের মধ্যে একটি সর্প দেখা যায়। ক্ষণেকের জন্য ইহা মনে করিয়া মন খিচড়িয়া থাকে ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে সর্প কেন থাকিবে? কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন মঙ্গলাভিপ্রায় আছে উহা চিন্তা করিয়া মন সুস্থতা লাভ করিল এবং ক্ষণেকের জন্যও বিদ্রোহ ভাব আমার মনে উদিত হইয়াছিল বলিয়া লজ্জিত হইলাম।

১৯ ভাদ্র।। অদ্য স্কুল গৃহে সন্ধ্যার পর বীরভূমের প্রসিদ্ধ উকীলবাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও হাজারিবাগের রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহাদিগের সহিত অনেক বিষয়ে আমার কথোপকথন হয়। বালকের শরীরবিনাশকারী বর্তমান শিক্ষা প্রণালী, উপজীবিকার জন্য লোকের শোণিত শোষণকারী উদ্বেগ, কৃতবিদ্য

বাঙ্গালীদিগের ব্যায়ামের প্রতি এবং সন্ধ্যার পর সঙ্গীতাদি বিশুদ্ধ আমাদের প্রতি অমনোযোগ, বাবুগিরি ও বিলাসিতার বৃদ্ধি, এরূপ বৃদ্ধি যে সামান্য অবস্থার লোক দুই পা হাঁটিয়া যাইতে পারে না, গোচারণের অভাব জন্য গো জাতির ক্রমশঃ অবনতি, বাঙ্গলীর একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য দুগ্ধের মহার্ঘতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কথা হয়। আমাদিগের দেশ অবনতির গড়ানে উপত্যকায় দ্রুতবেগে নামিতেছে।

২০ ভাদ্র।। অদ্য এখানকার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সমাজ সংস্কার বিষয়ে অনেক কথা হয়। তিনি মুসলমানদিগকে ব্রাহ্ম করিয়া হিন্দু করিবার অনেক পোষকতা করিলেন।

২২ ভাদ্র।। অদ্য বিলাতের প্রসিদ্ধ পাদ্রি Canon Farrar কর্তৃক রাজপুরুষদিগের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে উপদেশ পাঠ করিয়া পরম পুলকিত হইলাম। তিনি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"It is righteousness which is the pillar of nations, yea and the pillar of the universe. Break down that pillar and the universe falls into ruin and desolation." "ধর্মই মনুষ্য জাতিকে স্তম্ভ স্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে; শুদ্ধ মনুষ্য জাতি নহে, জগতকে ধারণা করিয়া রহিয়াছে। সেই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া দেও, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে।" এই বাক্য উপনিষদের "সত্রষসেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" সঙ্গে মিলে। উপনিষদের বাক্য উপনিষদকার ধর্মাবহ পুরুষের প্রতি খাটাইয়াছেন, ফেরর সাহেব তাহা বিশুদ্ধ ধর্মের প্রতি খাটাইয়াছেন। দুই-ই সঙ্গত বাক্য।

২৩ ভাদ্র। অদ্য আমার জন্মদিন। "জনম এমন বৃথা চলে গেল।" জন্মদিনে মনে কি গম্ভীর ভাবের উদয় হয়। এই দিবসে মনুষ্যের অপূর্ণতা ও সেই অকালপুরুষ ঈশ্বরের পূর্ণতা কি উজ্জ্বলরূপে মনে প্রতিভাত হয়।

২৪ ভাদ্র।। অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সর্মণ পাঠ করি। তিনি তাহাতে Theism অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।" "A fresh in flux of heavenly light, new and glorious thoughts of God and of human destiny, a hope that maketh..... not ashamed, unstaind by selfishness and pride that all men of all ages, races and climes shall be enfolded at last in the everlasting arms, blest and taught, enriched and comforted by the divine love."

"স্বর্গীয় জ্যোতির নবীন আগম, ঈশ্বর এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় নব নব মহৎ মহৎ ভাব, এমন আশা উদ্রেককর যে সে আশা বিষয়ে লজ্জিত হইতে হয় না, বিমদ ও অস্বার্থপর আশা, এই আশা যে সকল কালের সকল জাতির এবং সকল দেশের লোক পরিশেষে সেই শাশ্বত বাহু দ্বারা আলিঙ্গিত হইবে এবং ঐশী প্রেম দ্বারা অনুগৃহীত ও উপদিষ্ট, ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত আশ্বাসিত হইবে।

অদ্য "সুরুচির কুটীর" পাঠ সমাপ্ত করি। ইহাতে উপন্যাস ছলে অল্প আয়ে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহের এবং পরোপকার সাধনের উপায় সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উপন্যাসটির নীরস বিষয় কর্মের প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছে "In a business-like manner"। যে যে স্থানে ভাবের উচ্ছ্বাস হওয়া কর্তব্য, সে সকল স্থান অতি নীরস ভাবে লিখিত হইয়াছে। এমন যে সুরেশ ও সুরুচির প্রথম প্রণয়ালাপ তাহা লোকে যেমন পাট্টা কবুলিয়ত লেখা কার্য সম্পাদন করে, সেইরূপ প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে ভাবের লেশমাত্র নাই। এই উপন্যাসটি "সুশীলার উপাখ্যানের" ন্যায় সাধারণ হিন্দু সমাজের উপযোগী করিয়া লেখা হয় নাই; কেবল ব্রাহ্মদিগের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। যাহা হউক, উহা হইতে আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য অর্থসঞ্চয় ও পরোপকার বিষয়ে অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারেন। অদ্য আমার পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যুদিবস। তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিলাম। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে কুশলে রাখুন। এই উপলক্ষে পরে দান করা হয়।

৩ আশ্বিন।। অদ্য বৈদ্যনাথে ভাদ্র পূর্ণিমার মেলা। অদ্য শুনিলাম মন্দিরে লোকের ভিড়ে দুইজন লোক নাকি মারা পড়িয়াছে।

৫ আশ্বিন।। অদ্য শুনিলাম বৈদ্যনাথের মন্দিরে দুইটি লোক মারা পড়িবার কথা যে শুনিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। ভিড়ে একজন লোক সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। "The queen vomited three black crows."

১৩ আশ্বিন।। অদ্য একটি ভাব মনে উদিত হয়। দুঃখ ধর্ম সাধনের অত্যন্ত সহকারী। ধর্মের অঙ্গ তিনটি, সর্বদা ঈশ্বর স্মরণ, পাপ প্রবৃত্তি দমন ও পরোপকার সাধন। দুঃখ যেমন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া দেয়, এমন অন্য কোনো পদার্থ নহে। বিদুর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তিনি যেন সর্বদা তাঁহাকে দুঃখে রাখেন। Lady Fanshawe প্রার্থনা করিয়াছিলেন "O God! Plant a thorn in every gourd of mine so that I may always remember thee."

"হে পরমেশ্বর। আমার প্রত্যেক অলাবুতে একটি করিয়া কন্টক নিহিত কর যে আমি তোমাকে সর্বদা স্মরণ করিতে পারিব।" দুঃখ সাংসারিক সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া পাপ প্রবৃত্তি দমনের যেমন সহায়তা করে, এমন অন্য কিছু নহে। দুঃখ ধর্মের গুরুত্ব যেমন দেখাইয়া দেয, এমন অন্য কিছু নহে। নিজে দুঃখ পাইলে যেমন অন্যের দুঃখে সহানুভূতি হয়, এমন অন্য কিছুতেই হয় না। অতএব দুঃখ পরোপকার সাধনের প্রতি অত্যন্ত সহকারী বলিতে হইবে। দুঃখ ভোগ ধর্মসাধনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু দুঃখ সহ্য করা কঠিন। ঈশ্বর আমাদিগকে এ বিষয়ে বলপ্রদান করুন।

১৫ আশ্বিন।। অদ্য মেদিনীপুরের বাবু সীতানাথ প্রহরাজ ও তাঁহার কর্মাধ্যক্ষ

আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ও বন্ধু বাবু অখিলচন্দ্র দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। প্রহ্লাজ মহাশয়ের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন হয়। তিনি উক্ত কথোপকথনের সময় ব্রাহ্মদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন ব্রাহ্মধর্মের উচ্চতা ও তদনুবর্তীদিগের আচরণ এই দুয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? আমি বলিলাম তাহার কারণ মনুষ্যের অপূর্ণতা। উত্তম মধ্যম লোক তাবৎ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইরূপ ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও আছে; তবে আমি স্বীকার করি ব্রাহ্মধর্ম ও তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তৃতা যেরূপ উচ্চ ও তাহার তুলনায় আমাদিগের আচরণ যেরূপ নিকৃষ্ট, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ লোকের চক্ষে যেরূপ চট করিয়া লাগে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের সম্বন্ধে সেরূপ চট করিয়া লাগে না। অতএব আচরণ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্তব্য।

১৯ আশ্বিন।। অদ্য "Sunday Mirror" পাঠ করি। কেশববাবুরা এক্ষণে স্ত্রী স্বাধীনতার দিকে বড় লিখিতেছেন। তোমরাইত, ঠাকুর। প্রথম আরম্ভ করিলে।

২০ আশ্বিন।। অদ্য গতবারের "বঙ্গদর্শন" পাঠ করি। বঙ্গদর্শনে "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" বিষয়ে যে ব্যক্তি প্রস্তাব লিখিতেছেন, তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর কাব্যের দোষগুণ বিচার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। তিনি পুরুষ ও স্বভাবের প্রভেদ সম্বন্ধে তাহা লিখিয়াছেন, যাহা অসাধারণ মানবস্বভাব পরিজ্ঞান প্রদর্শন করিতেছে।

২৩ আশ্বিন।। অদ্য শেষ সংখ্যক "বান্ধব" পাঠ করি, তাহাতে দুর্গাপূজা সম্বন্ধীয় "ভারতশক্তির মহোৎসব" শিরস্ক প্রস্তাবে লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও শাস্ত্রীয় গবেষণার প্রগাঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে। এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া যদি বাঙ্গালীর হৃদয়ে সামরিক প্রবৃত্তি উত্তেজিত করা যাইতে পারে তাহা হইলে যতদিন পৌত্তলিকতা ভারতে থাকিবে, ততদিন উক্ত উৎসব হইতে শুভফল উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে সামান্য মেটে ফিরিঙ্গিরা যাহা পারে অর্থাৎ রাজার বিপদের সময় তাহাকে যুদ্ধে সাহায্য করা, বাঙ্গালীরা তাহা পারে না, এইজন্য তাহারা পর্যন্ত আমাদিগকে ঘৃণা করে। আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত দেবদেবী কল্পনা সকলই রূপক মূলক। তাহা প্রাচীন হিন্দুদিগের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ করিতেছে।

২৯ আশ্বিন।। প্রত্যহ আমার আলয়ে পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। অদ্য চারিটার সময় বাহিরের লোকের সঙ্গে উক্ত উপাসনা করি। আমি উপাসনা করি, কা-বাবু প্রার্থনা করেন এবং দ্বা-বাবু গান করেন। আমি বলিলাম যত প্রকার রোগ আছে অর্থাৎ সামাজিক রোগ, রাজনৈতিক রোগ এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় রোগ ইহাদিগের প্রত্যেকের ঔষধ আছে। সকল রোগের পরম ভিষক পরমেশ্বর। তিনি ভিষকের ভিষক। তিনি বৈদ্যনাথ তিনি প্রকৃত বৈদ্যনাথ। এই বৈদ্যনাথতীর্থে সেই প্রকৃত বৈদ্যনাথের উপাসনা করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। উপাসনার পর শ্রীযুক্ত রাজকুমার পাণ্ডা উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে বৈদ্যনাথের পূজায় যে প্রকার পেঁড়া ব্যবহৃত হয় সেই প্রকার পেঁড়া স্বহস্তে বন্টন করিলেন। ইনি ব্যবসায়ী পাণ্ডাদিগের মধ্যে

একটু উদার।

২ কার্ত্তিক।। অদ্য প্রাতঃকালে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে বৈদ্যনাথের মন্দির দেখিতে যাই। তথায় রাজেন্দ্রবাবু প্রত্যেক দেব মন্দিরে প্রাচীরস্থ সমস্ত চিত্রফলকের প্রতিকৃতি কাগজের উপর তুলিয়া লয়েন। এই সকল প্রতিকৃতি পাঠক তাঁহার প্রণীত দেবগৃহের উৎকৃষ্ট বৃত্তান্ত-পুস্তিকায় দেখিতে পাইবেন। ঐ পুস্তিকা প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় অনেক সংবাদে পূর্ণ।

৩ কার্ত্তিক।। অদ্য কা-বাবুর সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি বলি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ মহৎ স্বভাবের একটি লক্ষণ।

৫ কার্ত্তিক।। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদী তীরে ব্রহ্মোপাসনা হয়। কা-বাবু ও আমি আমরা উভয়ে প্রার্থনা করি, দ্বা-বাবু গান করেন। আমি উন্নতমস্তক বৃক্ষরাজির ন্যায় ঈশ্বরের দিকে উন্নত হইতে, গিরির ন্যায় স্থৈর্য ও ধৈর্য বিশিষ্ট হইতে এবং স্রোতঃস্বতী যেমন সমুদ্র দিকে ধাবিত হইতেছে সেইরূপ তাঁহার দিকে ধাবিত হইতে আত্মার যে বল আবশ্যক তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। কা-বাবু সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক বৎসরের পর দেবগৃহে আসিয়া সেই সকল বন্ধুর সহিত পুনরায় সম্মিলিত হইয়া এরূপ উপাসনা করিতে ঈশ্বর তাঁহাকে সমর্থ করিলেন তজ্জন্য সেই মঙ্গলময় পুরুষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

১০ কার্ত্তিক।। অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ ''সর্মথন'' দ্বয় পাঠ করি। বয়সী সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্মের সারমর্ম এক কথায় বলিয়া দিয়াছেন ''An Angry God, a bleeding saviour and a gaping hell.'' ''কোপন স্বভাব ঈশ্বর, শোনিতাক্ত কলেবর পরিত্রাতা ও গিলিবার জন্য হাঁ করা নরক।''

১১ কার্ত্তিক।। অদ্য ভাদ্র মাসের ''আর্যদর্শন'' পাঠ করি। এই সংখ্যক আর্য্যদর্শনে ''সন্ন্যাসী'' শিরস্ক প্রস্তাবে ''সন্ন্যাসী'' শব্দের একটি নতুন মনোহর অর্থ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেশের ধর্মের, সমাজের অথবা রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সে পর্যন্ত না ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক এইরূপ সন্ন্যাসী উদিত হইবে যে পর্যন্ত তাহার প্রকৃত উন্নতি হইবে না। এই কথা অতি যথার্থ।

১২ কার্ত্তিক।। অদ্য বিখ্যাত বাবু প্যারিচাঁদ মিত্রের দ্বারা ইংরাজিতে লিখিত রামকমল সেনের জীবনবৃত্ত পাঠ করি। দেওয়ান রামকমল সেনের জীবনবৃত্ত অতীব কৌতূহলজনক। ইনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। এই পুস্তকের শেষে লেখক বলিয়াছেন যে ভক্তি ধর্মসাধনের নিম্নের অঙ্গ, সাধনের উচ্চতম অঙ্গ সমাধি। ভক্তির অবস্থা উদ্বেল অবস্থা, সমাধি শান্তির অবস্থা। শান্তির অবস্থা উদ্বেল আমার মতে সমাধি ভক্তিরও অবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (২) উচ্চতম অবস্থা, শান্তিরও উচ্চতম অবস্থা। বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুতৎপর হইয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের সর্বদা চিত্তার্পিত থাকাই প্রকৃত সমাধি। তাহা ভক্তি ও গাঢ় প্রেম ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে? কিন্তু

সমাধির অবস্থা শান্ত অবস্থা লেখকের এই বাক্য অতি যথার্থ। প্রীতি ও ভক্তি উচ্চতম অবস্থাতে শান্ত ভাব ধারণ করে। নদী যখন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে তখন তাহার আর কল্লোল থাকে না।

১৬ **কার্ত্তিক**।। অদ্য শেষ সংখ্যক "সাধারণী" পাঠ করি। তাহাতে প্রকাশিত দুর্ভিক্ষ ও মেলেরিয়া শিরস্ক প্রস্তাবটি অতি উৎকৃষ্ট। তাহা পাঠ করিয়া চক্ষে জল আইল। মেলেরিয়াতে আমাদিগের দেশ উৎসন্ন হইতেছে। যদি ইংলণ্ডে এরূপ হইত হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। গবর্নমেন্ট কেবল কমিশন বসাইয়া নিশ্চিন্ত। সকল বিষয়েতেই একটা করিয়া কমিশন। তাঁহারা মনে করেন কমিশন বসাইলেই গবর্নমেন্টের কর্তব্য সম্পন্ন হইল। কমিশন বসিল, রিপোর্ট করিল, সে রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। আর কি চাও ?

১৭ **কার্ত্তিক**।। অদ্য শেষ সংখ্যক "Sunday Mirror" পাঠ করি। ইহাতে কোন পারসী কাব্য হইতে উদ্ধৃত একটি বাক্য অতীব সুন্দর বোধ হইল। "আমি অনেকদিন পর্যন্ত ঈশ্বরের পথে লোককে আহ্বান করিলাম কিন্তু আমার কথা কেহ শুনিল না। আমি তৎপরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আলয়ে চলিয়া গেলাম। কিন্তু তথায় দেখিলাম আমি যাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম তাহাদিগের মধ্যে অনেকে আমা অপেক্ষা উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন।"

১৮ **কার্ত্তিক**।। অদ্য বয়সী সাহেবের উপদেশ (Langham Hall Pulpit Vol III No. 34. Theism its principles and Beliefs) পাঠ করি। বয়সী সাহেব এই উপদেশে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেখাইয়াছেন যে (Lord Herbert of Cherbury) প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন, নীরস দার্শনিক একেশ্বরবাদী (Deist) ছিলেন না। তিনি তাঁহার পুস্তক "De Veritate" প্রকাশ করিবার পূর্বে ঈশ্বরের নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তিমান লোক বলিয়া বোধ হয়। তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিবার পূর্বে তাঁহার স্পষ্ট আদেশ চাহিয়াছিলেন। তিনি যে প্রকার আদেশ চাহিয়াছিলেন অর্থাৎ আকাশে কোন চিহ্ন সে প্রকারে ঈশ্বর তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। Lord Herbert of Cherbury ইংরাজ ব্রাহ্মদিগের পিতামহ বলিতে হইবে। তিনি খ্রীষ্টাব্দ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন।

২৬ **কার্ত্তিক**।। অদ্য ভাতরবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সর্মণ পাঠ করি। তাহাতে এই উৎকৃষ্ট বাক্য আছে "For some good purpose not always seen by us, evil befalls us which we cannot prevent or avert. Nothing in heaven or earth can reconcile us to such afflictions but knowing or believing that a loving hand has sent them that a love greater and a wisdom higher than our own are the secret source of all that

worries or distresses us." "যে মন্দ আমরা কোন মতে এড়াইতে পারি না সে মন্দ আমাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু এই মঙ্গল অভিপ্রায় আমরা সকল স্থলে বুঝিতে পারি না। যদ্যপি আমরা ইহা না বিশ্বাস করি যে এক প্রেমময় হস্ত এই সকল দুঃখ প্রেরণ করে এবং আমাদিগের জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান এবং আমাদিগের প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর প্রেম আমাদিগের দুঃখ ও কষ্টের নিগূঢ় কারণ তাহা হইলে তাহা সহ্য করিতে আমাদিগের কখন মন যাইত না।"

২৮ **কার্তিক**।। অদ্য প্রাতে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই তখন তাঁহার সহিত এখানকার পাণ্ডা একজন দেখা করিতে আইসে। এখানকার পাণ্ডারা গণ্ড মূর্খ। কেবল দৈ চিঁড়া খাইতে ভালবাসে। শুনিলাম তাহারা বেদ পড়ে, তাহার পর জানা গেল যে আসল বেদ পাঠ করে না। ভবদেবের কর্মকাণ্ডীয় পদ্ধতির বৈদিক মন্ত্র সকল অভ্যাস করে। তাহার অর্থ পর্যন্ত বুঝে না। পাণ্ডাদিগের মধ্যে দুই একজন লোক বিদ্বান আছেন।

২৯ **কার্তিক**।। অদ্য "Life of Macaulay by George Trevelyan" পাঠ করি। গ্রন্থকার মেকলের ভাগিনেয় "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ।" মেকলের লেখার স্বচ্ছ উজ্জ্বল জীবন্ত রসাত্মক ভাব তাঁর ভাগিনেয়ের লেখাতেও অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকে অদ্য মেকলের শৈশব বৃত্তান্ত পাঠ করিলাম। মেকলে এচোড়ে পাকা ছেলে ছিলেন। কিন্তু অনেক এচোড়ে পাকা ছেলে এচোড়ে পাকিয়া যেমন শীঘ্র বিস্বাদ হইয়া যায় মেকলে এইরূপ ছিলেন না। তাঁহার বয়সের সঙ্গে তাঁহার স্বাদুতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে পরিশেষে তাঁহাকে কামড়ে কামড়ে খেয়ে লোকের সাধ মিটিত না।

৩০ **কার্তিক**।। অদ্য প্রাতে বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ধাড়ওয়া নদীতীরে গিয়া ব্রহ্মোপাসনা করি। মল্লিক মহাশয় গান করেন। উপাসনার পর বক্তৃতাকালে আমি বলি, "আমরা কি অপবিত্র! প্রাতঃসমীরণ কি পবিত্র! প্রাতঃসমীরণ আমরা নিশ্বসন করিবার উপযুক্ত নহি।" বৈকালে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হয়। অদ্য হইতে নিয়ম হইল যে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা চারিটার সময় হইবে। এখানকার গবর্নমেন্টের কর্মচারীদিগের সুবিধার জন্য এই নিয়ম করা হইল।

১ **অগ্রহায়ণ**।। অদ্য "Life of Macaulay by G. Trevelyan" পাঠ করি। মেকলের কালেজে পড়িবার সময় গণিতের প্রতি কি বিদ্বেষ ছিল। সকলে বলে যে গণিত শিক্ষা "Discipline of the mind" মনের সম্বন্ধে উপকারী সাধন, কিন্তু মেকলে বলিতেছেন Discipline of the mind! say rather starvation, confinement, torture annihilation but it must be" "সাধন! সাধন বলিলয়া একেবারে অনাহারে প্রাণ বিয়োগ, কারাবাস, নিগ্রহ, বিধ্বংস বলিলে হয় কিন্তু ইহা ঘটিবেই" (অর্থাৎ আমাকে উহা পড়িতেই হইবে।) কিন্তু এইরূপে সন্তোষ

অবলম্বন করিলেওও পুনরায় অসন্তোষ ফুটিয়া বেরুচে। "But three years I cannot endure the thought. I cannot bear to contemplate what I must undergo. Farewell then Homer and Sophocles and Cicero!—Farewell happy fields. Where joy forever dwells! Hail horrors, hail infernal World!

"তিন বৎসর পড়িতে হইবে। ইহা মনে করা আমার পক্ষে অসহ্য। কি কষ্ট আমাকে পাইতে হইবে ইহা ভাবিলে সহিষ্ণুতা থাকে না। হোমর সফক্লিজ্ এবং সিসিরো তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি।

"চিরানন্দ বিরাজ যে সুখদ প্রান্তরে,
বিদায় তব নিকট। সম্ভাষি তোরেরে
নরক ও নরকের ভীষণ দর্শন।"

কলেজে অধ্যয়ন কালে আমারও গণিতের প্রতি এইরূপ বিদ্বেষ ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহার উপকারিত্ব বিশেষতঃ কল্পনাপ্রিয় হিন্দুজাতির সম্বন্ধে তাহার উপকারিত্ব স্বীকার করিয়া থাকি।

৭ **অগ্রহায়ণ**।। অদ্য "Langham Hall Pulpit Vol III No. 38. Theism; its Principles and Beliefs Part IV" পাঠ করি। এই উপদেশ বয়সী সাহেব পরলোকের প্রধান অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন পরলোকের প্রধান প্রমাণ এই যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের জন্য সকল ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভালবাসা সার্থক হইবার আবশ্যকতা এবং দ্বিতীয়তঃ মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবার জন্য মনের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা। এই দুইটি প্রমাণ বিশিষ্ট প্রমাণ বলিতে হইবে, বিশেষতঃ প্রথমটি। ঈশ্বরের জন্য এত করিলাম তাহার পর তিনি একেবারে আমাকে বিনাশ করিবেন ইহা কি কখন হইতে পারে?

৮ **অগ্রহায়ণ**।। অদ্য প্রাতে, ড—বাবু ও গো—বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ, Theosophy এবং 'Spiritualism' সম্বন্ধে কথা হয়। আমি বলিলাম যে যোগে এবং থিওসফি যতদূর যোগ লইয়া নাড়াচাড়া করে তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস আছে। যোগে আশ্চর্য শক্তির সঞ্চার হয়। আমি বলিলাম যে যোগীরা অনেক দিন বিনা আহারে থাকিতে পারেন ও শূন্যে বসিয়া থাকিতে পারেন ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। Spiritualism সম্বন্ধে আমি বলিলাম যে মিল্টন যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে—"Millions of spiritual creatures walk the earth both when we wake and when we sleep unseen."

"অযুত অযুত আত্মা অবনী মণ্ডলে
করে বিচরণ যবে নিদ্রিত আমরা
থাকি অথবা জাগ্রত।"

এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে পরলোকগত আত্মা সকল আমরা যাহা করিতেছি তাহা অনুভব করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের কথাবার্তা চলে ইহার যাহা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তদপেক্ষা নিশ্চয়তর প্রমাণ নাই পাইলে তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি নাই কিন্তু আমি যাহা বলিলাম তাহা যেন আপনারা ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস না হয় মনে করেন। ইহারা আমার নিজের বিশ্বাস মাত্র।

১৩ অগ্রহায়ণ।। অদ্য বয়সী সাহেবের উপদেশ "Theism; its Principles and Beliefs Part V" পাঠ করি। ইহাতে তিনি বলেন যে আত্মপ্রভাব এবং দেবপ্রসাদ উভয়ের সংযুক্ত কার্যে আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি। "That while the soul is diligiently seeking and earnestly striving to know God and his will, the divine spirit is also operating by imparting strength and energy, by giving clearness to the soul what it is in earnest to see and to know," "যখন আত্মা ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানিতে মনের সহিত ও বিশেষ যত্নপূর্বক চেষ্টা করে তখন ঈশ্বরের প্রভাবও তাহাকে বল প্রদান করিয়া এবং তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পরিষ্কার করিয়া যাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা তাহাকে বস্তুত প্রদর্শন করে।"

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা

বিজ্ঞাপন

কয়েক বৎসর হইল আমি জাতীয় সভায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উপস্থিতমতে বক্তৃতা করি; সে বক্তৃতা করিবার সময় তাহা কাহারও দ্বারা আনুপূর্বিক লিখিত না হওয়াতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, কেবল তাহার সারমর্ম 'ন্যাশনাল পেপর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৯৮ শকের ১৯এ বৈশাখ দিবসে মেদিনীপুরে ঐ বিষয়ে উপস্থিতমতে এক বক্তৃতা করি, তাহা লিখিত হইয়া ঐ বৎসরের ৪ঠা অগ্রহায়ণ দিবসে কলিকাতার বঙ্গ ভাষা সমালোচনী সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। সে অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা এক্ষণে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। 'ভারত সংস্কারক' সম্বাদপত্রে এই বক্তৃতার যে সমালোচনা হইয়াছিল, সংশোধনকালে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমি কৃতজ্ঞতা পূর্বক স্বীকার করিতেছি যে, এই বক্তৃতা প্রণয়নে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ও লং সাহেবের সঙ্কলিত *Descriptive Catalogue of Bengalee Books* নামক পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থে ভূয়সী দোষ-গুণ-বিচার-ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমপরতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যদি বড় বড় গ্রন্থকর্তার সামান্য ব্যাকরণ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ লইয়া তুল-কালাম্ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ আরো প্রশংসনীয় হইত। অবশেষে বক্তব্য এই যে, এই বক্তৃতায় যাহা আছে, তাহা কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিবৃত্তিক বিবরণ বিষয়ক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এমত নহে; আমার নিজের জীবনের দর্শনও অনেক সহকারিতা করিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। তথাপি আশঙ্কা হইতেছে, এই বক্তৃতায় অনেক উপযুক্ত গ্রন্থকারের নাম অথবা তৎপ্রণীত কোন কোন গ্রন্থের উল্লেখ করি নাই; যদি মানবীয় অপূর্ণতা হেতু এই ও অন্যান্য প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকে, তবে ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ও উল্লিখিত গ্রন্থকারেরা স্বীয় স্বীয় ঔদার্যগুণে আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা এই পুস্তিকা প্রকাশ করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি সভার সাহায্য জন্য তাহার প্রথম মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত আয় সভাকে অর্পণ করিয়াছি। সভার অন্যানা সভাগণের মধ্যে শোভাবাজার নিবাসী সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর উক্ত ভার সম্পাদনে সভাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ইতি।

কলিকাতা।

১৩ই বৈশাখ ১৮০০ শক। শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা

আমি অদ্য বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কিছু বলিবার মানস করি। এই বক্তৃতা করিবার সময় কোন কোন কবির গুণপরিচায়ক দুই একটি কবিতা পাঠ করিয়া আপনাদিগের শুনাইব ইচ্ছা আছে; কিন্তু এমন সকল কবির গ্রন্থ্ হইতে আমি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিব যাঁহারা উৎকৃষ্ট কবি কিন্তু যাঁহাদিগের গ্রন্থ্ অত্যন্ত প্রচলিত নহে।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বলিতে গেলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? হাউএনথ্‌স্যাঙ্ নামক একজন চীনদেশীয় পর্যটক খ্রীষ্টীয় শকের সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান বঙ্গ, বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কিয়দংশের ভাষা এক ছিল, কেবল আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ভাষা একটু পৃথক ছিল। এই ভাষা বোধ হয়, মাগধী-প্রাকৃত-ভাষোৎপন্ন একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী ছিল। চাঁদকবির কবিতার ভাষা যেমন শৌরসেনী-প্রাকৃত সমুদ্ভূত একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী, উল্লিখিত হিন্দীভাষা সেইরূপ মাগধী-প্রাকৃত সমুদ্ভূত-অন্যপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী। এ ভাষা হইতে বেহার অঞ্চলের হিন্দী ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য বাঙ্গালা ভাষার অত্যন্ত প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থের ভাষা কতকটা হিন্দীর ন্যায়। ভাষার কুলজী ধরিয়া গেলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষা একপ্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী হইতে, সেই প্রাচীন হিন্দী মাগধী-প্রাকৃত হইতে, মাগধী পালী হইতে, পালী গাথা হইতে এবং গাথা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি বঙ্গভাষার আদি কবি। যাঁহারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, বিদ্যাপতি শিবসিংহ নামক এক রাজার সভাসদ্ ছিলেন। কিন্তু, ঐ প্রস্তাবলেখকেরা অনুমান করেন যে, শিবসিংহ্ বাঁকুড়া অথবা বীরভূম প্রদেশের একজন জমীদার ছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সদ্বিদ্বান্ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গদর্শনে' সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, শিবসিংহ মিথিলাপ্রদেশের রাজা ছিলেন। মিথিলাতে 'পঞ্জী' নামে এক গ্রন্থ্ প্রচলিত আছে। ঐ গ্রন্থে মিথিলার রাজা ও শ্রেষ্ঠ লোকদিগের বংশাবলী এবং জন্ম ও মৃত্যুর শক লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শিবসিংহ মিথিলার রাজা ও বিদ্যাপতি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। শিবসিংহ ১৩৬৯ শক হইতে সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, সে প্রবাদ এই যে, "রাজা শিবসংহের মহিষী লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির প্রসক্তি ছিল এবং লছিমাকে না দেখিলে তাঁহার কবিতা নিঃসৃত হইত না। রাজা এই বিষয় অবগত হইয়া সন্দেহভঞ্জনার্থ মধ্যে মধ্যে বিদ্যাপতিকে গৃহবদ্ধ

করিয়া কবিতা রচিতে বলিতেন, বিদ্যাপতি তাহাতে অসমর্থ হইলে লছিমা কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে ঐ গৃহের গবাক্ষপথে উপস্থিত হইয়া দেখা দিতেন এবং অমনি বিদ্যাপতির মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইত। এইরূপে যে সকল কবিতা রচিত হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক, রাজা ইহাতে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাপতিকে শূলে দেন। বিদ্যাপতি শূলবিদ্ধ হইয়াও অকস্মাৎ লছিমাকে তথায় দর্শন ও গীতার্দ্ধ রচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।''* এই আখ্যান অবিশুদ্ধরূপে ইতালী দেশীয় মহাকবি দরিদ্র ট্যাসো এবং তাঁহার প্রিয়তমা অতুল ধনশালী সুমহৎ এষ্টে বংশীয় রাজকুমারী লিয়োনারার গল্প স্মরণ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই প্রবাদ অত্যন্ত প্রচলিত আছে যে, কবি বিদ্যাপতি একজন পরম সাধক ছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, তিনি তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়া ভাগীরথীনীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে তাহার তীরে গমন করিতেছিলেন। বাঢ় নামক স্থানে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়াতে গঙ্গাকে তথায় আগমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গঙ্গা তথায় আগমন করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এইজন্য উক্ত স্থানে গঙ্গাকে এক্ষণে ত্রিধারা হইতে দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতি যেরূপ সাধক ছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত গর্হিত প্রণয়ের গল্প তাঁহার জীবনের সহিত সঙ্গত হয় না।

বিদ্যাপতির অধিকাংশ কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে রচিত। অল্পসংখ্যক কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করেন যে, তিনি তাঁহার সকল কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের দ্বারা তাহা সর্ব্বদা গীত ও তাহাদিগের দ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ প্রতিলিপিকৃত হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন কবিতা অনেকটা বাঙ্গালা রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার সকল কবিতা সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিত। কেন না মৈথিলী হিন্দীতে রচিত কি বাঙ্গালায় রচিত তাঁহার সকল পদাবলীই বৈষ্ণবদিগের দ্বারা অত্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে যে, যেমন স্কট্‌লণ্ডের বর্‌ন্স কবি তাঁহার কবিতাগুলি কবিতা ইংরাজীতে ও কতকগুলি কবিতা স্কচ্ ভাষাতে রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে ও কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মিথিলাপ্রদেশের লোকেরা ও বঙ্গদেশের লোকেরা আপনাদিগকে প্রায় একদেশের লোক মনে করিত। মিথিলা পঞ্চগৌড়ের মধ্যে পরিগণিত ও অনেকদিন অবধি সেনবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তথায় বঙ্গরাজ লক্ষ্মণসেনের অব্দ এখনও প্রচলিত আছে। এই সকল কারণবশতঃ মিথিলাপ্রদেশের লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের লোকদিগের বিলক্ষণে সখ্যভাব ছিল ও এই সখ্যভাব নিবন্ধন বঙ্গদেশের লোকেরা মিথিলার লোকদিগের নিকট হইতে

* রামগতি ন্যায়রত্নের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা)।

অনেক মানসিক উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রথমে মিথিলাপ্রদেশে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপে তাহা প্রচার করেন। আমাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিহুতী ছাঁদের অক্ষর। মিথিলার সঙ্গে যখন বঙ্গদেশের এতদ্রূপ নিকট সম্বন্ধ ছিল, তখন ইহা অসম্ভব নহে যে, বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলী হিন্দীতে এবং কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির দুই একটি কবিতা যাহা কেহ কখন উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি:—

১

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু
দয়া করি না ছাড়বি মোয়।
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

২

তাতল সৈকত, বারিবিন্দুসম
সুতমিত রমণীসমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে।
মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়

অভয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।

আধ জনম হাম, নিঁদে গোঙাইনু,

জরা শিশু কত দিন গেলা।

নিধুবনে রমণী, রসরঙ্গে মাতনু

তোহে ভজব কোন বেলা।।

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,

ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,

সাগর লহরী সমানা।।

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমনভয়ে

তুয়া বিনা গতি নাহি আর।

আদি অনাদিক, নাথ কৃপায়সি,

ভবতারণ ভার তোহার।।"

বিদ্যাপতির এই দুইটি কবিতা তখনকার বাঙ্গালা ভাষায় রচিত; পূর্ব্বে এক স্থানে উল্লিখিত কারণবশতঃ হিন্দীর সহিত ঐ ভাষার কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আছে; কিন্তু যাহা হউক, উহা বাঙ্গালা, এইজন্য অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝা যায়; কিন্তু তাঁহার এমন সকল কবিতা আছে, যাহা ঐরূপ সহজে বুঝা যায় না। তাহা মৈথিলী হিন্দীতে বিরচিত।

বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী এক কবি ছিলেন, তাঁহার নাম চণ্ডিদাস। তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন না, তিনি বঙ্গবাসী ছিলেন। তিনি বীরভূমপ্রদেশের নান্নুর নানক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার অত্যন্ত সখ্যভাব ছিল। তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিদ্যাপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, এবং বিদ্যাপতির অজ্ঞাতসারে তিনিও বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে দুইজনের সাক্ষাৎ হইল, এই বিষয়ে চণ্ডিদাসের বন্ধু রূপনারায়ণ একটি মনোহর কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি:—

"চণ্ডিদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।

বিদ্যাপতি তব চণ্ডিদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।।

দুঁহু উৎকন্ঠিত ভেল। সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল।।

চণ্ডিদাস তব্ রহুই না পারহি চললহি দরশন লাগি।

পন্থহি দুঁহুজন দুঁহু গুণ গাওত দুঁহু হিয়ে দুঁহু রহু জাগি।।

দৈবহি দুঁহু দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।

দুঁহু দোঁহা নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই।।

তথা ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস তথি রূপনারায়ণসঙ্গে।

দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥''

উক্ত কবিতাতে ''রূপনারায়ণ গোই'' এই বাক্য থাকাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, রূপনারায়ণ উহার রচয়িতা ছিলেন। ''গোই'' পারসী শব্দ, উহার অর্থ—''বলে''।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের অব্যবহিত পরেই চৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যেরা বাঙ্গালা ভাষার বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। চৈতন্য ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫৫ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈতন্য যে সময়ে বঙ্গদেশে ধর্ম্মসংস্কারকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পঞ্জাবে নামক ও ইউরোপে লুথার ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই সময়ে পৃথিবীতে কেমন একটি ধর্ম সংস্কারের হাওয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মোৎসাহ সাংক্রামিক। চৈতন্য নিজে ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি ছিলেন, এজন্য অন্যকে মাতাইতে সক্ষম হইতেন। তিনি যখন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে হরিনাম ব্যতীত অন্য শব্দ বিনির্গত হইত না। তিনি অসামান্য রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির প্রতি সহকারিতা করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষে সুগম রাজমার্গ অথবা লৌহবর্ত্ম ছিল না, তথাপি চৈতন্য সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে বৃন্দাবন পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রভূত উৎসাহ সহকারে স্বকীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। আমি কাণপুর প্রভৃতি দেশে চৈতন্যমতাবলম্বী হিন্দুস্থানী দেখিয়াছি। ধর্ম্মসংস্কারসম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য এই উনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সম্পাদন করিতে ভীত হয়েন, চৈতন্য ধর্ম্মোন্মত্ততার সাংক্রমিক গুণপ্রভাবে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহ দিয়াছিলেন, অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছিলেন এবং দুই তিনটি মুসলমানকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্কার বিধেয় কি না ও কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায় নহে, সাধারণ হিন্দুসমাজ মধ্যে তাহা প্রচলিত হইতে পারে কি না এই বিষয় বিচার জন্য বর্ত্তমান স্থান ও উপলক্ষ উপযুক্ত নহে।

চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার এই সময়ে বাঙ্গালীর মনকে নতুন জীবন প্রদান করিয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষা নূতন উদ্যম ও স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক নূতন নূতন গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়ে রূপ গোস্বামী রিপু-দমন বিষয়ে 'রাগময় কোণ', সনাতম গোস্বামী 'রসময় কলিকা', জীব গোস্বামী 'করচাই', বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত', লোচন 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত', রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে রায়শেখর, বাসু ঘোষ, নরহরিদাস, বৈষ্ণবদাস, যদুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণ রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে নানাপ্রকার পদাবলিসকল রচনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অবস্থার নিদর্শনস্বরূপ গোবিন্দদাসের একটি পদ আপনাদের নিকট পাঠ করিতেছি:—

"ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দু।
দুর্লভ মানুষ জনমে সতসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু॥
শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনী জাগি।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলাভ লাগি॥
এরূপ যৌবন ভবন ধনজন কি আছে ইথে পরতীত।
কমলদল জল জীবন টলমল সেবহু হরিপদ নিত॥"

এক্ষণে আমরা কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের কালে আগমন করিতেছি। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সুবিধার জন্য কবিকঙ্কণের কথা অগ্রে বলিব; পরে কৃত্তিবাস ও কাশীরামকে একটি যুগলস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের বিষয় এককালে বলিব। কিন্তু ইঁহাদিগের কথা বলিবার অগ্রে আর একটি কবির কথা সারিয়া রাখিতে চাহি। সেই কবির নাম ক্ষেমানন্দ। ইনি কবিকঙ্কণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষেমানন্দ প্রকৃতির অকপট পুত্র-কন্যা স্ত্রীলোক ও ইতর লোকদিগের মনোমোহনকারী প্রসিদ্ধ 'মনসার ভাসান' রচনা করেন। শুনিতে পাই যে, নারায়ণদেব ও দ্বিজবংশী নামক 'মনসার ভাসান' পূর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা আমি কখন শ্রবণ অথবা পাঠ করি নাই। অতএব তাহা কিরূপ, তাহা বলিতে পারি না।

কবিকঙ্কণের প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। তিনি জেলা বর্দ্ধমানের সেলিমাবাদ পরগণার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪৯৫ শকে 'চণ্ডীকাব্য' রচনা আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শকে তাহা শেষ করেন। তিনি কোন জমীদারের অত্যাচারবশতঃ স্বগ্রাম পরিত্যাগকরতঃ মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূম পরগণার আঁড়রা গ্রামের জমীদার বাঁকুড়া রায়ের নিকট আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি পথিমধ্যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন চণ্ডী আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিষয়ে একখানি কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন 'চণ্ডীকাব্যে' যেখানে এই ঘটনা বর্ণিত আছে, সেই অংশটুকু আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি:—

"বাহিল গোড়াইনদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি,
তেউটায় হইনু উপনীত।
দ্বারকেশ্বর তরি, পাইনু মাতুলপুরী,
গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর,
উপনীত গোথড়া নগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান,
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥"

হায়! হায়! কবি কি দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন!

"আশ্রয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া,
পূজা কৈনু কুমুদপ্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া,
আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গীত।
গোথড়া ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই,
আঁড়রায় গিয়া উপনীত॥
আঁড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি,
রাজা দিল দশ আড়া ধান।"

কি সন্তোষচিত্ত! দশ ধাড়া ধানে এত সন্তুষ্ট!

"বীর মাধবের সুত বাঁকুড়াদেব গুণযুত,
শিশু পাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপ গুণে অবদাত,
গুরু করি করিল পূজিত॥
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য।
হাতে করি পত্র মসী, আপনি কলমে বসি,
নানা ছাঁদে লেখান কবিত্ব॥
সঙ্গে ভাই রামানন্দি, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি,
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত,
প্রকাশিত নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রী কবিকঙ্কণ গান
মম ভাষা করিও কুশল॥"

ভ্রাতৃস্নেহের পুরাবৃত্তে রামানন্দের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতে পারে।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, "উপরিলিখিত সন্দর্ভটি মুদ্রিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে অবিকল উদ্ধৃত নহে। কবিকঙ্কণ আঁড়রা গ্রামের যে ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা রঘুনাথদেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের বংশীয়েরা উক্ত আঁড়রা গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী 'সেনাপতে' নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস করেন। তাঁহারা কহেন যে, তাঁহাদের বাটীতে যে চণ্ডীপুস্তক বর্ত্তমান আছে, তাহা কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত। এ কথা সত্যি কি না বলিতে পারি না, আমাদের আত্মীয় মেদিনীপুর জেলায় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই পুস্তক হইতে উপরি উক্ত সর্ন্দভটি সমুদায় লেখাইয়া আনিয়া দিয়াছেন। আমরা উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা উক্ত সেনাপতে গ্রামের দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের পাঠানুসারে বহুল অংশে বিশোধিত হইয়াছে।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন সেনাপতে গ্রামের রাজবংশ দ্বারা রক্ষিত যে চণ্ডীগ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি যে, উক্ত পুস্তক সেই বংশের লোক দ্বারা প্রত্যহ পূজিত হইয়া থাকে এবং পূজার সময় প্রতিদিন চন্দনচর্চ্চিত হওয়াতে কোন কোন স্থানে তাহার অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। কি মানবস্বভাব পরিজ্ঞান, কি বাহ্য-জগদ্বর্ণনা-নৈপুণ্য, কি করুণারসের উদ্দীপনাশক্তি, কি সুকল্পনা, সকল বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয়। যদি তাঁহার মানবস্বভাব-পরিজ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে যে স্থলে অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। যদি তাঁহার বাহ্যজগদ্বর্ণনা-নৈপুণ্য বিশেষরূপে দেখিতে চাও, তবে তাঁহার বর্ণিত কলিঙ্গায় ঝড়বৃষ্টির বর্ণন ও মগরায়ও ঐ ঘটনার বর্ণন পাঠ কর। যদি তাঁহার করুণারস উদ্দীপনশক্তির বিশেষ পরিচয় পাইতে চাও, তবে ধনপতির কারামোচনকালে আক্ষেপউক্তি পাঠ কর। যদি এই তিন গুণের একত্রে মিশ্রণ দেখিতে চাও, তবে ফুল্লরার বারমাস্যা পাঠ কর। যদি তাঁহার সুকল্পনাশক্তির বিশেষ নিদর্শন দেখিতে চাও, তবে কালীদহের কমলকামিনী-কর্ত্তৃক করিগ্রাস ও উদ্গীরণব্যাপার বর্ণন এবং যে স্থানে পাত্রমিত্র সভাসদ্ লইয়া পশুরাজ সিংহের বার দিয়া বসা বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। এই দুই স্থলে মুকুন্দরাম সুকল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রতিভা বিষয়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। ভারতচন্দ্র তাঁহাকে অনেক স্থলে অনুকরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অনেক স্থানের ভাব পার্সি ও সংস্কৃত হইতে নীত। এসিয়া কিম্বা ইউরোপখণ্ডের এমন কোন কবি নাই, যাঁহাকে মাইকেল মধুসূদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল-রচনাশক্তি বিষয়ে মোটা ধুতি ও দোজ পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ শোভন ধুতি ও উড়ানি পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্ ভারতচন্দ্র এবং কোট

পেণ্টুলন পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নেই। কবিকঙ্কণের দুইটি মনোহর লক্ষণ আছে। সেই দুইটি মনোহর লক্ষণ এই যে, তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্রজীবন যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোন কবি সেরূপ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার আদিরস বর্ণনাতে কিছুমাত্র অশ্লীলতা নাই। "দরিদ্রের কবি" এই গৌরবাস্পদ উপাধি যেমন তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তেমন অন্য কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

কৃত্তিবাস ফুলেগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪৬০ শকে রামায়ণ রচনা করেন। কাশীরাম দাস জেলা বর্দ্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দুইশত বৎসর পূর্বে মহাভারত রচনা করেন। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের মুদি বকালি পর্য্যন্ত সকলে উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। ইহা বিবেচনা করিলে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে অল্প সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। কবিদিগের সৌভাগ্য প্রধান প্রধান সেনাপতি ও রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত কামনা করিয়া থাকেন। কুইবেকের যুদ্ধের পূর্ব্বদিন জেনারেল উলফ্ ইংরাজী কবি গ্রে-প্রণীত "Elegy written in a country churchyard" নামক কবিতা পাঠ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কল্য ফরাসিস্‌দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করা অপেক্ষা এই কবিতার রচয়িতা হইতে বাসনা হয়। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে। আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা জাহাজি গোরার ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশু নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বাল্যকাল অবধি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া আইসে। কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, সম্বাদপত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়।

কাশীরাম দাসের পর রামেশ্বর প্রাদুর্ভূত হন। তিনি হুগলী জেলার বরদা পরগণার যদুপর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুর নগরের অনতিদূরস্থিত কর্ণগড় নামক স্থানের রাজা যশমন্ত সিংহের সভাসদ্ ছিলেন। এই যশমন্ত সিংহ বিখ্যাত অজিত সিংহের পিতা ছিলেন। রামেশ্বরের 'শিবায়নে' লিখিত আছে:—

"যশমন্ত নরনাথ, অজিত সিংহের তাত।"

কর্ণগড়ের রাজপ্রাসাদ ক্রমে ভগ্ন হইতেছে, আর কিছুদিন পরে তাহার কোন চিহ্নই থাকিবে না, কিন্তু রামেশ্বরের 'শিবায়নে' তাহার অধিবাসীদিগের নাম চিররক্ষিত থাকিবে। কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তিনি সামান্য ব্যক্তি হইয়াও রাজাদিগকে অমরণ-ধর্ম্ম প্রদান করিতে পারেন। রামেশ্বরের ভাষা তত প্রাঞ্জল ও মধুর নহে; তথাপি স্থানে স্থানে তিনি মানবস্বভাব-বর্ণনে এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে এরূপ প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাঁহাকে নিতান্ত সামান্য কবি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। মেদিনীপুর গৌরব করিতে পারেন যে, তিনি রামেশ্বরের

ন্যায় কবিকে এক সময়ে তাঁহার বক্ষে পোষণ করিয়াছিলেন। 'শিবায়ন' ব্যতীত রামশ্বের 'সত্যনারায়ণের পুথি' রচিয়াছেন, তাহা অন্যান্য সত্যনারায়ণের কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তাহার অনেক স্থানের বর্ণনা অতীব মনোহারিণী হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্ব স্থানে সত্যনারায়ণের পূজার সময় ঐ গাথা গীত হইয়া থাকে। তাঁহার 'সত্যনারায়ণ পুথি' হইতে এক স্থান উদ্ধৃত হইতেছে। স্বদেশে বহুকাল অনুপস্থিতির পর তৎসন্নিহিত নদীতীরে বণিকপত্নী চন্দ্রকলার পতির নৌকা লাগিবার সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। পতি-বিরহ-বিধুরা চন্দ্রকলার শোক কবি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"ধরিয়া মায়ের গলা, কাঁদে কন্যা চন্দ্রকলা,
স্বামি শোকে হইয়া কাতর।
ম্লান হইল মুখশশী, মনোরমা মুক্তকেশী,
না সম্বরে অঙ্গের অম্বর॥
হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় হানয়ে বুকে,
কপালেতে কঙ্কণ আঘাত।
ধৈরজ ধরিতে নারে, কেন্দে কহে উচ্চস্বরে,
কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ॥
হায় এ কি অকস্মাৎ, কোথা গেলে প্রাণনাথ,
একবার দরশন দেও।
দেশে আইলে কত দিনে. বড় সাধ ছিল মনে,
আঁখিভরি দেখিব তোমারে।
তাহাতে দারুণ বিধি, হরিল হাতের নিধি,
বড় শেল রহিল অন্তরে॥
পতির মরণে যেন, রতির বিষাদ হেন,
কান্দে কন্যা করিয়া বিলাপ।
মায়ের বিদরে বুক, বাপে দশগুণ দুঃখ,
সবে কান্দি করে মনস্তাপ।"

"বাপে দশগুণ দুঃখ"—কবি কি সত্যই বলিয়াছেন!

শুনিতে পাই যে, রামেশ্বরের 'সত্যনারায়ণের পুথি'র ন্যায় পূর্ব্বদেশে সত্যনারায়ণের ও শনির পাঁচালী প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা আমি কখন শুনি নাই; অতএব তাহা কিরূপ, বলিতে পারি না।

এক্ষণে আমরা একটি ধর্ম্মসঙ্গীত-রচয়িতা সাধুপুরুষের নিকট আগমন করিতেছি। তাঁহার গীতগুলি অতি সহজ ভাষায় রচিত এবং বঙ্গদেশে সর্ব্ব স্থানে পরমার্থসাধক বলিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। তাঁহার নাম কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

সেন। যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাতভিখারীদিগের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে, তাহা বলা যায় না। রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন। রামপ্রসাদ সেন ধর্ম্মসঙ্গীত ব্যতীত 'কালী-সংকীর্ত্তন' ও 'কবিরঞ্জন-বিদ্যা-সুন্দর' নামক কবিতাদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতের ন্যায় তাহা তত প্রসিদ্ধ নহে।

এই সময়ে সুবিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার ভুরসুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ ছিলেন। ইনি জীবনের শেষভাগে মূলাজোড় গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বংশাবলী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ভারতচন্দ্র ১৬৭৪ শকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করেন :—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

কাহারও কাহারও মতে ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। অনেক স্থানে ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ছায়া মাত্র। উদ্ভাবনীশক্তিতে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু রায় গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহার সন্দেহ নাই। মানবস্বভাব-পরিজ্ঞানে যে তিনি কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন, ইহা বলা যাইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের রচনার তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচাছোলা মাজাঘষা যে, বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সুচিক্কণ নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে, অন্য কোন কবি সেরূপ পারেন না :—

"পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি"
"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট"

তৃতীয়তঃ তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণ মধ্যে এত প্রচলিত যে, তাহা গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে :—

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"
"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"
"বড়র পিরিতি বালির বাদ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ"

কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্রের যদি উদ্ভাবনীশক্তি থাকিত, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ বিদ্যা ও কুলশীল উভয়গুণসম্পন্ন জামাতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই হইতেন। "গজদন্ত কনকে জড়িত।"

রায় গুণাকরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নাম ঘনরাম। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'ধর্ম্মমঙ্গল গান'। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করিবার ৪২ বৎসর পূর্ব্বে ঘনরাম ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ঘনরামের কবিতাতে স্বাভাবিক সারল্য ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই।

ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'-প্রণেতা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। গায়নেরা চামর ঢুলাইয়া ও মন্দিরা বাজাইয়া চণ্ডী ও রামায়ণ যেমন গান করিয়া থাকে, তেমনি এই কাব্যটিও গান করিয়া থাকে। আমার স্মরণ হয়, আমার বাল্যকালে আমার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-সম্পর্কীয় কোন ভক্তিভাজন স্ত্রী-লোক সর্বদা 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' ভক্তির সহিত পাঠ করিতেন। তখন বীটন সাহেব এদেশে আগমন করেন নাই ও স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাতও হয় নাই।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থই পদ্যে রচনা হইয়া আসিতেছিল, এই সময় গদ্যগ্রন্থ রচনা হইতে আরম্ভ হয়। এস সময় হইতে রচনার বিষয়ানুসারে বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিষয় বলিব। সে সকল বিষয় এই;—গদ্য, সাধারণ পদ্য, গীতিকাব্য নাটক, উপন্যাস, শ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য, সঙ্গীত, পুরাবৃত্ত, পুরাতত্ত্বানুসন্ধান, বিজ্ঞান, দর্শন,—আপনারা ভয় পাবেন না, এই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইবে,—মুদ্রাযন্ত্র, সম্বাদপত্র, সাময়িক পুস্তিকা, বক্তৃতারীতি, খৃষ্টানী বাঙ্গালা, মুসলমানী বাঙ্গালা, কয়েকটি ধর্ম্মের নিকট বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উপকৃত ভাব, বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতির কালবিভাগ, বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান ও ভাবী অবস্থা।

অনেকে মনে করেন যে, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্যগ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহা-কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় গদ্যগ্রন্থ লিখিত হইবার পূর্ব্বেও কতিপয় গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের ভাষা ভাল নহে। ইংরাজী ১৮০৬ সালে 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' প্রকাশিত হয়। উহা রামরাম বসু দ্বারা কেরি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে প্রণীত হইয়াছিল। রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম

কালেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে'র ভাষা অতি কর্কশ। ১৮০৫ সালে 'কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত্র' প্রকাশিত হয়। উহাও কেরি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে ঐ কালেজের অন্যতর শিক্ষক রাজীবলোচন দ্বারা প্রণীত হয়। ১৮০৮ সালে 'রাজাবলী' ও ১৮১৩ সালে 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' ঐ কালেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক উৎকলদেশ-জাত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার দ্বারা প্রকাশিত হয়। 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র অনেক স্থল যে প্রকার উৎকট সাধুভাষায় লিখিত, তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে:— "কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" ১৮১৪ সালে 'পুরুষ-পরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। উহা বিদ্যাপতি-প্রণীত ঐ নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ১৮৩০ সালে কলিকাতার তদানীন্তন লর্ড বিশপ টর্নর সাহেবের প্রস্তাবানুসারে 'পুরুষ-পরীক্ষা' রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের দ্বারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়। ঐ অনুবাদ সাহেব মহলে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠার মূল। উল্লিখিত গ্রন্থসকল এমন অপকৃষ্ট ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অন্যায় হয় না। তিনিই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের জনয়িতা। ১৮১৬ সালে রাজা রামমোহন রায় দশোপনিষদ বাঙ্গালা গদ্য ভূমিকার সহিত প্রকাশ করেন। সেই অবধি তিনি অনেক বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার বিষয়ক। ইহার একখানি গ্রন্থ সহমরণের বিপক্ষে। সহমরণের পক্ষের লোকেরা তাঁহাদিগের একখানি গ্রন্থে আমাদিগের দেশের বেচারী স্ত্রীলোকদিগের উপর নানাপ্রকার অযথা দোষারোপ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় তাহাদিগের পক্ষ-সমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার গদ্যভাষার দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে:—

"পঞ্চম, তাহাদের ধর্ম্মভয় অল্প। এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ পনেরো বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপিও ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃ গৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্মনির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাসীবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন,

ভোজনাদিপাত্রমার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্রস্থিতি অধিককাল করেন, এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহারদিগের স্বামী, শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন, এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজনাবশেষে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণকায়স্থ, যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোকসকল এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসী স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন; রাত্রিতে শয্যাদি যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ক্রটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানসদুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ক্রটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদিগের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপি কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।”*

*রাজা রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে স্থানে স্থানে গুরু কর্ত্তার ইতর ক্রিয়া ও ইতর কর্ত্তার গুরু ক্রিয়া ও সর্ব্বনাম আছে। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতু এইরূপ হইয়াছে।

"পুরুষের প্রাবল্য হেতু" এই প্রয়োগে বিশেষ রস আছে। এই প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির যেরূপ উকীল ছিলেন, এমন বোধ হয় সুবিখ্যাত মিল সাহেবও নহেন। এই স্থানে রামমোহন রায় তাঁহার বরাঙ্গিণী মোয়াক্কেলদিগের জন্য যেরূপ লড়িয়াছেন, এমন প্রায় অন্য কাহাকে দৃষ্ট হয় না।

সুখের বিষয় এই যে, রামমোহন রায় আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা আর একপ্রকার একশেষে যাইতেছেন। সে কালের স্ত্রীলোকেরা যেমন গৃহকার্য্য পরিশ্রম-তৎপর ছিলেন, এক্ষণকার স্ত্রীলোকদিগকে সেরূপ দেখা যায় না।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর একাদশ বৎসর পরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দ্বারা যে বঙ্গভাষার বহু উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বাদশ বৎসর উহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ের মধ্যে পত্রিকাতে যে সকল প্রস্তাব লিখেন, তাহা বঙ্গভাষাকে অতি সমৃদ্ধশালিনী করিয়াছে। অক্ষয়বাবুর প্রণীত 'বাহ্যবস্তু' ও 'ধর্ম্মনীতি' তাঁহার সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত "প্রাচীন হিন্দুদিগের বাণিজ্য", "পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষা", "কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা" প্রভৃতি তাঁহার স্বকপোল-রচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্ব্বোত্তম রচনা। দুঃখের বিষয়ে এই যে, তাহা এখনো স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। অক্ষয়বাবু বর্ত্তমান বঙ্গভাষার একজন প্রধান নির্ম্মাতা।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা ভাষার জন্সনস্বরূপ বিজ্ঞাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট আগমন করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রন্থসকলের দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয়বাবু কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনীশক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত 'সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এবং 'বিধবাবিবাহ-বিচার' গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল-রচনাশক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার সময় তাহা সমাপনকালে অনেক ইংরাজীওয়ালা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর-রচিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত 'সীতার বনবাসে' ভবভূতির 'উত্তরচরিত' ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেকে মনোহর রচনা

আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোল-রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরিমাণে নির্ম্মাণ ও পরিমার্জ্জন-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছে।

বিদ্যাসাগরের ইদানীন্তন ভাষা যেমন সহজ, কোমল ও মসৃণ হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তিনি সংস্কৃত-শব্দবহুল সাধুভাষা করাতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার ও শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ সালে অপভাষায় লিখিত একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহার নাম 'মাসিক পত্রিকা'। ঐ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপন থাকিত। সেই বিজ্ঞাপনে এই কথাগুলি লেখা থাকিত, "এই পত্রিকা পণ্ডিতলোকদিগের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে না। তাঁহারা পড়্তে চান পড়বেন, কিন্তু তাঁদের জন্য এ পত্রিকা নহে।" ঐ পত্রিকায় টেকচাঁদ ঠাকুর-প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ কল্পিত টেকচাঁদ ঠাকুর আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র। সেই অবধি দুই প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে,বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাষা। কোন্ ভাষা জয়লাভ করিবে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে সন্দেহ ছিল। এক্ষণে যেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐ দুই ভাষা হইতে উৎপন্ন এক মিশ্র ভাষা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক বিখ্যাত উপন্যাস-রচয়িতা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এমন এমন বিশেষ বিষয় আছে, যাহাতে হয় কেবল বিদ্যাসাগরী ভাষা, নয় কেবল আলালী ভাষা চিরকাল ব্যবহৃত হইবে। পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত কিম্বা বিজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলে বিদ্যাসাগরী ভাষা অবলম্বন করিতেই হইবে, আর শ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য, কিম্বা হাস্যকর উপন্যাস কিম্বা নাটক লিখিতে হইলে আলালী ভাষা ব্যবহার করিতেই হইবে।

"আলালী ভাষা" এই প্রয়োগ যুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাষাসম্বন্ধে প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি ঐ প্রস্তাবে বলিয়াছেন, "আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতুম পেঁচা বল, মৃণালিনী বল, পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি, কিন্তু পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই এ সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়।...অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কি না ?—আমাদিগের বোধে উচিত। যেমন ফলাহারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মোণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়,—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়োর খাঁট্টা মুখে না দিলে

সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফল কথা এই, পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার; একবিধ রচনা পাঠে সর্ব্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নয়। অতএব ভাষার মধ্যে নানাপ্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায় হাস্যপরিহাসাদি লঘু বিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণকার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপ্রদা হয়।''

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ হইতে টেকচাঁদ ঠাকুর-ঘটিত একটি অতীব কৌতুকজনক স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা গেল না। টেকচাঁদ ঠাকুর বাবুরামের শ্রাদ্ধ-বর্ণনে লিখিয়াছেন, ''দিনরাত্রি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন যেন গো মড়কে মুচির পার্ব্বণ।'' পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন নিজে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, অতএব তিনি টেকচাঁদ ঠাকুরের এই উক্তিতে নিতান্ত ক্ষুন্ন হইয়া লিখিয়াছেন, ''এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা বহুবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করেন, চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। সহস্র ক্লেশভোগ, করিয়াও তাহা করিতে পারিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন। অধ্যাপনার প্রণালীও এদেশের স্বতন্ত্ররূপ,—ছাত্রদিগকে অন্ন দিয়া পড়াইতে হয়। বিদ্যাধ্যাপনের এরূপ উদার রীতি বোধ হয় কোন দেশে নাই। অধ্যাপকেরা বৈষয়িক সুখে বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞান বিতরণ কার্য্যেই সর্ব্বদা নিরত থাকেন, এইজন্য তাঁহাদের আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দেশীয় ধার্ম্মিক বিজ্ঞলোকেরা শ্রাদ্ধবিবাহাদি সকল কার্য্যের উপলক্ষ্যেই তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া থাকেন। তাহাই অধ্যাপকদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। তদ্দ্বারা তাঁহারা পরিবারদিগের কথঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া অভিলষিত কার্য্যে চিরজীবন যাপন করেন। অতএব আমাদিগের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগের ন্যায় শ্লাঘ্যকর্ম্মা ও উদারাশয় পণ্ডিত কোন্ জাতির মধ্যে কত আছেন? যদিও উৎসাহবিরহাদি নানা কারণে এক্ষণে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতে নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন না, তথাপি সাধারণ্যে ঐ শ্রেণীস্থ লোকের উপর প্রাচীন ও নব্য, উভয় তন্ত্রেরই কৃতবিদ্য বিজ্ঞলোকদিগের অদ্যাপি বিলক্ষণ গৌরববুদ্ধি আছে, যেহেতু তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে একদল ঐরূপ মহেচ্ছু লোক আছেন, এজন্য ভিন্নজাতীয়দিগের নিকট গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু পাঠকগণ দেখুন, হিন্দুজাতির গৌরবস্থল সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি টেকচাঁদবাবু কিরূপ বিজ্ঞোচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।'' পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তৎপরে বলিতেছেন, ''কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর কেন, ব্রাহ্মণজাতির প্রতি টেকচাঁদবাবুর কিছু বিদ্বেষ আছে বোধ হয়, যেহেতু তিনি আগড়পাড়াস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গোষ্ঠীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন,

'বামুনে বুদ্ধি বড় মোটা, সকল সময়ে সব কথা শুনিয়া বুঝিতে পারে না ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁক্‌ড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয় ইত্যাদি'—এক্ষণে টেকচাঁদবাবুর প্রতি জিজ্ঞাস্য এই, ন্যায়শাস্ত্র বোঝা কি মোটা বুদ্ধির কর্ম্ম? এপর্য্যন্ত এই মোটা বুদ্ধির ব্রাহ্মণ ভিন্ন কয়জন সরু বুদ্ধি ইতরজাতীয় লোক ন্যায়শাস্ত্র বুঝিতে পারিয়াছেন? এদেশে ব্রাহ্মণেরাই চিরকাল শাস্ত্র-চর্চ্চা ও বুদ্ধির পরিচালনা করিয়াছেন। অতএব তাঁদের সন্তানেরা সাধারণ্যে অপরিশীলিত বুদ্ধি ও অন্যান্য জাতীয়দিগের সন্তানগণ অপেক্ষা অধিক মোটা বুদ্ধি হইবেন, তাহার সম্ভব নয়।'' পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি যথার্থ। কিন্তু শ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য-প্রণেতারা কত কি বলিয়া থাকেন, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য এত প্রয়াস পাইবার আবশ্যক কি? টেকচাঁদ ঠাকুরের উক্তি অপেক্ষা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের খণ্ডন আরও কৌতুকজনক হইয়াছে, বিশেষতঃ যেখানে তিনি ''পাঠকবর্গ দেখুন'' বলিয়া পাঠকবর্গ-সমীপে আপীল করিয়াছেন, সেই স্থান আরও কৌতুকজনক হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকটেও বঙ্গভাষা বিশেষ উপকৃত আছে। তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ করিয়া ভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। উহা বিদ্যারত্নের একটি খনিস্বরূপ। তিনি 'প্রাকৃতিক ভূগোল' প্রকাশ করিয়াও বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়াছেন।

'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ভাষা অনেক পরিমাণে ঋণী আছে। তিনি উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে সম্পাদিত সম্বাদপত্র প্রকাশ ও অনেক নূতন শব্দের ও প্রয়োগের সৃষ্টি করিয়া ভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে পুরাবৃত্ত রচনা করেন।

এক্ষণকার গদ্য-লেখকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন প্রধান। ইঁহার বিষয় আমরা পরে বলিব।

গদ্য ছাড়িয়া তৎপরে আমার সাধারণ পদ্য বিভাগে প্রবেশ করিতেছি। এই বিভাগে ভারতচন্দ্রের পর আমাদিগের দৃষ্টি প্রথমতঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রতি নিপতিত হয়। ইহাঁর প্রধান গ্রন্থ 'বাসবদত্তা'। এই গ্রন্থ অনেক সংস্কৃত কবি ও ভারতচন্দ্রের অনুকরণে পরিপূর্ণ। তথাপি তর্কালঙ্কার মহাশয় স্থানে স্থানে যে কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সামান্য কবি বলিয়া বোধ হয় না, বিশেষতঃ যখন বিবেচনা করা যায় যে, তিনি একুশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আরও প্রশংসা করিতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রহস্যজনক কবিতাতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি পাঁঠার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাঁঠার সাদা ও কাল ছানাগুলিকে কানাই বলায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। কানাই বলাই যেমন গোষ্ঠে খেলা করিয়াছিলেন, ইহারাও মাঠে সেইরূপ খেলা করে। তিনি ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন,

তাহাতে এই বাক্য আছে:—

"মুরগির আণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা,
খেয়ে কর প্রাণ ঠাণ্ডা।"

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সম্বন্ধে তিনি এক কবিতা লেখেন, তাহাতে এই বাক্য আছে:—

"মাথামুণ্ডু ঘুরে গেল মাথামুণ্ডু লিখে।"

গরীব যে আমি, আমার সম্বন্ধেও লিখিয়াছিলেন:—

"বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।"

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেবের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা অতীব রহস্যজনক; তাহাতে মার্শম্যান সাহেবকে শিবরূপ এবং তাঁহার সহকারী সম্পাদক টাউনষেণ্ড ও রবিন্‌সন সাহেবদিগকে নন্দী ও ভৃঙ্গীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নন্দী এক্ষণে বিলাতে গিয়া *Spectator* নামক তথাকার বিখ্যাত সম্বাদপত্রের সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন; ভৃঙ্গীটি এখনও এখানে আছেন, তিনি এক্ষণে 'বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট গেজেটে'র সম্পাদক। ঐ গেজেটে গবর্ণমেন্ট আইনের যে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তাহা তাঁহারই। ঐ অনুবাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি চমৎকার!

'রামরসায়ন'-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী একজন সামান্য কবি নহেন। ইনি দক্ষিণদেশবাসী ছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেনের নিকট সর্ব্বদা আসিতেন।

মাইকেল মধুসূদনরূপ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের দেশের বর্ত্তমানকালের প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের প্রভার নিকট তাঁহার প্রভা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। রঙ্গলালবাবুর কবিতাতে সহৃদয়তাগুণ অধিক নাই, কিন্তু তিনি একজন অতি উৎকৃষ্ট কবি, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রধান।

ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঢাকাই কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের প্রণীত 'সদ্ভাবশতক' অতীব মনোহর। তাহা পারস্য কবি হাফেজকে আদর্শ করিয়া লিখিত, কিন্তু উহা হাফেজের হীন অনুকরণ নহে। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মিত্র ঢাকা-প্রদেশীয় অন্যতর বিখ্যাত কবি।

এক্ষণে আমরা মাইকেল মধুসূদনের নিকট আগমন করিতেছি। এই বারেই ঠকাঠকি! মাইকেল মধুসূদনের যেমন গোঁড়াও অনেক, তেমনি শত্রুও অনেক। তাঁহার সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল। তিনি কালেজে আমার সমাধ্যায়ী ছিলেন। যখন আমি মেদিনীপুরে ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বদা পত্র লেখা হইত; সেই সকল পত্র আমার নিকট আছে; তাহা অতীব কৌতূহলজনক। যখন আমি ঐ স্থানে ছিলাম, তখন মাইকেল মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছাপাইবার পূর্ব্বে তাহার প্রথম

দুই সর্গ আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া যেখানে যেখানে দোষ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত তিনি আমাকে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' সম্বাদপত্রে তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রার্থনামতে আমি ঐ কাব্য উক্ত পত্রে সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষগুণ বিচারের সময় বন্ধুতাভাবের দ্বারা মনকে বশীভূত হইতে দেওয়া উচিৎ নহে। আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোষে গুণে, মাইকেল মধুসূদনও তেমনি দোষে গুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষ ও গুণ আছে, কিন্তু "দোষে গুণে কবি" এই প্রয়োগের অর্থ এই যে, যেমন তাঁহার অসামান্য গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য্য, করুণারসের উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন তাঁহার দোষ বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টুলন দেখা দেয়। আর্য্যকুলসূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দু জাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয় ভাবসম্পন্ন, তেমন অন্য কোন কবি নহেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল; যথা,—হোমর ও বাল্মীকি। শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে মিলটনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে, তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা শব্দ-বিন্যাসের রাজ-গাম্ভীর্য্য ও রচনার জম্‌জমাট্ দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিল্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণই দৃষ্ট হয়। "যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে" "নাদিল দম্ভোলি কড় কড় রবে" ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগদ্বারা মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রসভঙ্গ দোষ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনাকালে মাইকেল মধুসূদন "খেদাইনু" "নাদিলা" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে

সম্বোধন করিবার সময় তিনি ''রামভদ্র'' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ঐ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার মধ্যে গৃধিনী, শকুনী ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎসরসের প্রবর্ত্তনা দ্বারা শান্তিরসের ভঙ্গ করা হইল। কিন্তু এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষসত্ত্বে কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি? 'মেঘনাদবধ' ব্যতীত 'বীরাঙ্গনা', 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা' প্রভৃতি তাঁহার অন্য সকল কবিতাও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তির অন্যান্য প্রমাণে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নবপ্রেমের মুগ্ধতা কমিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার দোষসকল স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।*

কয়েক বৎসর হইল, 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'য় 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' নামে মাইকেল মধুসূদনের রচনার একটি হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। আমি ইংরাজীতে হোমর প্রভৃতি কবির হাস্যকর অনুকরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই হাস্যকর অনুকরণটি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকে এইরূপ মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অনুকরণ রচনা করেন, তিনি কবির অমর্য্যাদা করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শুনিতে পাই, কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণে বিরক্ত না হইয়া তাহা পাঠ করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

''ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য।

দ্রুহিণ-বাহন সাধু, অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে,—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত—দুর্জ্জয়—
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিলা?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখরপ্রহারে,
যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।

* এই বক্তৃতা করিবার পর আমি অবগত হইলাম যে, আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য মাইকেল মধুসূদনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় পক্ষীয় লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক বলিয়াছি।

অর্কস্মারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত
সু আশুগ ইরম্মদ গমে সনসনে)
চতুষ্পদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছসম
নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে। হায় রে! যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা দশভূজাকাছে,—
(স্মাদ্রীশ আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্ মণ্ডলী।
কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহুঃ দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্য্যাত্মজালয়ে—
(বিষ্ণুপরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারুবিনির্ম্মিত দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরি সঙ্কীর্ত্তনে।''

এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ''ভারতসঙ্গীত'' অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে। তাঁহার রচিত ''ভারতসঙ্গীতে'' মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর গুরু মাধবাচার্য্য বলিতেছেন :—

''বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
বিংশতিকোটি মানবের বাস

ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

... ...

কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতি তেমনি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ি লুটাও।
অই দেখ! সেই মাথার উপরে
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল;
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?
বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

আমার মতে হেমচন্দ্রবাবুর সকল কবিতার মধ্যে "গঙ্গার উৎপত্তি" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে:—

১

"ঋষি কয় জন সন্ধ্যা সমাপন
করি একদিন বসিলা ধ্যানে,
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা
কহিতে লাগিলা আসি সেখানে;—

২

রাখ ঋষিগণ সমূলে নিধন

মানবসংসার হলো এবার,
হলো ছারখার ভুবন আমার,
অনাবৃষ্টি তাপ সহে না আর।

৩

শুনে ঋষিগণ করে দৃঢ় পণ
যোগে দিল মন একান্ত চিতে;
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম আরাধনা
করিতে লাগিল মানবহিতে।

৪

মানব মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময়;
মানবে রাখিতে নারায়ণচিতে
হইল অসীম করুণোদয়।

৫

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগনমণ্ডল তিমিরময়,
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।

৬

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিত প্রায়,
নিবিড় আঁধার জলধিহুঙ্কার
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

৭

নাহি করে গতি গ্রহদলপতি
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে,
নদনদীজল হইল অচল
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

৮

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয়;

ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চঁকিতে ভুবনত্রয়।

৯

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়
ব্রহ্মসনাতন অতুল চরণ
সলিল নির্ঝর বহিছে তায়।

১০

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী,
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে,
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি,

১১

হায়! কি অপার আনন্দ আমার,
ব্রহ্মসনাতন চরণ হতে
ব্রহ্মা কমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।"

নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, বর্ত্তমানকালের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। ইহাঁদের মধ্যে কোন কোন সাহিত্য-রসাভিজ্ঞ ব্যক্তি নবীনচন্দ্র সেনকে এক্ষণকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কবি বলিয়া গণ্য করেন। কেহ কেহ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীকে ঐ পদ প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা আপনাদিগের অভিপ্রায় পক্ষে যে সকল যুক্তি দেখান, তাহা নিতান্ত ক্ষীণ বোধ হয় না। আমি বিহারীবাবুর গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া তাঁহাকে "দুঃখের কবি" এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম, তিনি যেমন দুঃখ ও মানসিক কষ্ট বর্ণনা করিতে পারেন, তেমন অন্য কোন বর্ত্তমান কবি পারেন না।

গঙ্গার গতির সঙ্গে বাঙ্গালা কবিতার গতির উপমা দেওয়া যাইতে পারে। গঙ্গা যেমন বিষ্ণুপদ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া হিমালয়প্রদেশে যেখানে প্রকৃতিদেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে হিমালয়দুহিতা পার্ব্বতীর কীর্ত্তিস্থান দিয়া যেমন প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মুকুন্দরামের চণ্ডী মহাকাব্যে বন্য ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণকরতঃ মহামায়ার অদ্ভুত কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। গঙ্গা যেমন বিঠুর গ্রামের

সন্নিহিত হইয়া একদিকে বাল্মীকির তপোবন ও অন্যদিকে রামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থান অযোধ্যাপ্রদেশ, দুইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামগুণ গান করিয়া ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের কীর্ত্তিস্থান দিয়া প্রবাহিত যমুনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মধ্যকালে কৃষ্ণার্জ্জুনের গুণকীর্ত্তনকারী কাশীরাম দাসের মহাভারতরূপ শাখানদী হইতে বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপ প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। ভাগীরথী যেমন একদিকে চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর, অন্যদিকে চাণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, কলিকাতা, ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইউরোপীয় কীর্ত্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা অধুনাতন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালা কবিদিগের গ্রন্থে ইউরোপীয় সুন্দর, কিন্তু বঙ্গপ্রকৃতি-বিরোধী অস্বাভাবিক ভাবের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছে। গঙ্গা যেমন কলিকাতার দক্ষিণে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া মহাকল্লোলসমন্বিত বেগে সমুদ্রসমাগম লাভ করিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী, উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও ওজস্বী হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

সাধারণ পদ্য বিভাগ ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে আমরা তাহার একটি বিশেষ শাখা অর্থাৎ গীতিকাব্যের বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। রামপ্রসাদ সেনের পর গীত রচনায় নিধিরাম গুপ্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম 'গীতরত্ন' গ্রন্থ। উহা সচরাচর 'নিধুর টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধ। নিধুবাবু ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিধুবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি বাণিজ্যাগারে কর্ম্ম করিতেন। কথিত আছে যে, তিনি ঐ বাণিজ্যাগারে যে ডে-বুক রাখিতেন, তাহাতে একদিন একটি টপ্পা লিখিয়াছিলেন। নিধুবাবুর রচিত গীতে মধ্যে মধ্যে চমৎকার ভাব আছে :—

> ''নির্ভয় শরীর মোর
> উল্লাসিত অন্তর,
> হৃদয়ে উদয় সদা প্রেম পূর্ণচন্দ্র।''

এই বাক্য মানবীয় প্রেম অপেক্ষা ঐশী প্রেমের প্রতি আরো অধিক খাটে।

> ''নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
> বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?''

"যদি সুখী হইবে, হে মন রাজন!
অহঙ্কার দূর কর ক্রোধ নিবারণ।"

নিধুবাবুর পর কবিওয়ালাগণ গীতরচনা-বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিধুবাবু নিজেও একজন কবিওয়ালা ছিলেন। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু নরসিং ও রাম বসু প্রধান। হরু ঠাকুরের গীতগুলি অতি উৎকৃষ্ট। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার রচিত অধিকাংশ গীত আর পাওয়া যায় না। রাম বসুর বিরহ আমাদের দেশে অতি বিখ্যাত। অন্তর ও বাহ্যজগৎ বর্ণনে রাম বসুর যেরূপ নৈপুণ্য দেখা যায়, এমন বাঙালা ভাষায় অতি অল্পসংখ্যক কবির দেখা যায়। রাম বসুর গীতগুলি যেন স্বভাবের হস্ত হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বহির্গত হইয়াছে, এমনি বোধ হয়। হরু ঠাকুরের বিষয়ে যে আক্ষেপ করা গেল, রাম বসুর সম্বন্ধে সেই আক্ষেপ করা যাইতে পারে। তাঁহার অনেকগুলি গীত লোপ পাইয়াছে। আমার রচিত 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে হরু ঠাকুর ও রাম বসুর কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি। কবিওয়ালাগণ ব্যতীত অন্যান্য গীতরচকেরা বাঙ্গালা ভাষার অল্প উপকার সাধন করেন নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "কলিকাতার ঠনঠনেনিবাসী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের ও শোভাবাজারনিবাসী গঙ্গানারায়ণ লস্করের পাঁচালী, পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত তাবাগ্রামনিবাসী পরমানন্দ অধিকারীর তুক্ক, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেলডাঙ্গানিবাসী রূপ অধিকারীর ঢপ, বর্দ্ধমানান্তঃপাতী চুপীগ্রামনিবাসী রঘুনাথ রায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের) ও নরচন্দ্রের শ্যামাবিষয় গীত, উলুসে গোপালনগরনিবাসী মধুসূদন কানের কীর্ত্তন, বাঁশবেড়েনিবাসী শ্রীধর কবিরত্নের আদিরস-সংক্রান্ত গীত, গোপাল উড়ে, গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, বদনচন্দ্র অধিকারী, নীলকমল সিংহ, দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, মদনমোহন মাষ্টার প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গীত, এ সকলও বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন পক্ষে সাধারণ সাহায্য করে নাই। আমরা বাহুল্যভয়ে এ সমস্তে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া দুঃখিত রহিলাম।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার অত বড় গ্রন্থে যে ভয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, আমিও ঐ ভয়ের আধিক্যবশতঃ একটি সামান্য বক্তৃতায় ইহাঁদিগের বিষয় অধিক বলিতে পারিলাম না।

কিন্তু আমরা একটি বিশেষ গীতরচয়িতার বিষয় কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার নাম দাশরথী রায়। দাশু রায়ের পাঁচালী এদেশে বিখ্যাত। উহা সহজ ও কোমল সুরে রচিত এবং উহার মধ্যে কোনটা হাস্যরসের উদ্রেক এবং কোনটা করুণারসের উদ্দীপনা করে বলিয়া উহা আমাদিগের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু উহার মধ্যে অনেকগুলি অশ্লীলতাদোষে এত দূষিত যে, তাহা ভদ্রসমীপে পাঠ করা যায় না।

ধর্ম্মসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কেও গীতরচকদিগের মধ্যে এক প্রধান আসন দেওয়া যাইতে পারে। শুনা যায় যে, রামমোহন রায় প্রথমে কবি হইতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের গুণগরিমা দেখিয়া তাঁহার সমান হওয়া অসাধ্য মনে করিলেন এবং নিরাশ-পঙ্কে পতিত হইয়া কবিতা রচনাকার্য্য হইতে একেবারে বিরত হইলেন। তাঁহার রচিত গীতের মধ্যে স্থানে স্থানে অল্প কবিত্ব শক্তি প্রকাশিত হয় নাই:—

"অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।"
"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।"

ডাক্তারব্যবসায়ী কলিকাতার একজন দুর্দ্ধর্ষ নাস্তিক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তিনি এই গান শুনিলেন, তখন তাঁহার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত একেবারে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি পরম মনোহর ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করিয়া স্বজাতিকে চিরসম্পত্তি দান করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়েও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সে বিষয় স্বদেশপ্রেম। তাঁহার রচিত শেষোক্তপ্রকার একটি সঙ্গীত আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি:—

"মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশো গান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?

ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান।

হোক ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা,

অতুলনা ভারত ললনা।

হোক ভারতে জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোধন
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ।

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী;
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির?
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?
পৃথুরাজ আদি বীরগণ;
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু, দুষ্টের দমন।

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!

কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!

কেন ডর ভীরু! কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়;
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?

হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভরতের জয়!

'বঙ্গদর্শন' আমার প্রণীত 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' সমালোচনা সময়ে ঐ গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃত সত্যেন্দ্রবাবুর এই গীতটি আমার রচিত মনে করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক! হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!"

অনেকে এইরূপ আক্ষেপ করেন যে, ধর্ম্ম ও আদিরস-ঘটিত গীত* ব্যতীত বন্ধুতা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি গীত রচিত হয় নাই, কিন্তু এ আক্ষেপ অনেক পরিমাণে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে অমূলক। সত্যেন্দ্রবাবু স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক কতকগুলি গীত রচনা করিয়া এ অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়াছেন। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'সঙ্গীতশতক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নানা বিষয়ের সঙ্গীত আছে। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় 'গীতহার' নামে ঐ প্রকার এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গীতগুলি কিন্তু তত উৎকৃষ্ট ও মনোহর নহে। 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

---

* দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের আদিরস-ঘটিত অনেক গীত অশ্লীলতা ও অবিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা কলুষিত।

এক্ষণে আমরা নাটক বিভাগ ধরিতেছি। 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম প্রকাশিত নাটক। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালা ভাষার দ্বিতীয় নাটক রচনা করেন। সে নাটকের নাম 'ভানুমতী-চিত্ত-বিলাস', তাহা সেক্সপিয়ারের 'মর্চেন্ট অব্ বেনিস' নামক নাটককে আদর্শ করিয়া লিখিত। গম্ভীর ভাবের প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও আমাদিগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর হাস্যকর নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে; রামনারায়ণ তর্করত্ন ও দীনবন্ধু মিত্র তাহাদের প্রণেতা। ইহারর মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ। ইহাঁদিগের প্রণীত গম্ভীর নাটকের যে স্থানে হাস্যরসের বর্ণনা আছে, সেখানে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। গম্ভীর নাটক-রচয়িতাদিগের মধ্যে 'নবীন তপস্বিনী' ও 'লীলাবতী' নাটক-প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র, 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী-নাটক'-প্রণেতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'বিধবাবিবাহ নাটক'-প্রণেতা উমেশচন্দ্র মিত্র, 'নবনাটক'-প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন, 'রামাভিষেক' ও 'সতী নাটক'-প্রণেতা মনোমোহন বসু, 'পুরুবিক্রম' এবং 'সরোজিনী-নাটক'-প্রণেতা সাধারণের অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি, 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী-নাটক'-প্রণেতা উপেন্দ্রনাথ দাস এবং 'কুলীনকন্যা'-প্রণেতা লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রধান। মনোমোহন বসুর অন্তর্জ্জগৎ বর্ণনাতে যেমন পারগতা আছে, বাহ্যজগৎ বর্ণনাতে তেমনই পারগতা আছে। তাঁহার প্রণীত 'পদ্যমালা' পুস্তক শিশুদিগের জন্য লিখিত; বয়স্ক লোকে তাহার অল্প সংবাদই রাখেন, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এরূপ বাহ্যজগৎ বর্ণনানৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আধুনিক অতি অল্প বাঙ্গালা কবিতাতে সেরূপ দৃষ্ট হয়। প্রহসন-মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে পঙ্গপালের ন্যায় নাটক বহির্গত হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ নাটকের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা বলিতেন, তাহা খাটে,—"না টক না মিষ্টি।"

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে যেমন নাটক পঙ্গপালের ন্যায় বহির্গত হইতেছে, তেমনি উহা উপন্যাসও ক্রমিক প্রসব করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থাকিলে হয়ত বলিতেন, উপন্যাস নামই তাহাদের উপযুক্ত। উহাদিগের অধিকাংশ উপন্যাস অর্থাৎ খারাব সাজান গল্পগুলি; তাহাদের প্রণেতারা গল্প ভাল সাজাইতে পারে না। তাহাদিগকে যদি নবন্যাস বলিয়া ডাকা যায়, তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত থাকিলে বোধ হয় বলিতেন যে, নবন্যাস নাম তাহাদের অনুপযুক্ত অর্থাৎ সে সকল নূতন সাজান নহে। তাহাতে উদ্ভাবনীশক্তি অতি অল্পই প্রকাশিত আছে। শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস পাইকপাড়ার রাজাদিগের স্বসম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস বিনিসৃত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাম 'বিজয় বল্লভ', কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগের পরম বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয়। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাস বিভাগে অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।' তিনি সেই অতুল খ্যাতির সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। যেহেতু তাঁহার ন্যায় উপন্যাস-রচয়িতা বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। কিন্তু কোন কোন লোক যে বলে, তিনি "বেঙ্গলি সার ওয়াল্টার স্কট", তাহাতে আমার ঈষদ্ধাস্য পায়। 'মেসায়া' নামক বীররসের কাব্য-প্রণেতা জর্ম্মণ কবি ক্লপষ্টককে লোকে জর্ম্মণ মিল্টন বলিয়া ডাকিত, তাহাতে ইংরাজী কবি ও তত্ত্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত কোলরিজ্ বলিয়াছিলেন, "German Milton indeed!" সেইরূপ বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি, "Bengalee Sir Walter Scott indeed!" লোকে যাহা বলুক, বঙ্কিমবাবুর প্রকৃতি আমি যতদূর জানি, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তিনি নিজে এরূপ উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন। কেহ কেহ মাইকেল মধুসূদনকেও মিল্টনের ন্যায় কবি বলিয়া মনে করেন, এতৎ সম্বন্ধেও আমি বলিতে পারি, "Bengalee Milton indeed!" আমি মেদিনীপুর থাকিতে মাইকেল মধুসূদন নিজে আমাকে লিখিয়াছিলেন :—

"The poem Meghnadhbadha is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton, but that is all bosh. Nothing can be better than Milton. Many say it licks Kalidas. I have no objection to that, I do not think it impossible to equal Virgil, Kalidas and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets. Milton is divine."

মিল্টন ও সার ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় কাব্যকার সচরাচর জন্মে না। বঙ্গদেশে যে কখন মিল্টনের ন্যায় কবি অথবা স্কটের ন্যায় উপন্যাস-রচয়িতা জন্মিবে না, এমন আমি বলিতেছি না। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন মিল্টন অথবা বঙ্কিমবাবু সার ওয়াল্টার স্কট নহেন। বঙ্কিমবাবু সার ওয়াল্টার স্কটের তুল্য না হউন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় উপন্যাস-রচয়িতা, তাহার আর সন্দেহ নাই। কোন কোন স্থানে তাঁহার বর্ণনা সুসঙ্গত নহে এবং কোন কোন স্থানে জাতীয় ভাবের অভাব আছে, অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিরা আমাদিগের হিন্দু জাতির রীতি নীতি অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারেন না,—তথাপি মানবস্বভাব বিশেষতঃ উচ্চ-প্রকৃতির স্ত্রীলোকের স্বভাব স্বভাবানুযায়ী চিত্রিত করিতে বঙ্কিমবাবুর ন্যায় আমাদিগের মধ্যে কে সমর্থ? উপন্যাস-রচয়িতা বলিয়া 'স্বর্ণলতা'-প্রণেতা অল্প খ্যাতি লাভ করেন নাই। তাঁহার রচিত উপন্যাসের একটি প্রধান গুণ এই যে, তাহার কোন স্থানে জাতীয় ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। 'বঙ্গবিজেতা'-প্রণেতা সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত এই বিভাগে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামক উপন্যাসে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ পুস্তক এমন দীর্ঘায়ত যে, তাহা পাঠের জন্য মনুষ্যের অল্পায়ু কুলিয়া উঠে না।

এক্ষণে আমরা শ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য বিভাগে প্রবেশ করিতেছি। টেকচাঁদ ঠাকুর এ প্রকার কাব্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থসকলে মানবস্বভাব-পরিজ্ঞান বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাঁর বিষয় পূর্ব্বে আমরা অনেক বলিয়াছি। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুমপেঁচার নক্সা' বিলক্ষণ হাস্যরস-উদ্দীপনী-শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নক্সাগুলি জলজ্যান্ত বোধ হয়। সম্প্রতি ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কল্পতরু' নামক একখানি শ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার চিত্রগুলিতে নিতান্ত অল্প ক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই।

সঙ্গীত বিভাগে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হিন্দু সঙ্গীতের উন্নতি জন্য আমরা শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট বিশেষ উপকৃত আছি। ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গীত বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাহার অনাদর করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তাহা অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। কাপ্তেন উইলার্ড এবং লামার্টিনিয়রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আল্‌ডিস সাহেব ইহার দৃষ্টান্ত।

পুরাবৃত্ত বিভাগে কেবল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম শ্রেণীর পুরাবৃত্ত এখনও আমাদিগের ভাষায় লিখিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পুরাতত্ত্বানুসন্ধান,—ইংরাজীতে যাহাকে Antiquities বলে,—সে বিভাগকে আপনাদিগের স্বস্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থদ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলালবাবু ও অক্ষয়বাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর এ বিষয়ে রামদাসবাবু ও রজনীবাবুর গ্রন্থসকল প্রশংসা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান বিভাগে কেবল 'পদার্থ-বিদ্যা'-প্রণেতা অক্ষয়কুমার দত্ত, 'প্রাকৃতিক ভূগোল'-প্রণেতা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'-প্রণেতা ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং 'পদার্থ-দর্শন'-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এগুলির অধিকাংশ অনুবাদ মাত্র। এখনও বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে সমর্থ হয় নাই।

দর্শন বিভাগে রামমোহন রায়, 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা'-প্রণেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং 'তত্ত্ববিদ্যা'-প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বেদান্ত-দর্শনের অর্থ করিয়াছেন, রামমোহন রায় আপনার স্বাধীন বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। ইহা দ্বারভাঙ্গা-প্রবাসী চন্দ্রশেখর বসু তাঁহার বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। 'বঙ্গদর্শন' নামক সাময়িক পত্রিকায় দর্শন বিষয়ক সূক্ষ্মবুদ্ধিমত্তা-সূচক (কেহ কেহ বলিবেন অতিবুদ্ধি-সূচক) কতকগুলি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতা, নাটক ও উপন্যাস বিভাগ ছাড়িয়া যতই আমরা পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান ও দর্শন বিভাগের দিকে আসিতেছি, ততই গ্রন্থকারের সংখ্যা আস্তে আস্তে অতি সুন্দররূপে কমিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীরা টপ্পা রচনাতে যত পটু, এই সকল গুরুতর বিষয় রচনাতে তত পটু নহে।

আমরা যেরূপ বিষয় বিভাগ করিয়াছি, তাহাতে এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের পুরাবৃত্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতে হয়। প্রায় একশত বৎসর হইল, নেথ্যানিয়েল হ্যালহেড নামক এতদ্দেশ-হিতৈষী উচ্চপদস্থ একজন সাহেব ইংরাজী ভাষায় একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে উদাহরণগুলি ছাপাইবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তখন ছাপার বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার বন্ধু মহাত্মা চার্লস্ উইলকিন্স সাহেব—ইনি পরে সার চার্লস্ উইলকিন্স হইয়াছিলেন এবং ইংরাজীতে ভগবদ্গীতা অনুবাদ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন,—ইংরাজী ১৭৭৮ সালে স্বহস্তে একসাট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। সেই প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। তাহার পর শ্রীরামপুর মিসনরিরা উক্ত মুদ্রাযন্ত্র বিলক্ষণরূপে উন্নত করেন। তাঁহাদিগের মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত অতি পরিষ্কাররূপে প্রথম ছাপা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার আপনার মনোমত ঐ দুই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া গরীব কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের একেবারে দফা খাইয়াছেন। 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকৃত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ছাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

১৮১৬ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য 'বেঙ্গল-গেজেট' নামক প্রথম বাঙ্গালা সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন। এই গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সচিত্র 'অন্নদামঙ্গল' ও অন্যান্য পুস্তক ছাপাইয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সাহেবদিগের নিকট বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে আমরা অত্যন্ত উপকৃত, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে শ্লাঘা করিতে পারি যে, একজন বাঙ্গালী বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৮১৬ সালে মার্শম্যান সাহেব 'সমাচার-দর্পণ' নামক সম্বাদপত্র প্রথম প্রচার করেন। এই সম্বাদপত্র অনেক দিন চলিয়াছিল। গবর্ণমেন্ট ইহার অনেক কাপির গ্রাহক হইয়া ইহার বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, আমরা বাল্যকালে এই 'সমাচার-দর্পণ' অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমাদিগের গ্রামে "বাজারিয়া" দল নামক পরপীড়ক একদল গাঁজাখোর ছিল। 'সমাচার-দর্পণ' তাহাদিগের অত্যাচারের বিষয় লেখাতে দারগা আসিয়া সুরথাল করে, তাহাতে তাহারা শাসিত হইয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় ১৮১৯ সালে 'কৌমুদী' নামে সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁহার সহকারী ছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় সহমরণের বিপক্ষতা করাতে ভবানীচরণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া ১৮২২ সালে 'চন্দ্রিকা' নামক সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন। এই 'চন্দ্রিকা' অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ও প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মুখস্বরূপ

বলিয়া গণ্য। ভূতপূর্ব সল্ট বোর্ডের দেওয়ান নীলরত্ন হালদার ১৮২৫ সালে 'বঙ্গদূত' নামক একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন। আমার 'সে কাল এ কাল' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে বঙ্গদূতের সহিত আর একটি বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের বিবাদ হওয়াতে এবং 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব সে বিবাদের মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করাতে 'বঙ্গদূত'-সম্পাদক বলিয়াছেন যে, ''হচ্ছিল হরুঠাকুরে ও নিলু রামপ্রসাদে, এ আবার আন্টনি ফিরিঙ্গি কোথা থেকে এলো।'' ১৮৩০ সালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'প্রভাকর' নামক বিখ্যাত সম্বাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন, উহা সকল সাধারণ হিতানুষ্ঠানে প্রধান উদ্যোগী ঠাকুর-গোষ্ঠীর সাহায্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 'প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সকল প্রকাশিত হইত। এই 'প্রভাকরে' অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণ প্রথম লেখনী চালনা করিয়া রচনাকার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করেন। এই 'প্রভাকর' অনেক দিন অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যজগতের উপর মনোহর রশ্মিজাল বর্ষণ করিয়াছিল। প্রতি বৎসর 'প্রভাকরে'র জন্মতিথি-দিবসে 'প্রভাকর'-সম্পাদক তাঁহার সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎসব করিতেন। এই উৎসবে কতই না আনন্দ হইত! ১৮৩৫ সালে অদ্বৈতচরণ আঢ্য 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্বাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৩৯ সালে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 'ভাস্কর' ও 'রসরাজ' কাগজ বাহির করেন। লোকে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে খর্ব্বাকৃতি জন্য গুড়গুড়ে বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সর্ব্বদা লেখনীযুদ্ধ হইত। 'প্রভাকর' পত্র যেমন তাহার উত্তম পদ্য জন্য বিখ্যাত ছিল, তেমনি 'ভাস্কর' তাহার উত্তম গদ্য জন্য বিখ্যাত ছিল। গৌরীশঙ্কর উত্তম গদ্য লিখিতে পারিতেন। তিনি 'ভাস্কর' কাগজ প্রথম প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন না, প্রথম সম্পাদক আর একজন ছিলেন। উল্লিখিত প্রথম সম্পাদক আন্দুলিয়ার রাজা রাজনারায়ণের বিপক্ষে লেখাতে ছেলেধরা যেমন গোপনে ছেলে ধরিয়া লইয়া যায়, তেমনি রাজা রাজনারায়ণ তাঁহাকে কলিকাতা হইতে গোপনে বল পূর্ব্বক আন্দুলে লইয়া গিয়া কয়েক দিন তথায় কয়েদ করিয়া রাখেন। এরূপ সম্পাদকহরণ ব্যাপার বঙ্গদেশে, এমন কি বোধ হয় জগতে, কখনও ঘটে নাই। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদের কুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের বিপক্ষে লেখাতে জেলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। ১৮৪০ সালে রাজা কৃষ্ণনাথ রায় 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' নামে এক সম্বাদপত্র বাহির করেন। এইটি মফঃস্বলস্থ সম্বাদপত্রের প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৮৪৭ সালে বিখ্যাত জমীদার কালীনাথ চৌধুরী 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামে এক সম্বাদপত্র বাহির করেন, এইটি মফঃস্বলে প্রকাশিত দ্বিতীয় সম্বাদপত্র। ১৮৫৮ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত এই একাদশ বৎসরের মধ্যে নানা সম্বাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি

জঘন্য। এই সময়ে 'আক্কেল গুড়ুম' নামে একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার লিখনভঙ্গী দেখিয়া লোকের আক্কেল যথার্থই গুড়ুম হইত। 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের পূর্ব্বের সম্বাদপত্র সকল অশ্লীলতা দোষে অত্যন্ত দূষিত ছিল। 'প্রভাকর' ও 'রসরাজে' যখন ঝগড়া হইত, তখন রাস্তায় দুইজন ময়লা-পরিষ্কারক জাতীয় লোক ঝগড়া করিয়া পরস্পরের হস্তিকাস্থিত ময়লা লইয়া পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ জঘন্য দৃশ্য হয়, সেইরূপ জঘন্য দৃশ্য হইত। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বাঙ্গালা সম্বাদপত্রকে প্রথম এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করেন।

এক্ষণে আমরা সাময়িক পুস্তিকার বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১৮১৮ সালে প্রথম সাময়িক পুস্তিকা মিসনরিদিগের দ্বারা শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। তাহার নাম 'দিগদর্শন'। ইহাতে বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত ও সাহিত্য বিষয় প্রস্তাব সচিত্র প্রকাশিত হইত। ১৮২১ সালে রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণ সেবধী' প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি মিসনরিদিগের সহিত তর্ক করিতেন। ১৮৩১ সালে কালেজের বিখ্যাত শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র 'জ্ঞানোদয়' প্রকাশ করেন। ইহাতে পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত, প্রাণিবৃত্তান্ত এবং বিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইত। ১৮৩২ সালে কালেজের বিখ্যাত ছাত্র গঙ্গাচরণ সেন 'বিজ্ঞান সেবধী' প্রকাশ করেন। হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা ঐ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। উহাতে নানা বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইত। ১৮৪২ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত 'বিদ্যাদর্শন' প্রকাশ করেন, তাহার পর বৎসর তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হওয়াতে 'বিদ্যাদর্শন'-সম্পাদনকার্য্য পরিত্যাগ করেন। ১৮৫০ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি লেখকেরা 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, ''এই পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার-রচিত এমন একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, সেরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালা রচনা পূর্ব্বে আর কখনই প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, আমি ঐ প্রস্তাব ওরূপ কখনই লিখিতে পারিতাম না।'' ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থসংগ্রহ' প্রকাশ করেন। ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে 'বান্ধব', 'আর্য্য-দর্শন' ও 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রভৃতি অনেকে উত্তম উত্তম সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। মধ্যে একটি কোয়ারটারলি রিভিউ অর্থাৎ ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। মধ্যে একটি কোয়ার্‌টার্‌লি রিভিউ অর্থাৎ ত্রৈমাসিক সমালোচনাও প্রকাশিত হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কেন প্রকাশিত হইল না, বলিতে পারি না। 'বঙ্গদর্শন' নামক সাময়িক পত্রিকা মধ্যে তিন চারি বৎসর প্রকাশিত হইয়া প্রভূত পরিমাণে লোকের শিক্ষা ও বিনোদসাধন করিয়া অস্তমিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা এই মনোহর পত্রিকার নিকট বিশেষরূপে উপকৃত আছে।*

এই বক্তৃতা করিবার পর 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

কথকতা অল্প পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধন করে নাই। 'সাবিত্রী-উপাখ্যান' নামক সুকাব্যের রচয়িতা প্রিয় বন্ধু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত 'সেই একদিন আর এই একদিন' প্রস্তাবে বলেন, ''কথকতা বাঙ্গালিজাতির বিনোদকর উপায়সমূহের মধ্যে প্রধান উপায়। কথক বেদীতে বসিয়া স্বরসংযোগে কান্ত কোমল পদাবলীতে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের বিনোদসুখ ও ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি, এককালে উভয়ই সম্পাদন করেন। কথকতার প্রথম স্রষ্টা ও উন্নতিকারকেরা সুকবি ছিলেন। প্রভাতবর্ণন, মধ্যাহ্নবর্ণন, সন্ধ্যাবর্ণন, নিশীথবর্ণন, যুদ্ধবর্ণন প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণনার যে সকল বাক্যাবলী গ্রথিত আছে, তাহা অতি মনোহর ও বিস্ময়কর। বর্ণনাকালে বর্ণনীয় বিষয় শ্রোতৃবর্গের নেত্রসম্মুখে যেন মূর্ত্তিমান্ করিয়া দেওয়া হয়। কথকতা শ্রবণে অনুপম আনন্দ ও পুত্রশোক নিবারণ হয়। কথকতায় অতি পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় দ্রবীভূত ও অশ্রু বিগলিত হয়। উহা এত উৎকৃষ্ট যে, ইতিপূর্ব্বে লর্ড বিশপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কথকতা প্রণালীতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে। শুনিয়াছি, কোন কোন মিসনরি না কি কথকতার রীতিতে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছে।

''এ স্থলে কথকতার কিরূপে প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একদা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী-নিবাসী গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় এক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। প্রাতে যথারীতি পাঠ হইত। বৈকালে শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্য অন্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না, দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিকটে এক স্থানে রামায়ণ গান হইতেছে। সেইখানেই সকল লোক যাইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, ''আচ্ছা সকলকে বলিবে কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত গান শুনিতে পাইবে।'' তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি গায়ক ও কবি ছিলেন। রাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যেয় অংশকে তাঁহার স্বকপোল উদ্ভাবিত কথকতার রীতিতে পরিণত করিয়া রাখিলেন। পরদিন বৈকালে নূতন রীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন, চারিদিক্ হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বরসংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীতপদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন ধ্রুবচরিত, প্রহ্লাদচরিত, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি। ক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতেরও কথাগ্রন্থ বিরচিত হয়। গঙ্গাধর শিরোমণির পর কৃষ্ণহরি শিরোমণি কথকতাকে অনেক পল্লবিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন। গোবরডাঙ্গা-নিবাসী রামধন শিরোমণিও তাহাতে অনেক অঙ্গরাগ দিয়াছেন।''

বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার রীতি প্রথম খৃষ্টান মিসনরিগণ প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা বক্তৃতার প্রণালী প্রথমে অতি অপকৃষ্ট ছিল। একজন মিসনরি বক্তৃতার সময় ঈশ্বর অদ্ভুত কীর্ত্তিবর্ণন সময়ে বলিয়াছিলেন, 'ঈশু লাজোরকে মরা হইতে উঠান, ঈশু সমুদ্র মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যান, ঈশু গঙ্গাভূত আরাম করেন।'' এ স্থলে মিসনরি সাহেব গোর হইতে উঠান না বলিয়া ''মরা হইতে উঠান'' বলিয়াছিলেন এবং গোঁগাভূত (নিউ টেষ্টমেন্টের dumb devil বাক্যের অনুবাদ) না বলিয়া ''গঙ্গাভূত'' বলিয়াছিলেন। এক্ষণে মিসনরিদিগের বক্তৃতাপ্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ। উহা তাড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুসমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে। দেবেন্দ্রবাবু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণ জন্য কতই উপকৃত, তাহা বলা যায় না। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ না করিলে এবং বহুল আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক প্রথম প্রথম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি বিশেষরূপে সংশোধিত না করিয়া দিলে বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির পত্তনভূমি সংস্থাপিত হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন আপনার প্রণীত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থ্ দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই এক সময়েই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ ও সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। প্রাথমিক পত্রিকাগুলি সংশোধন জন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু তাঁহার নিকট কত উপকৃত, তাহা তিনি তাঁহার 'বাহ্যবস্তু' পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। ঐ 'বাহ্যবস্তু' প্রাথমিক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' গুলিতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রবর্ত্তিত বক্তৃতারীতি ধর্ম্ম উপদেশ প্রদানে নিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা অন্য সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি যে সকল সভায় উপস্থিত লোক অধিকাংশ বাঙ্গালী, সেই সকল সভার মধ্যে যে সকল সভা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য ছাত্রদিগের দ্বারা সংস্থাপিত, তাহা ব্যতীত অন্যান্য বাঙ্গালী সভার বক্তৃতাতে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। এক্ষণে অনেক সভায় বাঙ্গালা ভাষাতে বক্তৃতাকালে আপনার মনের ভাব যথোপযুক্তরূপে ব্যক্ত করিতে অধিকাংশ লোক কষ্ট বোধ করেন। উল্লিখিত কষ্টের কারণ এই যে, অদ্যাপি আমরা দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করিবার সময় অধিকাংশ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করি। আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত না হইলে বাঙ্গালা বক্তৃতায় বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিবার সম্ভবনা নাই। খাঁটী

ইংরাজীতে কথোপকথন করিলে আমরা ইংরাজী ভাষায় উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি, কিম্বা খাঁটী বাঙ্গালাতে কথোপকথন করিলে আমরা বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি। যে ভাব ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে কোনমতে প্রকাশিত হয় না, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ইংরাজী শব্দ অবশ্য ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু এমন ভাব অল্পই আছে। একাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমার এক ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তিকায়* বাঙ্গালা কথোপকথনের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের প্রথম প্রস্তাব করি। ঐ পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে এক দিন গিয়া দেখি, সেই ভবনের একজন সিবিলিয়ান যুবক তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে লইয়া একটি নূতন রকম ক্রীড়া করিতেছেন। সে ক্রীড়াটি এই যে, যে ব্যক্তি কথোপকথনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, প্রতি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার জন্য এক পয়সা করিয়া তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইবেক। জরিমানার পয়সা সকল জড় করিয়া জলখাবার আনাইয়া খাওয়া হইবে। আমিও ঐ ক্রীড়ার ভাগী হইলাম। ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত কোন ব্যক্তির সাত আনা, কোন ব্যক্তির ছয় আনা, কোন ব্যক্তির পাঁচ আনা করিয়া জরিমানা হইল। আমারও দুইটি পয়সা জরিমানা হইল।

এই বক্তৃতার প্রারম্ভাবধি ও এ পর্যন্ত উপরে যাহা বলিলাম, তাহা প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধীয়। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত আর দুইপ্রকার বাঙ্গালা ভাষা আমাদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সংবাদ বোধ হয় আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই লয়েন না। তাহা খৃষ্টানী বাঙ্গালা ও মুসলমানী বাঙ্গালা। খৃষ্টানী বাঙ্গালা পূর্ব্বে অতি কদাকার ছিল, এক্ষণে অনেক পরিমাণে তাহা উন্নত হইয়াছে। মধ্যে ভবানীপুরের খৃষ্টানেরা 'বঙ্গ মিহির' নামে একখানি সাময়িক পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহার ভাষা বিশুদ্ধ। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন ভাল কবিও উদিত হইয়াছেন। অসংখ্য বাঙ্গালা পুস্তক মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জন্য প্রকাশিত হয়। বাঙ্গাল মাঝিদিগকে নৌকা লাগাইয়া তাহা পাঠ করিতে দৃষ্ট হয়। মুসলমানী বাঙ্গালার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গোলেবকোয়ালি' গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া একটি অংশ পাঠ করিতেছি:—

''শুন হে মুমিন সব করিয়া ধ্যায়ান।
বকাওলির পুথি এই কেতাবের নাম॥
দফা দফা কতবার ছাপা হয়েছিল।
রসিক লোকেতে তাহা চুমিয়া লইল॥
রসিক লোকের বড়া খাহেষ দেখিয়া।

*Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal. – 1866

ছাপাইনু পুথি আমি মেহন্নত করিয়া॥
যে জন খাহেষদার খাহেষ হইবে।
বটতলা যাইলে পর আলবত্তা পাইবে॥
মহম্মদ আজিমুদ্দিন দপ্তরী জানিবে নাম মোর।
মস্তফাই ছাপাখানা দরিয়া কিনার॥
কম্পোজ কেরেট আর যত কিছু ভার।
হীন সদরদ্দিন জানিবে নাম তার॥”

কবি আজিমুদ্দিন (তিনি যে আপনাকে দ্বিজ আজিমুদ্দিন বলিয়া পরিচয় দেন নাই, এই আমাদের ভাগ্য!) আপনার নাম চিরস্থায়ী করিয়া তৎপরে তাঁহার কম্পোজিটরের নামও চিরস্থায়ী করিয়াছেন।

পুরাবৃত্তের চিন্তাশীল পাঠকেরা প্রতীতি করিয়া থাকেন যে, এক একটি ধর্ম্ম ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি সামান্য প্রভাব প্রদর্শন করে নাই। প্রথম বৌদ্ধ প্রচারকেরা প্রচলিত ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সেই সকল ভাষার অল্প উন্নতি সাধন করেন নাই। ইউরোপখণ্ডের ধর্ম্মসংস্কারক লুথর প্রচলিত ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও তাহাতে প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রচলিত ভাষার অল্প উন্নতিসাধন করেন নাই। অন্যান্য কোন কোন ভাষা যেমন স্বীয় উন্নতি জন্য ধর্ম্মের নিকট ঋণী আছে বঙ্গভাষাও তদ্রূপ। বঙ্গভাষা তিনটি ধর্ম্মের নিকট বিশেষ উপকৃত, সে তিনটি ধর্ম্ম-বৈষ্ণবধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। বাঙ্গালা ভাষা বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট কত উপকৃত, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের নিকট কত উপকৃত, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলি নাই। খৃষ্টান মিসনরিরা বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা দ্বিতীয় বাঙ্গালা সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম সূত্রপাত করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা প্রথম বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশ করেন। খৃষ্টান মিসনরিরা উন্নতপ্রকারের বাঙ্গালা পাঠশালার সৃষ্টিকর্ত্তা। খৃষ্টান মিসনরিদিগের মধ্যে কেরি ও মার্শম্যান সাহেবের নিকট বঙ্গদেশ বিশেষ উপকৃত। সেই সকল উপকার বঙ্গবাসীরা কখনই ভুলিতে পারিবে না।

বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি নিম্নলিখিত কয়েক কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) বিদ্যাপতির কাল।
(২) চৈতন্যের কাল।
(৩) কবিকঙ্কণের কাল।
(৪) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাল।
(৫) শ্রীরামপুর মিসনরিদিগের কাল।
(৬) রামমোহন রায়ের কাল।
(৭) তত্ত্ববোধিনীর কাল।

(৮) বিদ্যাসাগরের কাল।

(৯) মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমের কাল।

এক্ষণে মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমের কাল চলিতেছে।

বাঙ্গাল ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক আশাজনক বলিতে হইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাকে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য অতি অল্প লোকে আদর করিতেন; এক্ষণে ঐ প্রকার অনল্পসংখ্যক লোক বাঙ্গালা ভাষাকে আদর করিতে দৃষ্ট হয়েন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় কোন প্রস্তাব রচনা করিতে হেয় বোধ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ন্যায় লোকে সেরূপ করেন না। কেহ কেহ এক্ষণে মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিতে হেয় বোধ করিতেন। চতুর্দ্দিকে মাতৃভাষার সমাদর ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা বিবেচনা করিলে মনে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদের সঞ্চার হয়, তাহা বলা যায় না। এই সমাদরের বিশেষ চিহ্ন এই যে, কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বঙ্গভাষার চালনার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থ গ্রন্থকারদিগকে অর্থ পারিতোষিক ও অন্যান্য প্রকারে অর্থানুকূল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ উৎসাহ-প্রদাতার মধ্যে কাশিম-বাজার-নিবাসিনী মহামান্য মহাবদান্যা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, পুঁটিয়া-নিবাসিনী শ্রীশ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী, কলিকাতা-নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, বহরমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন, রঙ্গপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন রায়চৌধুরী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী বাহাদুর ও ভাওয়াল-নিবাসী কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বাহাদুর সর্ব্বপ্রধান।*

বাঙ্গালা ভাষার ভাবী অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা এক্ষণে ঠিক বলা যায় না। পুরুষের ভাগ্য যেরূপ নিরূপণ করা যায় না, ভাষারও ভাগ্য সেইরূপ নিরূপণ করা যায় না। যখন রমুলস চোর বাটপাড় লইয়া রোম নগরের পত্তন করেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই কতিপয় চোর বাটপাড়ের ভাষা এক সময়ে সমস্ত ইউরোপখণ্ডের বিদ্বান্‌দিগের ভাষা হইবে, এবং সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঐ প্রকার ভাষা হইয়া থাকিবে? যখন মহম্মদ মুসলমানধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত, মরুভূমি-নিবাসী কতকগুলি দস্যুর ভাষা এক সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিদ্বান্‌দিগের ভাষা হইবে? যখন শাক্যমুনির প্রথম শিষ্যেরা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের ভাষা পালি ভাষাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই পালি ভাষা সমস্ত পূর্ব্ব এসিয়ার

* এই বক্তৃতা করিবার সময় রাণী শরৎসুন্দরী মহারাণী ও রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষা হইবে? বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্যে কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন। হয়ত ভবিষ্যতে উহা ঐ প্রকার সম্পদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার বাহ্যসম্পদ্ আকস্মিক ঘটনার প্রতি নির্ভর করে। আর একপ্রকার সম্পদ্ আছে, তাহা মনুষ্যের যত্নের প্রতি নির্ভর করে। সে সম্পদ্ আভ্যন্তরীণ; সে সম্পদ সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ দ্বারা ভূষিত হওয়ারূপ সম্পদ্। অদ্য আটাইস বৎসর হইল, মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থে বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম, "যথার্থ বলিতে কি, হোমর, প্লেটো ও সফক্লিজ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরসপানের প্রভূত সুখসম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্র বর্ণনা-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক শেক্স্পিয়রের অমরণ-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত নাটকসকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হই, কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনাশক্তি-সম্পন্ন গেটী ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই, তথাপি এক আশা অপূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য বিশালখ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা; সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃতরস পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সে আশা কবে পূর্ণ করিবে? সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষা-রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্যদেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে!" যখন কতিপয় স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি ব্যতীত মাতৃভাষার প্রতি সাধারণতঃ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোকদিগের অনাদর এখনও প্রবল রহিয়াছে, তখন শীঘ্র এ আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। "মাতৃভাষার অসম্পন্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে কি কারুণ্যরসের সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন, তাঁহারাই জানেন। ইংরাজদিগের গুণসকল অনুকরণ না করিয়া তাঁহাদিগের দোষ অনুকরণ করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদেশীয় পদার্থের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমরা অনুকরণ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। ধ্রুবতারার প্রতি যেমন দিগ্‌দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে, তেমনি বিদেশগত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে। সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ। সেই স্থানের সহিত তাঁহার বালসখিত্ব, সেই স্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয় জনদিগের আবাস। সেই প্রিয় মনোহর স্বদেশ নিরুর্ব্বর ও প্রমোদজনক দৃশ্যশূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ—এমন কি কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের সুচারু গোলাবপুষ্পের উপবন ও নেপল্‌স সন্নিহিত জলের ও তটের নয়ন বিমুগ্ধকর শোভায় হাস্যমান বিখ্যাত উপসাগর পর্য্যন্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না; এমন স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি যাঁহার অনুরাগ নাই, তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে?* যখন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ইংরাজীর সঙ্গে বাঙ্গালা

* হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভায় অভিব্যক্ত উল্লিখিত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত। -১৭৭৮ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দেখ।

মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার খিচুড়ী ভাষাতে কথা কহিয়া থাকেন, যখন তাঁহারা মাতৃভাষাতে একখানি সামান্য পত্র লিখিতে হেয় বোধ করেন, যখন তাঁহারা বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, তখন স্বদেশের প্রতি ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রেম জন্মিয়াছে, ইহা আমরা কি প্রকারে বলিতে পারি? স্কুল কালেজের ছাত্রেরা ইংরাজী ভাষাতে আপনাদিগের অধিকার জন্মাইবার জন্য বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাতে ইংরাজী বক্তৃতা করিতে পারে এবং প্রবীণ লোকেও তাহাদিগের উৎসাহার্থ তথায় গিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর অন্যান্য সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন? স্কুল কালেজের ছাত্রেরা ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিবার জন্য পরস্পরকে ইংরাজীতে পত্র লিখিতে পারে, কিন্তু প্রবীণ লোকে ওরূপ করিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন? যখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, যখন আমরা দেখিব যে, দেশীয় ভাষাতে পত্র লিখিতে তাঁহারা হেয় বোধ করেন না, যখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তখন আমরা বলিতে পারিব যে, স্বদেশের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রেম উদিত হইয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন, জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। এ বিষয়ে পাদ্রি রিচার্ড সাহেব মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"Gentlemen! let me say there is but little hope of a nation until it has some sense of nationality, and nationality without a national language, which is the free spontaneous outcome of the national mind, is a delusion. Probably the best index to the growth of a people is the growth and development of its language. Moreover there is an interchange of cause and effect; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary to the formation of national character. I appeal then to your patriotism, I appeal to you on behalf of your mother tongue; it is well worthy your regard."

এক্ষণে বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের প্রতি আমি কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদিগের প্রতি বিনীতভাবে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা হীন অনুকরণ রীতি পরিত্যাগ করুন। শিশু সন্তান যদি চিরকালই মাতার হাত ধরিয়া চলে, তবে সে কি কখন হাঁটিতে শিখিতে পারে? সেইরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা যদি চিরকাল ইংরাজদিগের হাত ধরিয়া চলেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা কখন মহৎ গ্রন্থকার হইতে পারিবেন? অনুকরণের বিদ্যালয়ে মহত্ত্ব কখন শিখা যায় না। তাঁহারা আপনাদিগের

স্বাধীন ভাবকে স্ফূর্তি দিতে আরম্ভ করুন। শিশু সন্তান প্রথমে স্বাধীনভাবে হাঁটিবার সময় অনেক বার পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু সেই রকম করিয়াই হাঁটিতে শিখে। সেইরূপ গ্রন্থকর্ত্তারা আপনাদের স্বাধীন ভাবকে স্ফূর্ত্তি দিলে তাঁহাদিগের প্রথমে অনেক ভুল করিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। অনেক ত্রুটির মধ্যে যদি দুই একটি প্রকৃত অভিনব ভাব থাকে, বরং সে ভাল; কিন্তু নিস্তেজ নিয়মপরতা ও পরিশুদ্ধতা ভাল নহে। আর তাঁহারা আর একটি কাজ করুন, আমরা উপন্যাসে উপন্যাসে নাটকে নাটকে জ্বালাতন হইয়াছি, দেবতার দোহাই, তাঁহারা গুরুতর বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করুন।

অবশেষে বঙ্গভাষা সমালোচনী সভার সভ্যদিগকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাব সমাপন করিতেছি। তাঁহারা উপযুক্ত সময়েই এই সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে হয়। নিরুৎসাহ বৃদ্ধত্বের একটি প্রধান লক্ষণ, কিন্তু তাঁহাদিগের উৎসাহ দেখিয়া বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত যৌবনের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। উৎসাহ সাংক্রামিক গুণ; এই উৎসাহানল তাঁহারা ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকুন। তাঁহারা অচিরাৎ সুসিদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই যুবক, তাঁহারা অনেকদিন বাঁচিবেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা এক্ষণে অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি। যৌবন অতি মনোহর কাল। এক্ষণে আশা তাঁহাদিগের সম্মুখে,—উৎসাহ তাঁহাদিগের দক্ষিণে,—আনন্দ তাঁহাদিগের বামে। এক্ষণে তাঁহাদিগকে কে পায়?-ঈশ্বর তাঁহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা সফল করুন।*

[হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতা]

কোন দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যালাভ সেদেশের সকল মঙ্গলের মূলীভূত হইয়াছে। প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের বিচিত্র শোভার ভূয়োভূয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের উদয় হয়, বায়ু হিল্লোলে কম্পিত সুচারু শ্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্রের

* এই প্রবন্ধে ভুলক্রমে যথাস্থানে হেমবাবুর 'বৃত্রসংহার' নামক শ্রেষ্ঠ বীররস প্রধান কাব্য এবং বঙ্কিমবাবুর 'বিজ্ঞান রহস্য' গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর 'বিজ্ঞান রহস্য' কেবলমাত্র অনুবাদ অথবা সংগ্রহ নহে। এই পুস্তক এবং তাঁহার প্রণীত 'লোকরহস্য', 'বিবিধ সমালোচনা' এবং উচ্চ ভাবের বহুতর তানবিশিষ্ট 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি কেবল উপন্যাস রচনাতে অদ্বিতীয় এমত নহে; অন্যান্য বিষয়েও লিখিতে অসাধারণরূপে পারগ। গভীর চিন্তাশীল 'বান্ধব'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাত চিন্তা', 'সাধারণী'র সুযোগ্য ও সুরসিক সম্পাদক শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রণীত 'উদ্দীপনা' প্রভৃতি প্রবন্ধেরও কোন উল্লেখ এই বক্তৃতাতে করা হয় নাই, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শন' ও 'বান্ধবে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন এই বক্তৃতায় ঐ সাময়িক পত্রিকাদ্বয়ের বিষয় বলা হইয়াছে, তখন ঐ সকল প্রবন্ধের কথাও বলা হইয়াছে গণ্য করিতে হইবেক।

সুরঙ্গ তরঙ্গাবলি সন্দর্শনে যে অপূর্ব আহ্লাদ সঞ্চার হয়, বা নিশানাথ পূর্ণচন্দ্রের অজস্র সুধা বর্ষণে জগৎ সুধাময় দেখিয়া চিত্ত যে অপার পুলকে পরিপূর্ণ হয়, সূর্য্য সেই সমস্ত দৃষ্টিসুখের একমাত্র মূল কারণ; তদ্রূপ দেশস্থ লোকের কায়িক সুস্থতা, মানসিক ক্ষমতা, লোকাচারের সুশৃঙ্খলা, ধনের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের উন্নতি প্রভৃতি যত প্রকার মঙ্গলকল্প আছে, বিদ্যারূপ দীপ্যমান সূর্য্যজ্যোতি সে সমুদয়ের একমাত্র মূল কারণ হইয়াছে। অতএব এদেশের দুরবস্থা মোচন বা সুখোন্নতির নিমিত্তে সর্ব্বাগ্রে দেশস্থ লোকের অজ্ঞান তিমির নিরাকরণ করা অতি গুরুতর উপায় হইয়াছে। হা! যৎ পরিমাণে এই মহা কার্য্য সাধনের প্রয়োজন, তাহার প্রতি তৎপরিমাণে রাজা কি প্রজা সকলেরই অবহেলা। আমারদিগের দেশ অজ্ঞানতিমির দ্বারা যে রূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। চতুর্দ্দিকে কি মহাশূন্য দেখিতেছি! অসীম সম বিস্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে! কুত্রাপি কোন ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়স্বরূপ ক্ষুদ্র দীপ প্রকাশে পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধকার আরও প্রগাঢ় বোধ হইতেছে! বিশেষতঃ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাস্থান যে আমারদিগের দেশীয় ভাষার পাঠশালা, তাহাও সেই অন্ধকারেরই আলয়। বিষয় কর্ম্মোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক শিক্ষা যে বিদ্যালয়ের প্রধান বা সমস্ত বিদ্যাই হইয়াছে, কতিপয় অশুদ্ধ চিরনিরূপিত পত্র লেখার অভ্যাস যাহার সম্যক্ লিপিবিদ্যা হইয়াছে এবং অল্পজ্ঞ অঙ্ক গুরু শুভঙ্করের আর্য্যা এবং সরস্বতীবন্দনা, গুরুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা ও দাতাকর্ণাদি যাহার সমুদয় পাঠ্যগ্রন্থ হইয়াছে, সে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের যে বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইবে তাহার কি সম্ভাবনা? কিন্তু কেবল বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য করাও বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই! আমারদিগের মানসিক তাবৎ বৃত্তির উন্নতি ও সুনিয়ম করা, দুষ্ট রিপুসকল শাসন করিয়া ধর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রবল করা, সুসাধু বিশুদ্ধ চরিত্রভূষণে আপনাকে ভূষিত করা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বদেশের প্রতি প্রীতি, পরোপকারে অনুরাগ সঞ্চার করা, এবং জগদীশ্বরের প্রেমামৃতরসে চিত্ত আর্দ্র রাখা, বিদ্যাভ্যাসের সম্যক্ প্রয়োজন হইয়াছে। এ সমস্ত প্রয়োজন এদেশের ইংলণ্ডীয়, কি দেশ্য ভাষার কোন বিদ্যালয়েই সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহার বিপরীত ব্যবহার সকলের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহারদিগের চিত্তভূমিকে সুরম্য সুসৌরভ পুষ্পে আমোদিত না করিয়া ঘনরোপিত কণ্টকি বন দ্বারা ভয়ঙ্কর করেন। যদ্রূপ সন্তানকে স্নেহের সহিত পালন করা উচিত, তদ্রূপ শিষ্যকে প্রীতির সহিত উপদেশ কর্ত্তব্য, কিন্তু গুরু মহাশয়ের ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত? তিনি নিয়ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রেরা ভয়েতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তাঁহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দ্দয় দণ্ডভয়ে তাহারা কম্পিতকলেবর থাকে। তাহারা শিক্ষাগুরুকে যমস্বরূপ দেখে, এবং বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে; সুতরাং অনেকেরই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি শত্রুতা ভাব ও দ্বেষানল ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তাহারা তাঁহার আসনতলে কণ্টক স্থাপন ও তিমিরাবৃত

রজনীতে মৃৎপিণ্ড বা ইষ্টকখণ্ড ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে ত্রুটি করে না, দেবদেবীর সন্নিধানে একান্তচিত্তে তাঁহার মৃত্যুও প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হয় না। এ স্থলেও তাহারদিগের দুর্ম্মতির নিরাশ নাই। পিতামাতা তাহারদিগকে এমত যন্ত্রণার স্থানে প্রেরণ করেন, ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতামাতারও অমঙ্গল ইচ্ছা করে। এইরূপে তাহারদিগের ক্রোধ, দ্বেষ, গুরুনিন্দা ও অকৃতজ্ঞতাদি মনের কুবৃত্তি সকল প্রবল হয়। যাহারা গুরু মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে সচেষ্ট, তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি ও মিথ্যাচরণের অভ্যাসে আশু নিপুণ হয়; কারণ যে বালক অপহরণ করিয়াও গুরু মহাশয়কে তাঁহার প্রয়োজনীয় যত বস্তু প্রদান করিতে পারে, ততই তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।

অতএব আমারদিগের যে সকল দেশীয় পাঠশালা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা স্থান, তাহা যখন এ প্রকার অচিন্ত্য বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন দেশ মধ্যে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ হইবার কি সম্ভাবনা? কিন্তু এই সকল পাঠশালাতেও কত লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়? ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয় যে বাঙ্গালা ও বেহারের প্রত্যেক শত বালকের মধ্যে কেবল আট জন বালক বিদ্যাভাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক শত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে ছয় জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয়—প্রত্যেক শতে ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ অতি সামান্য প্রকার বিদ্যার্জ্জনেও বঞ্চিত রহিয়াছে। বাঙ্গালা ও বেহারের ৬০,০০০০০ ষষ্টি লক্ষ শিক্ষণীয় বালক এবং ২১০,০০০০০ দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণশূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে।* দেশীয় লোকের এবম্প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রদীপ্ত দুঃখানলে দগ্ধ না হয়? নিরাশয় ম্লান ও অবসন্ন না হয়? তাহারা স্বীয় পার্শ্ববর্ত্তী ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আহার বিহারাদি যৎকিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করাই জীবনের সমুদয় কার্য্য বোধ করে। পশুর সহিত মনুষ্যের কি প্রভেদ? মুনষ্যের উৎকৃষ্ট সুখের কারণ কোন্ পদার্থ, ও মনুষ্যের স্বভাবের উৎকর্ষই বা কি? কিরূপ শক্তির বীজসকল আমারদিগের মনে স্থাপিত আছে, এবং তাহার প্রকাশ ও উন্নতি হইয়া কি প্রকার মহৎ মঙ্গলের উদয় হইতে পারে? এই সংসারেরও সুখস্বচ্ছন্দতা কি প্রকার মহৎ মঙ্গলের উদর হইতে পারে? এই সংসারেরও সুখস্বচ্ছন্দতা কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, এবং রাজপদের সৃষ্টি ও রাজাপ্রজার প্রভেদই বা কি নিমিত্তে হইয়াছে? এ সকলের কিছুই তাহারা জ্ঞাত নহে, তাহারদিগের চিন্তাস্রোত এ পথে স্বপ্নেও কখন প্রবাহিত হয় নাই। তাহারা অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে!

*William Adam's Report on the State of Education in Bengal and Behar &c reviewed in the *Calcutta Review*, No. 4.

দেশহিতৈষী পুরুষ এবং দয়াশীল রাজা ইহারদিগের জ্ঞানোদয়ের উপায় ধার্য্য না করিয়া কি প্রকারে মনঃস্থির রাখিতে পারেন? এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য অন্য কোন চেষ্টা সকল হইবে না। কিন্তু ইহার উপায় করা কি বিস্তীর্ণ কার্য্য! ক্রোশ বা দ্বিক্রোশান্তে পাঠশালা স্থাপন ব্যতীত সাধারণরূপে বিদ্যাজ্যোতি ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গালা পাঠশালা সকলের বর্ত্তমান অবস্থা যতকাল থাকিবে, ততকাল এ আশা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণেও সার্থক হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব তৎপরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করা, বঙ্গভাষায় বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক উত্তমোত্তম গ্রন্থসকল প্রস্তুত করা, এবং ছাত্রদিগকে তাহার উপদেশ প্রদানের নিমিত্তে সুযোগ্য কৃতবিদ্য শিক্ষকসকল নিযুক্ত করা ইহার আবশ্যক উপায় হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডীয় ভাষার নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে, ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষকসকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধারণরূপে ইংলণ্ডীয় ভাষার উপদেশ করা উচিত। অনেক ইংলণ্ডীয় পুরুষ এবং আমাদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর অলীক মতও আর নেই। এ ভ্রম খণ্ডনের নিমিত্তে এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্মভাষায় কি পরভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন সুলভ হয়? এ বিষয় আমারদিগের কোন সংশয় স্থলই বোধ হয় না—ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে। শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বকালেই যে ভাষার অর্দ্ধভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ় কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই পৈতৃক ভাষা অভ্যাস করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ, ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়? পরদেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে। যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহারা যদিও বহু অংশে কৃতার্থ হইতে পারে, কিন্তু দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ বা যে সকল মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থ হইয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে কালযাপন করে, যাহারদিগের পিতামাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় প্রাণধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যালাভের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জ্জন করিবার উপায়ও নাই। সকল দেশেরই এইপ্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলণ্ড দেশে উপায়ক্ষম ব্যক্তিদিগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য নগর বিশেষে যেরূপ মহা মহা বিদ্যাগার বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যাভাস নিমিত্তে গ্রাম মধ্যে দেশভাষার পাঠশালা সকল স্থাপিত আছে। এদেশের বিষয়েও রাজপুরুষদিগের সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া

আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে আত্মভাষা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্গুণ ধনের প্রয়োজন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানাভ্যাসে যে ব্যয় হয়, স্বভাষায় বালকেরা তাহার চতুর্থ অংশের এক অংশ ব্যয়ে তুল্য জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ স্বদেশের বিদ্যা যতকাল স্বদেশের ভাষাস্বরূপ সুচারু পরিচ্ছদ পরিধানে সজ্জীভূত না হয়, ততকাল সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গত কখনই হইতে পারে না। এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যাশূন্য পুরুষেরা ও জ্ঞানাধিকারবঞ্চিত অবলারা পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়াও সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত আছে যে পৃথিবী বাসুকীর মস্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছে সূর্য্য এক লক্ষ ও চন্দ্র দ্বিলক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, রাহু দৈত্যের গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহারদিগের গ্রহণ হইতেছে, এবং অদিন ও অক্ষণে যাত্রা করিলে রোগাদি অমঙ্গল ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহারা নিরাকরণ অবশ্যই হয়, তদ্রূপ আমারদিগের দেশীয় ভাষায় বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইলে তাহারা পরম্পরা শ্রুতি দ্বারাও অনায়াসেই জানিবে যে ভূমণ্ডল শূন্যেতে স্থিতি করিয়া সূর্য্যকে সম্বৎসরে পরিবেষ্টন করে, সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্র অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে স্থিতি করে, ভূচ্ছায়া প্রবেশ দ্বারা চন্দ্রগ্রহণের ও চন্দ্রবিম্ব আবরণ দ্বারা সূর্য্যগ্রহণের সংঘটনা হয়, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ ও অপরিমিত ভোগাদি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করা রোগের একমাত্র কারণ, ও শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার হেতু, ঈশ্বরের যে বিষয়ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তদ্দারা সেই বিষয়ঘটিত অমঙ্গল হইবে, এবং যে বিষয়ক নিয়ম পালন করিবে তদ্দারা সেই বিষয়ের সুখ প্রাপ্তি হইবে। স্বদেশোৎপন্ন শস্য যেরূপে সকলের সুলভ হইয়া সর্ব্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ স্বদেশের ভাষা দ্বারা সকলে জ্ঞান তৃপ্ত হইয়া তৎ ফল সুখসম্ভোগ করিতে পারে।

এদেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনী যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এদেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষার দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। ইহা সত্য যে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু তাহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই বা কত? বর্ত্তমান কোন পত্র-সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে রাজধানী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে পারদর্শী হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহস্রই বা কত? এদেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহস্র অংশের এক অংশেও নহে।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহা বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশভাষাসকল ঐ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা এ কথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত দেশে আত্মভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন? সেই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারী জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে। মিশর দেশে রোমানদিগের অধিকার চ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশ ভাষা যে কপ্‌টিক্ তাহা এইক্ষণকার দুইশত বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্‌স ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে গ্রীকদিগের অধিকারকালে যে সকল নগর গ্রীক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার দেশভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশে বহু সংখ্যাতে পুরুষাক্রমে বসতি করেন, এবং পুরোবাসিদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংশ্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্থানী ও পারসীক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এই রূপ উদ্ভব হইয়াছে। যদি জয়বান্ জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্য রূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহাদিগের সহিত এক জাতিভূত না হয়েন, তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে ইটালী ও সিশিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত লোককে তাহাদিগের স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনারা তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা আপনারাই ব্যবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশভাষাসকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না—নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎ কথা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এ মনস্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না।

আমারদিগের দেশভাষার অনুষ্ঠানের প্রতি যে সকল ইংলণ্ডীয় লোক পূর্ব্বপক্ষ করেন, তাঁহারদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসকল প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবাপুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে "সেই বাঞ্ছিত কাল কোন্ দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা

হইবে।" হা! ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু সে বিষয় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবারং জন্য অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদর যোগ্য বোধ করেন না—হিন্দু নাম তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চিত্ত প্রমোদকারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রহিয়াছেন, আর আমারদিগের ইংরাজী ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠ বোধ করেন না—সে যে কি দুর্ল্লভ অমূল্য রত্নাকর, তাহার অনুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ, ইঁহারদিগের কি বিপরীত ব্যবহার! ইঁহারা পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যক বোধ করেন না। ইউরোপখণ্ডের অন্তঃপাতি কোন্ দেশের কোন্ স্থানে কি নগর? কোন্ বৎসর তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে? তদবধি সেখানে কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে? তাহা তাঁহারদিগের সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু আপনারদিগের এই জন্মভূমির তদ্রূপ বিবরণ জানিবার জন্য কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন? এই কলিকাতা নগরীর চতুর্দ্দিকে বিংশতি ক্রোশ দূরে কোন্ স্থান তাহা অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ জ্ঞাত নহেন; পূর্ব্বকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল? কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল? তাহারদিগের কোন্ বংশের কোন্ রাজা কোন্ দিবস রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কোন্ দিন কি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বৎসর কয় মাস পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছেন? এতাদৃশ সকল বৃত্তান্তের অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক শিক্ষা করেন; কিন্তু আপনারদিগের কি মূল? পূর্ব্বে কোন্ সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? কিরূপ ধর্ম্ম ছিল? কি কি বিদ্যাপ্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত কি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনাও আছে, কি আক্ষেপের বিষয়! ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, জর্ম্মণি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছে, তথাপি কোন্ দিন কোন্ গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী! নেবোরের রোমান্ ইতিহাস ও থরল্‌ওয়ালের গ্রীক্ ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র! কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাষ করে? 'এসিয়াটিক্ রিসর্চ্চ' ও এসিয়াটিক্ সমাজের 'জর্নেল' গ্রন্থ কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?

যাঁহারদিগের এরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, আত্মভাষার উচ্ছেদ [illegible] করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে একটি [illegible] সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম্ম। কিন্তু ইহা কি তাঁহারদিগের আন্তরিক বাসনা? [illegible] তাঁহাদিগের এমত স্নেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য ক্লেশ বোধ হইবে? ইহা যদি হইবে তবে তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোন মিত্রকে প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্ঘাটন করেন? [illegible] সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজী বক্তৃতা কেন করিযা থাকেন? যাহা হউক এ সকল ব্যবহার জন্মভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে। জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়—প্রেমামৃতরস সাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়! যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্যক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগী মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সহৃদমণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ, সম্পদ, যাহা কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্ব্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে আর নাই—যে নাম চিন্তা মাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ্‌বান্ধবের প্রেমার্দ্র আননসকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে! "কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা শিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন" কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভূমিবাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিসাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য? পূর্ব্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনই ছিল না। অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত না হয় যে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীযসী"? বীর্য্যবান্ গ্রীক্ জাতি ও জয়পিপাসু রোমান্ জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়, কিন্তু অমরকীর্ত্তি পাণ্ডু পুত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ রাজপুত্রদিগের নামোচ্চরণ মাত্র চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে!

সেক্সপিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয় বটে, কিন্তু আমারদিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্য্যভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে! হোমর্ ও বর্জ্জিল্ অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমারদের! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন্ এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা ইংরাজী ও জর্ম্মণ্, অবনীর সকল ভাষা একদিকে, আর অন্যদিকে সুচারু সুমধুর শব্দরত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে?—জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা—জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে?

যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক্ উদ্দেশ্য, তথাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের প্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী পর্ব্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রীতি পাত্র, স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশবকালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্যভাষণে মাতাপিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে। এই প্রকরণলেখকের কোন মান্য মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পরভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্তি হয় না, এবং আত্মভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী পারসীক দেশে যে পর্য্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্টরূপে প্রচার ছিল, সে পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফেরদোসী আত্মভাষাতে শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামৃতরসে পূর্ণ গ্রন্থসকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ্ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীতসকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনারদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইতালী ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি যশস্বী গ্রন্থকর্ত্তারূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বর্জ্জিল ও হোরেস্, এবং লিবি ও সিসিরো ইঁহারা ইটালী ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণি দেশেতে কীর্ত্তিমান্ ফ্রেডরিক্ রাজার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান্ লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি

স্বকৃত ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থকর্ত্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্য্যোদ্ভব রচনাসকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড দেশে যতদিন নর্ম্মান ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল, তত দিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর্ স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতাসকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থসকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেখ ইউরোপখণ্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন্ ভাষায় বিদ্যাভাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ও উত্তমোত্তম গ্রন্থসকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধকাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন্, পোর্টুগেল ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপখণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা? যে যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্মভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থসকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্ম সন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্তবেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমারদিগকেও গণ্য করিবেন, এবং পরজাতীয় লোকেরা আমারদিগের সুচারু রচিত প্রস্তাবসকল পাঠের নিমিত্তে আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন। আমারদিগের দেশভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক্ সম্ভব, কারণ তাহার বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্ব্বার্থপ্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।

More perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either.

Sir W.Jones's work.

অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবকগণ! আমারদিগের দেশভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক, কিন্তু তাহারদিগের সঙ্গী হইয়া তোমারদিগের হাস্যাস্পদ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু অনেক ইংরাজেরও এই একান্ত মত যে সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শিক্ষাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা কি ইহাতে তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের উচিত যে সর্ব্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন্ ও লাক্, নিউটন ও লাপ্লাস্, কুবিয়র্ ও হম্বোলট্ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্মভাষাতে ভাষিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যাসকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ব্ববিবেচনাতে দেশভাষায় বিদ্যাভাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত

আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহারদিগের সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষা উপার্জ্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্ত্তমান কালে ইউরোপখণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষাসকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যক্‌রূপে উপার্জ্জিত হইবার নহে; আমারদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এদেশীয় সকল শাস্ত্র ও সকল বিদ্যার আধার ও বর্ত্তমান দেশভাষা ও সকলেরও আকরস্বরূপ হইয়াছে; এবং আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থান বিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থীরা ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মণ এবং সংস্কৃত, আরবী ও পারসীক ভাষা সুন্দররূপে অভ্যাস করিতে পারে। এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশভাষার পাঠশালাসকল স্থাপন করা আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেণ্টের ইহাতে উৎসাহের সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজকার্য্যের প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা বিতরণে কিরূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি হইবে—জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি-সংস্কারে তাঁহার কেন যত্ন হইবে? বিশেষতঃ রাজার এক আজ্ঞাতে যাহা হইবে, সহস্র সহস্র প্রজার যুগবৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রাজকার্য্য দেশভাষাতে সম্পন্ন হইবে, তবে আপনা হইতেই কত লোক আত্মভাষা শিক্ষাতে সযত্ন হয়েন। যদি বল গবর্ণমেন্ট এ উপায় অগ্রেই করিয়াছেন অগ্রেই তাঁহার শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্য্যে দেশভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে এক শত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে। এই উভয় বিষয়েই তাঁহারদিগের যদ্রূপ অবহেলা তাহাতে সকলে অনায়াসে মনে করিতে পারেন, যে তাঁহারা কেবল এ বিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় বিচারালয়সকলে বঙ্গভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহারা কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গালা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্তু তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাতস্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোন লিপি এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারাগারের লিপি কর্ম্মচারী। জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্য্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি

ইংরাজ গবর্ণমেন্টের যোগ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত একশত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টের লেশমাত্রও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক্ বিদ্যাগারও স্থাপন করিয়াছেন,* কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ একশত বাঙ্গালা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই, শিক্ষক নাই, এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য্য সকল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? একজন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালাসকল গবর্ণমেন্টের আপন সন্তান আর বাঙ্গালা পাঠশালাসকল সপত্নী সন্তান। আত্ম সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এদেশে দেশভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেন্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র। ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন—আমারদিগের সর্ব্বস্বের পরিবর্ত্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যা দান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দেশভাষার পাঠশালাসকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন। অনুরাগশূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। গুরুকার্য্যের গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইতে অবশ্য সে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক! ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থসকল অনুবাদ করা এবং দেশভাষার উপযুক্ত শিক্ষকসকল প্রস্তুত করা এ বিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন, এবং সম্যক্ যত্ন পূর্ব্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাঁহারা দিন দিন কৃতকার্য্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক, এবং বঙ্গভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিবাদ আছে, তখন তাহা কার্য্য দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দ্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।

* বাঙ্গালা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালার নিমিত্তে তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য রাজার যদ্রূপ চেষ্টা কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছেন না।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', শ্রাবণ ১৭৭০ শক, পৃ ৬৪-৭২

স্বদেশীয় ভাষানুশীলন
মেদিনীপুরস্থ বিতর্ক সমাজের বক্তৃতা

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা সাধারণ লোককে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন জন্য তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। তৎকালে তাঁহারা উক্ত ভাষাদ্বয়ের অনুশীলনের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেন। ঐ ভাষাদ্বয়ের ছাত্রগণকে বহু মূল্য পারিতোষিক ও উচ্চ মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন ও ইউরোপীয় ভাষা হইতে উক্ত দুইভাষাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনুবাদ জন্য অধিক বেতনে অনুবাদক সকল নিযুক্ত করিতেন। কৌতুকের বিষয় এই যে ঐ সকল অনুবাদকের মধ্যে যাঁহাদিগের অনুবাদ অস্পষ্ট হইত, তাঁহাদিগের অনুবাদিত পুস্তকের ব্যাখ্যাতা পদে আবার তাঁহাদিগকেই বিলক্ষণ বেতনে নিযুক্ত করিতেন। বিশালাকার গ্রন্থ সকল এত অধিক মুদ্রিত হইল যে তৎকালের শিক্ষা সমাজের দীর্ঘ পুস্তকাগারে সে সকল রাখিবার স্থানের অভাব হইয়া উঠিল, ও বৃহৎ বৃহৎ দারু নির্ম্মিত পুস্তকাধার সকল গ্রন্থ ভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু এত যত্ন ও এত ব্যয়ে অল্পই ফলোদয় হইল। ইউরোপীয় ভাষা হইতে নিকৃষ্টরূপে অনুবাদিত সেই সকল গ্রন্থের প্রতি লোকের বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না; তদ্দ্বারা মনের দীনতা ও কুসংস্কার দূরীকৃত না হইয়া বরং বদ্ধমূলই হইতে লাগিল। আরবী ও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষার প্রতি লোকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; উক্ত ভাষাদ্বয় প্রণীত পুস্তকাপেক্ষা ইংরাজী ভাষার পুস্তক সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিক্রীত হইতে লাগিল; বালকদিগকে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করাইবার জন্য মহা বিদ্যালয় হিন্দু কালেজ বিনা রাজ সহায়ে কেবল কতিপয় ধনাঢ্য হিন্দু মহাশয়দিগের ব্যয়ে ও যত্নে সংস্থাপিত হইল। এমত সময়ে মহাত্মা লার্ড উইলিয়ম্ বেনটিন্ক সাহেব যাঁহার ন্যায় পারগ ও ধর্ম্মশীল গবর্ণর্ জেনরেল্ এতদ্দেশে কখন আমগন করেন নাই, ও যাঁহার নিকট বিবিধ মহোপকার জন্য এই দেশ অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ দিবসীয় রাজ বিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষা কর্ম্ম তদাবধি ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইবেক, এবং পূর্ব্বে যে অর্থ আরবী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইতেছিল, তাহা কেবল ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইবেক, এবং যে সকল সংস্কৃত ও আরবী বিদ্যালয় লোক সমীপে অত্যন্ত আদৃত, সেই সকল বিদ্যালয় ব্যতীত ঐ প্রকার অন্য সকল বিদ্যালয় ক্রমে ক্রমে রহিত করিয়া দেওয়া যাইবেক। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের উক্ত বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারিনী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। এই

সময়াবধি ইংরাজী ভাষার প্রতি লোকদিগের আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অনেক স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল সাধারণ লোকে ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল; এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেদ দশা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালের গবর্ণর জেনরেল শ্রীযুক্ত লার্ড অকলেণ্ড সাহেব সাধারণ শিক্ষাকার্য্য সম্বন্ধীয় স্বকীয় অভিপ্রায়ে প্রতিপাদক পত্রে ব্যক্ত করেন যে যদবধি বাঙ্গালা ভাষাতে বালকদিগের শিক্ষোপযোগী উত্তম উত্তম পুস্তক সকল প্রস্তুত না হইবেক তদবধি কেবল ইংরাজী ভাষাতে শিক্ষাকর্ম্ম সম্পাদিত হইতে থাকিবেক। যখন ঐ সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবে, তখন জেলা ইস্কুলে আর ইংরাজীতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গালাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশোজ্জ্বলকর ও তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত টমাসন্ সাহেব দেশের প্রচলিত ভাষাতে অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ লোকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে ইহা স্থির করিয়া গ্রামে গ্রামে হিন্দী ভাষার পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক, ঐ দেশের প্রচুর হিত সাধনের উপায় করেন। মহানুভব টমাসন্ সাহেবের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষা প্রণালী এত দিবস পরে বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের যত্ন দ্বারা এতদ্দেশে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নূতন বাঙ্গালা পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে এ প্রকার বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হইবার সূচনা হইতেছে, এতদ্দেশীয় গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা সকলেরও উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং এই সমস্ত পাঠশালার তত্ত্বাবধারণ জন্য উপযুক্ত পরিদর্শক সকল নিযুক্ত হইয়াছে। এত দিবস পরে এতদ্দেশে দেশীয় প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জনগণকে বিদ্যাভাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ইহার পূর্ব্বে রাজপুরুষেরা বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই এমত নহে। গবর্ণর জেনরেল্ হারডিঞ্জ সাহেব ১০১ পাঠশালা এতদ্দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভঙ্গ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। গত শিক্ষা সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কেমিরণ সাহেব রাজকীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতি উক্ত আপন বক্তৃতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "তোমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে তোমরাই কেবল ইউরোপীয় বিদ্যানুশীলন করিতেছে; ইংরাজী ভাষার গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষাতে অনুবাদ করিয়া স্বদেশস্থ লোকের অশেষ হিত সাধন করিতে পার।" ডিপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত মেডক্ সাহেব হুগলি কালেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা বর্ণন করিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেব যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে

কৃষ্ণনগরস্থ কালেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন, ‘‘কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজী ভাষার গদ্য পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘা পূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই কহি যে বঙ্গভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাঁহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি যে, যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদিগের গ্রন্থকর্ত্তা হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা থাকে তবে স্বকীয় ভাষার গ্রন্থ রচনা গ্রন্থের উত্তম উত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে স্থায়িতর কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিবে। যাঁহারা প্রথমে এই পথাবলম্বী হইয়া কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে।’’

যাহা হউক এত দিবস পরে বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা সাধারণ জনগণকে শিক্ষা প্রদান করিবার উপায় হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পরিবারের ভরণপোষণের উপায়ের জন্য সাধারণ লোকদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয় অতএব তাহাদিগের সম্বন্ধে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান আবশ্যক, যে হেতুক লোকে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয় ভাষার আশ্রয় দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হয় তত পরভাষার আশ্রয় দ্বারা শিক্ষা করিতে কখনই সক্ষম হয় না। অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রদান যত অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হয় তদ্রূপ ইংরাজীতে শিক্ষা প্রদান হয় না। ইংরাজী ভাষার ইংরেজ শিক্ষকদিগের অত্যন্ত দূর দেশ হইতে এখানে আসিতে হয় এবং ঐ ভাষার এতদ্দেশজাত শিক্ষকদিগের পঠদ্দশাকালীন অনেক পরিশ্রমে দীর্ঘকালে ঐ ভাগ আয়ত্ত করিতে হয় এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজী শিক্ষক অল্প বেতনে দুর্ল্লভনীয়, অতএব সকল দিক বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শিক্ষা প্রদান শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবেক। শিক্ষা প্রদান দ্বারা পল্লিগ্রামস্থ লোকের কত মহোপকার সাধন হইবেক তাহা বর্ণনাতীত। বিবেচনা করিয়া দেখুন এক্ষণে পল্লিগ্রামে কত আচার, কত দৌরাত্ম্য, কত প্রবঞ্চনা, কত শঠতাচরণ, ও কত পরস্পর অবিশ্বাস প্রবল রহিয়াছে! পল্লিগ্রামস্থ লোকেরা বিদ্যা অভ্যাস করিলে তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগের মনোযোগ হইবেক, তাহাদিগের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হ্রাস হইবে, তাহারা রাজ প্রদত্ত স্বর্গীয় ক্ষমতা সকল বিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে এক্ষণাপেক্ষা অধিক ক্ষম[তা]বান্ হইবে ও ভূস্বামী ও রাজকর্ম্মচারিদিগের দ্বারা তাহাদিগের পীড়িত ও প্রবঞ্চিত হইবার সম্ভবনা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে। পরন্তু তাহারা জ্ঞাত হইবে যে কেবল ভূমিকর্ষণ ও বাণিজ্য করিবার জন্য মনুষ্য এখানে জন্মগ্রহণ করে

নাই, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে যাহার মার্জ্জন ও উন্নতির প্রতি তাঁহার সুখ অনেক অংশে নির্ভর করে।*

বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল, সে সকল উপকার সকল লোকের বোধসুলভ কিন্তু তাদ্দ্বারা আর এক মহোপকার সাধন হইবেক, তাহা এরূপ বোধসুলভ নহে, অতএব তাহা বাহুল্য রূপে প্রতিপাদন করিতে প্রবত্ত হইতেছি। বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইবেক সেই ভাষা যত উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইবেতই উত্তমোত্তম কাব্যকার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক। অন্যূন আট বৎসর হইল আমি মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহাতে আমি অনেক উদাহরণের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে যদবধি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে তদবধি সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদয় হয়েন না আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদয় হইতে থাকেন। সে বক্তৃতা অতি দীর্ঘ অতএব সময়াভাব প্রযুক্ত তাহার সমুদয় এক্ষণে পাঠ করা হইতে পারে না; এই জন্য এ স্থলে তাহারা সারম্য সঙ্কলন করিয়া বলিতেছি।

"দেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে এই দুই প্রকার বশতঃ উদয় হয়; প্রথম কারণ, মাতৃ ভাষা দুগ্ধের ন্যায়; মাতৃ দুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্তিজনক ও তদ্দ্বারা তাহার যেরূপ বলাধান হয়, পশু দুগ্ধ সেরূপ নহে, তেমনি মাতৃ ভাষার প্রেমার্দ্র আশ্রয়ে মনের ভাব সকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না। বিদেশীয় ভাষাতে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পারগ হউন না কেন, তথাপি জাতীয় ভাষাতে তদ্রূপ পারগতা উপার্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য, তাহা থাকিলে সেই আত্মভাষাতে কাব্যরচনা পরভাষাতে কাব্য রচনা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কারণ কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা অত্যন্ত প্রবল হইলেও, যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া অতি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত সেই ভাষার আলোচনা করেন, কেবল তাঁহারাই অনেক পরিমাণে সেই ভাষার নিগূঢ় প্রকৃতি ও তাহার প্রত্যেক শব্দ ও কাব্যাংশও

* শেষ কয়েক পংক্তিতে যে ভাব ব্যক্ত আছে তদনুযায়ী ভাব বঙ্গদেশ-হিতৈষী পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত হজসন্ প্রেট্ সাহেব কোন জেলাস্কুলের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

প্রয়োগ কোন বিশেষ অর্থবোধক ও কোন স্থলে ব্যবহারযোগ্য তাহা অবগত হইয়া সেই ভাষাতে প্রস্তাব রচনায় পটু হইতে পারেন, আর অবশিষ্ট লোকে সেই ভাষানুশীলনে তত ব্যয় স্বীকার ও তত যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না সুতরাং সে ভাষাতে তাহাদিগের সেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে না, অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে দেশে বিদেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল, সেই দেশে সেই বিদেশীয় ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোক অল্প সংখ্যক ও তাহাতে অল্প ব্যুৎপন্ন লোক বহু সংখ্যক; অল্প সংখ্যক লোক অপেক্ষা বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে লোক সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিবার অধিক সম্ভাবনা কিন্তু উক্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অভাবে ও স্বদেশীয় ভাষার অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতুও তাঁহাদিগের সেই শক্তি স্ফূর্তি পায় না। এই দুই কারণবশতঃ ইহা কখন দৃষ্ট হয় নাই, যে যে ভাষা আমরা কখন শিক্ষা করিয়াছি তাহা আমাদিগের স্মরণ হয় না, যাহা শিখিবার জন্য তাহার ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই আত্মভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষাতে কেহ কখন কোন সমীচীন কাব্য লিখিতে সমর্থ হইয়াছে। দেখুন রোমানেরা পৃথিবীর অনেকানেক দেশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু ইটালি দেশ যাহার প্রচলিত ভাষা তখন রোমান ভাষা ছিল, সেই দেশের লোক ব্যতীত অন্য দেশের লোক ঐ ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে বিখ্যাত হইতে পারে নাই। বর্জিল ও অবিড্, হোরেস ও সিসিরো, লুক্রিশস্ ও কেটলস্, লিবি ও টেসিটস্ সকলেই ইটালি দেশ জাত। যে পর্য্যন্ত ইয়ুরোপ খণ্ডে ইটালি, ফ্রান্স ও স্পেইন নামক দেশ সকলেতে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল সে পর্য্যন্ত ঐ সকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার উদয় হয়েন নাই, তৎপরে যখন ঐ সকল দেশের মধ্যে প্রত্যেক দেশে তত্তদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষার অনুশীলন প্রবল হইয়া উঠিল তখন ডেন্টি ও টেসো, কর্ণিল্ ও রেসিন্, কেলডিরোন্ ও লোপ্‌ডি বেগা ইত্যাদি চিত্তের উন্নতিকর ও বিনোদকর কবিশ্রেষ্ঠ সকল উদয় হইতে লাগিলেন। যদবধি ইংলণ্ড দেশে নবমেন ফ্রেঞ্চ ভাষা কিম্বা জর্ম্মণি দেশে ফ্রেঞ্চ ভাষার অনুশীলন প্রবল ছিল তদবধি কোন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার ঐ সকল দেশে উদয় হয় নাই, তৎপরে ঐ দেশদ্বয়ে প্রচলিত ভাষার আলোচনা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রকাণ্ড মানসিক বীর্য্যবান সেক্‌সপিয়র ও মিল্‌টন্, গোয়েথি ও সিলর, ক্লপষ্টক ও ক্রিনিগ্রাথ্ আপনাদিগের নিজ নিজ প্রকাশিত কাব্য দ্বারা মর্ত্ত্য লোককে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। আসিয়া খণ্ডে দেখুন যদবধি পারস্যদেশে আরবী ভাষার আলোচনার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তদবধি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদয় হয়েন নাই, তৎপরে যখন দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন ফেরদোসি দ্বারা ইরাণের প্রাচীন রাজাদিগের বৃত্তান্ত পূরিত বীররসের প্রধান প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত 'সাহনামা' নামক মহাকাব্য বিরচিত

হইল, তখন সাদি তাঁহার মধুর রসস্ফীত সরল প্রবন্ধ উপদেশ গ্রন্থের সহিত উদয় হইলেন, তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকর পরম রমণীয়, স্থানে স্থানে পরমার্থ রসপূর্ণ গাথাবলি প্রচার করিলেন ও জেলালউদ্দীন রুমি বিবিধ প্রসঙ্গ গর্ত্ত 'মস্‌নবি' নামক পরমোৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য কাব্য প্রকাশ করিলেন। দৃষ্ট হইতেছে যে কোন দেশে পরকীয় ভাষার অনুশীলনের প্রবলতার সময়ে যে কিছু হৃদয় স্ফূর্ত্ত্য প্রকৃত কবিতা প্রচারিত হয়, তাহা বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত প্রচলিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। যখন ফ্রান্স ও জর্ম্মণি দেশে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল তখন অমৃতভাষিণী হৃদয় স্ফূর্ত্ত্য কবিতা পরকীয় ভাষার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ সহৃদয়তা শূন্য কবিদিগের মানস ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ট্রাবাডর ও মিনিসিঙ্গর নামক দরিদ্র পরিব্রাজক গাথকদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সারল্য সুধাসিক্ত বাক্য দ্বারা প্রকৃতির অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহন করিয়াছিলেন। আমাদিগের এই বঙ্গভূমিতে এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর সীমা নাই। তাঁহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইয়াছেন! বিপুল কীর্ত্তিমান মহারাজ ফ্রেডরীকের দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের স্মরণ করা উচিত। ঐ যশস্বী ভূপতি বাল্যকালাবধি ফ্রেঞ্চ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ঐ ভাষাতে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ফ্রান্স দেশীয় লোকদিগের সহিত বাক্যালাপে দিবাভাগের অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন, নিজে ঐ ভাষায় ক্ষমতাসূচক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তথাচ তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থেতে ঐ ভাষার প্রকৃতি বিরুদ্ধ প্রয়োগ ধৃত করিয়া সূক্ষ্ম কাব্য বিবেক শক্তি সম্পন্ন পারি নগরের পৌরজনেরা হাস্য করিত। তাঁহা দ্বারা নিজ সভায় আহূত বলটেয়ার নামক ফ্রান্স দেশীয় মহাপণ্ডিতের নিকট যখন তিনি আপনার রচিত প্রস্তাব সকল সংশোধন জন্য প্রেরণ করিতেন তখন বলটেয়ার কহিতেন "রাজা কত গুলিন মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" ঐ সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে বাঙ্গালা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা দুঃসাধ্য কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সিসিরোর সময়ের লাটিন ভাষার ন্যায় কিম্বা লেসিঙ্গের সময়ের জর্ম্মণ ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষা অসম্পন্ন? আপনাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত করিয়া ঐ দুই মহাত্মা কি পর্যন্ত্য না যশস্বী হইয়াছেন, যদ্যপি আমাদিগের আত্মভাষার উন্নতি সাধনে আমরা যত্নবান হই তবে ঐরূপ যশস্বী আমরাও হইতে পারি। আহা! বাঙ্গালা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবকদিগের হৃদয়ে কি কিছুমাত্র কারুণ্য রসের সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন তাহা তাঁহারাই জানেন। স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ইংরাজদিগের শ্রদ্ধা দেখিলে আমারদিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সদি নামক ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন "যে স্থলে এক প্রকৃত ইংরাজী

কথার দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে সে স্থলে যে ব্যক্তি ফ্রেঞ্চ ভাষা অথবা জর্ম্মন ভাষোদ্ভব কথা ব্যবহার করে, তাহাকে আত্মভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য রজ্জু বদ্ধ করিয়া হত্যা করা উচিত।" উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তার এই উক্তি অতিশয় কটু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু আত্মভাষার প্রতি ইংরাজদিগের যতদূর প্রেম তাহা তাহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজদিগের গুণ সকল অনুকরণ না করিয়া দোষ অনুকরণ করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদেশীয় পদার্থ প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমরা অনুকরণ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। ধ্রুব তারার প্রতি যেমন দিগ্‌দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে তেমনি বিদেশ গত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে; সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ। সেই স্থানের সহিত তাঁহার বালসখিত্ব; সেই স্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয়জনদিগের আবাস। সেই প্রিয় মনোহর স্বদেশ নিরুর্ব্বরা ও প্রমোদজনক দৃশ্যশূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ, এমন কি কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের সুচারু গোলাব পুষ্পের উপবন ও নেপেল্‌স সন্নিহিত জলের ও তটের নয়ন বিমুগ্ধকর শোভায় হাস্যমান বিখ্যাত অখাত পর্য্যন্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। এমন স্বদেশের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে? যথার্থ বলিতে কি হোমর্‌, প্লেটো ও সফোক্লিস্‌ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরস পানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক সেক্‌সপিয়রের অমৃত ধর্ম্ম প্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হই কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনা শক্তি সম্পন্ন গোয়েথি ও সিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন পূজ্য বিশাল খ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা, সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃত ধারা পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে? সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে।"

পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল যে বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত হইল, তাহা অন্যূন আট বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয় বলিতে হইবেক যে সেই আট বৎসরের মধ্যে আত্মভাষার প্রতি ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মনোযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে; এমন কি যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে কথোপকথন করিতে পারিতেন না, তাঁহারা পর্য্যন্ত আত্মভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় লোকের উপকার সাধন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সেই আট বৎসরের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে অনেক নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক

বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশীয় ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। হে স্বদেশীয় ভাষা! এত দিবস পরে তোমার সৌভাগ্যের উষার চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে, স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তিরা আশাপূর্ণ অন্তঃকরণে সেই সকল চিহ্ন নিরীক্ষণ করিতেছেন। গৃহের এক দেশে সংস্থিত অনাদৃত জননীর ন্যায় তোমার অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা তোমাকে পূর্ব্বে অবজ্ঞা করিত; এক্ষণে তোমার প্রধান প্রধান সন্তানেরা যত্নের সহিত তোমার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরম বরণীয়া আর্য্যা সংস্কৃত ভাষার অনুত্তমা কন্যা যে তুমি তোমাকে পূর্ব্বে কে চিনিত? তোমাতে যে এত প্রভা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা পূর্ব্বে কে বুঝিতে পারিয়াছিল? স্বদেশীয় ভাষার প্রতি এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মনোযোগ বর্দ্ধমান দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইতেছে। তাঁহারা যদ্যপি নিদ্রায় কাল যাপন করিবেন তবে আর কাহার দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার সাধন হইবে? তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার যে বিষয় রচনাতে স্বাভাবিক বিশেষ ক্ষমতা আছে এমন অনুভব করিবেন, তাঁহার সেই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা উচিত। কেহ বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক স্বদেশীয় লোকের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হইবে অতএব তদ্বিষয়ে গ্রন্থ রচনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, কেহ বলেন যন্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কেহ বলেন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কেহ বলেন কৃষি কার্য্য ও সম্পত্তি বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু যেমন কৃষিবৃত্তি, বাণিজ্যবৃত্তি, শিল্পবৃত্তি, প্রাড়্‌বিবাক বৃত্তি, ধর্ম্মোপদেশ বৃত্তি ইত্যাদি প্রত্যেক বৃত্তির পক্ষের লোকেরা সেই বৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী কহে কিন্তু সকল বৃত্তিই লোক সমাজের পক্ষে উপকারী তেমনি সকল প্রকার উত্তম বিষয়ে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা স্বদেশের পক্ষে উপকারী হইবে। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাতে বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব রচনা করা যেরূপ কঠিন বোধ হইত এক্ষণে সেরূপ কঠিন বোধ হয় না। এই পরমোপকার জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট ও শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি কতকগুলি সদ্বিদ্যাশালী স্বদেশহিতৈষী মহাশয়দিগের নিকট এই দেশ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে। এস্থলে আর এক জন মহাশয় ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; তাঁহার এমনি ভদ্রতা ও অমায়িক স্বভাব যে এস্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে তিনি বিশেষ কুণ্ঠিত হইবেন এই প্রযুক্ত তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষায় প্রস্তাব রচনা প্রণালী বিষয়ে উপদেশ জন্য কত উপকৃত আছেন ও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় ও যত্ন দ্বারা আর এক মহৎ অভিপ্রায় সাধনের অনুষঙ্গাধীন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে কত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাহা তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন। এই সকল মহাশয়দিগের যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে ও পূর্ব্বে তাহাতে বিবিধ বিষয়ে রচনা করা যেরূপ সুকঠিন বোধ হইত এক্ষণে তদ্রূপ হয় না। ইহা যথার্থ বটে যে পূর্ব্বকালের কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র

প্রভৃতি ও বর্ত্তমানকালের শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবিদিগের বিরচিত কবিতা ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় স্বকপোল রচিত প্রবন্ধ সকল অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, কেবল অনুবাদ ও ইংরাজী হইতে পরিগৃহীত ভাবগর্ভ গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু এ প্রকার অনেক দেশে প্রথমে হইয়াছিল, তৎপরে ভাষা উন্নত ও সুসম্পন্ন হইলে বিবিধ বিষয়ে স্বকপোল রচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল; সেইরূপ এই দেশেও হইবেক। চতুর্দিকে শুভ চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার পালিত শ্যেন শাবককে বর্দ্ধমান দেখিয়া ভবিষ্যতে আকাশের অত্যন্ত উচ্চ প্রদেশে তাহাকে উড্ডীয়মান হইতে দর্শন করিব এই আশাতে পুলকিত হয়, তেমনি স্বদেশীয় লোকের গ্রন্থ রচনা শক্তি উৎকর্ষ রূপ আকাশে ক্রমশ ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া সমীচীনতা রূপ সূর্য্যের সহিত অসঙ্কুচিত নয়নে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইবে এই প্রত্যাশাতে চিত্ত অত্যন্ত উল্লসিত হইতেছে! ইউরোপয়ী জ্ঞান ও সংস্কৃতোদ্ভব বাঙ্গালা ভাষায় বিমিশ্র প্রভাবে যে এক নবতর কল্যাণতর রচনাবলীর উদয় হইবেক ইহা চিন্তা করিয়া মন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছে!

'তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শক, পৃ ২৩-৩০.

স্বদেশীয় ভাষানুশীলন

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ নির্ভর করে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন আবার জাতীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। স্বদেশীয় ভাষানুশীলন সম্বন্ধে আমরা অনেক দিন হইল এই পত্রিকায় উল্লিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন আমাদিগের লেখা দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকারও সাধিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যাঁহাদিগের অনাদর ছিল, ঐ প্রস্তাব প্রকাশ করিবার পর তাহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছিল। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতি অনেক পরিমাণে সেই অনুরাগ বর্দ্ধনের ফল। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের যে প্রকার উন্নতি আমরা প্রত্যাশা করি তাহা এখনও হইয়া উঠে নাই। এখনও কেবল বাঙ্গালীর পাঠের নিমিত্ত ইংরাজীতে প্রবন্ধ লেখা বিশেষতঃ কেবল বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজীতে বক্তৃতা করার প্রতি লোকের বিলক্ষণ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এখনও আমরা দেখিতেছি যে, আমাদিগের সেই পূর্ব্বকার কথা অনেক পরিমাণে খাটে, অতএব আমরা স্বদেশস্থ লোকের পুনঃস্মরণার্থ আমাদিগের পূর্ব্বের কথা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। কাব্যকার সম্বন্ধে আমরা ইহাতে যাহা বলিয়াছি বক্তা সম্বন্ধেও তাহা খাটে।

"যাবৎ যদি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদিত হয়েন না, আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত্ন

বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদিত হইতে থাকেন। দেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে এই দুই কারণ বশত উদিত হয়। প্রথম কারণ মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের ন্যায় ; মাতৃদুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্তিজনক ও তদ্দারা তাহার যেরূপ বলাধান হয়, পশুদুগ্ধে সেরূপ হয় না, তেমনি মাতৃভাষার প্রেমার্দ্র আশ্রয়ে মনের ভাব সকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না। বিদেশীয় ভাষাতে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পারগ হউন না কেন, তথাপি জাতীয় ভাষাতে তদ্রূপ পারগতা উপার্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য, সেই পারগতা থাকিলে আত্মভাষাতে কাব্যরচনা পরভাষাতে কাব্যরচনা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হয় তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কারণ, কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা অত্যন্ত প্রবল হইলে, যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত সেই ভাষার আলোচনা করেন, কেবল তাঁহারাই অনেক পরিমাণে সেই ভাষার নিগূঢ় প্রকৃতি ও তাহার প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক প্রয়োগ কোন্ বিশেষ অর্থবোধক ও কোন্ স্থলে ব্যবহারযোগ্য তাহা অবগত হইয়া সেই ভাষাতে প্রস্তাব রচনায় পটু হইতে পারেন, আর অবশিষ্ট লোক সেই ভাষানুশীলনে তত ব্যয় স্বীকার ও তত যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না, সুতরাং সেই ভাষাতে তাহাদিগের সেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে না। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, যে দেশে বিদেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল, সেই দেশে সেই বিদেশীয় ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোক অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিবার অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু উক্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি-অভাবে ও স্বদেশীয় ভাষার অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতু তাঁহাদিগের সেই শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। এই দুই কারণ বশত ইহা কখন দৃষ্ট হয় নাই, যে, যে ভাষা আমরা কখন শিক্ষা করিয়াছি তাহা আমাদিগের স্মরণ হয় না, যাহা শিখিবার জন্য তাহার ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই আত্মভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষাতে কেহ কখন কোন সমীচীন কাব্য লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেখ, রোমানের পৃথিবীর অনেক অনেক দেশ জয় করিয়াছিল কিন্তু ইটালী দেশ, যাহার প্রচলিত ভাষা তখন রোমান অর্থাৎ লাটিন ভাষা ছিল, সেই দেশের লোক ব্যতীত অন্য দেশের লোক ঐ ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকাররূপে বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। বর্জ্জিল ও অবিড, হোরেস ও সিসিরো, লুক্রিষস্ ও কেটলস্ সকলেই ইটালীদেশজাত। যে পর্য্যন্ত ইউরোপখণ্ডস্থ ইটালী, ফ্রান্স ও স্পেন নামক দেশ সকলে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল সে পর্য্যন্ত ঐ সকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার উদিত হয়েন নাই, তৎপরের যখন ঐ সকল দেশের মধ্যে প্রত্যেক দেশে তদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষার অনুশীলন প্রবল হইয়া উঠিল তখন দান্তে ও ট্যাসো, কর্ণিল ও রেসীন, কেলডিরো ও লোপডিবেগা ইত্যাদি

চিত্তের উন্নতিকর ও বিনোদকর কবিশ্রেষ্ঠ সকল উদিত হইতে লাগিলেন। যদবধি ইংলণ্ড দেশে শিখলেন শ্রেষ্ঠ ভাষা কিম্বা জরমেনি দেশে ফ্রেঞ্চ ভাষার অনুশীলন প্রবল ছিল তদবধি কোন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার ঐ সকল দেশে উদিত হয়েন নাই, তৎপরে ঐ দেশদ্বয়ে প্রচলিত ভাষার আলোচনা যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রকাণ্ড মানসিক বীর্য্যবান শেক্সপিয়র ও মিল্টন, গেটী ও শিলর, ক্লপষ্টক ও ফিলিগ্রাথ আপনাদিগের নিজ নিজ প্রকাশিত কাব্য দ্বারা মর্ত্ত্যলোককে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। এসিয়া খণ্ডে দেখ, যদবধি পারস্য দেশে আরবী ভাষার আলোচনার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তদবধি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার তথায় উদিত হয়েন নাই, তৎপরে যখন দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন ফরদোসি দ্বারা ইরাণের প্রাচীন রাজাদিগের বৃত্তান্ত-পূরিত বীররসপ্রধান প্রধান প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত 'সাহনামা' নামক মহাকাব্য বিরচিত হইল, তখন সাদি তাঁহার মধুররসস্ফীত সরলপ্রবন্ধ উপদেশগ্রন্থের সহিত উদিত হইলেন, তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকর পরম রমণীয় পরমার্থরসপূর্ণ গাথাবলী প্রচার করিলেন ও জেলালউদ্দীন রুমি বিবিধ প্রসঙ্গগর্ভ 'মসনবী' নামক পরমোৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য কাব্য প্রকাশ করিলেন। দৃষ্ট হইতেছে যে, কোন দেশে পরকীয়, ভাষার অনুশীলনের প্রবলতার সময়ে যে কিছু হৃদয়স্ফূর্ত প্রকৃত কবিতা প্রচারিত হয়, তাহা বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় অসম্পূর্ণ অসংস্কৃত প্রচলিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। যখন ফ্রান্স ও জরমেনি দেশে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল তখন অমৃতোপম হৃদয়স্ফূর্ত্ত কবিতা পরকীয় ভাষার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ সহৃদয়তাশূন্য কবিদিগের মানস-ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক টুবাডর ও মিনিসিঙ্গর নামক দরিদ্র পরিব্রাজক গায়কদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সারল্যসুধাসিক্ত বাক্য দ্বারা প্রকৃতির অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহন করিয়াছিলেন। আমাদিগের এই বঙ্গভূমিতে এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকাররূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর সীমা নাই। তাঁহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। বিপুল কীর্ত্তিমান মহারাজ ফ্রেডরিকের দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের স্মরণ করা উচিত। ঐ যশস্বী ভূপতি বাল্যকালাবধি ফ্রেঞ্চ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ঐ ভাষাতে অত্যন্ত বুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ফ্রান্স দেশীয় লোকদিগের সহিত বাক্যালাপে দিবাভাগের অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন, নিজে ঐ ভাষার ক্ষমতাসূচক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তথাচ তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থে ঐ ভাষায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রয়োগ ধৃত করিয়া সূক্ষ্মকাব্যবিবেকশক্তিসম্পন্ন পারীস নগরের পৌরজনেরা হাস্য করিত। তাঁহা দ্বারা আহূত বল্টেয়র নামক ফ্রান্স দেশীয় মহাপণ্ডিতের নিকট যখন তিনি আপনার রচিত প্রস্তাব সকল সংশোধন জন্য প্রেরণ করিতেন তখন বল্টেয়র কহিতেন, "রাজা কতকগুলিন মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।"

ঐ সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, সিসিরোর সময়ের লাটিন ভাষার ন্যায় কিম্বা লেসিঙ্গের সময়ের জরমেন ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষা অসম্পন্ন? আপনাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত করিয়া ঐ দুই মহাত্মা কি পর্য্যন্ত না যশস্বী হইয়াছেন? যদ্যপি আমাদিগের আত্মভাষার উন্নতি সাধনে আমরা যত্নবান হই তবে ঐরূপ যশস্বী আমরাও হইতে পারি। আহা! বাঙ্গালা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবকদিগের হৃদয় কি কিছুমাত্র কারুণ্য সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন তাঁহারাই জানেন।''*

ঐ সকল কথা কাব্যকারসম্বন্ধে যেমন খাটে বক্তাসম্বন্ধে তেমনি খাটে। আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে কতকগুলি ইংরাজী সদ্বক্তা উদিত হইয়াছেন, যাঁহারা অতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র, কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার রীতি তাঁহারা পরিত্যাগ করুন। তাঁহারা যদি বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা না করেন তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা কি প্রকারে আরো সুসম্পন্ন হইবে এবং কি প্রকারে বাঙ্গালা বক্তৃতার বা উন্নতি সাধন হইবে? তাঁহারা যাহা বলেন তদ্দারা অধিকাংশ লোকের উপকার হয় না, যেহেতু অধিকাংশ লোক ইংরাজী বুঝে না। আমাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট কবি ও উপন্যাসরচয়িতা উদিত হইতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ধর্ম্ম বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে তেমন বক্তা উদিত হইতেছেন না।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শক।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্তিক ১৭৯৮ শক, পৃ ১২৬-২৮

মেঘনাদবধ সমালোচনা

প্রথম :

আরবদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে যে, তাহাদিগের দেশে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ঘোটক বা উষ্ট্র জন্মিলে অথবা তাহাদিগের বংশে একজন উৎকৃষ্ট কবির উদয় হইলে, তাহারা আনন্দোৎসব করিয়া থাকে। একজন কবিকে ঘোটক বা উষ্ট্রের ন্যায় পশু বলিয়া গণ্য করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমাদের স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতি-সাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে জন্মভূমিকে 'শ্যামা জন্মদে' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার 'মেঘনাদবধ' বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। মিল্টন ও বাল্মীকিতে এবং তাঁহাতে যদিও অনেক অন্তর, কিন্তু তিনি এই মহাকবিদিগের দৃষ্টান্তানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার কাব্যে ইউরোপ ও আসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য্য দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নূতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এই প্রকার অনুকরণ দূষণীয় মনে হইলে মিল্টনের ন্যায় কবিও নিন্দার্হ হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল ইহার দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু-আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুত এই কাব্যটি এশিয়া রূপ জনিতা ও ইউরোপ রূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ। বঙ্গভাষায় এই কাব্যের দোষ গুণ সমালোচনা বঙ্গভাষার একটি প্রধান অভাব। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কয়েক পংক্তি দ্বারা এই অভাব পূরণার্থ যথাকিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভ সৌন্দর্য্যরসপূর্ণ। কবি স্বদেশীয়দিগকে যে অমৃত পরিবেশন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন* ইহা হইতে তাহার পূর্ব্বস্বাদপ্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে রাবণের সভা বর্ণনা অতি সুশোভন। বীরবাহু শোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম করুণ-রসার্দ্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের যে যুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন তাহা বস্তুত বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা কবির স্ব-বাক্যে তাহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না—'ধন্য শিক্ষা তব

* গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কবিবর!' আর্য্য ও সেমিটিক* ভাবগর্ভ পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি কেমন গম্ভীর:

"—নাদিল কম্বু অম্বুরাশি রবে!—"

অনুপ্রাস গুণ এই পংক্তিটির সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা যথোপযুক্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছে এবং অনল্প কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণ যে শ্লেষোক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী—

কেমন স্বভাব-সঙ্গত চরিত্র! কবি যে করুণ রসে বিশেষ সুনিপুণ, রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি তাহার আর এক উদাহরণ—

বরজে শজারু পশি বারুইর যথা—

ইত্যাদি উপমাটি পাইলে হোমরও সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। রাক্ষসগণের রণসজ্জার বর্ণনা দেখিলে কবির প্রগাঢ় বীররসবর্ণনাশক্তি বিলক্ষণ অনুভূত হয়। বারুণীর মুক্তালঙ্কৃত কেশপাশ হোমরকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেয়। মেঘনাদ প্রমোদ উদ্যানের বর্ণনা:

"—কুহরিছে ডালে
......ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর!"—

কয়েকটি অনুপম চিত্রচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া কি সুন্দর হইয়াছে:

"—নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি," ইত্যাদি—

এই হিব্রু চিত্রপূর্ণ রাক্ষস বন্দীদের গান যে কতদূর প্রশংসনীয় বলিতে পারি না।

"বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কণকলঙ্কা জয় জয় রবে।"

এই দুই পংক্তি অত্যুৎকৃষ্ট রচনাশক্তির একটি উদাহরণ। শব্দবিন্যাসের যদি কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হয়, ইহারা সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম সর্গ এইরূপ প্রভূত অলঙ্কাররাজিতে সুসজ্জিত।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যা বর্ণনাটি যারপরনাই মনোহর। অমরবৃন্দের আমোদ-প্রমোদ ইহা অপেক্ষা ন্যূনতর নহে। ইহা পাঠকালে হোমরকে স্মরণ হয়। শিব দুর্গা কামদেব ও রতির উপন্যাসে হোমরোপম সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। কামদেব ও রতি হোমরের হ্রম্বার ও আফ্রোডিটীর অনুরূপ। শিব ও দুর্গার চতুর্দ্দিকস্থ স্বর্ণরঞ্জিত মেঘ এবং পুষ্পমালা পাঠে হোমরের পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি স্মৃতিপথারূঢ় হয়।

* আর্য্য = হিন্দু। সেমিটিক = ইহুদীয়।

"হেন ভাষি যোভ, দুই বাহু পশারিয়া
আলিঙ্গিলেন ধর্ম্মপত্নী,—সর্ব্বদেবমাতা।
যুগল মূরতি ঊর্দ্ধে নিয়ে বসুন্ধরা,
প্রসবে নবীন শষ্প নয়ন-রঞ্জন,
শিশির মুকুতাফলে সজ্জিত কমল,
প্রফুল্ল রজনীগন্ধা, জাফরান দল;
কোমল কুসুমগুচ্ছ হয়ে শয্যাধান,
কঠিন পৃথিবী হতে ব্যবধিল দোঁহে,
বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণমণ্ডিত
সৃজিলা জলদ এক, জ্যোতির্ময় প্রভা,
দরদর ঝরে তাহে শিশিরের ধারা।" হোমর, ১২শ সর্গ,
৩৪৬-৫৭ পং

কামদেব দগ্ধ শরীরে শিবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে রতি তাঁহার প্রতি যে কথা বলেন তাহা দাম্পত্য প্রণয় পূর্ণ। এই সর্গে ঝটিকা বর্ণনা যারপরনাই প্রশংসনীয়। বায়ু কর্ত্তৃক গুহা হইতে ঝঞ্ঝা সকলের উন্মোচন পাঠে ভর্জ্জিলের ইওনসের কথা মনে হয়।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদারচিত্ততা দেখিলে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা চমৎকার।

চতুর্থ সর্গে প্রথমেই বাল্মীকির প্রতি সম্বোধন যথার্থই অতি মনোহর—

"—রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

এবং বাল্মীকির 'রত্নাকর' নামোল্লেখও মনোহর হইয়াছে। এই সর্গে সীতার শোচনীয় দুরবস্থা যেরূপ করুণ রসের সহিত চিত্রিত সেইরূপ ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। তাহার উপযুক্ত রূপ প্রশংসা কি প্রকারে করিব ভাবিয়া পাই না। ইহা যতবার পাঠ করিয়াছি অশ্রুপাত সম্বরণ করিতে পারি নাই। করুণ ও শোক-রস রচনাশক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ। এতভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে বীররসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যে কুঞ্চিকার দ্বারা সহানুভূতির অশ্রুদ্বার উন্মুক্ত করা যায়, প্রকৃতিদেবী তাহা ভারতীয় অনেক কবি অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। পঞ্চবটী বনে স্বামীর সহিত সীতার সুখভোগ বর্ণনায় যেরূপ বন্য সরলতা এবং আনন্দকর বিজনবাস বিবৃত হইয়াছে তাহার প্রশংসা বাক্যাতীত। সীতার এই অবস্থা ও তাঁহার ভাবী দুরবস্থা পরস্পর কেমন বিভিন্ন। এই সমুদায় বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—

"—শুনিয়াছে বীণাধ্বনি, দাস,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে।"

পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে অপ্সরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ বর্ণনা অতি চমৎকার। স্বর্গীয় অপ্সরাগণের সরোবর-স্নান বর্ণনাতে যেরূপ অত্যুজ্জ্বল অপরিমেয় কল্পনা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট ইতালীয় কবিদিগের লেখনী-যোগ্য এবং আরবীয় উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুতভাবে চিত্রিত। প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার সময় মেঘনাদের সম্বোধনটি মাধুরী ও লালিত্যে মিল্টনের ইভের প্রতি আদমের উক্তির সমতুল্য।

ষষ্ঠ স্বর্গে লঙ্কার নাগরিকদিগের প্রবোধন এবং নগরের ক্রমোত্থিত কোলাহল ও ব্যস্ততা অসামান্য কবিত্বের পরিচায়ক। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনা বাক্য-সকল ভয়ঙ্কর হৃদয়ভেদী এবং সম্পূর্ণরূপে অখন্ডনীয়। মেঘনাদের পতনে বিভীষণের বিলাপ অত্যন্ত শোকোদ্দীপক।

সপ্তম সর্গ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরদ্ধ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি পাঠে আমি বিমোহিত হইয়াছি:—

"কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।"

কবির প্রভাত ও সন্ধ্যার বর্ণনা মনোহর। প্রমীলার বক্ষঃস্থ মুক্তামালার সহিত শরৎকালীন মেঘে চন্দ্রের রজতচ্ছটার তুলনা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। এই স্থানের অনেকগুলি উপমা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর উপমার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আমি এই সমালোচনায় রাশি রাশি নিরুপম উপমার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উপমা সঙ্কলন করিয়াছি। রাক্ষসদিগের রণসজ্জা যার পর নাই উৎসাহকর এবং হোমরোপম। যুদ্ধ বর্ণনাও ন্যূন নহে; ইহা পাঠ করিলে হোমরের যে সর্গে গ্রীক ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্বন বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু আমাদিগের কবির দেবগণ প্রকান্ড দেহ ও অসুন্দরাকৃতি হইলেও হোমরের দেবতাদের ন্যায় বালকবৎ সম্ভাষণ ও আচরণ করেন নাই; তিনি বানরদিগের কার্য্য মানব বীরদিগের ন্যায় বর্ণনা করিয়া সভ্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ বর্ণনা অতিশয় করুণ-রসার্দ্র, এবং বাল্মীকি-রচিত তদ্বিষয়ক একটি বর্ণনার অনুরূপ। এই সর্গের নরক বর্ণনা অনেক স্থলে প্রথম শ্রেণীর কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে হোমর ভার্জ্জিল, দান্তে, মিল্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণকারী নহেন। মিল্টন যেরূপ অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন।

নবম সর্গে প্রমীলা তাঁহার মৃত পতির জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা

না করিয়া কবি নিজের বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোক কি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? যে মায়াবী পুরুষের কুহকে সংসারারণ্য তাঁহার নিকট কুসুমোদ্যানবৎ প্রতীত হইতেছিল, তাঁহার বিয়োগে সকলই ঘোরতর শূন্য বোধ হইল; বিলাপ ও অশ্রুপাত এ প্রকার শোকের অতি সামান্য নিদর্শন। এই সর্গে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজীব বর্ণনা অতি শোভন ও হৃদয়গ্রাহী।

দোষ: এক্ষণে কাব্যের দোষ সকলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, ভাবের পরস্পর অনৈক্য। (১) কবি স্বদেশীয় লোকের মনোরঞ্জনার্থ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিল্টনের ক্রাইস্ট্ অপেক্ষা সেটান্ নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত, কিন্তু আমাদের কবিতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে, মিল্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন; আমাদের কবি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইন্দ্রজিতের অন্যায় হত্যা সাধনাতে লক্ষ্মণের প্রতি রামের পশ্চাল্লিখিত উক্তিটি শ্লেষোক্তি-প্রায় বোধ হয়:

"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!" ইত্যাদি।

লক্ষ্মণ কি বাহুবলই প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রজিতকে হত্যা করিয়াছিলেন? ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কবি,—

"—বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ—" ইত্যাদি।

এই উক্তির দ্বারা রাক্ষসদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যের সর্ব্বাংশে কবির মত স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদিত হওয়া উচিত ছিল। (২) কোন কোন স্থলে সরল এবং অসরল বর্ণনা একত্র মিশ্রিত হইয়াছে, যথা ১ম সর্গ ৩২৯-৩৪২ পংক্তি; এবং সপ্তম সর্গ ১৫৮-১৯১ পংক্তি। প্রথমোক্ত স্থলে চিত্রাঙ্গদা ও তাঁহার সহচরী রাক্ষস সুন্দরীগণের মুক্ত কেশ-পাশ ও নিশ্বাস প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝড়ের সহিত তুলনা এবং শেষোক্ত স্থলে রাবণের স্ত্রী-সেনানীগণের দন্তের সহিত তোমর, ভোমর, শূল ইত্যাদির তুলনা এবং অঞ্চলের সহিত পতাকা ইত্যাদির তুলনা দ্বারা উক্ত স্থল সকলের হোমরোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ম্বরের পরস্পরের এ প্রকার সংমিশ্রণ পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) এক স্থানে বিপরীত ভাবোদ্দীপক অভিপ্রায় সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের উপসংহারে কবি,

"—তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়,—"

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শান্তির সুন্দর বর্ণনা করিয়া হঠাৎ,

"আইল ধাইয়া পুনঃ রণক্ষেত্রে শিবা
শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী শকুনি;
পিশাচ।—"

এই বীভৎস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বর্ণনার মাধুর্য্য এককালে নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে কবি পাঠকগণের ভয় ও আশ্চর্য্যভাব উদ্দীপনার্থ লঙ্কাবাসিনী বীর রমণীদিগের রণসজ্জা ও যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বর্ণনায় সে ভাবের ব্যাঘাত হইতেছে।

"অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম ধনুঃ মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম শরে!—"

এই বর্ণনাতে সমুদায় বিষয়টি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েকটি পংক্তি হাস্যকর।

"অধরে ধরি লো মধু, গরলা লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে?
* * * *

দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পনখা পিসী
মাতিল, মদন-মদে পঞ্চবটী বনে";

এরূপ ভাষা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধোজ্জ্বলিত সমরোৎসাহিত বীরাঙ্গনার যোগ্য নহে। বর্ণনার কোন কোন স্থল বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই কাব্যে অতি সাধ্বী রমণীও বিলাসিতার কলঙ্কে দূষিত হইয়াছে। এক স্থলে সীতা লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয় চপল বালিকার ন্যায় হরিণীদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন, এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে 'নাতিনী জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সীতার নম্রতা, অসাধারণ সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের যে চিরন্তন সংস্কার আছে, তাহার সহিত উপরোক্ত বর্ণনার ঐক্য হয় না। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্যে স্বামীর সম্মুখে রমণীগণের নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু আমাদিগের কবি সীতার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল চতুরা রসিকদিগের পক্ষে সম্ভব। অর্দ্ধবাতুল রমণীরাই হরিণীর সঙ্গে নৃত্য করিতে পারে।

—চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!

(৫ম সর্গ ৩৮৭-৮৮ পং)

এই স্থলে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অকস্মাৎ আসিয়া কবি-বর্ণিত নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধতা এক কালে বিনষ্ট করিয়াছে। এটা অমার্জ্জনীয় দোষ। নিশ্চয়ই মিল্টন কখনও এইরূপ লিখিতেন না। শেষ সর্গে:

"বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে"

(নবম সর্গ—২৯৫ পংক্তি)

এই হাস্যকর পংক্তিটি আমাদের অতি-প্রাচীন সাম্প্রদায়িক এবং প্রাচীন পদার্থের পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগেরও প্রীতিপদ হইবে না। এইরূপ বর্ণনা মহাকাব্যের অনুপযোগী। বিশেষত যে প্রকার উন্নত ও মহদ্ভাবপূর্ণ কবিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। (৪) এই প্রসঙ্গে হিন্দুভাব বিরুদ্ধ কতগুলি বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সজ্জা প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার-সঙ্গত নহে। ইহাতে ইউরোপীয় সামরিক সজ্জা, বর্তমান বঙ্গীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সজ্জা এবং সহমরণ ক্রিয়া সজ্জা একত্র বিমিশ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ণনার অতি-দীর্ঘতা। এই দোষের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে। নরক বর্ণনায় এই দোষটি উপলক্ষিত হয়। নরক রাজ্যে ভ্রমণ গ্রীস রোম ও ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কবিদিগের একটি প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়। আমাদিগের কবির পক্ষেও তাহা অল্প প্রলোভনকর নহে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহাকে তিনি অতিরিক্ত স্থান দান করিয়াছেন। বর্ণনাটি কাব্যের পরিমাণাধিক। বস্তুত মেঘনাদবধ কাব্যের অবয়বোচিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, নীতিগর্ভ মহাকাব্যের অভাব। মেঘনাদে এমন নীতিগর্ভ মহাবাক্য অল্প আছে যে, তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহার সকলগুলি ঠিক দোষ নাও হইতে পারে। যাহা হউক উল্লিখিত দোষ সত্ত্বেও 'মেঘনাদবধ' বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু দোষ ধরিলে 'প্যারাডাইস লস্ট্' কাব্যেও তাহা অল্প নাই। গোল্ডস্মিথ বলেন, 'লেখকের গুণের আধিক্য স্থায়ী কীর্তির যেমন নিদান, দোষের অল্পতা সেইরূপ নহে। আমাদের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থসকলও দোষগুণ উভয়েরই আশ্রয়, তাহাতে যেমন বিলক্ষণ গুণ আছে, তেমনি বিলক্ষণ দোষও আছে। "মেঘনাদবধ কাব্যে" নায়ক মেঘের আড়ালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় যেমন বীর রস পরিপূর্ণ হইতেন, কাব্যটিও সেইরূপ স্থানে স্থানে বীররস পরিপূর্ণ এবং সময়ান্তরে তিনি তাঁহার প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার জন্য যেরূপ কোমল স্বর ধারণ

করিতেন, কাব্যটিও স্থানে স্থানে সেইরূপ কোমল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে এত অল্প কালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিয়ড ও মিল্টনের প্যাঁরাডাইস লস্টের ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণ রসে বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাংলা কাব্য প্রচারিত হইবে? ফলতঃ সময় মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, কিন্তু মানুষই সময়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। কাল মানুষকে উচ্চ করিয়া তুলে না। মনুষ্য কালকে উচ্চ করিয়া তুলে। আমাদিগের কবি বঙ্গ ভাষাতে নূতন কবিতা রচনাপ্রণালী ও অনেক নূতন শব্দ ও নূতন প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অথচ অতি অল্প স্থলে তাহার কষ্ট-কবিত্ব দোষ উপলক্ষিত হয়। তাহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনাপ্রণালী 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল, মসৃণ, তরল ও শ্রুতি-সুখকর। ইহার শব্দবিন্যাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত ও সুসংহত। আমরা যখনই ইহা পাঠ করি, তখনই ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকারর এবং তাঁহার সমালোচক উভয়ই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে। অসাধারণ প্রতিভার কি রমণীয়—কি অক্ষয় প্রভাব। কত বংশপরম্পররা গত হইবে, তথাপি আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের যে সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, লোকে সেই সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিবে; তুরীধ্বনির ন্যায় যে সকল ভাব বীরভাব উদ্দীপন করিয়া আমাদিগের হৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছে, তাহাদিগেরও করিবে; এবং যে সকল স্থান আমাদের অন্তঃকরণকে প্রীতি ও কোমলতায় বিচলিত করিতেছে তাহাদিগকেও তাহা সেইরূপ করিবে। আমাদিগের জাতীয় মানসিক প্রকৃতি সংগঠন পক্ষে 'মেঘনাদ বধ' যথেষ্ট সাহায্য করিবে। শাসনকর্তা বা বীরের ন্যায় কবির জয় সাড়ম্বর নয় বটে, কিন্তু তাহা সুনিশ্চয় ও সুদূরব্যাপ্ত। কবির ভাবসকল স্বজাতির মনোহর বৃত্তির উপাদান হয়, এবং জাতীয় শিক্ষা ও মহত্ত্ব সাধনের পক্ষে প্রভূত সহকারিতা করিয়া থাকে।*

* এই সমালোচনা ৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'বিবিধ প্রবন্ধের' প্রথম খন্ডে ১২৮৯ সালে (১৮৮২ খ্রী) প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি 'মেঘনাদ বধ' প্রকাশিত হবার অব্যবহিত কবিকে ইংরাজীতে লিখে পত্রাকারে পাঠান হয়। যখন মেঘনাদ বধ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই প্রস্তাবটি লিখিত হয়েছিল। তাতে যে মত প্রকাশিত হয়েছে তার পরে অল্প পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছিল।—মধুস্মৃতি (২য় সংস্করণ, ১৩৬১). নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃঃ ১৪৪। মধুস্মৃতি-তে নগেন্দ্রনাথ সোম ৺রাজনারায়ণ বসুকে 'মেঘনাদ বধ'-এর প্রথম

সে কাল আর এ কাল

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ও আমি, আমরা দুই জনে তত্ত্ববোধিনী সভায় কার্য্য করিতাম, ইহা ১৭৯৪ শকের ফাল্গুন মাসে হঠাৎ একদিন মনে পড়িল। বোধ হইল, আমরা যেন সেই প্রকাণ্ড ডেস্কের সম্মুখে এখনও দুই জনে কার্য্য করিতেছি। এইরূপ পূর্ব্বকার বন্ধুতার ব্যাপার হঠাৎ স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়াতে অক্ষয়বাবুর সন্দর্শন জন্য মন ব্যাকুল হইল। তৎপরে একদিন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত বালীতে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাক্ষাতের সময় নানাবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। অক্ষয়বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমি ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ইংরাজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকলল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই, আমি যে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি, পূর্ব্বে আমার এইরূপ মানস ছিল। অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবিত বিষয় আর এই বিষয়টি প্রায় সমান। পূর্ব্বে মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা থাকাতে সহসা অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তৎপরে জাতীয় সভায় ঐ শকের ১১ চৈত্র দিবসে সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া একটি বক্তৃতা করি। আমার প্রিয় বন্ধু ও ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ঐ বক্তৃতার নোট্ লিখিয়াছিলেন। সেই সকল নোট হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উৎপত্তি হয়। প্রবন্ধটি লিখিয়া অক্ষয়বাবুকে দেখান হইয়াছিল। তিনি যে সকল স্থান পরিবর্ত্তন অথবা যে সকল স্থানে নূতন বিষয় সংযোগ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ স্থানে তাহা করিয়া দিয়াছি। এই প্রবন্ধ রচনাতে আমার বর্ত্তমান অপটু শরীরে যত দূর পরিশ্রম করিতে পারি, তাহা করিতে ত্রুটি করি নাই; এক্ষণে যাঁহার প্রস্তাবে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে, তিনি স্নেহের, এবং সাধারণবর্গ অনুগ্রহের কোমল করপল্লবে ইহা গ্রহণ করিলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ইতি।

কলিকাতা,—মির্জাপুর :
২২এ আশ্বিন, ১৭৯৬ শক। — শ্রীরাজনারায়ণ বসু

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকের দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কণ সময়ে ইহার পরিবর্দ্ধন কার্য্যে মধুর তুলসীদাসী রামায়ণের মধুর অনুবাদক বান্ধববর সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় সে কাল সম্বন্ধীয় কতকগুলি সম্বাদ

আমাকে দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি যে সকল সম্বাদ দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ নোটের আকারে পুস্তকের পত্র-নিম্নে প্রকাশিত হইল, যে সকল সম্বাদ মূলে গৃহীত হইয়াছে, তাহা এই [ ] চিহ্নর মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে ইতি।

কলিকাতা : শ্রীরাজনারায়ণ বসু

২২এ চৈত্র, ১৮০০ শক।

সে কাল আর এ কাল

কিছু দিন হইল, আমি এই জাতীয় সভায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। অদ্য "সে কাল আর এ কাল" এ বিষয়ে কিছু বলিবার মানস করি। "সে কাল আর এ কাল" এই নামটিই কৌতুকজনক। বস্তুতঃ আমি আপনাদিগের সহিত কৌতুক ও আমোদ করিব বলিয়াই অদ্য এখানে আগমন করিয়াছি। যেমন সমস্ত দিবস কঠিন পরিশ্রম করিয়া, লোকে সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করে, তদ্রূপ আমি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার নিমিত্ত শাস্ত্রান্বেষণ প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রম করিয়া, আপনাদের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিবার জন্য অদ্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি। কিন্তু ভরসা করি, অদ্যকার বক্তৃতা কেবল আমোদজনক হইবে এমন নহে, ইহাতে উপকারও লাভ হইতে পারিবে। কৌতুকচ্ছলে কতকগুলি হিতকর বাক্য বলা আমার অদ্যকার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য।

অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় "সে কাল আর এ কাল।" ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকালেজ এ মহানগরে সংস্থাপিত হয়। ১৮৩০ সালে ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ফল ফলে। ঐ বৎসরে কতকগুলি যুবক ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা সেই সময়ে ইউরোপীয় বিদ্যার আলোক লাভ করিয়া সমাজসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সময়ে একটি নূতন ভাব হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে সময় তাহা "সে কাল" এবং তাহার পরের কাল "এ কাল" শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।

প্রথমতঃ আমি সে কালের সংক্ষেপ বিবরণ বর্ণনা করিব ও তৎপরে এ কালের সংক্ষেপ বিবরণ বলিব। এ কালের বিবরণের সময় সে কালের সঙ্গে তুলনায় এ কালে কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে, আর কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত অবনতি হইতেছে, তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

কোন কাল বর্ণনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই কালের প্রধান প্রধান শ্রেণীর লোকের চিত্র প্রদর্শন করিয়া, সেই কালের লোকেরা সাধারণতঃ দৈনিক জীবন কিরূপে যাপন করিতেন ও জীবনের প্রধান কার্য্য—যথা, ধর্ম্মসাধন, বিষয়কার্য্য সম্পাদন ও আমোদ সম্ভোগ—কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা বর্ণন করিলে সেই কালের

প্রকৃত ছবি মনে প্রতিভাত হইতে পারে। আমি সে কালের এই রূপ বর্ণনা করিয়া পরে বর্ত্তমান কাল বর্ণনা করিব। যে সকল আচার ব্যবহার ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে অথচ এখনও কিছু কিছু আছে, তাহা সে কালের আচার ব্যবহার বলিয়া গণ্য করিব।

সে কালের বিষয় বলিতে হইলে সে কালের সাহেবদের বিষয় অগ্রে বলিতে হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে গিয়া সাহেবদের কথা প্রথমে বলা হয় কেন? তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সাহেবেরা আমাদিগের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাহেবদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা জন্য, সে কালের সাহেবরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সে কালের বাঙ্গালীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা না জানিলে সে কালের বাঙ্গালীদের অবস্থা ভাল জানা যাইতে পারে না, অতএব সে কালের সাহেবদিগের বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। সাহেবেরা আমাদিগের রাজা। রাজার সম্মান অগ্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সে কালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন। তাহার এক কারণ এই, তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। যাঁহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন; সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা আত্মীয়তা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্নকালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আলবোলা ফুঁক্‌তেন, বাইনাচ দিতেন ও হুলি খেল্‌তেন।* ষ্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রামশিলা ছিল। তিনি প্রত্যহ পূজারি ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহার পূজা করাইতেন।† বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম কোম্পানির পূজা হইয়া, তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে

* এখানে যে বর্ণনা করা গেল, তাহা ইংরাজী আমলেব প্রথম সময়ের প্রতি খাটে।

† বহু কাল হইল, একজন সম্ভ্রান্ত সৈনিক সাহেব যোগীদিগেব অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া স্বয়ং যোগী হইযাছিলেন। ইনি পঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অনেক দিন কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন। এ কালেও গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সে কালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সে কাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের আর এ দেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই, সেরূপ মমতা নাই। অবশ্য অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন, যাঁহারা এই কথার ব্যভিচারস্থল স্বরূপ। কিন্তু আমি যেরূপ বর্ণনা করিলাম এইরূপ সাহেবই অধিক। পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ মহাপুরুষেরা এখানে আসিয়া এদেশের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এদেশীয়দের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন উদ্ভট কবিতাকার, হিন্দুদিগের প্রাতঃস্মরণীয় স্ত্রীলোকদিগের নাম যে শ্লোকে উল্লেখিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে সে কালের কতিপয় ইংরাজ মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আদর্শ ও নকল দুইটি শ্লোকই নিম্নে লিখিত হইল।

আদর্শ।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং।।

নকল।

হেয়ার্ কম্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং।

এই সকল মহাপুরুষদিগের বিষয় মহাশয়েরা অনেকেই অবগত আছেন। ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ীর ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কট্‌লণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার-স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দুকালেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। আমি এক জন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। কম্বিন্

সাহেব এই কলিকাতা নগরের এক জন প্রধান সওদাগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি সিপাইদের বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি দয়াশীল ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্দেশীয়দের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ছিল। জন পামরকে লোকে "Prince of Merchants" অর্থাৎ সওদাগরদের রাজা বলিয়া ডাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গোরের উপরে "Here lies John Palmer, friend of the poor," "এখানে দরিদ্র-জন-বন্ধু জন পামর আছেন," কেবল এই বাক্যটি লিখিত হইয়াছিল। কেরি ও মার্শমেন সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে বাস করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠশালার সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে বঙ্গদেশের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সে কালের এই সকল মহদন্তঃকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

অতঃপর সে কালের বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সে কালের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদিগের বর্ণনা করিতে গেলে আমাদের দৃষ্টি গুরু মহাশয়ের উপর প্রথম পতিত হয়। গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রদিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল। নাড়ুগোপাল অর্থাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার নির্দ্দয় দণ্ড প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তালপাতে; তার পর পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলার পাতে; তার পর কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে, সামান্য পত্র লিখিতে ও গুরু-দক্ষিণা ও দাতাকর্ণ নামক পুস্তক পড়িতে সমর্থ করা, গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল। গুরু মহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন। আমার স্মরণ হয়, আমি যখন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ করিতাম, তখন রামনারায়ণ নামে আমার একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি কোন দোষ করিলে, গুরু মহাশয় যখন রামনারায়ণ! বলিয়া ডাকিতেন, তখন তাঁহার ভয়সূচক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত!

গুরু মহাশয়ের পর আখন্‌জীর বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। আখন্‌জী অতি অদ্ভুত পদার্থ ছিলেন। মনে করুন হিন্দুর বাটীর একটি ঘরে মুসলমানের বাসা। তিনি তথায় বৃহদাকার বদনা ও স্তূপাকার পেঁয়াজ লইয়া বসিয়া আছেন। সাগরেদ্‌রা নিয়ত বশবর্ত্তী। চাকর দ্বারা জল আনয়ন কার্য্য করিয়া লওয়া আখন্‌জীর মনঃপূত হইত না। তাঁহার সাগরেদ্‌দিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত। তখন পারশী পড়ার বড় ধুম। তখন পারশী পড়াই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত।

এই পারশী ভাষা সকল আদালতে চলিত ছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ব্যবহার আদালতে রহিত হয়। পন্দনামা, গোলেস্তা, বোস্তা, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি পুস্তক সাধারণ পাঠ্য পুস্তক ছিল। কেহ কেহ আরবী ব্যাকরণ একটু একটু পাঠ করিতেন। আখন্‌জীরা পারশীর উচ্চারণ অতি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

[এইখানে বক্তা হাফেজের একটি কবিতা আখন্‌জীদিগের মত প্রথম উচ্চারণ করিয়া, পরে তাহার প্রকৃত ইরাণী উচ্চারণ শ্রোতাদিগকে শুনাইলেন। সে কবিতার অর্থ এই ''যদি সেই শিরাজের প্রণয়িনী আমার উপহারদত্ত চিত্ত তাঁহার হস্তে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখের একটি মাত্র কৃষ্ণবর্ণ তিলের জন্য আমি সমর্কন্দ ও বোখারা নগরদ্বয় প্রদান করিতে পারি।'']

অতঃপর সে কালের ভট্টাচার্য্যগণ আমাদিগের বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। তখনকার ভট্টাচার্য্যগণ অতি সরলস্বভাব ছিলেন। এখনকার ভট্টাচার্য্যগণ যেমন বিষয়বুদ্ধিতে বিষয়ী লোকের ঘাড়ে যান, সে কালের ভট্টাচার্য্যেরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ়রূপে জানিতেন এবং অতি সরল ও সদাশয় ছিলেন। সে কালের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী রামনাথ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের নিকটস্থ একটি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি রাজসভাবিচরণকারী চাটুকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় সভ্যতার নিয়ম পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্য লোকে তাঁহাকে বুনো রামনাথ বলিয়া ডাকিত। এক দিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অমাত্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কি প্রয়োজন তাহা জানিতে হইবে, এজন্য ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মহাশয়ের কিছু অনুপপত্তি আছে?'' এখন, ন্যায়শাস্ত্রে অনুপপত্তির অর্থ, যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় না। ভট্টাচার্য্য তাহাই বুঝিয়া লইলেন এবং বলিলেন, ''কৈ না, আমার কিছুই অনুপপত্তি নাই।'' রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মহাশয়ের কিছু অসঙ্গতি আছে?'' এখন অসঙ্গতি শব্দের ন্যায়শাস্ত্রোল্লিখিত অর্থ অসমন্বয়। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, ''না, কিছুই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।'' রাজা দেখিলেন, মহা মুষ্কিল। তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনটন আছে?'' ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, ''না, কিছুই অনটন নাই; আমার কয়েক বিঘা ভূমি আছে, তাহাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়, আর সম্মুখে এই তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহার পত্র আমার গৃহিণী দিব্য পাক করেন, অতি সুন্দর লাগে, আমি সচ্ছন্দে তাহা দিয়া অন্ন আহার করি।'' আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, এমন সরল সাধু সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে লোকে বুনো বলিত। ইনি যদি বুনো, তবে সভ্য কে? আর এক ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ডাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেলেন। এ দিকে ডাইল

উথলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, বিষম বিপদ্। ডাইল উথলিয়া পড়া কি প্রকারে নিবারণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হাতে পইতা জড়াইয়া পতনোম্মুখ ডাইলের অব্যবহিত উপরিস্থ শূন্যে তাহা স্থাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহা নিবারিত হইল না। এমন সময় তাহার ব্রাহ্মণী পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলেন। তিনি কহিলেন, "এ কি? ইহাতে একটু তেল ফেলিয়া দিতে পারে নাই?" এই বলিয়া তিনি ডাইলে একটু তেল ফেলিয়া দিলেন। ডাইলের উথলিয়া পড়া নিবারিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্য গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, " তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা বল; অবশ্য কোন দেবী হইবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রকারে সাধন করিতে পারিলে?" যদ্যপি এই গল্পে বাহুল্য বর্ণনার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উহা যে, সে কালের ভট্টাচার্য্যদিগের অসামান্য সারল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভট্টাচার্য্যদিগের অবৈষয়িকতার আর একটি সুন্দর গল্প আছে। এক জন ভট্টাচার্য্য পুথি পড়িতেছিলেন; পড়িতে পড়িতে অনেক রাত্রি হইলে তাঁহার তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি টীকা লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। দেখিলেন দূরে একটা পাঁজা পুড়িতেছে। তিনি আস্তে আস্তে সেই স্থানে টীকা ধরাইতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘরে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অতঃপর সে কালের রাজকর্ম্মচারীদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এক এক জন আমলার উপর অনেক কর্ম্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক এক জন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরের এক জন দেওয়ানের কথা এইরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, নগরের সমুদয় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার করিত। তখন ঐ সকল পদ এক প্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। এক জন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত।* শুনা আছে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ-বৎসর-বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া

* এই প্রথার জের এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্য্যন্ত টানিয়াছিল। অনেকে অবগত আছেন বাবু রামকমল সেন মহাশয়ের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে তাঁহার তিন পুত্র হরি বাবু, প্যারীবাবু ও বংশী বাবু টেঁকশালের দেওয়ান হইয়াছিলেন। বংশীবাবুর পর হরিবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুবাবু দেওয়ান হন, যদুবাবু জয়পুরে যাত্রা করিলে পরিশেষে বিখ্যাত কেশব বাবু পর্য্যন্ত কিছু দিন উক্ত দেওয়ানী কার্য্য করেন।

দেওয়ানী করিতে গেলেন। সাহেবেরা তাঁহাদিগের দেওয়ানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুদ্ধ বাঙ্গালীরা যে উৎকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উৎকোচ লইতেন। এখন সেরূপ নাই। এ বিষয়ে অবশ্যই উন্নতি দেখিতেছি। এই বিষয়ে পরে আরো বলিব।

পরিশেষে সে কালের ধনী লোকদিগের বর্ণনা করা হইতেছে। ইঁহারা অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। পুষ্করিণী খননাদি পূর্ত্তকর্ম্মে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে বিলক্ষণ দান করিতেন। তাঁহারা অতিথি-সেবায় তৎপর ছিলেন। তাঁহারা গুণী লোকদিগকে বিলক্ষণরূপে পালন করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গায়কদিগকে বিশিষ্ট অর্থানুকূল্য করিতেন। কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের দানশীলতা প্রযোজিত হইত না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অত্যন্ত বদান্য ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সে কালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে ইঁহারা সাধারণতঃ দৈনিক জীবন কি প্রকারে যাপন করিতেন ও জীবনের প্রধান কার্য্য সকল অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান, বিষয়কর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদ কিরূপে করিতেন, তদ্বিষয় বলিলেই সে কালের চিত্র সম্পূর্ণ হয়।

সে কালের রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত অপর সাধারণ লোকে কিরূপে দৈনিক জীবনযাপন করিতেন, তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে। জীবনোপায়ের সুলভতা প্রযুক্ত তাঁহারা দলাদলি, ক্রীড়া কৌতুক ও কথকতা শ্রবণে কালযাপন করিতেন। কথকতা অতি শ্রবণযোগ্য ব্যাপার। ভাল ভাল কথকের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা গিয়াছে। বড় বড় তাঁত কাটা এজুকে* রামধন ও শ্রীধর কথকের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছে। ইউরোপে স্কুলে বাগ্মিতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে কথকতা শিখিলেই বাগ্মিতা শিখা হইত। কথকতা প্রকৃত বাগ্মিতার কার্য্য। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কথকতার ক্রমে লোপ হইতেছে। কথকতা রীতি স্থিরতর থাকিয়া তাহার বিষয় ও প্রণালীতে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণে সে কালের লোকেরা জীবনের প্রধান কার্য্য সকল অর্থাৎ তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান, বিষয়কর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদ কিরূপে করিতেন, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

সে কালের লোকদিগের ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা দৃষ্ট হইত। তাঁহারা যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, তদনুরূপ কার্য্য করিতেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম সকল যত্নপূর্ব্বক

* "এজু" শব্দ ইংরাজী "Educated" শব্দের অপভ্রংশ।

* গত পূজার সময় (এই বক্তৃতা করিবার সাত মাস পরে) এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, "Prime York hams in canvas just in time for the Poojah."

পালন করিতেন—প্রাণপণে পালন করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম না ভঙ্গ হয়, এ বিষয়ে তাঁহারা বড় সাবধান ছিলেন। রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পূজার সময় সাহেবদিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন বলিয়া অন্যান্য হিন্দুগণ তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে কালে ধর্ম্মবিষয়ে, ভিতরে একখান বাহিরে একখান, এরূপ ছিল না। এক্ষণে যেমন দালানে পূজা হইতেছে, বৈঠকখানায় মদ্যপান ও উইলসনের দোকানের খানা চলিতেছে, অন্তরে দেব দেবীতে বিশ্বাস নাই, কিন্তু সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বাহ্য ঠাট বজায় রাখিতে হইবে, সে কালে এবম্ভূত ব্যাপার দৃষ্ট হইত না।*

সে কালের বিষয়ী লোকেরা কিরূপ বিষয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, তাহা সে কালের বিষয়ী লোকদিগের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক করে না।

এক্ষণে সে কালের আমোদ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি সে কালের প্রধান আমোদ ছিল। তাহার মধ্যে কবি প্রধান। হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু নর্সিং, রাম বসু, ভবানী বেণে, ইঁহাদিগের কবিতা সর্ব্বত্র বড় আদরের বস্তু ছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বহু যত্নে ইঁহাদের অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি নিতে বৈষ্ণব অর্থাৎ নিতাইদাস বৈরাগী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"ধনী লোক মাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রেই নিতাই দাসকে বায়না দিতেন; ইঁহার সহিত ভবানী বেণের সঙ্গীতযুদ্ধ ভাল হইত। যথা— প্রচলিত কথা— 'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই'। এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নিতে ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত। যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্যভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত। তৎকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল, কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক্ এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানরূপে গণ্য ছিল। এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাশডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতায়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃতসর্ব্বস্ব হইতেন, এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার নিদ্রা রহিত হইত। কত স্থানে কত বার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে 'নিত্যানন্দ প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইঁহার গাহনার প্রাক্কালে প্রভু উঠেছেন বলিয়াই গোঁড়ারা ঢলঢল হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।"

কবিওয়ালাদিগের এক একটি কবিতা এমন যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। হরু ঠাকুরের একটি কবিতাতে এইরূপ উক্তি দেখা যায়—

"নাম প্রেম তার, সাকার নহে, বস্তুটি সে নিরাকার,
জীবন, যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ বশীভূত তার।
সুখে লোক বলয়ে পিরিতি সুখের সার;
প্রাণের বাহিরও হয় সে যখন জীবনে যেন মরে রই॥"

কি চমৎকার ভাব! ইহা প্লেটো অথবা কোল্‌রিজের উপযুক্ত! কোল্‌রিজ্ এক স্থানে বলিয়াছেন—

"All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame
Are all but ministers of love
And feed his sacred flame."

হরু ঠাকুরের কবিতাটি ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না। হরু ঠাকুরের অপর একটি গীতি আছে—

"প্রেম কি যাচ্‌লে মিলে, খুজিলে মিলে?
সে আপনি উদয় হয়, শুভ যোগ পেলে।"

হরু ঠাকুরের কবিতামধ্যে আছে—

"আমি ত পাষাণ হয়ে
ছিলাম তোমারে ভুলে
প্রেমসাধ ত্যজিয়ে
তুমি কেন আসি, প্রাণ! পুন দর্শন দিলে।"

রাম বসু এক স্থানে কোন সাধ্বী স্ত্রীর বিরহযন্ত্রণা বর্ণনা করিয়াছেন—

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি,
আর বলা হলো না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তারে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারীজন্ম যেন করে না।
একে আমার এই যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এলো,
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,

সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নজলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না॥"

কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মনোহর চিত্র! রাম বসু কোন স্ত্রীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"বসন্তে শুধাও সখি নাথের মঙ্গল কি?
কাল আসিব বলে নাথ করেছে গমন,
ভাগ্যদোষে যদি, সে হল মিথ্যাবাদী, চারা কি এখন?
পতি গতি মুক্তি অবলার, সুখ মোক্ষ সে গো আমার,
তাহার কুশল শুনে কুশলে কুল রাখি।"

রাম বসু অন্য এক স্থানে লম্পট স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"প্রাণ! তুমি আপনার নহ, আমার কি হবে!"

এই সামান্য বাক্যে কি গভীর মানব-স্বভাব-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে! নিতাই দাস বৈরাগী এক স্থানে বলিয়াছেন—

"বিধি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
এ তিন অক্ষর, করিল সংযোগ
রসিকের সুখ আশ্রয়।"

সে তিন অক্ষর পি, রি, তি। যে ব্যক্তি এই কবিতাটি উক্ত করিয়াছেন, তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের মহত্ত্ব ও দেবভাব অবশ্যই পরিজ্ঞাত ছিলেন। এ কবিতাটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহে নাই; কোন লোকের মুখে পাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে কবিতাওয়ালারা উচ্চ দার্শনিক ভাবেও আরোহণ করিতেন। গোঁজ্লা গুঁই নামে এক জন কবিওয়ালা স্বামীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ, প্রাণ! তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।"

কবিওয়ালারা কেবল আমোদজনক কবিতা গান করিতেন, এমন নহে, কবি গাইবার সময় পরমার্থভাবপূরিত সঙ্গীতও গাইতেন। হরু ঠাকুরের রচিত এইরূপ একটি গান আছে—

"হরিনাম লইতে অলস করো না রসনা, যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি দেখে লা ডুবাবে।"

পাঠান্তর—

"ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি দেখে লা ডুবাবে।"

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"কি মনোহর! কি মোহহর! কি মোহকর! শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন মাত্রেই অশ্রুপতন ও রোমাঞ্চ হইতে থাকে। অতি মূঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবালবৃদ্ধবনিতামাত্রেই মুগ্ধ হইতে থাকেন। সকলেরই অন্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়, সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করে; মনের সমুদয় মোহ বিকার হরণপূর্ব্বক ভাব ভক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবে মরণ-হরণ-চরণ-স্মরণ করিতে থাকে। যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় ঐ নামসংকীর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কি ইতর, কি ভদ্র, তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কি এক নিগূঢ় মধুরত্ব আছে, তাহা আমি বচনে ব্যক্ত করণে অশক্ত হইলাম।" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই কথা অতি যথার্থ।

এই সকল কবিওয়ালারা তখনকার বিশেষ প্রতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন অদ্ভুত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার নাম আণ্টুনি ফিরিঙ্গী। এক জন ফিরিঙ্গী হিন্দু-কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এই আশ্চর্য্য! শুনা গিয়াছে, আণ্টুনি ফরাশ-ডাঙ্গার এক জন সম্ভ্রান্ত ফরাশিসের পুত্র। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাশডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া এক জন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন।* তিনি দুর্গার প্রতি উক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে, মাতঙ্গি!
ভজন সাধন জানি না, মা! জেতেতে ফিরিঙ্গী।"

* আণ্টুনি সাহেব গরীটির বাগানে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমার কোন আত্মীয় বলেন "আণ্টুনি সাহেবের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। উহা ফরাশডাঙ্গার সন্নিকট গরীটির বাগানে ছিল। রেলরোড হইবার পূর্ব্বে বাটী যাইবার সময়ে আমাদিগের নৌকা সর্ব্বদাই গরীটির বাগানের নীচে দিয়া যাইত। সুতরাং আণ্টুনি সাহেবের ভগ্ন বাটী সর্ব্বদা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত। কিছু দিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যুদলের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

পুনরায়—

"আণ্টুনি ফিরিঙ্গী বলে, নিদানকালে মা,
দিও চরণ দুখানি দিও চরণ দুখানি।"*

যখন বঙ্গসমাজ এইরূপে চলিতেছিল, তখন ইহা পরিবর্ত্তন করিতে এক ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি কে, না, স্কুলমাষ্টর। প্রথমে তাঁহার বেশভূষা অদ্ভুত, ইংরাজী উচ্চারণ কদাকার, শিক্ষাপ্রণালী অপকৃষ্ট ছিল। রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে এক জন ইংরাজী পড়াইতেন। তিনি যখন পড়াইতে আসিতেন, তখন জরির জুতা ও মতির মালা পরিয়া আসিতেন। এখন একবার মনে করে দেখুন দেখি, প্রেসিডেন্সি কালেজের এক জন বাঙ্গালী অধ্যাপক মতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায় দিয়া বসিয়া পড়াইতেছেন, কি চমৎকার বোধ হয়! সর্ব্বপ্রথমে লোকের ইংরাজী পড়িতে হইলে, টামস্ ডিস্ প্রণীত স্পেলিং বুক, স্কুলমাষ্টর, কামরূপা ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। "স্কুলমাষ্টর" পুস্তকে সকলই ছিল, গ্রামার, স্পেলিং ও রীডর। কামরূপাতে এক রাজপুত্রের গল্প লিখিত ছিল। তুতিনামা ঐ নামের পারসিক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ। কেহ যদি অত্যন্ত অধিক পড়িতেন, লোকে মনে করিত, তাঁহার মত বিদ্বান্ আর কেহ নাই। Grammar, Logic ও Rhetoric অর্থাৎ ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিন বিষয়ে তখন কতকগুলি উত্তম পুস্তক রচিত হইয়াছিল। তাহাদের নাম Port Royal Grammar, Port Royal Logic ইত্যাদি। লোকে বলিত "রয়েল গ্রামার ময়াল সাপ;" যেমন ময়াল সাপ বৃহৎ সাপ, তেমনি রয়েল গ্রামার পড়া অনেক বিদ্যার কর্ম্ম। তখন স্পেলিংএর প্রতি লোকের বড় মনোযোগ ছিল। বিবাহসভায় এই বিষয়ে বড় পীড়াপীড়ি হইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do you spell Nebuchadnezzar? কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do you spell Xerxes? ঐ সকল শব্দ ও Xenophon, Kamschatka প্রভৃতি শব্দের বানান জিজ্ঞাসা দ্বারা লোকের বিদ্যার পরীক্ষা হইত।

* আণ্টুনি ফিরিঙ্গীর এক জন বিপক্ষ কবিওয়ালার গীতেব কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:—

"আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কফন্ চোর।
ভাঙ্গে রাত হোলে সব মৌত গোর॥
টাট্‌কা গোরে হট্‌কা ভূতের রব, এ কি সম্ভব,
এ হম্‌কি দিয়ে বস্ত লোটে সব;
এর ঠায় ঠিকানা গেল জানা;
মাসুর হলো তিন সহর॥" হ, মো, সে।

আর এক জন বিপক্ষ কবিওয়ালা আণ্টনির দুর্গার নিকট প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন।

"ঈশুখ্রীষ্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে।
তুই জাতফিরিঙ্গী জবভুজঙ্গি পারবি না ক তরিতে" গ্রন্থকর্ত্তা।

তখন ঐরূপ সভায় ইংরাজীওয়ালারা পরস্পর এই বলিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, "What denomination put your papa?" তখন শব্দের অর্থ মুখস্থ করিবার বিবিধ প্রণালী ছিল। যথা—
(এক একটি শব্দের এক একটি অর্থ)।

গাড (God) ঈশ্বর।
লাড (Lord) ঈশ্বর।
কম্ (Come) আইস।
গো (Go) যাও।
আই (I) আমি।
ইউ (You) তুমি। ইত্যাদি।

এক একটি ইংরাজী শব্দের কতকগুলি অর্থও একেবারে সাধিতে হইত। যথা; Well—আচ্ছা, ভাল, পাতকো; Bear—সহ, বহ, ভল্লুক। সে কালের লোকেরা যাহার উচ্চারণ সমান মনে করিতেন, এমন কতকগুলি ইংরাজী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ একবারে অভ্যাস করিতেন। যথা—ফ্লোর (Flower) ফুল; ফ্লোর (Flour) ময়দা, ফ্লোর (Floor) মেজে। তাঁহারা "Flower" "Flour" ও "Floor" এই তিন শব্দ এক রকম উচ্চারণ করিতেন। তখন লোকে ডিক্ষনরি মুখস্থ করিত। তাঁহারা এক এক জনে Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন। মনে করুন, ডিক্ষনরি মুখস্থ করা কি বিষম ব্যাপার! তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোন দ্রব্যশ্রেণীর অন্তগর্ত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্থ বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন, স্কুলমাষ্টর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘোষাব? গ্যার্ডেন্ (Garden) ঘোষাব, না স্পাইস্ (Spice) ঘোষাব?" ইহার অর্থ, উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব, না সকল মশলার নাম মুখস্থ বলাব? যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন্ ঘোষাও, তবে সর্দ্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলিল, " পম্‌কিন্ (Pumpkin) লাউ কুম্‌ড়ো;" অমনি আর সকলে বলিয়া উঠিল, "পম্‌কিন্—লাউ কুম্‌ড়ো।"—সর্দ্দার পোড়ো বলিল, "কোকোম্বর (Cucumber) শসা;" আর সকলে অমনি বলিল, "কোকোম্বর শসা।" সর্দ্দার পোড়ো বলিল, "ব্রিঞ্জেল (Brinjal) বার্ত্তাকু;" আর সকলে অমনি বলিল, "ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু।" সর্দ্দার পোড়ো বলিল, "প্লোম্যান (Ploughman) চাসা;" আর সকলে অমনি বলিল, "প্লোম্যান চাসা।" এই সকল শব্দগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়।—

পম্‌কিন্ লাউ কুম্‌ড়া, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল্ বার্ত্তাকু, প্লোমেন্ চাসা॥

কখন কখন সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ বসান হইত। যথা—

খাম্বাজ রাগিণী,—তাল ঠুংরি।

নাই (Nigh) কাছে, নিয়র (Near) কাছে, নিয়রেষ্ট (Nearest) অতি কাছে।

কট্ (Cut) কাট্, কট্ (Cot) খাট্, ফলোয়িং (Following) পাছে।

এ ছাড়া আবার "আরবি নাইটের পালা" হইত, অর্থাৎ তবলা ঢোলক মন্দিরা লইয়া ইংরাজী পয়ারে লিখিত আরবিয়ান নাইটের গল্প বাসায় বাসায় গান করিয়া বেড়ান হইত।

"The chronicles of the Sassanians
That extended their dominions."

এইরূপ পয়ারে উল্লিখিত আরবি নাইটের পালা রচিত হইত।

ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল—মাষ্টর ক্যান্ লিব্, মাষ্টর ক্যান্ ডাই। (Master can live, master can die) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব "What, master can die!" এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উচাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, "ডাই" শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন "ষ্টাপ্ দেয়ার" "(Stop there)" অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, "ডাই মি" (Die me) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। ইফ্ মাষ্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাক ষ্টোন্ ডাই, মাই ফোরটীন্ জেনারেষণ ডাই।" "If master die, then I die, my cow die, my black-stone die, my fourteen generation die‹" "যদ্যপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু* মরিবে, আমার ব্লাক ষ্টোন অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোরটীন্ জেনারেষণ অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে।" একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কেন আইস নাই?" সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল, "চর্চ্চ"† (Church)। রথের আকার গির্জ্জার মত, তাই কথাটি

* এই দেশে কাউ শব্দের ভাগ্য তিন বার পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমে উহার উচ্চারণ কো ছিল, পরে কৌ হয়, তাহার পর এক্ষণে কাউ হইয়াছে।

† এই শব্দে যে কয়েকটি "চ" আছে, তাহা তালব্য বর্ণরূপে উচ্চারণ না করিয়া জিহ্বামূলীয় বর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং দীর্ঘায়ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সরকার যেরূপে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল, সেইরূপ হইবে।

বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু চর্চ্চ বলিলে ইটের গাঁথুনি বুঝায়, এ জন্য পরক্ষণেই বলা হইল, "উডেন্ চর্চ্চ" অর্থাৎ কাষ্ঠের গির্জ্জা। তাহা হইলেও বুঝা গেল না; তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল—"থ্রি ষ্টারিস্ হাই।" "Three stories high." "গাড আলমাইটী সিট্ অপন" (God Almighty sit upon) অর্থাৎ জগন্নাথ দেব বসিয়া আছেন, "লাং লাং রোপ" (Long long rope), "থৌজণ্ড মেন ক্যাচ" (Thousand men catch), "পূল পূল পূল" (Pull, pull, pull), "রনাওয়ে রনাওয়ে" (Run away, run away), "হরি হরি বোল— হরি হরি বোল।"

ইংরাজী শিক্ষার এই দুর্দ্দশা হিন্দুকালেজ সংস্থাপিত হইলে বিমোচিত হইল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্ জন্ হাইড ইষ্ট (Sir John Hyde East) এবং ডেবিড হেয়ার (David Hare) এই মহাত্মাদ্বয় প্রথমে ঐ কালেজ সংস্থাপিত করেন। উহার অন্য নাম মহাবিদ্যালয়। হিন্দুকালেজ বস্তুতঃ মহাবিদ্যালয় নামেরই উপযুক্ত ছিল। সর্ জন্ হাইড ইষ্ট সুপ্রীমকোর্টের জজ ছিলেন। ডেবিড হেয়ারের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই দুই লোকহিতৈষী উদারাশয় মহাত্মা ব্যক্তির যত্নে হিন্দুকালেজ সংস্থাপিত হয়। ঐ বিদ্যালয় এতদ্দেশীয়গণ দিগের টাকায় সংস্থাপিত হয়। প্রথমতঃ কেবল এতদ্দেশীয়গণ তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। কেবল তাঁহারাই উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহারা উপযুক্তরূপে উহার অধ্যক্ষতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের হস্ত হইতে উহার কার্য্যভার বিশেষ ইংরাজী কৌশল প্রয়োগ দ্বারা কাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

এই সময় হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নব ভাব হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয় ও সেই ভাব এখনও কার্য্য করিতেছে। কিন্তু হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, কেবল ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনা যে উহার এক মাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এমত নহে। আর একটি ঘটনা উহার একটি প্রধান কারণ স্বরূপ গণ্য করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন। সমুদায় হিন্দু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রামমোহন রায় এই সত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর এক মাত্র নিরাকার। তাহাতে অনেকে এইরূপ মনে করিলেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে ইহা দ্বারাই হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃতরূপে রক্ষিত হইবে।

এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষা হিন্দুসমাজে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহার বিবরণ ব্যক্ত করা যাইতেছে।

হিন্দুকালেজ হইতে প্রথম যে যুবকদল বহির্গত হয়েন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু রীতি নীতিতে অনেক দোষ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ হিন্দু কালেজের শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবের উপদেশ। ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ইটালীয়ান ও মাতা একজন এতদ্দেশীয়

স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি কালেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহাকেই অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে তত চিনিত না। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন। হিন্দু কালেজের ভিতর এক বার একটি তামাসা হইতেছিল। একটি বালক তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে আড়াল করিয়া তামাসা দেখিতেছিল। তিনি বলিলেন, "My boy! You are not transparent" "প্রিয় বালক! তুমি স্বচ্ছ পদার্থ নহ।" তাঁহার এই দেশে জন্ম। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গী যেমন বলে, "মোদের বিলাত," তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশেকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াও যায়। সে কবিতাটি তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের একটি পুরাতন-আখ্যান-মূলক কাব্যের মুখবন্ধ।

"My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou:
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee.
Save the sad story of thy misery!
Well—let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! one kind wish for thee."

"স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিতো ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্য পদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?

দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!''*

দুঃখের বিষয় এই যে, একজন ফিরিঙ্গী ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন হিন্দু-সন্তানকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভাল বাসিত। তিনিও তাহাদিগের সহবাসে সর্ব্বদা থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বাঙ্গালীদিগের সংসর্গে এরূপ বাঙ্গালী হইয়া যান যে, তিনি যে সাহেবের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন ফিরিঙ্গীরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে অনুযোগ করিত। তিনি কালেজে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তজ্জন্য কালেজের অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি রাত্রিতে আপনার ইটালীস্থ বাসায় উপদেশ দিবার নিয়ম করিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে এমনি ভাল বাসিত যে, অন্ধকার রাত্রি ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাগবাজার হইতে ইটালী যাইতে সঙ্কোচ করিত না। ডিরোজিওর শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে যে পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল। তাহারা হিন্দুসমাজের নিয়ম সকল অবহেলা করিতে লাগিল। ডিরোজিওর শিষ্যগণের আচরণ হেতু তাঁহার অত্যন্ত নিন্দা হইতে লাগিল, এজন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। হিন্দুকালেজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার কিছু দিন পরে ডিরোজিও সাহেবের মৃত্যু হয়। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর মাত্র ছিল।

তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবকশিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা। কেহ কেহ উদ্ধত বেশে দোকানদারের নিকটে গিয়া বলিতেন, ''গোরু খেতে পারিস্? গোরু খেতে পারিস্?'' এইরূপে প্রচলিত রীতি নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন। এক বার তাঁহাদের মন্ত্রণা হইল, মুসলমানের

---

* এই অনুবাদের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আমি উপকৃত আছি।

দোকানের বিস্কুট খেতে হবে। কয়েক দিন মন্ত্রণাই হয়, কাজে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না। এক দিন, অদ্য এই কার্য্য সমাধা করিতেই হইবে, এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানের দোকানের সম্মুখে আইলেন, কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া পথের উপরে সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এগিয়ে গিয়ে বিস্কুট কিনিয়া লইয়া আইসেন, তাহা কাহারও সাহস হয় না। শেষে একজন অপেক্ষাকৃত অধিক সাহসী পুরুষ এগুলেন। কিন্তু তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। আস্তে আস্তে দোকানের ভিতরে গিয়া বিস্কুট নিয়ে যেমন তিনি বেরুলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গিগণ তিন বার গগনভেদী স্বরে "Hip! Hip! Hurrah!" বলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ঐ কাজকে কুসংস্কারের উপর অসামান্য জয় মনে করিয়া এইরূপ করিয়াছিলেন। এক দিন চাঁদনী রাত্রি, কয়েক জন নব্য-সম্প্রদায়ের লোক ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীতলায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে কাহার আগমন নিরীক্ষণ করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। কাছে আসিতে দেখা গেল, একজন ক্ষৌরিত-মস্তক শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি, মাথায় চেঙ্গারী করিয়া উইলসনের দোকান হইতে রুটি বিস্কুট কেক্ লইয়া আসিয়াছে। যেমন সে মাথার ঝুড়িটি নামাইল, এবং তাহার কামান মাথা চাঁদনীতে চিক্ চিক্ করিতে লাগিল, অমনি সেই জগন্নাথের প্রসাদের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেলে। সে দেখে হাঁ কোরে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপরে বর্ণিত আচরণ দ্বারা ডিরোজিওর ছাত্রেরা জাতির বন্ধন শিথিল করেন। তাঁহারাই যে প্রথমতঃ তাহা শিথিল করেন এমত নহে। তাহার পূর্ব্ব হইতে ঐ বন্ধন বিলক্ষণ শিথিল হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম।

হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশীয় কালীপ্রসাদ দত্ত সর্ব্বনীতি-বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ হিন্দুনীতিবিরুদ্ধ এক কার্য্য করেন, তাহাতে তিনি জাত্যন্তরিত হয়েন ও তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে সমন্বয় করিয়া জাতিতে তুলেন। তাহাতেই কালীপ্রসাদী হেঙ্গামের উৎপত্তি হয়। ঐ কার্য্য, বিবী আনর নামক এক জন পরমা সুন্দরী মুসলমানীকে উপপত্নী রাখিয়া তাহার গৃহে কিছু দিন বাস করা। এই কার্য্যটি দ্বারা হিন্দুধর্ম্মবিহিত জাতির নিয়ম বিলক্ষণ ভঙ্গ করা হয়। এই হেঙ্গামাতে হিন্দুসমাজ ভয়ানক আন্দোলিত হইয়াছিল। এক পক্ষে শোভাবাজারস্থ রাজগণ, অপর পক্ষে মৃত রামদুলাল সরকার প্রভৃতি কলিকাতার তদানীন্তন অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া এই আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে রামদুলাল সরকার বলিয়াছিলেন, "জাতি আমার বাক্সের ভিতর" ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই হেঙ্গাম সময়ে একটি গীত রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রারম্ভে আছে,— "গেল গেল গেল হিন্দুয়ানী।" সেই প্রথম এই রব উত্থিত হয়, এখনও সেই রব শ্রুত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুয়ানী, অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন, সর্ব্বভূতে দয়া এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি ঔদার্য্য ভাব কখন যাইবার নহে।

কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম এবং হিন্দুকালেজের প্রথম ছাত্রদিগের মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া জাতির বন্ধন শিথিল করিয়া ঐ বিষয়ে বর্ত্তমান সামাজিক পরিবর্ত্তন অনেক পরিমাণে প্রবর্তিত করিয়াছে। কিন্তু এ সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য। আমাদিগের দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার প্রকৃত কারণ, ইংরাজী শিক্ষার স্থির ও স্থায়ী কার্য ও ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ। ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ সাধারণ লোককে এখনও তত কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই, যত মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। মত পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র হয়, কার্য্যের পরিবর্ত্তন তত শীঘ্র হয় না। কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্যদিগকে একটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহারা রাজকার্য্যে উৎকোচ গ্রহণ না করার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।

এইরূপে হিন্দুসমাজে যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, তাহা এক্ষণে কত দূর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে দেখ,—তখন কলিকাতাতে একটি কি দুইটি বিদ্যালয় ছিল, এখন নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সামাজিক পরিবর্ত্তন বিষয়ে দেখ,—এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা হইতেছে, তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হইতেছে, লোক বিলাত যাইতেছে, বিধবার বিবাহ হইতেছে, অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে বহির্গমন বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। এক্ষণকার কালে চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন; পরিবর্ত্তন বই আর কথা নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন হইলেই যে উন্নতি, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত অবনতি হইতেছে, তাহা বিচার করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যে যে বিষয়ে বঙ্গসমাজের প্রকৃত উন্নতি বা অবনতি হইতেছে, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি উক্ত সমাজের নিম্নে লিখিত বিষয় সম্বন্ধীয় উন্নতি ও অবনতির বিষয় বিবেচনা করিব।

১। শরীর।
২। বিদ্যা শিক্ষা।
৩। উপজীবিকা।
৪। সমাজ।
৫। চরিত্র।
৬। রাজ্য।
৭। ধর্ম্ম।

প্রথমতঃ। শারীরিক বলবীর্য্য।—এ বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, আমার পিতা ও পিতামহ বড় বলবান্ ছিলেন। সে কালের লোকের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান লোকদিগের কিছুই বল নাই বলিলে হয়। আমি জানি, কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে একটা বাঘ আসিয়াছিল, সেই গ্রামের একজন ভদ্র ব্যক্তি তাঁহারই মত বলবান্ একজন

নাপিতকে সঙ্গে লইয়া লাঠি হাতে করিয়া বাঘ মারিতে বেরুলেন। বিবেচনা করুন, লাঠি দ্বারা বাঘ মারা কত বড় সাহসের কর্ম্ম! তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল সর্ জন্ লরেন্স উত্তরপাড়ার স্কুলের বালকদিগকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সে কালের বাঙ্গালীদের তুলনায় এ কালের বাঙ্গালীরা নিতান্ত ক্ষীণ। চল্লিশ বৎসরে চাল্‌শে ধরে, এই সকলে জানেন; এক জনকে আমি দেখিলাম, তিনি ভাল দেখিতে পান না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়ের কি চাল্‌শে ধরেছে? তিনি বলিলেন, "না, পায়তারা ধরেছে।" অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। "এ বয়সে দৃষ্টির খর্ব্বতা হইলে, তাহাকে আর চাল্‌শে কেমন করে বলা যায়, পায়তারা বলিতে হয়।" কি আশ্চর্য্য! ইহার পর আমাদের দেশের লোকেরা কি সত্য সত্য বেগুনগাছে আঁকুষি দিবে না কি? এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোক জীবিত ছিলেন, তাঁহারা যদি ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে আমাদিগকে খর্ব্বকায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়েন, সন্দেহ নাই। ছেলেবেলা সে কালের স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ডাকাইত তাড়ানোর গল্প সকল শুনা গিয়াছিল। এক্ষণে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, পুরুষেরা একটা শিয়াল তাড়াইতেও সক্ষম নহে। এই শারীরিক বলবীর্য্যহানির কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। সেই সকল কারণ নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। বাল্যবিবাহাদি যে সকল কারণ সে কাল এ কাল দুই কালে সাধারণ, তাহা এখানে ধরা গেল না, কেবল এই কালে যে সকল কারণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই ধরা গেল।

১। এ কালের লোকের বলবীর্য্য ক্ষয়ের ও অল্পায়ুর প্রথম কারণ, দেশের নৈসর্গিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বলিতে হইবে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের এক প্রধান প্রমাণ এই যে, পূর্ব্বে শীতকালে যেরূপ শীত হইত, এক্ষণে সেরূপ হয় না। পূর্ব্বে সামান্য গৃহস্থকেও শীতকালের অধিকাংশ দিন আহারের পর গরম জলে আঁচাইতে হইত। কিন্তু এক্ষণে কেহ সেরূপ করে না। ষাইট্ সোত্তর বৎসর বয়ঃক্রমের নবদ্বীপবাসী ব্যক্তিরা বলিতেন যে, তাঁহারা বাল্যকালে ঘরের চালের উপর খড়িগুঁড়ার ন্যায় এক পদার্থ পড়িতে দেখিতেন, তাহাকে তাঁহারা পালা বলিতেন। সেই পদার্থকে ইংরাজীতে Frost বলে, তাহা অত্যন্ত শীতের চিহ্ন। পূর্ব্বে লোকে কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী, শান্তিপুর প্রভৃতি গ্রামে জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য যাইত,* কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল স্থান মেলেরিয়া অর্থাৎ দূষিত বাষ্পনিবন্ধন অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রয়াগ, কাণপুর প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে যেরূপ স্বাস্থ্যকর ছিল, এক্ষণে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। এই সকল স্থানে পূর্ব্বে শীতকালে যেরূপ শীত হইত, এক্ষণে সেরূপ হয় না।

* হালিসহরে গঙ্গার ধারে ৺বলরাম বসুর একখানি আটচালা ছিল, কলিকাতা-নিবাসী অনেক বাবু আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় তথায় বাস করিতেন।

নানা কারণে বোধ হইতেছে যে, ভারতবর্ষে একটি মহা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন চলিতেছে। এরূপ পরিবর্ত্তন লোকের শারীরিক বলবীর্য্যের প্রতি স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি?

২। এক্ষণকার লোকের শারীরিক বল-বীর্য্য হ্রাসের আর এক কারণ অতিশয় পরিশ্রম ও অকালে পরিশ্রম। এতদ্দেশে ইংরাজী সভ্যতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিশ্রম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইংরেজেরা যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন, আমরা সেরূপ কখনই পারি না। কিন্তু ইংরাজেরা চাহেন যে, আমরা তাঁহাদের ন্যায় পরিশ্রম করি। ইংরাজী পরিশ্রম এ দেশের উপযুক্ত নহে। অতিশয় পরিশ্রম যেমন শারীরিক বল বীর্য্য ক্ষয়ের কারণ, তেমনি অকালে পরিশ্রম তাহার আর এক কারণ। এখনকার রাজপুরুষেরা যে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার নিয়ম করিয়াছেন, ইহা এ দেশের পক্ষে কোনরূপে উপযোগী নহে। প্রখর রৌদ্রের সময় কর্ম্ম করিলে শরীর শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বালকেরা যে আহারের পরেই তাড়াতাড়ি স্কুলে যায়, এবং তথায় বদ্ধ বায়ুতে এক গৃহে শত শত ব্যক্তি গলদঘর্ম্ম কলেবরে থাকে, তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। পাদরি লং সাহেব আর একজন ভদ্র সাহেবকে লইয়া কোন স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। ঐ ভদ্র সাহেবটি স্কুলের ভিতরে ঢুকিয়া ছাত্রদিগের নিশ্বাসের গরম বাতাস ও ঘর্ম্মের গন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "This is hell" অর্থাৎ ইহা নরক স্বরূপ।

৩। ব্যায়াম শিক্ষার অভাব।—পূর্ব্বে গুলিদাণ্ডা ও কপাটি নামক যে সকল ক্রীড়া প্রচলিত ছিল, তাহাতে বিলক্ষণ অঙ্গচালনা হইত। পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে এক এক কুস্তির আড্ডা ছিল, ছেলে বুড়ো সকলে কুস্তি করিত। [শীতকালে রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে বয়স্ক ও অল্পবয়স্ক ভদ্রলোকেরা ঐ সকল কুস্তির আড্ডায় যাইয়া কুস্তি আরম্ভ করিতেন। তাঁহাদিগের তাল ঠোকার শব্দে অপর লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত।] এখন বয়স্কদিগের কথা দূরে থাকুক, পোনের ষোল বৎসরের বালকেরা পর্য্যন্ত অঙ্গচালনা করিতে বিমুখ। কোন জেলা-স্কুলে দেখিলাম, নিম্নশ্রেণীর ছেলেরা খেলা করিতেছে, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা খেলিতেছ না কেন?" তাহারা কিছু উত্তর করিল না; আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "তোমাদিকের খেলা করা কর্ত্তব্য, এত সকাল সকাল বিজ্ঞ হইলে চলিবে না।" ছোট ছোট বালকেরা পর্য্যন্ত যাহাতে অঙ্গচালনা না করে, তাহার জন্য আমাদিগের দেশীয় লোকেরা বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এখন একটি ছেলে সমস্ত দিন গড় গড় করিয়া পড়া মুখস্ত করিলে তাহাকে শান্ত ছেলে বলা হয়। এই যে শান্ত নাম, ইহা সর্ব্বনাশের গোড়া। ইংরাজেরা ঠিক বলেন, "All work and no play makes jack a bad boy;" কোন ক্রীড়া নাই, কেবল পরিশ্রম, ইহাতে বালকের অপকার হয়। যে পরিমাণে মানসিক

পরিশ্রমের আধিক্য, সেই পরিমাণে শারীরিক বলের হানি। স্কুলে গাদা গাদা বহি ধরিয়ে দেয়, ছেলেদিগকে ঐ সব মুখস্থ করিতে হয়, তাহারা দিনরাত কেবল তাহা করে, শারীরিক উন্নতির প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ দেয় না। যাহারা বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা দেয়, তাহাদের বয়ঃক্রম হদ্দো দশ এগার বৎসর। এই অল্পবয়স্ক বালকদিগকে এত পুস্তক পড়িতে হয় যে, ক্রীড়া ও আরাম করিবার অবকাশ পায় না। ঐ জন্য ফলও সেইরূপ ফলিতেছে। ছাত্রেরা রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এখনকার ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল উপাধি পায়, আমি তাহা পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী স্বর্গের পথে যাইতে যাইতে প্রথম দ্রৌপদী, পরে সহদেব, পরে নকুল, পরে অর্জ্জুন, পরে ভীম, একজনের পর একজন পড়িয়া গেলেন। সর্ব্বশেষে কেবল একা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলেন। তেমনি যে সকল ছাত্র প্রথমতঃ এণ্ট্রেন্স কোর্স পড়ে, তাহার মধ্যে কতকগুলি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা না দিতে দিতে পড়িয়া যায়। ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা না দিতে দিতে আর কতকগুলি পড়িয়া যায়। বি. এ পরীক্ষা না দিতে দিতে আর কতকগুলি পড়িয়া যায়। এম. এ উপাধি প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বর্গারোহণ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এক হিসাবে বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী মানুষ মারিবার কল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৪। অতিশয় পরিশ্রম, অসময়ে পরিশ্রম ও ব্যায়াম চর্চ্চার হ্রাস নিবন্ধন এখনকার লোকের ভোজন-শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এটি শারীরিক বল-বীর্য্য ক্ষয়ের কার্য্য ও কারণ দুইই। পূর্ব্বকার লোকেরা বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। এক্ষণকার লোকে সেরূপ পারে না। পূর্ব্বকালে যখন কেবল গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তখন বালকেরা তিন বার ভাত খাইত। পূর্ব্বকালে ভদ্র-লোকেই কতকগুলা ঝুনা নারিকেলের শাঁস ও চিড়ে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিয়া হজম করিতেন। ইহা যে অত্যন্ত পুষ্টিকর আহার, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণকার অধিকাংশ লোকে এরূপ পুষ্টিকর আহার খাইয়া হজম করিতে পারে না। ইংরাজেরা যে পরিমাণে আহার করিতে পারেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙ্গালীদিগের আহার নাই বলিলেই হয়। অধিক আহার করিয়া অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারা শারীরিক বলের একটি প্রধান কারণ।

৫। পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণের হ্রাস এ কালের লোকদিগের শারীরিক বল-বীর্য্যক্ষয় ও অল্পায়ুর আর এক কারণ। আমাদিগের বৈদ্য-গ্রন্থে লিখিত আছে, "আরোগ্যং কটুতিক্তেষু বলং মাংসপয়ঃসু চ"; কটু ও তিক্ত দ্রব্য স্বাস্থ্যকর এবং মাংস ও দুগ্ধ বলকর। এক্ষণকার সম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যে মাংসাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে মাংস জুটিয়া উঠা ভার। এক

একটি জাতির এক একটি প্রধান আহার আছে। গোমাংস যেমন ইংরাজদিগের প্রধান আহার, গোল আলু যেমন আইরিশদিগের প্রধান আহার, দাল রুটি যেমন হিন্দুস্থানীদিগের প্রধান আহার, তেমনি দাল, ভাত, দুধ, মাছ বাঙালীদিগের প্রধান আহার। এই চারি দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ যেমন পুষ্টিকর, এমন অন্য পদার্থ নহে। পূর্ব্বে আপামর সাধারণ সকলেই যেমন দুগ্ধ খাইতে পাইত, এক্ষণে দুগ্ধ মহার্ঘ্য হওয়াতে সেরূপ পায় না। কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি বলিয়াছিলাম, যখন দুগ্ধ এত মহার্ঘ্য হইয়া উঠিল, তখন আর দেশের কিসে উন্নতি হইবে? তিনি হাসিলেন। কিন্তু আমার কথার তাৎপর্য্য আছে। বস্তুতঃ দুগ্ধ বাঙ্গালীদিগের শরীর রক্ষা ও শারীরিক বল বিধান পক্ষে এরূপ উপযোগী যে, তদভাবে আমাদের শারীরিক উন্নতির আশা নাই। দুগ্ধ কিরূপে সুলভ হইবে, তাহার কোন উপায় দেখিতে পাই না। সাহেবেরা গোমাংসভোজী; দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীরাও তাহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগ দেন। বাঙ্গালীরা গোমাংসভোজী হইলে আরো ভয়ানক হইয়া উঠেন। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক বার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালী বাবু আহার করিতে গিয়াছিলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীল* হ্যায়?" খানসামা উত্তর করিল, "নহি হ্যায় খোদাওন্দ," বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীফ্‌ষ্টিক্† হ্যায়:" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।" বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্‌স্‌টেং‡ হ্যায়?" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।" বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কফেস্ ফুটজেলি ** হায়?" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।" বাবু বলিলেন, "গোরুকা কুচ্ হ্যায় নহি?" এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু, যিনি এত গোমাংস-প্রিয় ছিলেন না, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দে না?" এ বিষয়ে যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারাও ইংরাজীওয়ালাদিগের অনুগামী হয়েন। এক জন পাড়াগেঁয়ে জমীদার কিছু দিন কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি ঠিক ইয়ং বেঙ্গলের মত পোষাক পরিতেন ও উইলসনের দোকানে সর্ব্বদা যাইতেন। আপাততঃ দেখিলে কাহার সাধ্য যে বলে যে, তিনি ইংরাজী জানেন না। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইংরাজীর "A" অক্ষর গোমাংস ছিল। কিন্তু প্রকৃত গোমাংস গোমাংস ছিল না। হোটেলের নিয়ম এই, যাহারা প্রত্যহ সেইখানে আহার করে, তাহাদিগকে প্রত্যেক

* Veal অর্থাৎ বাছুরের মাংস। † Beefsteak অর্থাৎ গোরুর বড় বড় বাঁধা টুগরো। ‡ Oxtongue অর্থাৎ গোরুর জিব। ** Calf's foot jelly অর্থাৎ বাছুরের খুব দ্রব করিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইংরাজেরা গোরুর খুরটি পর্য্যন্ত ছাড়েন না, তাহা দ্রব করিয়া খাওয়া হয়।

দিনের আহারের খরচের এক হিসাব হোটেলওয়ালা দেয়। সেই সকল হিসাব বিলের বৌচরের কার্য্য করে। উল্লিখিত জমীদার বিলের টাকা দিবার সময়, হিসাব বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত প্রাত্যহিক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে, কি আহার করিলেন, তাহা প্রত্যহ লিখিবার সংকল্প করিয়া, এক দিন সেই দিনের ফর্দ্দ আপনার ইয়ং বেঙ্গাল সহচরের নিকট বুঝিয়া লইয়া, তাহার পৃষ্ঠে "অর্দ্ধ সের গোমাংস" এই বাক্যটি বাঙ্গালায় লিখিয়া রাখিলেন। তাহাতে সেই সহচর তাহার প্রতি আপনার আন্তরিক ঘৃণা আর লুক্কায়িত রাখিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোর সকল মাফ করিলাম, ইজের পেণ্টেলুন পরিলি তাহা মাফ করিলাম, ক্যাপ মাতায় দিলি তাহাও মাফ করিলাম, ফেটিং চড়িলি তাহাও মাফ করিলাম, ফের এর উপর আবার অর্দ্ধ সের গোমাংস?" এ দেশের লোকের পক্ষে গোমাংস অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য। এক জন প্রসিদ্ধ ইয়ং বেঙ্গাল বলিতেন যে, প্রত্যহ এ বেলা অর্দ্ধ সের আর ও বেলা অর্দ্ধ সের গোমাংস ভক্ষণ না করিলে বাঙ্গালী জাতি কখনই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন, কার্য্যে তাহাই করিতেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার এক ত্বাচ রোগ উপস্থিত হইয়া শরীর এমনি অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া ভাত ডাইল ধরিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু উপরে যে ভয়ানক গোখাদকদিগের কথা বলিলাম, এরূপ ভয়ানক গোখাদক দূরে থাকুক, সামান্য গোখাদকই বাঙ্গালীর মধ্যে কয় জন আছে? অতি অল্পই আছে। প্রধান গোখাদক আমাদিগের ইংরাজরাজপুরুষেরা ও মুসলমানেরা। তাঁহারা গোরু খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলিলেন, এই জন্য দুগ্ধ মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনতম হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করিতেন শাস্ত্রে এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্য সময়ের হিন্দুগণ গোরুর উপকারিত্ব ও এ দেশে তাহার মাংস ভক্ষণের অস্বাস্থ্যকর দোষ প্রতীতি করিয়া, গোমাংস ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। গোরু যেরূপ উপকারী জন্তু, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবহারই নিতান্ত কর্ত্তব্য। আকবর বাদশাহ তাঁহার রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সমুদায় হিন্দুবর্গের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ মহা অনিষ্টকর ও নির্দ্দয় প্রথা* এক্ষণে নিবারিত হইবার কিছু মাত্র আশা নাই। দুগ্ধ মহার্ঘ্য হওয়াতে বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। শরীরের অসম্পূর্ণ পোষণ বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের অল্পায়ুর কারণ বলিয়া একজন ইংরাজ সংবাদপত্রসম্পাদক স্থির করিয়াছেন।** একে ইংরাজী সভ্যতা-জনিত প্রভূত পরিশ্রমের চাপ, তাহার উপর ভোজনশক্তির হ্রাস ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণের হ্রাস, ইহাতে কি রক্ষা আছে?

* একজন বিদূষক কহিয়াছেন, "দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, নবনীত, ঘৃত, এই পাঁচটি দ্রব্য অমৃত। উদরপরায়ণ দুরাত্মা লোকেরা এই পঞ্চামৃত ভোজনে তৃপ্তি লাভ না করিয়া অমৃতের গাছ পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলেন।"

* Friend of India.

৬। কৃত্রিম খাদ্য দ্রব্যের ব্যবহার। আমরা বাল্যকালে ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য যেরূপ অকৃত্রিম পাইতাম, এখন আর সেরূপ পাই না। জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কৃত্রিমতা বাড়িয়াছে। এটি একটি সভ্যতার চিহ্ন। বিলাতে এরূপ কৃত্রিমতা বিলক্ষণ চলে। এখন খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে কি ছাই ভস্ম মিশায়, পূর্ব্বে যে সব জিনিস স্বাদু লাগিত, তাহা আর সেরূপ স্বাদু লাগে না। কেবল ছাই ভস্ম মিশায় এমন নহে, বিষবৎ দ্রব্য সকলও মিশায়, তাহা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। সুতরাং সেই সকল দ্রব্য ব্যবহারে যে আয়ু ও বলের ক্ষয় হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? অকৃত্রিম খাদ্য দ্রব্য কিছু অসাধারণ পদার্থ নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, তাহা কি দরিদ্র কি ধনাঢ্য সকলেই ব্যবহার করিতে পায়। কিন্তু এখন এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অকৃত্রিম খাদ্য দ্রব্য অসাধারণ পদার্থ, কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ব্যবহার করিতে পারেন। জিনিস ভেজাল করা কেবল ইংরাজী আমলে দৃষ্ট হইতেছে। মুসলমানদিগের আমলে এরূপ ছিল না। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের আমলে সকলেতেই ভেজাল, সকলেতেই খাদ, সকলই গিল্‌টি। মানুষেতে ভেজাল, মানুষেতেও খাদ, মানুষও গিল্‌টি।

৭। পানদোষের প্রবলতা। ব্রাণ্ডিরূপ অগ্নিময় পানীয় দ্বারা এ দেশের কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই অগ্নিতে কত ধনী, মানী ও বিদ্বানের প্রাণ আহুতিস্বরূপ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এত দিন তাঁহারা জীবিত থাকিলে লোক-সমাজের কত মঙ্গল সাধিত হইত! স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে দেশীয় মদ্য বিলাতি মদ্য অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর, কিন্তু ধর্ম্মের দৃষ্টিতে সকল প্রকার মদ্যপানই একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য! এ বিষয়ে আরো পশ্চাৎ বলিবার অভিলাষ রহিল।

৮। শরীর সম্বন্ধীয় ইংরাজী আচার ব্যবহার অবলম্বন শারীরিক বলবীর্য্যহানির এক প্রধান কারণ। আমরা ইংরাজী পড়িয়া শরীররক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক মঙ্গলকর পুরাতন প্রথা পরিত্যাগ করিতেছি ও এ দেশের উপযুক্ত কি না তাহা বিবেচনা না করিয়া অনেক ইংরাজী রীতি অবলম্বন করিতেছি। ইংরাজী রীতি এ দেশের পক্ষে উপযুক্ত নহে। ইংরাজী রীতি অবলম্বন ও দেশীয় রীতি পালন, এই দুয়ের ফলাফলের প্রভেদ দেখাইবার জন্য আমি প্রথম প্রথা অবলম্বনকারী বৃদ্ধ মনুষ্যের সহিত দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বনকারী বৃদ্ধ মনুষ্যের তুলনা করিব। বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কথা কহার আমি সম্পূর্ণরূপে বিরোধী, কিন্তু কৌতুকের অনুরোধে আমি বর্ত্তমান উপলক্ষে দুইটি বিমিশ্র বাক্য ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে দুটি বাক্য বর্ণ্যাকিউলর (Vernacular) বুড়ো ও এংগ্লিসাইজ্‌ড (Anglicized) বুড়ো। এংগ্লিসাইজ্‌ড বুড়ো অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বুড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ণ্যাকিউলর বুড়োয় রাত্রি থাকিতে নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বিছানাতে শুইয়া

শুইয়া ধর্ম্ম-সঙ্গীত গান করেন,—ইহা কেমন চিত্তপ্রফুল্লকর! তৎপরে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করেন,—ইহাতে শরীর কেমন ভাল থাকে। তার পর স্নান করিয়া ফুলের বাগানে গিয়া ফুল তুলে আনেন,—পুষ্পের সুগন্ধ শরীরের পক্ষে কেমন হিতকর! ফুল আহরণ করিয়া দেবপূজা করেন,—তাহা মনের প্রফুল্লতা সঞ্চার করিয়া শরীর মন উভয়ের বল সাধন করে। একজন ইংরাজ সংশয়বাদী,—সংশয়বাদী হইয়াও আমাকে বলিয়াছিলেন যে, উপাসনা যেমন মনের টনিক্ অর্থাৎ বলকর ঔষধ, এমন আর দ্বিতীয় নাই। এই ত গেল বর্ণ্যাকিউলর বুড়োর কথা। আর যিনি এংগ্লিসাইজ্‌ড বুড়ো, তিনি খানা খাইয়া ও ব্রাণ্ডি পান করিয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান; সূর্য্যোদয় কেমন করে হয়, তা কখন দেখেন নাই ও প্রাতঃকালের সুস্নিগ্ধ বায়ু কখন সেবন করেন নাই। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো, কিন্তু এমন সহজ কাজ যে, চক্ষু সম্পূর্ণরূপে খোলা, ইহাও তাঁহার পক্ষে দুষ্কর কার্য্য বোধ হয়। শারীরিক গ্লানি অত্যন্ত, খোঁমারি হইয়াছে, বিপদ্ উপস্থিত!! এইরূপে ইংরাজী আহার পানে ও অন্যান্য ইংরাজী রীতি পালনে এংগ্লিসাইজ্‌ড বুড়োর শরীর নানা রোগের আধার হয়। আমি এই স্থলে দুই পক্ষের দুইটি একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম। সাধারণতঃ বলিতে গেলে ইংরাজীওয়ালারা প্রাচীন-রীতি-পালনকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায় ডাঁটো ও সুস্থকায় নহেন। ইহার কারণ, তাঁহারা অনেক পরিমাণে ইংরাজী আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ইংরাজীওয়ালারা যত রুগ্ন ও অল্পায়ু, টোলের অধ্যাপকেরা সেরূপ নহেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইংরাজীওয়ালারা অনেক পরিমাণে ইংরাজী আচার ব্যবহার অনুসারে চলেন, টোলের অধ্যাপকেরা সেরূপ চলেন না। আমাদিগের দেশের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া আমাদিগের চলা কর্ত্তব্য।

৯। দুর্ভাবনা বৃদ্ধি। পূর্ব্বকালের লোক এক্ষণকার লোকের ন্যায় সুখপ্রিয় ও বিলাসপরায়ণ ছিলেন না; তাঁহাদিগের অভাব অল্প ছিল, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন। এক্ষণে যেমন সকল লোকের মুখে দুর্ভাবনার চিহ্নসকল পরিলক্ষিত হয়, সে কালের লোকদের সেরূপ লক্ষিত হইত না। তাঁহারা দিব্য করে প্রফুল্লচিত্তে পিঁড়ি ঠেস দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে থাকিতেন; যে কেহ আসিত, আপনি চকমকি ঠুকে তামাক খাওয়াইতেন ও তাহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেন। তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা মনের সুখ অধিক ভোগ করিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনায়াসে জীবিকা লাভ করিতেন ও অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য হইয়াছে, জীবিকা লাভ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লোকে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। লোকের ভাবিতে ভাবিতে অস্থি পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় অভাব, ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা এসে ঢুকেছে, অথচ সেই

সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না। লোকের দুর্ভাবনা বৃদ্ধি যে তাহাদের আয়ু ও শারীরিক বলবীর্য্য ক্ষয়ের এক প্রধান কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই।

১০। এ দিকে যেমন দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা প্রতিবিধানার্থ আমোদ প্রমোদ নাই। পূর্ব্বকালে সঙ্গীত চর্চ্চার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। প্রত্যেক গ্রামে ও সহরের প্রত্যেক পল্লীতে গাওনার আড্ডা ছিল। সেখানে দশ জনে একত্রিত হইয়া গাওনা বাজনা করিত, কিন্তু এক্ষণে এই সব গাওনার আড্ডা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে লোককে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে দেখা যায় না। উচ্চ উচ্চ পদাভিষিক্ত বৃদ্ধ ইংরাজদিগকে অফিসের কাজ করিয়া র‍্যাকেট কোর্টে খেলিতে ও তাহার পরে বাটীতে আসিয়া পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে দেখা যায়। তাঁহারা এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণকার বাঙ্গালীদিগকে নির্দ্দোষ আমোদ করিতে দেখা যায় না, এই জন্য তাঁহারা ক্রমে রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন। নির্দ্দোষ আমোদ শরীররূপ কলের চরবি স্বরূপ।

১১। বাবুগিরির বৃদ্ধি। সে কালে এতদ্দেশে দু-একটি বাবু ছিল; এক্ষণে সকলেই বাবু। পূর্ব্বে মোটা চালচলন সাধারণ ছিল; এক্ষণে বাবুয়ানা চালচলন সাধারণ ও মোটা চালচলন বিরল। এক্ষণে কি ভদ্র, কি ইতর লোক, উপার্জ্জনশীল হইলেই গাড়ী পাল্‌কি ব্যতীত এক পাও চলিতে পারে না।* পূর্ব্বকার অধিকাংশ ভদ্র লোকও এরূপ শারীরিক পরিশ্রম-বিমুখ ছিলেন না। ইহাতে তাঁহারা এক্ষণকার লোক অপেক্ষা সুস্থ ও বলিষ্ঠকায় হইতেন।

উপরোক্ত কারণ সকলে এদেশের লোকে বিশেষতঃ ভদ্রলোকে ক্রমে ক্ষীণ, রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন। পল্লীগ্রামের রীতি, ভদ্রলোক সকল নিজে বাজার করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে পল্লীগ্রামের বাজারে ভদ্রলোক বৃদ্ধ অধিক দেখা যায় না। ছোট লোক বৃদ্ধই অধিক দেখা যায়। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভদ্রলোক অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন।

শারীরিক বলবীর্য্যের বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলা হইল। অতঃপর বিদ্যাশিক্ষা ও মানসিক উন্নতির বিষয়ে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিদ্যাশিক্ষার বিষয় বলিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদিগের মাতৃভাষা শিক্ষা বিষয়ে বলা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বাঙ্গালার

* এক্ষণকার বাবুরা অতি কৃপাযোগ্য; গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিবেন, তথাপি হাঁটিয়া পথ চলিবেন না। একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়ীখানি মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষিরাজের বংশ। বেতো ঘোড়া'র বাবা। সপাসপ চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, "শিরোমণি মহাশয়! আমার গাড়ীতে আসুন"; তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাকে শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে।"

আদর বেশী অবশ্যই বলিতে হইবে। আমরা যখন কালেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। সুতরাং যখন আমরা কালেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল। আমাদিগের সময়ের কালেজের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে এক দিন কালেজে যাইবার সময় রাস্তায় একজন সামান্য লোক একটি বাঙ্গালা লেখা পড়িয়া তাহার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইতে অনুরোধ করে। তিনি সে লেখাটি বুঝিতে না পরিয়া তাঁহার এত দূর লজ্জা উপস্থিত হইল যে, ললাটে স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কাগজ ফিরাইয়া লইয়া বলিল "বাবু! এ ইড়িবিড়ি করা নয়, বাঙ্গালার ঘানি।" এক বার এই সময়ের শিক্ষিত আমার একটি বন্ধু বয়স্ক অবস্থায় আমার বাসায় এক দিন আসিয়া বলিলেন "আজ একটা বড় শুভ সমাচার শুনিলাম।" আমরা আস্তে ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি সমাচার?" তিনি বলিলেন, "সোমপ্রকাশাদি সম্বাদপত্রে নাকি আন্দোলন হচ্চে যে তিনটা 'স' উঠে গিয়ে একটা 'স' হবে, তা হলেই আমার বাঙ্গালা লেখার সুবিধা হবে।" তিনি এক বার এক সভায় "অভিনন্দন-পত্র" শব্দের পরিবর্ত্তে "রঘুনন্দন-পত্র" বলে ফেলেছিলেন। ঐ সময়ে কালেজে শিক্ষিত কোন ব্যক্তি কোন প্রধান বিদ্যালয়েব বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহকারী পণ্ডিতকে ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! এই শব্দে উচ্চারণ ব্র্যাঘ্‌ঘ না?" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "উহার উচ্চারণ ব্যাঘ্র।" অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "আমি তাই ত বলছি ব্র্যাঘ্‌ঘ ব্র্যাঘ্‌ঘ।" উল্লিখিত সময়ের আর এক ব্যক্তিকে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে বক্‌সু খানসামা নামক কোন খানসামার নাম লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল; তিনি "বক্‌সু" শব্দ কি প্রকারে লিখিবেন ভাবিয়া আকুল। যদি "বক্‌সু" লিখেন, তাহা হইলে লোকে মনে করিবে যে, কি মূর্খ! "কষ" এইরূপ না লিখিয়া "ক্ষ" লিখিলেই হইত, আর যদি "বক্ষু" লিখেন তাহা হইলে লোকে "বক্‌খু" উচ্চারণ করিবার সম্ভাবনা। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি ইংরাজী অক্ষর X এর সাহায্য লইয়া "বx " এইরূপ লিখিলেন। প্রথম প্রথম যাঁহাবা কালেজে পড়িতেন, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা বিদ্যা এইরূপ ছিল। এখন সে দিন গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এ বড় দুঃখের বিষয় যে, সংস্কৃতের চর্চা তদ্রূপ হইতেছে না। বাগ্‌দেবী সরস্বতী গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া রাইন নদীর তীরে আশ্রয় লইয়াছেন। বাগ্‌দেবীর এরূপ অন্তর্ধানের জাজ্বল্যমান প্রমাণ, ভট্টাচার্য্যদের দুর্দ্দশা। তাঁহাদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদের স্ত্রীর ছিন্ন বস্ত্র, চালে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই; এক এক লোকের হয়ত অনেকগুলি ছেলে; কি করিয়া তাহাদিগকে

মানুষ করিবেন ভাবিয়া অস্থির!* এই উৎকট দণ্ড তাঁহারা কেন প্রাপ্ত হইতেছেন? কেবল সংস্কৃত চর্চ্চা করেন বলিয়া। জগতের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অদ্বিতীয় ভাষা। সর্ উইলিয়ম জোন্স বলিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষা "More copious than the Latin, more perfect than the Greek and more exquisitely refined than either."—এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা শিক্ষা করান বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদিগের নিকট হইতে এই ঘোরতর শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি বটে, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহার দ্বারা যথার্থ বিদ্যা উপার্জ্জন যাহাকে বলে তাহা হইতেছে না। শিক্ষাপ্রণালীর দোষ ইহার প্রধান কারণ। যেরূপে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল হইতে পারে না। আমি স্বয়ং কোন স্কুলের হেডমাষ্টর ছিলাম। আমি করিতাম কি, না, নিজে বালকদিগকে পুস্তকের কোন স্থানের প্রকৃত অর্থটি তাহাদিগের মুখ দিয়া বাহির করাইতাম। আর কেবল এইরূপ করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। উপস্থিত পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ পাড়িয়া ছাত্রদিগের বহুজ্ঞতা যাহাতে জন্মে এমন চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এরূপে পড়ানোতে পরীক্ষার ফল মন্দ হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আমার নিন্দা হইতে লাগিল। আমার একটি বন্ধু, তিনিও নিজে একজন শিক্ষক ছিলেন; তিনি আমাকে দাদা দাদা করিতেন। তিনি আমাকে এক দিন বলিলেন, "দাদা! তুমি ভাল কচ্ছো না, তোমার দুর্নাম হচ্ছে—ছেলেদের গেডিয়ে দেও," (অর্থাৎ ক্রমিক মুখস্থ করাও) "আজকাল না গেডাইলে কোন মতে পরিত্রাণ নাই।" মানসিক বৃত্তি পরিচালনা না করিয়া পড়ার পক্ষে (Key) কী-গুলি বড় সুবিধাজনক। এই কী মুখস্থ করা বহুল অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। আমি বলি, বরং বিদ্যামন্দিরে সিঁদ কেটে ঢুকা ভাল, তবু এইরূপ চাবি দিয়া তাহার দ্বার খোলা কর্ত্তব্য নয়। ছেলেরা যাহা কীতে আছে, তাহাই অবিকল মুখস্থ করে। পরীক্ষা দিয়া আসিয়া দেখে, যাহা লিখিয়াছে, তাহা কীর সহিত মিলিয়াছে কি না? এক বার এক বালক এইরূপ মিলাইবার সময় দেখিল, একটা "The" ভুল গিয়াছে, তাহার জন্য মহা দুঃখিত। ভূগোল গ্রন্থে অনেক সমান বর্ণনা থাকে বলিয়া Ditto শব্দ লিখিত থাকে। এক বার প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়, যাহার Ditto সে বিষয় লইয়া প্রশ্ন দেওয়া হয় নাই; কিন্তু যে বিশেষ তত্ত্বটির পার্শ্বে Ditto লিখিত আছে, কেবল সেই তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে একটি বালক Ditto এই উত্তর লিখিয়াছিল। আমাদিগের দেশের এক জন প্রধান ব্যক্তি বলেন যে, ছেলেরা পরীক্ষা দিয়া আইসে

* প্রথম বার মুদ্রিত পুস্তকে এই স্থল পাঠ করিয়া আমার কোন দরিদ্র ভট্টাচার্য্য বন্ধু অশ্রুপাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।—গ্রন্থকার।

না, বমি করিয়া আইসে। কথাটি শুনিতে কিছু অশ্লীল, কিন্তু বস্তুতঃ ঠিক্। মেন্ সাহেব এই গেডানো রীতির পোষকতা করিতেন। মেন্ সাহেবের একটা চমৎকার গুণ ছিল। যাহা ত্রিজগতের লোক কেহই ভাল বলিত না, তিনি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেন। তিনি যাহা বলুন, গেডানো রীতিতে অনেক অনিষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে হিন্দুকালেজে কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত না ও এ গ্রন্থের একটু, ও গ্রন্থের একটু, এরূপ করিয়া পড়ানো হইত না, ছাত্রদিগকে নিজে কতই পড়িতে হইত, তাহার সীমা নাই। তাঁহারা নিজে যাহা পাঠ করিতেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে শিক্ষক যাহা পড়াইতেন, তাহা অতি অল্প বলিতে হইবে। এক্ষণকার এণ্ট্রান্স কোর্স, ফার্ষ্ট আর্টস্ কোর্স ও বি. এ কোর্স সমস্ত একত্র কর, কত বড় বই হইবে? ইহাতে ইংরাজী সাহিত্যে কি বিদ্যা হইতে পারে?

শিক্ষাবিষয়ক আর একটি অভাব আছে, সে অভাব নীতি শিক্ষার অভাব। কোন স্কুলে ভাল করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। নীতি শিক্ষা না হইলে, আমি বলি কোন শিক্ষাই হইল না। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, অন্য মনুষ্যের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, জীবনের উদ্দেশ্য আমরা কিরূপে সম্পাদন করিতে পারি, কি প্রকারে পবিত্রমনা ও মহৎ হইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি, ইহা জানা নীতিশিক্ষা ব্যতীত কি প্রকারে সম্ভবে? কালেজ ও স্কুলে বিশেষ করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না, ও বালকেরা সন্নীতি পালন করে কি না, এ বিষয়ে তত তত্ত্বাবধান নাই, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে।

উপরে পুরুষদিগের শিক্ষার বিষয়ে বলিয়া স্ত্রীদিগের শিক্ষার বিষয়ে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। স্ত্রীলোকেরা দশ বার বৎসর বয়স অবধি বালিকাবিদ্যালয়ে পড়ে, তাহাতে কেবল বর্ণপরিচয় ও শব্দপরিচয় মাত্র হয়, তাহার পর আর লেখা পড়ার কোন চর্চ্চাই থাকে না। "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থের রচয়িতা রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচারক; কিন্তু তাঁহার ঐ গ্রন্থে তিনি যে সকল বিদ্যাবতী স্ত্রীর উদাহরণ দিয়াছেন, আমাদিগের কোন স্ত্রীলোক অদ্যাপি সেরূপ বিদ্যাবতী হইতে পারেন নাই। আপনাদিগের অবশ্য সে দিবস বেশ স্মরণ হয়, যে দিবস পূর্ণকুম্ভ স্থাপন ও অশোকবৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক মহামহোৎসবের সহিত বীটন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, এবং 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই শ্লোক দ্বারা আলিখিত যান-সকল স্কুলে বালিকা লইয়া যাইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত। মহাত্মা বীটন সাহেব যে অভিপ্রায়ে ঐ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এত দিনে এত যত্নে তাহা সিদ্ধ হইল না। স্ত্রীলোকেরা এত দিনে উত্তম শিক্ষালাভ করিতে পারিল না। আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা উচ্চতর

বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম, তাহ হটী বিদ্যালঙ্কারের* দৃষ্টান্ত দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের অল্প বিদ্যা হওয়া অপেক্ষা আদৌ বিদ্যা না হওয়া ভাল। ইংরাজ কবি পোপ বলিয়াছেন, "Little learning is a dangerous thing।" এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা তাহাদিগকে কেবল অশ্লীল গল্প ও নাটক পাঠে পারগ করে। আমি বলি, হয় স্ত্রীদিগের রীতিমত শিক্ষা দেও, নতুবা শিক্ষা দেওয়ায় কাজ নাই।* বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে বিশিষ্টরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কোন উৎকৃষ্ট প্রণালী আমাদের দ্বারা অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কোন চেষ্টা করি না। আমরা এ বিষয়ে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। স্ত্রীদিগের শিল্প-শিক্ষা এক প্রধান শিক্ষা; তাহাও ভালরূপে হইতেছে না। তাহারা কেবল কার্পেটই বুন্‌ছে, কার্পেটই বুনছে। যদি তাহা না করিয়া পিরাণ শেলাই করিতে শিখে, তাহা হইলেও জানিলাম যে, কিছু উপকারে আইল। এক্ষণে স্ত্রীশিল্প কেবল বয়ে যাইবার একটি উপায় হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার বিষয় এই যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া পুনরায় পুরুষদিগের শিক্ষার বিষয়ে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এক্ষণে স্কুল, কালেজে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে কি বিশেষ উপকার দর্শিতেছে? কৈ অদ্যাবধি দুই একটি লোক ব্যতীত সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞান বিষয়ে কেহ কিছু নূতন রকম লিখিতে অথবা নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, স্কুল কিম্বা কালেজ পরিত্যাগ করিয়া লেখা পড়ার

* হটী বিদ্যালঙ্কার এক জন বিদ্যাবতী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যা। ইঁহার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জিলাব সোঞাই গ্রাম। ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় বিদায় লইতেন।—গ্রন্থকার।

* সম্পূর্ণ আলো অথবা সম্পূর্ণ অন্ধকার ভাল। কারণ আলো-আঁধারে পথ চলিতে গেলে পড়িয়া হস্ত-পদাদি ভগ্ন হইয়া যায়। আমাদিগের স্ত্রীলোকের বিদ্যা আলো-আঁধারে গোচ; ইহাতে কেবল বিপরীত ফল লাভ হয়। উহা অপেক্ষা মূর্খ হইয়া থাকে সে ভাল।

"বিদ্যা বলে অবিদ্যার অপরূপ ক্রিয়া।
মূর্খ হয়ে বেঁচে থাক্ আল্‌পানা দিয়া॥"—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

হ. মো. গু.

আমরা আহ্লাদিত চিত্তে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এক্ষণে বীটন বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু ইংরাজীর প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে, সংস্কৃতের প্রতিও যেরূপ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন স্ত্রীলোকদিগকে সাক্ষাৎ সরস্বতীর ন্যায় বোধ হয়।

১৮০০ শক, গ্রন্থকার।

চর্চ্চা অধিকাংশ লোক ছাড়িয়া দেয়। আমি স্বীকার করি, জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য যাঁহাদিগকে সমস্ত দিবস আফিসে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহারা সন্ধ্যার পরে আসিয়া যদি কিছু না করিতে পারেন, তাঁহাদিগের কতকটা ওজর আছে; কিন্তু যাঁহাদের সময় আছে, উপায় আছে, তাঁহারাও যে কালেজ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনা একবারে ত্যাগ করিয়া বসেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। কোন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া কিম্বা কোন নূতন ভাবের কাব্য রচনা না হইবার বিশেষ কারণ এই। কালেজ অথবা স্কুল ছাড়িয়া লেখা পড়ার চর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করিলে কি প্রকারে এই প্রকার আবিষ্ক্রিয়া বা কাব্য রচনা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি লেখা পড়ার চর্চ্চা রাখেন, তাঁহারা আবার কেবল হীন অনুকরণে রত। প্রাচীন কবি কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রাম বসু, ইঁহাদের কবিতা যেন ঠিক স্বভাবের হস্ত হইতে বাহির হইয়াছে। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে সেরূপ সহৃদয়তা দেখা যায় না। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ কহে। এক্ষণকার কোন কোন কাব্যে পূর্ব্বকার কাব্য অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত আছে বটে; কিন্তু জাতীয় ভাব, সারল্য ও সহৃদয়তা বিষয়ে হীন বলিতে হইবে। এই ত গেল লেখার বিষয়, কথোপকথনে এই হীন অনুকরণ আরো স্পষ্ট দেখা যায়। তাহার প্রধান চিহ্ন ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ একত্র মিশাইয়া বলা। আমরা এক্ষণে যেরূপ কথা কহি, তাহা শুনিলে ইংরাজেরা কিম্বা অন্য কোন বিদেশীয় লোক হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না। সে কালের লোক কৌতুকের জন্য ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ মিশাইয়া ছড়া প্রস্তুত করিতেন। যথা:—

"শ্যাম going মথুরায়, গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়,
বলে your Okroor uncle Is a great rascal."

আমরা কৌতুকের জন্য নহে, গম্ভীরভাবে ঐরূপ ভাষায় কথা কহি। কিন্তু আমরা নিজে বুঝিতে পারি না যে, তাহা কত হাস্যাস্পদ। "আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে Doctor কে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন। Physic বেস্ operate করেছিল, four five times motion হলো, অদ্য কিছু better বোধ কচ্চেন।" এ বিড়ম্বনা কেন? সমস্তটা বাঙ্গালায় না বলিতে পার, কেবল ইংরাজীতে কেন বল না? তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল। কোন কোন স্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে চলে না, যথা;— ডেস্ক, বেঞ্চ, টাউনহল, গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি। কিন্তু যে স্থলে বাঙ্গালা শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে, সে স্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা অন্যায়। যাঁহারা ইংরাজী কিছু জানেন না, ইংরাজী ভাষাজ্ঞতা জানাইবার জন্য তাঁহারা বাঙ্গালার সঙ্গে আরো ইংরাজী শব্দ মিশাল করিয়া বলেন। কোন কোন ভট্টাচার্য্য এইরূপ করিয়া থাকেন, তাহাতে আরো হাসি পায়।*

* কোন কোন ভট্টাচার্য্য ইংরাজী ভাল জানেন না, এবং ইংরাজীতে না কথা কহিলে নয়। সংস্কৃত কালেজের কোন অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রদিগকে দ্বার বন্ধ করিতে বাঙ্গালায় না বলিয়া ইংরাজীতে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "give the door"।—গ্রন্থকার।

ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তা সদি (Southey) বলিয়াছেন, "আমাদিগের ভাষা অতি মহৎ ভাষা, অতি সুন্দর ভাষা। ইংরাজী ও জর্ম্মাণ ভাষার পরস্পর জ্ঞাতিত্ব অনুরোধে জর্ম্মাণ ভাষোৎপন্ন শব্দ ব্যবহার আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু যেখানে একটি খাঁটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেখানে যে ব্যক্তি লাটিন অথবা ফ্রেঞ্চ শব্দ ব্যবহার করে, মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য তাহাকে ফাঁসি দিয়া তাহার শরীর খণ্ড বিখণ্ড করা উচিত।" যাঁহারা বাঙ্গালা কথোপকথনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে একবারে এরূপ উৎকট দণ্ড না করিয়া একটি ভদ্র উপায় প্রথম অবলম্বন করিলে ভাল হয়। যদি দেখা গেল, ভদ্রতায় কিছু হইল না, শেষে সদি-বিহিত দণ্ড আছে। সে ভদ্র উপায় এই,—যখন কেহ ইংরাজী মিশিয়ে কথা কহিবেন, তখনই বলা যাইবে "ভাষায় আজ্ঞা হউক।" এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণের একটি শ্যামা ঠাকুরাণী ছিল, সেই শ্যামা ঠাকুরাণীটি তাঁহার উপজীবিকার একমাত্র উপায় ছিল। লোকে সেই ঠাকুরাণীর পূজা দিত; তাহাতে তাঁহার গুজরান হইত। এক দিন সন্ধ্যার সময় তিনি গাঁজাটি টেনে দেবালয়ের দ্বারে বসিয়া আছেন, মনে হইল, দেবী ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেবতারা কখনই ভাষায় কথা কহেন না, দেববাণী সংস্কৃততেই কথা কহিয়া থাকেন। তিনি ত সংস্কৃত জানেন না, অতএব দেবীকে বলা হইল, "মা! আমি অতি মূঢ়, ভাষায় আজ্ঞা হউক।" এই "ভাষায় আজ্ঞা হউক" কথাটা আমাদের শিখে রাখতে হবে; ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কেহ বাঙ্গালা বলিলেই ঐ কথা বলিতে হইবে।

শুদ্ধ গ্রন্থ লেখা ও কথোপকথনে হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়, এমন নহে; সকল বিষয়েই ঐ হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়। একটি সামান্য পত্র লিখিতে হইলে তাহা ইংরাজীতে লেখা হয়। কোন্ ইংরাজ ফ্রেঞ্চ অথবা জর্ম্মান ভাষায় স্বদেশীয় লোককে পত্র লিখে? যে সকল ছাত্রেরা ইংরাজী লিখিতে শিখিতেছেন, তাঁহারা ঐ ভাষায় লেখা অভ্যাস করিবার জন্য ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে পারেন, কিন্তু বয়স্ক লোকে এরূপ করেন কেন? বাঙ্গালীর সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করা হয় কেন? ইহার মানে কি? যে সভার সভ্যেরা বাঙ্গালী, সে সভার কার্য্যবিবরণ ইংরাজীতে রাখা হয় কেন? ডিবেটিং ক্লব, জুবিনাইল ক্লব প্রভৃতি সভা, যাহার উদ্দেশ্য ইংরাজী চর্চ্চা এবং ইংরাজী শিক্ষার্থী বালকেরা যাহার সভ্য, সে সকল সভার সভ্যেরা ইংরাজী ভাষা আরও করিবার জন্য সভার কার্য্য বিবরণ ইংরাজী ভাষাতে রাখিতে পারেন, কিন্তু প্রবীণ লোকের সভা যাহা অন্য উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সভ্যেরা তাহার কার্য্যবিবরণ ইংরাজীতে রাখিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন, ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে এত বাক্যব্যয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, যাহাতে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হয়, তাহা কখন অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা

সঞ্চারিত হইতে হইতে মহৎ বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইবে। আর এক কথা এই, যাহা মাতৃভাষাসম্বন্ধীয়, তাহা আমরা আদৌ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি কেন?

উপজীবিকা সম্বন্ধে এই বলা আবশ্যক যে, এক্ষণে যেমন ইউরোপীয় অভাব সকল দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনি তাহা মোচনের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না। ইউরোপে এত শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, এখানে কেবল মাত্র এক চাকরি দ্বারা কি এত ভদ্রলোকের জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে? হাইকোর্টের একজন উকীল সম্প্রতি শামলা মাথায় দিয়ে প্রত্যহ হাইকোর্টে বেরিয়ে কিছু হয় না দেখে, শেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, ধোপার কাজের এক কারখানা খুলিলে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ হয়। বস্তুতঃ জগৎশুদ্ধ লোক কি কখন কেরাণী অথবা স্কুলমাষ্টর অথবা উকীল হইতে পারে? শিল্প বাণিজ্যের দিক্ দিয়া কেহ পথ চলে না। অনেকে বারিষ্টার অথবা সিবিলিয়ান হইবার জন্য বিলাতে যাইতেছেন, কিন্তু কয় জন সেখানে শিল্প অথবা যন্ত্রবিদ্যা শিখিতে যান? শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগ জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদিগের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আইলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি, বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্য্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে, আমরা আগুন জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না। বাহিরে শেক্‌সপীয়র, মিল্‌টন ও ডিফরেন্‌শিয়ল কেলকুলসের চাক্‌চিক্য, ভিতরে সব ভুওয়া। আমাদের সকল বিষয়েই সাহেবদের উপর নির্ভর, তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। শেষ কালে ইংরাজেরা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিবেন, তবে কি আমরা আহার করিব? তাঁহারা বিদেশীয় লোক, তাঁহারা আমাদের জন্য যতটুকু করেন, আমাদের ততটুকুই ভাল। তাহাদের উপর আমাদের জোর কি? এই সকল ভারি গভীর বিষয়, এ সব বিষয়ে অতি প্রগাঢ় চিন্তা আবশ্যক। কিসে আমাদের জাতিত্ব থাকে, কিসে যায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের চলা আবশ্যক, নতুবা অত্যন্ত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

উপজীবিকার বিষয় বলিয়া এক্ষণে আমাদিগের সমাজের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের সমাজ এখনও প্রকৃতরূপে সংগঠিত হয় নাই। তাহার একটি সামান্য প্রমাণ দিতেছি। প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে; সেইরূপ পরিচ্ছদ সেই জাতীয় সকল ব্যক্তিই পরিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বাঙ্গালী জাতির একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোন মজ্‌লিসে যাউন, এক শত প্রকার পরিচ্ছদ দেখিবেন; পরিচ্ছদের কিছু মাত্র সমানতা নাই। ইহাতে এক এক বার বোধ হয়, আমাদিগের কিছু মাত্র জাতিত্ব নাই। বস্তুতঃ ঐক্য না থাকিলে প্রকৃত জাতিত্ব কিরূপে

সংগঠিত হইবে? আমাদিগের কোন বিষয়ে ঐক্য নাই। ইহার উপর আমরা আবার অনুকরণ-প্রিয়। বাঙ্গালী জাতি অত্যন্ত অনুকরণ-প্রিয়; আমরা সকল বিষয়েই সাহেবদের অনুকরণ করিতে ভালবাসি। কিন্তু বিবেচনা করি না যে, সে অনুকরণ আমাদের দেশের উপযোগী কি না, আর তদ্দ্বারা আমাদিগের দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে কি না? সাহেবেরা পর্য্যন্ত যে সাহেবী প্রথা এ দেশের উপযোগী নহে মনে করেন, তাহাও আমরা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হই না। সাহেবেরা নিজে বলিয়া থাকেন, সাহেবী পোশাগ এ দেশের কোন মতে উপযুক্ত নয়, কিন্তু আমাদিগের দেশের কোন কোন ব্যক্তি ঐ পোশাগ ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। আমাদিগের দেশের কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বিডন সাহেবের সহিত ধুতি চাদর পরিয়া দেখা করিতে যাইতেন, তাহাতে গবর্ণর সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। এক বার গ্রীষ্মের সময় দেখা করিতে গিয়াছেন, গিয়া দেখেন যে, গবর্ণর সাহেব ঢিলে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছেন। আমাদিগের বন্ধুকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন,— "তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হচ্চে, ইচ্ছা করে তোমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিয়া থাকি।" আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন,—"তাই কেন করুন না?" বিডন সাহেব বলিলেন,—"ওরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদিগের দেশাচার-বিরুদ্ধ, সুতরাং কেমন ক'রে করি?" আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন,— "আপনাদিগের বেলা দেশাচার বলবৎ, আর আমাদিগের বেলা তাহা কিছুই নহে, আপনারা এরূপ বিবেচনা করেন কেন?" চতুর্দ্দিকে হীন অনুকরণের প্রবলতা দৃষ্ট হইতেছে। প্রতি পদেই অনুকরণ, ইহাতে আন্তরিক সারবত্তার হানি হইতেছে, বীর্য্যের হানি হইতেছে, আমরা অন্য সমাজীয়দের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি। কি আশ্চর্য্য! সাহেবেরা যাহা করিবেন, তাহাই ভাল, আর সব মন্দ। এ উপলক্ষে একটা গল্প মনে পড়িল। কতকগুলি লোক এক বাসায় থাকিত। তাহারা এক দিন একটা কাঁঠাল ক্রয় করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বড় ইংরাজভক্ত এবং কাঁঠালভক্তও ছিলেন; আর আর সঙ্গীদিগের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে কাঁঠালের ভাগ ফাঁকি দেয়। একজন উহার মধ্যে বলিয়া উঠিল, "ইংরাজেরা কাঁঠাল খায় না।" তিনি অমনি কাঁঠাল ভক্ষণে বিরত হইলেন, আর আর বন্ধুরা সমুদয় কাঁঠাল খাইয়া ফেলিল। ইংরাজেরা না থাকিলে কোন সভা জাঁকে না। ইংরাজেরা ভাল না বলিলে কোন কার্য্যের মূল্য হয় না। সকল কাজেই রাঙ্গামুখের বার্ণিষ চাই। এ বিষয়ে আর একটা গল্প মনে হইল। এক বার এক ব্যক্তি আর একজনকে বলিতেছিল, "ওদের বাটীতে পূজার বড় ধুম, গোরায় লুচি ভাজ্‌ছে।" যে কার্য্য গোরায় করে, তাহার ভারি মূল্য। এখন আমাদের সকল কার্য্যেই গোরার দ্বারা লুচি ভাজান চাই! সামাজিক বিষয়েতেও সাহেবদিগের সাহায্য চাই। সাহেবেরা হিন্দুসমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়ে যেরূপ বিজ্ঞতা ফলান, তাহা দেখিলে আমার হাসি উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে

বঙ্গদূত নামক একখানি সম্বাদ পত্র ছিল।* তাহার সহিত সংবাদ প্রভাকরের ঝগড়া হইয়াছিল। আপনারা জানেন, সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা কিরূপ বিবাদপ্রিয়। তাঁহাদের ঝগড়া দেখিয়া ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া সম্পাদক তাহার মধ্যস্থতা করিতে গেলেন। বঙ্গদূত বলিল, "হচ্ছিল ভোলা ময়রা ও নীলু রামপ্রসাদে, এ আবার আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কোথা থেকে এল?" সেই অবধি দুর্দ্ধর্ষ ফ্রেণ্ড একেবারে চুপ্। এইরূপ অনেক সময় হিন্দুসমাজের আন্দোলনে সাহেবদিগের বিজ্ঞতা ফলান দেখিয়া আমরাও বলিতে বাধ্য হই যে, "হচ্ছিল ভোলা ময়রা ও নীলু রামপ্রসাদে, আবার আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কোথা হতে এলো?" আমাদের অর্থ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় বিলাতে আপীল হয়, এখন সামাজিক বিষয়েতেও বিলাত আপীল হইতেছে! সম্প্রতি এক বাঙ্গালী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামাজিক কোন বিষয়† লইয়া বিবাদ হইতেছিল। দুই পক্ষ বিলাতের লোকদিগের নিকট আপীল করিলেন, তাঁহারা এক পক্ষে ডিক্রী দিলেন। যে পক্ষ জিতিলেন, তাঁহাদের কতই বা আনন্দ! যে পক্ষ হারিলেন, তাঁহাদের কতই বা বিষাদ! যাঁহারা বিলাতে যান নাই, তাঁহারা বিলাতের এইরূপ পক্ষপাতী। যাঁহারা বিলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। বাঙ্গালীরা এখন ক্রমাগত বিলাতে যাইতেছে। যেমন কাশীতে ও প্রয়াগে বাঙ্গালী পাড়া হইয়াছে, তেমনি লণ্ডনে এক বাঙ্গালী পাড়া না হইয়া উঠে। লোকে যেমন কাশীতে মরিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনি সম্প্রতি বিলাতের ফেরত একজন যুবক ডাক্তার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া লণ্ডনে মরিবার ইচ্ছা করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল; তিনি যেমন কাশীধামে পৌঁছিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পূর্ব্বে যেমন যুবকেরা পশ্চিমে পলাইত, এক্ষণে তেমনি তাহারা বিলাতে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল যুবক কোমলস্বভাব এবং এরূপ ভীরু যে, অন্ধকারে এ ঘর হইতে ও ঘরে একেলা যাইতে অক্ষম, তাহারা পর্য্যন্ত বিলাতে যাইতেছে। যেমন কুলকামিনীদিগের উপর জগন্নাথের ডোর নামিলে তাহারা পুরী যাইতে কোন বাধা বিঘ্ন মানেন না, ইহারাও সেইরূপ বিলাতে যাইতে কোন বাধা বিঘ্ন মানেন না; এঁদের উপর বোধ হয়, বলরামের ডোর্ নামে। বলরামের সহিত ইংরাজদিগের তিন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। প্রথম,—বর্ণ বিষয়ে, দ্বিতীয়,—বল বিষয়ে, তৃতীয়,—মদ্যপান বিষয়ে। মহাভারতে উক্ত আছে, অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত

* বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূত-সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, এবং অতি সুপুরুষ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

† সে বিষয় উপাসনালয়ে প্রকাশ্য স্থানে স্ত্রীলোক বসিবে কি না। — গ্রন্থকার।

দেবলোকে গিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদিগের দেবলোক বিলাত। এক্ষণে বাঙ্গালীরা বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যান। শ্রুত হওয়া যায়, এই দেবলোকে দেবকন্যারা না কি মোহনী মন্ত্র জানেন। তাঁহারা বাঙ্গালীদের ভুলাইয়া রাখেন। এই জন্য পিতার সর্ব্বদা ভয়, পাছে দেবকন্যাদিগের অনুরাগপ্রভাবে পুত্রের মন হইতে মানবকন্যার প্রতি অনুরাগ তিরোহিত হইয়া যায়। আমি বিলাতে যাইবার প্রতিপক্ষ নহি। বিলাতে যাইলে অনেক উপকার আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত একেবারে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা এক্ষণে বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন, হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে নোকসানের খাতায় লিখিতে বাধ্য হয়েন। বাবু বিলাত হইতে সাহেব সাজিয়া ফিরিয়া আসিলেন, না কাহারো সঙ্গে পোশাগে মিলে, না কাহারো সঙ্গে ব্যবহারে মিলে। কোথায় তাঁহারা যে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া আইলেন, সেই জ্ঞানালোকে স্বদেশীয়দিগকে বিভূষিত করিবেন, না একবারে সমাজছাড়া হয়ে বস্‌লেন। তাঁহারা উভয় দলের ত্যাজ্য হয়েন। বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে তো তাঁহাদিগের মিলে না, ইংরাজেরাও তাঁহাদিগকে অনুকরণকারী শাখামৃগ বলিয়া ঘৃণা করে। কেন যে আমাদিগের দেশের লোক ইংরাজদিগের এত গোঁড়া হয়েন, কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞবর লব সাহেব বলেন, ''আমাদের রীতি নীতি এমন দোষাশ্রিত যে, দিন দিন তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইতেছে। বাঙ্গালীরা কেন সে সকল নির্দ্দোষ মনে করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার অনুকরণ করে, বুঝিতে পারি না।'' এই ইংরাজী অনুকরণের দরুণ সমাজসংস্কারের গতি বিপথগামী হইতেছে। প্রকৃত গতিতে যদি সমাজসংস্কারের স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে সমাজসংস্কার কার্য্য এত দিনে যে কত অগ্রসর হইত, তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের সমাজসংস্কারকেরা যদি স্বদেশীয় ভাবকে পত্তনভূমি করিয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন সন্দেহ নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইঁহারা এই ভাবে সমাজসংস্কার আরম্ভ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিজাতীয় ভাষা, বিজাতীয় ভাব, বিজাতীয় ধর্ম্ম কখন এদেশে স্থায়ী হইবে না, এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম ''অধিকারতত্ত্ব।'' সেই গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেছি।

''ইংরাজদিগের রীতি, নীতি, ভাবভঙ্গী অনুকরণ করার ইচ্ছা আমাদিগের যুবকগণের মনে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অনর্থক কতিপয় ভাবভঙ্গী রীতি নীতির অনুকরণ করা কেবল হীনতা মাত্র। তাহাকে উদ্ধার বলে না, তাহা হীন অনুকরণ শব্দের বাচ্য। ইংরাজী বিদ্যার যোগে এ দেশে যাহা আসিতেছে, অনেকে তাহাই অনুকরণ করিতেছেন। ইংরাজেরা শিক্ষা দিলেন, ভূত প্রেত নাই, তাহারাও ভূত প্রেত মানিলেন

না; পশ্চাৎ ইংরাজী পুস্তকে লিখিল, ভূত প্রেত আছে, আবার মানিলেন। এ দেশের লোক মদ্যপায়ী ছিল না, যুবা পুরুষেরা ইংরাজদিগের অনুকরণে পান করিতে শিখিলেন; পশ্চাৎ ইংরাজেরা সুরাপান-নিবারণী সভা করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহারাওও সভা করিলেন। একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানগণ কহিলেন যে, যীশুকে মানবধর্ম্মের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ না করিলে মুক্তি নাই; তাঁহারাও যীশুকে অবলম্বন করিলেন। আবার যদি ইংরাজেরা কহেন, যীশুকে ধর্ম্মের মধ্যে রাখা উচিত নহে, তখন তাঁহারাও যীশুকে ত্যাগ করিবেন। হিন্দু শাসনকালে আমাদের দেশের স্ত্রীগণ এখনকার ন্যায় গৃহে রুদ্ধা থাকিতেন না। মুসলমানদিগের অনুকরণে বা ভয়ে আমাদের বর্ত্তমান অবরোধ-প্রণালী অবলম্বিত হইল। এখন ইংরাজের রাজ্য, অতএব আমাদের যুবাগণ আপনাপন স্ত্রীদিগকে বিবীদিগের ন্যায় সভা মজলিশে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চাৎ যদি ইংরাজেরা অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন,* তখন এ দেশের লোকেরা আপনাদের স্ত্রীদিগকে গৃহে প্রবেশ করাইতে পথ পাইবেন না। দেশীয় লোকেরা শাস্ত্রকথা শুনিবার বা শাস্ত্র পড়িবার অনুরোধ করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু ইংরাজেরা হিন্দুশাস্ত্র পড়েন, দেখিয়া অনেকে পড়িতে যান। বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র বা পুস্তক পড়িতে ভাল লাগে না, কেবল ইংরাজী পুস্তক ও সংবাদপত্র পড়িতেই ভাল লাগে। ইংরাজী ঔষধ ভাল, বাঙ্গালা ঔষধ মন্দ; ইংরাজী খাদ্য ভাল, বাঙ্গালা খাদ্য মন্দ; ইংরাজী পাদরী ভাল, বাঙ্গালা পাদরী মন্দ; ইংরাজী বাইবেল ভাল, হিন্দু শাস্ত্র মন্দ; ইংরাজী সব ভাল, দেশীয় সব মন্দ।

"কিন্তু হে স্বদেশ-হিতৈষি! তুমি এমন মনে করিও না যে, সমুদায় ভারতবর্ষ এরূপ ইংরাজী ভাবে অনুবাদিত হইয়াছে। * *
* * স্বজাতীয় ভাবে মানবের স্বাভাবিক অধিকার। সে অধিকার হইতে স্বভাবতঃ কেহই ভ্রষ্ট হইবেক না। যদি ইংরাজেরা ঋণকৃত স্বজাতীয় ধর্ম্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট না হন, তবে আমরাই কি এত হীন হইয়াছি যে, ভারতমৃত্তিকার উৎপন্ন ধর্ম্মভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে? যদি ইংরাজেরা স্থূলধর্ম্মপ্রতিপাদক বাইবেল ত্যাগ না করেন, তবে আমরাই কি এত মূঢ় হইয়াছি যে, ভারতমৃত্তিকার মঙ্গলপ্রসূনস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্র ত্যাগ করিব? এই সকল ধর্ম্মভাব, এই সকল ব্রহ্মজ্ঞানশাস্ত্র, যাহার গুরু ভাবের সহিত শতকোটি বাইবেল, ইঞ্জিল, তওরেৎ, জবুর, কোরাণ

* এই বর্ত্তমান সময়েই সাহেবেরা তাঁহাদের অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতায় বিরক্ত হইয়া প্রাচীন কালের শাসনপ্রণালীর পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছেন।— *Saturday Review, vide Englishman, 6th May, 1871.*"—(অধিকারতত্ত্ব প্রণেতার নিজেব নোট।)

ও আবেস্তা এবং পার্কর্, নিউম্যান, কাণ্ট, কুজিন প্রভৃতির স্তূপায়মান গ্রন্থসমূহ সমতুল্য হয় না, তাহাতে আমাদের যে আত্মীয় ও স্বজাতীয় এই দ্বিবিধ অধিকার যুগপৎ আছে, তাহা মনে করিলেও পিতামহ পুরাণ পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়।''

উল্লিখিত মহাশাস্ত্র সকলকে মূল করিয়া ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে আমাদিগের প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের এমন একটি কার্য্য নাই, উহার সম্বন্ধীয় এমন একটি বিশুদ্ধ মত নাই, যাহার প্রমাণ আমাদিগের শাস্ত্রে না পাওয়া যায়। ধর্ম্ম বিষয়ে এমন একটি সদুপদেশ নাই, যাহা আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না; সমাজ সম্বন্ধে এমন একটি সুরীতি নাই, যাহা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না, এবং যাহা এক্ষণে হিন্দুভাবে প্রচার না করা যাইতে পারে। হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া আমরা ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা ঐ কার্য্যে সুসিদ্ধ হইতে পারি।

চরিত্র বিষয়ে এ কালে দুইটি বিষয়ে উন্নতি দেখা যাইতেছে। এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর এক স্বদেশপ্রিয়তা। সে কালে ঘুষ লওয়া একটা বড় দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। কারণ বড় ছোট প্রায় সকল লোকেই উহাতে কিছু না কিছু লিপ্ত থাকিতেন। এখন সুশিক্ষিত দলের মধ্যে ঘুষ লওয়া বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সে কালের লোকদিগের স্বদেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্যবোধ ছিল না; এখন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে সে কর্ত্তব্যবোধ জন্মিতেছে, বলিতে হইবে। চরিত্র সম্বন্ধে যেমন দুই একটি বিষয়ে উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, তেমনি তৎসম্বন্ধে অনেক দোষ জন্মিতেছে। তাহা অতি শোচনীয়।

চরিত্র সম্বন্ধে এক্ষণকার লোকের প্রথম দোষ, পিতৃভক্তির হ্রাস। নিজ কর্ম্মস্থলে বৃদ্ধ পিতা আসিলে তাঁহাকে পিতা বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে বাবু লজ্জিত হয়েন ও কোন কোন বাবু বাবার পরিবার অর্থাৎ মাকে খেতে দিতে হয় বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন, এইরূপ গল্প সকল শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল গল্প সম্পূর্ণরূপে সত্য না হউক, তথাপি এই সকল গল্প উঠা এক্ষণকার লোকের মনের ভাবের পরিচয় প্রদান করে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বৃদ্ধ পিতা হৃষ্টচিত্তে তাঁহার এক বৃদ্ধ বন্ধুকে স্বীয় উপযুক্ত কীর্ত্তিমান্ পুত্রের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য লইয়া গেলেন; পিতা ও তাঁহার বন্ধু গদির নীচে বসিলেন, আর পুত্র গদির উপর বসিয়া রহিলেন। চাণক্যশ্লোকে উক্ত আছে যে,—''পুত্র ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলে তাহার সঙ্গে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবে।'' উপযুক্ত পুত্রের সহিত পিতার এইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু পুত্রের উচিত হয় না যে, পিতার প্রতি কোন অসম্মানের চিহ্ন প্রদর্শন করেন। কিন্তু পিতার প্রতি অসম্মানের চিহ্ন প্রকাশ করিতে এক্ষণে অনেক যুবককে দৃষ্টি করা যায়।

এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত। মদ্যপান যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে অতি ভীষণ অনিষ্টপাতের কারণ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন, পরিমিত মদ্যপানে দোষ নাই। কিন্তু ইহা যে কুদৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া কত অনিষ্ট সাধন করে, তাহার অন্ত নাই। পিতা কিম্বা শিক্ষক পরিমিত মদ্যপায়ী হইলেও বাবা কিম্বা মাষ্টার মদ খান ত আমি খাব না কেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যুবকেরা মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু তিনি যে পরিমিতরূপ পান করেন, তাহা বিবেচনা না করিয়া আশু অপরিমিত পানে প্রবৃত্ত হয়। এ বিষয়ে বাবা ও মাষ্টারেরও অধিক দিন সাবধান থাকা কঠিন। তাঁহারাও অধিক দিন মিতপায়ী থাকিতে পারেন না। পরিমিত মদ্যপান কেমন, না,—বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা। সেই ছিদ্র দিয়া জল প্রবেশ করিয়া ক্রমে বাঁধ যেমন নষ্ট করে, সেইরূপ পানদোষ পরিমিত পানরূপ ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করে। আমি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, পূর্ব্বে কালেজের ছাত্রেরা এই দোষে যেরূপ লিপ্ত ছিলেন, এক্ষণকার ছাত্রেরা সেরূপ লিপ্ত নহেন। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সে কালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি। পূর্ব্বে গ্রামের প্রান্তে দুই এক ঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত; এক্ষণে পল্লিগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমন বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা কিন্তু সভ্যতার চিহ্ন। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে।*

এক্ষণকার লোকেরা পূর্ব্বকার লোক অপেক্ষা অধিক অসরল। এখন পদে পদে খলতা, অসরলতা; এখন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া শীঘ্র বুঝিবার যো নাই যে, তাহার মনের ভাব কি? এখন বাহিরে, "আসিতে আজ্ঞা হউক," "ভাল আছেন," "মহাশয়" ইত্যাদি দাঁত বাহির করা সভ্যতা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরস্পর এমনি কৌশল চলিতেছে যে, তুমি যদি "বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়।" এক্ষণে ছদ্ম ব্যবহার অতিশয় প্রবল। এ বিষয়ে বহরমপুরনিবাসী সুকবি রামদাস সেন এক্ষণকার লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব সত্য।

* প্রকৃত সভ্যতা কাহাকে বলে, তজ্জন্য আমার প্রণীত "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার" ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।—গ্রন্থকার।

"কত ভাবে ভ্রম তুমি কত সাজ পর।
বঙ্গ-রঙ্গ-আগারেতে অভিনয় কর॥
দেশের হিতের জন্য করি প্রাণপণ।
এখানে সেখানে ফের মহাব্যস্ত মন॥
পীযূষ বর্ষণ মুখে হৃদে ক্ষুরধার।
মরি কি বঙ্গের সুত চরিত্র তোমার!॥"

এক্ষণে প্রতারণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে এক ধর্ম্মসাক্ষী অথবা সূর্য্যসাক্ষী তমঃসুকে কাজ চলিত, বোধ হয় কোন কোন পুরাতন বাড়ীর পুরাতন কাগজপত্র খুঁজিলে তাহার মধ্যে এরূপ তমঃসুক এখনো পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে চারি দিকে আঁটাআঁটি করিলেও লোকের প্রতারণা নিবারিত হয় না।

এখনকার লোকদিগের স্বার্থপরতা বড় প্রবল। এ কাল অপেক্ষা সে কালে পল্লির লোকদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি অধিক ছিল। পূর্ব্বে গ্রামসম্পর্ক পাতান হইত ও যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক পাতান হইত, তাহার প্রতি লোকে তদনুরূপ ব্যবহার করিত; তাঁহারা "দেহ-সম্বন্ধ হতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা"* জ্ঞান করিতেন। এমন কি, ইতর লোকের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ পাতান হইত ও ঐরূপ সম্বন্ধানুসারে ব্যবহারের সময় অনেক পরিমাণে জাতিভেদের নিয়ম পালন করা হইত না। বাটীতে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে পাড়ার লোকে আসিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত; এমন কি, গৃহমার্জ্জনী পর্য্যন্ত লইয়া গৃহমার্জ্জন করিত। পূর্ব্বকার লোকেরা আপদ্ বিপদে পাড়ার লোকসকলের বিশেষ সহায়তা করিতেন, এখন তেমন দেখা যায় না। দূরস্থ পল্লিগ্রামে সে কালের ভাব এখনও দৃষ্ট হয়। সে কালে কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে এক সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ছাতি হাতে করিয়া বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া কে কেমন আছে, কাহার কি হইয়াছে, এই সব তত্ত্ব লইতেন।* সে গ্রামের যে সকল চাকুরে লোকদিগকে সর্ব্বদা বিদেশে থাকিতে হইত, তাঁহার উপরে তাহারা স্বগৃহের আবশ্যক কর্ম্মের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। তিনি তাহা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতেন। এমন কি, কাহারো বাড়ীতে পুষ্করিণী খনন হইতেছে, বাড়ীর কর্ত্তা বিদেশে, তিনি রৌদ্রের সময় ছাতি ঘাড়ে করিয়া বসিয়া খনন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে এক স্বপ্নাদ্য ঔষধ ছিল; দেশ বিদেশ হইতে রোগী সকল তাহা লইতে আসিত। তিনি কখন কখন তাহাদর মল মূত্র পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। এমন পরহিতৈষিতা এখন কোথায় দেখা যায়? এক্ষণে

* প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রতি দিন প্রাতঃকালে আপনার পল্লিমধ্যে প্রত্যেক বাটীতে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। যাহার বাটীতে যে দিন অন্নের অসংস্থান থাকিত, সেই দিন তাহার বাটীতে মাসাধিক চলে, এমন তণ্ডুলাদি পাঠাইয়া দিতেন। তন্নিমিত্ত তিনি স্বীয় পল্লিমধ্যে কর্ত্তা উপাধি প্রাপ্ত হন।

আতিথেয়তা ধর্ম্মের ও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সে কালের এমন সকল গল্প শুনা আছে যে, এক এক লোকের বাড়ীতে রাশীকৃত অন্ন পাক হইত; সেই রাশীকৃত অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইত। কেবল বাড়ীর কর্ত্তা যিনি, তিনিই ঘি খাবেন, এ বড় খারাব কথা, সেই সঘৃত অন্ন অতিথি অভ্যাগত সমুদায় লোককে ভোজন করান হইত। এখন এমনি হইয়া উঠিয়াছে, বাগান হইতে আম্র আইলে তাহার মধ্যে হিসাব মত কয়েকটা রেখে বাকী বাজারে বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়। পূর্ব্বে বাটীতে লোক আইলে তিনি যাহাতে অধিক দিন থাকেন, লোকে এমন আগ্রহ প্রকাশ করিত, পূর্ব্বে ঘটি বাঁধা দিয়া লোকে অতিথিসেবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিত, এক্ষণে অতিথি বাটী হইতে বেরুতে পারিলে বাঁচে। এখনও কলিকাতা অপেক্ষা পল্লিগ্রামে অধিক আতিথেয়তা আছে। যেমন অন্যদেশীয় লোক অপেক্ষা স্বদেশীয় লোক নিকটতর, তেমনি অন্য স্বদেশীয় লোক অপেক্ষা আত্মীয় কুটুম্ব নিকটতর। এই নিকটতর সম্পর্কবোধ ক্রমে হ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বকার লোকেরা আত্মীয় স্বজনের যেমন সম্বাদ লইতেন, এক্ষণকার লোকে তেমন লয় না। বদান্যতা বিষয়েও এ কালের লোকদিগের হীনতা দৃষ্ট হয়। এক্ষণকার বদান্যতা চাঁদাপুস্তকগত বদান্যতা, আন্তরিক বদান্যতা নহে। পূর্ব্বকার বদান্যতা আড়ম্বরশূন্য ছিল; এক্ষণকার বদান্যতা সাড়ম্বর। এখনও পল্লিগ্রামে অনেক আড়ম্বরশূন্য বদান্যতার কার্য্য হইয়া থাকে; তাহা সাহেবদের গোচর হয় না। তাঁহারা অনুমান করেন যে, বাঙ্গালীদিগের বদান্যতা নাই। যাহা হউক, গড়ে এ কালে স্বার্থপরতার অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার অপর নাম স্বার্থপরতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি পোনের টাকা মাসে উপার্জ্জন করিত, সে আট টাকা পরিবার প্রতিপালনে ব্যয় করিয়া বাকী সাত টাকা পরোপকারে ব্যয় করিতে সমর্থ হইত, এক্ষণে সে সেই সাত টাকা সভ্যতার অনুরোধে বিলাসের দ্রব্যে ব্যয় করিতে বাধ্য হয়।

কৃতজ্ঞতাধর্ম্মেও এক্ষণকার লোকদিগকে পূর্ব্বকার লোক অপেক্ষা হীন দেখা যায়। পূর্ব্বকার লোকে যেমন সরলতাপূর্ব্বক উপকার স্বীকার করিতেন, এক্ষণকার লোকে সেরূপ করে না। স্বকীয় গৌরব নাশের আশঙ্কায় তাহারা তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করে। এক্ষণকার একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি বলেন যে, তিনি যাহার যত উপকার করিয়াছেন, তিনি তাহা হইতে তত অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের উপর একবারে এমনি চটিয়া গিয়াছেন যে, কাহারও উপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। এরূপ চটিয়া বসিয়া থাকা অন্যায়; কিন্তু এরূপ চটিবার বিশেষ কারণ আছে, তাহাও অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা যে বিখ্যাত ব্যক্তির কথা বলিতেছি, তিনি বস্তুতঃ চটিয়া বসিয়া থাকেন না, তাঁহার হৃদয় তাহাকে চটিয়া থাকিতে দেয় না।

এক্ষণে সুখপ্রিয়তা, বিলাসপরায়ণতা ও বাবুগিরির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন শুনা গিয়াছে, পূর্ব্বকালের কোন দেওয়ান নৌকা হইতে উঠিয়া বাড়ী যাইবেন;

যেখানে নৌকা হইতে নামিলেন, সেখান হইতে তাঁহার বাটী ১০।১২ ক্রোশ দূর। পালকী আসিয়া পৌঁছে নাই; তিনি হাঁটিয়াই চলিয়া গেলেন। এখন দু পা হাঁটিতে হইলে সম্পন্ন লোকে বিপদ্ জ্ঞান করে। সেতুবন্ধ রামেশ্বরের লোকেরা বাবুকে "জবড়জঙ্গ্" বলিয়া ডাকে; বাবুর এমন উপযুক্ত আখ্যা আর কোনখানে শুনি নাই। দেওয়ান বাটীতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবধুর প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে; সূতিকাগৃহের জন্য কাষ্ঠ চাই। কিন্তু দেখেন, ভৃত্যেরা কোন কারণবশতঃ কেহ উপস্থিত নাই; কি করেন, নিজেই কাঠ চেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণকার লোকে এরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে অত্যন্ত বিমুখ। এখন লেখাপড়া শিখিলেই কেবল বাবু হইবার চেষ্টা। কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, তিনি স্বীয় গ্রামের কৃষকদিগের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন, তাহাতে উল্টা ফল উৎপত্তি হইতে লাগিল। ছেলেদের পিতারা বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আমার ছেলেকে আর পড়িতে দেওয়া হবে না। আমাদের বাপ পিতামহের প্রথা চাসবাস করা, ছেলেরা তাহাতে সাহায্য করিয়া থাকে। এখন স্কুলে দেওয়া অবধি আমার ছেলে এমনি বাবু হয়ে পড়েছে যে, কেবল মোজা আর ইংরাজী জুতা পরিবার জন্য ব্যগ্র; আমার কোন কর্ম্মেই সে সাহায্য করে না।" এই কথা অনেক স্থলে নাইটস্কুলের ছাত্রদিগের পক্ষে খাটে।

চরিত্র বিষয়ে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের আর এক অবনতির চিহ্ন যুবকদিগের অশিষ্ট ব্যবহার। সে কালে যেমন প্রবীণ ব্যক্তির সম্মান ছিল, যেমন প্রত্যেক পাড়ায় এক জন করিয়া কর্ত্তা থাকিতেন, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, সকলেই তাঁহার বশম্বদ থাকিত, সেরূপ ভাব এখন দৃষ্ট হয় না। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহাকে মানে না, কেহ কাহার তোয়াক্কা রাখে না। স্বাধীনতার ভাব ভাল ভাব, কিন্তু বয়সের প্রতি, বিজ্ঞতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা কর্ত্তব্য। ঔদ্ধত্য কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। যুবকেরা অত্যন্ত মান্য ব্যক্তির বিষয়েও কথোপকথনের সময়—"তিনি" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "সে" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে; "করিয়াছেন" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "করিয়াছে" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। নিউটন ও বেকনও এই অশিষ্টাচার হইতে অব্যাহতি পান না। কিন্তু আপনার স্ত্রীর প্রতি তাহাদিগকে এরূপ অসম্মান প্রকাশ করিতে কখন দৃষ্ট হয় না। পায়ে পা ঠেকিয়াছে, হয় ইংরাজী শিষ্টাচার অনুসারে "বেগ ইওর পার্ডন" বল, অথবা বাঙ্গালী প্রথা অনুসারে "নমস্কার" কর, ইহার কিছুই করে না। রাস্তায় মান্য ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে, হয় ইংরাজী প্রথানুসারে মাথা নোয়াও অথবা বাঙ্গালী প্রথা অনুসারে নমস্কার কর, কিন্তু কিছুই করা হয় না। তাঁহার প্রতি এমনি ব্যবহার করা হয়, যেন তাঁহার সঙ্গে কোন কালে আলাপ নাই। কোন কোন যুবককে গুরুতর ব্যক্তি যে কেদারায় বসিয়া আছেন, তাহার উপর ইংরেজী কেতা অনুসারে পা রাখিতে দৃষ্ট হয়। অশিষ্টতা ইহা অপেক্ষা অধিক গমন করিতে পারে না।

এই ত পুরুষদিগের কথা গেল। এক্ষণে এ কালের স্ত্রীলোকদিগের কথা কিছু বলিতে চাই। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এ কালের স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক শ্রমশীলা ছিলেন। এক্ষণে সম্পন্ন মানুষের বাটীতে স্ত্রীলোকেরা যেমন দাস দাসী ও পাচক পাচিকার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিতে বিমুখ, সে কালের স্ত্রীলোকেরা সেরূপ ছিলেন না। সে কালের বড় বাড়ীর স্ত্রী লোকেরা পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে গৃহকার্য্যে নিজ হস্তে সম্পাদন করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য করিতে, শারীরিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক। এ বিষয়ে বিলাতের শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা এরূপ বাবু নহেন।* এক্ষণকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীদিগের ন্যায় সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা স্বহস্তে পাক করা অসম্মানের কার্য্য মনে করিতেন না। বিলাতে মধ্যে সম্পন্ন লোকের স্ত্রীরা পাকক্রিয়ার প্রতি অত্যন্ত অমনোযোগী হইয়াছিলেন ; এক্ষণে তাঁহারা তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছেন। এক্ষণে মহা প্রদর্শনের স্ফাটিক গৃহে একজন সূপশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি ঐ শাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন; অনেক বিবি তাহা শুনিতে যান। এক্ষণে পাকক্রিয়ার উন্নতি সাধন জন্য স্ত্রীলোকদিগের একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সভার কর্ত্রী মহারাণীর এক কন্যা। আমাদিগের দেশ এক্ষণে সকল বিষয়ে বিলাতের অনুবর্ত্তী। যখন বিলাতে এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইতেছে, তখন ভরসা হইতেছে, এখানেও ঐ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইবে। সম্প্রতি বিলাতের একটি বিবি বাঙ্গালী দ্বারা সম্পাদিত কোন ইংরাজী সম্বাদপত্রের সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা চিরকাল পাকক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ জন্য বিখ্যাত; এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ যেন ন্যূন না হয়; তাহা হইলে তজ্জন্য বিলাতের বিবিরা এক্ষণে যেমন অনুতাপ করিতেছেন, সেইরূপ অনুতাপ করিতে হইবে। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক আত্মনির্ভরশালিনী ছিলেন। তাঁহারা শিশু সন্তানের সামান্য সামান্য রোগে চিকিৎসকের উপর এত নির্ভর করিতেন না, নিজে চিকিৎসা করিতেন। এ বিষয়ে সে কালের স্ত্রীলোকদিগের যে জ্ঞান ছিল, তাহা অবজ্ঞা করা আমাদের উচিত হয় না। এখনও সে কালের যে সকল গিন্নিবান্নি জীবিত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ সকল ঔষধ জানিয়া লইয়া তদ্বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ

* ''বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানেন, নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিববর্ত্তিত হয় না। যদি আধুনিক বাঙ্গালীরা বহুরোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহাব অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে, সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমবিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কাবণের মধ্যে অগ্রগণ্য।''— 'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ, ১২৮১।

করা কর্ত্তব্য। শিশু সন্তানদিগের প্রতি তেজস্কর বিদেশীয় ঔষধ প্রয়োগ করা তাহাদিগের রুগ্ন প্রকৃতি ও দৌর্ব্বলের প্রধান কারণ। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক স্নেহশীলা ও দয়াশীলা ছিলেন। স্বামীর ও পুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের ত স্বভাবতঃ স্নেহ হইয়া থাকে। স্বামী ও পুত্র ব্যতীত অপরের প্রতি দয়া ও স্নেহ করাই ধর্ম্ম। সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা বাটীস্থ আত্মীয় পরিজন ভৃত্য সকলের ভাল করিয়া আহার হইল কি না, তাহা নিজে সম্পূর্ণ মনোযোগপূর্ব্বক দেখিতেন। এক্ষণে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা সেরূপ দেখেন না। পতিভক্তি ও পতিনিষ্ঠা আমাদিগের হিন্দু স্ত্রীদিগের প্রধান গৌরবস্থল। এ বিষয়েও এ কালে স্ত্রীলোকদিগের হীনতা দৃষ্ট হইতেছে।

উপরে ভদ্র স্ত্রীপুরুষদিগের চিত্র প্রদর্শিত হইল। যখন ভদ্রলোকেরা এরূপ, তখন ছোট লোকেরা ভাল থাকিবে, ইহা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আমাদিগের দেশের ছোট লোকেরা অন্যান্য দেশের ছোট লোক অপেক্ষা ধীর, সৎ, বিশ্বাসী ও ধর্ম্মভীরু। ইউরোপ খণ্ডের ছোট লোকেরা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশুবিশেষ বলিলে হয়। আমাদিগের দেশের ছোট লোকেরা এরূপ নহে। ইহার প্রধান কারণ পূর্ব্বকার ভদ্র লোকদিগের দৃষ্টান্ত এবং রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিগর্ভ কথা সর্ব্বদা শ্রবণ। কিন্তু এক্ষণকার ভদ্রলোকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে ছোট লোকদিগের মধ্যে পানদোষ ও অসৎ ব্যবহার ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে এক্ষণে সেরূপ সততা ও ধর্ম্মভীরুতা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে প্রভু ভৃত্যের মধ্যে যেরূপ একটি স্নেহভাব দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। প্রভুদিগের ব্যবহার ইহার একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে। তাঁহারা ভৃত্যদিগের প্রতি সে কালের লোকের মত সদয় ব্যবহার করেন না, ইংরাজী চলনে চলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে ভৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ নির্ম্মায়িক ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাঁরাও সেইরূপ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য ''সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে'' অর্থাৎ সুখ দুঃখ আপনার যেমন, পরেরও সেইরূপ। সাহেব তাঁহাদিগকে অপমান করিলে তাঁহাদিগের মনে যেরূপ গ্লানি উপস্থিত হয়, তাঁহাদিগের ভৃত্যদিগকে অপমান করিলেও তাহাদিগেরও সেইরূপ হইয়া থাকে।

উপরে প্রদর্শিত চিত্র অবলোকন করিলে প্রতীতি হইবেক যে, চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের সমাজ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আমাদের পুরাতন গুণগুলি হারাইতেছি, অথচ ইংরাজদিগের সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিতেছি না। বিলাতের অনেক ভদ্র ইংরাজেরা চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণস্থল হইতে পারেন। এমন শুনা গিয়াছে, তাঁহারা ব্রাণ্ডি পান করেন না, তাঁহারা ব্রাণ্ডির নাম পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের নিকট উচ্চারণ করা অশিষ্টাচার জ্ঞান করেন। তাঁহাদের স্বার্থপরতা অল্প, আতিথেয়তা বিলক্ষণ আছে, সরলতা বিলক্ষণ আছে, কৃতজ্ঞতাও বিলক্ষণ আছে। কৈ, বিলাতের

ভদ্র ইংরাজদিগের এই সকল ভদ্র গুণ ত আমরা অনুকরণ করি না? কৈ, সাধারণ ইংরাজবর্গের সাহস, অধ্যবসায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ও শ্রমশীলতা ত আমরা অনুকরণ করি না? তাঁহাদের যত মন্দ গুণ, তাই অনুকরণ করি। এদিকে এই অধম প্রবৃত্তি, ওদিকে সমস্ত হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা, এই দুইটি একত্র মিলিত হইয়া যে কি অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তালরস বৃক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া নৈসর্গিক নিয়মানুসারে পরিমিত সূর্য্যকিরণ সেবনে মধুর গুণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা বহির্গত করাইয়া অনৈসর্গিকরূপে অপরিমিত সূর্য্যকিরণ সেবন করাইলে, তাড়িতে পরিণত হয়। সেইরূপ যদি হিন্দু সমাজ আপনাতে আপনি থাকিয়া অর্থাৎ আপনার মর্য্যাদা না হারাইয়া স্বীয় আচার ব্যবহার সকলকে পাশ্চাত্য আলোক স্বাভাবিক ক্রমে সেবন করায়, তাহা হইলে তাহা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া, উহা আপনাতে আপনি থাকিয়া, ঐ সকল আচার ব্যবহারকে ঐ আলোক অস্বাভাবিক আতিশর্য্যের সহিত সেবন করাইতেছে; ইহাতে কেবল এই ফল হইতেছে যে, উক্ত সমাজ গাঁজিয়া উঠিয়া ভ্রষ্টাচাররূপে জঘন্য তাড়ি উৎপন্ন করিতেছে। আবার, যাঁহারা এই জঘন্য তাড়ি পান করেন, তাঁহাদের মত্ততাই বা কত!

চরিত্র বিষয়ে দেশস্থ লোকের অবনতির কারণ তাহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে অবনতি। ধর্ম্মের প্রধান উপাদান ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও পরকালের ভয়। সে কালের লোকের বিশ্বাস যেরূপ থাকুক না কেন, ঈশ্বরের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং পরকালের ভয় ছিল; এক্ষণকার লোকদিগের সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিদ্যানুশীলনের প্রাদুর্ভাববশতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে সত্যজ্ঞান প্রচারিত হইতেছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান উপাদান শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পরকালের ভয়, সে সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এক্ষণকার সাকার উপাসকদিগের আপনাদিগের উপাসিত দেব দেবীতে তত বিশ্বাস নাই; তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম এক্ষণে কেবল তামসিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণকার নিরাকার উপাসকদিগকের জিজ্ঞাস্য এই যে, সরলচিত্ত বিশ্বাসী সাকার উপাসকেরা যেমন তাঁহাদের দেবতাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তাঁহারা কি নিরাকার ঈশ্বরকে সেইরূপ সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করেন? সে কালের পৌত্তলিকেরা যেরূপ তাঁহাদিগের ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিতেন, তাঁহারা কি তাঁহাদের ধর্ম্মের নিয়ম, বিশেষতঃ উপাসনার নিয়ম সেইরূপ পালন করিয়া থাকেন? পূর্ব্বকালের লোকেরা যেমন সকল কার্য্যে পরকালের ভয় করিতেন, তাঁহারা কি সেইরূপ করিয়া থাকেন? সে কালের লোকেরা যেরূপ ধর্ম্মভীরু, সরল, স্নেহশীল ও দয়াশীল ছিলেন, তাঁহারা কি সেইরূপ ধর্ম্মভীরু, স্নেহশীল ও দয়াশীল? এক্ষণে সভা, বক্তৃতা উৎসবরূপ ধর্ম্মামোদের প্রতি লোকের অধিক দৃষ্টি; ধর্ম্ম সাধনের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্যের প্রতি লোকের অধিক দৃষ্টি সেই উপদেশানুসারে কার্য্যের প্রতি তত দৃষ্টি

নাই। লোকে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া বলে, "বেস বক্তৃতা করিয়াছে,—বেস্ বক্তৃতা করিয়াছে।" কিন্তু যে উপদেশ শুনা হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অতি অল্প লোকেই চেষ্টিত হয়। এই অবস্থায় যে এক্ষণে এই দেশে কেবল ধর্ম্মোদাসীনের দল,—কেবল ধর্ম্মশূন্য লোকের দল বাড়িবে, তাহার সন্দেহ কি? ধর্ম্ম সমাজ-রক্ষার পত্তন ভূমি। যে সমাজের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে সমাজের কি উন্নতির আশা করা যাইতে পারে? নাস্তিকতা ও তজ্জনিত পাপাচরণ জন্য অত বড় ফ্রান্সের কি দুর্দ্দশাই না হইল? যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে ঐরূপ দুর্দ্দশাই ঘটে।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের রাজ্যবিষয়ক অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা আত্মশাসনে অক্ষম। আমাদিগকে এক্ষণে অনেক দিন পরাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এক প্রভু গিয়া এক প্রভু হইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই প্রভু, আমাদিগের বর্ত্তমান প্রভুরা যত ভাল, তত ভাল না হইতেও পারেন। অতএব এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমাদিগের ন্যায্য আশা পূরণ করেন না। পূর্ব্বে সাহেবেরা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এক্ষণে ইংলণ্ড গমনের সুবিধা হওয়াতে এ দেশের প্রতি সাহেবদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা মমতা কমিয়া গিয়াছে, আর সেরূপ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর বাড়ীতে গিয়া কোন সাহেব তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করেন না এবং তাহার সন্তানদিগকে আদর করেন না। সে কালের বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তত ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন না, তাঁহারা রাজ্যতত্ত্ব তত সূক্ষ্মরূপে বুঝিতেন না, আর সাহেবেরাও তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদিগের কোন কথাই চলে না। গ্রীক পুরাণে লিখিত আছে যে, ট্যাণ্টেলস্ নামক এক ব্যক্তি নরকে একটি উদ্ভুত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিপাসায় আকুল, কিন্তু যেমন সে স্রোতের জল পান করিতে যায়, তেমনি জল তার ওষ্ঠদ্বয় হইতে পলায়ন করে। আমাদিগের দশা সেইরূপ হইয়াছে। আমরা যখন মনে করি যে, রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন সুখ লাভ করিলাম, অমনি সেই সুখ আমাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করে। আমরা ইংরাজী শিক্ষা না করিতাম; এ বিড়ম্বনা অপেক্ষা সে বরং ভাল ছিল। কোন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন:—

"Where ignorance is bliss,
'Tis folly to be wise."

"যখন অজ্ঞতায় সুখ, তখন বিজ্ঞ হওয়া অজ্ঞতার কর্ম্ম।" এ বিষয়ে আরো অনেক বলা যাইতে পারে। কিন্তু বক্তৃতা আরো দীর্ঘ হইবে বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইলাম।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন,—যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য্য হারাইতেছি,—যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চ্চা হ্রাস হইতেছে,—যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ,—যখন দেশের শিক্ষাপ্রণালী এত অপকৃষ্ট যে, তদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইতেছে,—যখন বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না,—যখন স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত,—যখন উপজীবিকার আহরণের বিশিষ্ট উপায় সকল অবলম্বিত হইতেছে না,—যখন সমাজসংস্কারে আমরা যথোচিত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না,—যখন চতুর্দ্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল,—যখন আমাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়,—বিশেষতঃ যখন ধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন,—তখন গড়ে আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।

কিন্তু আমাদিগের নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে, যে হেতু আশাই সকল উন্নতির মূল। যখন বাঙ্গালী দ্বারা কোন কালে অনেক কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তখন এমত আশা করা যাইতে পারে যে, সেই বাঙ্গালী দ্বারা পুনরায় অনেক কার্য্য সাধিত হইবে। সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজারা, যাঁহারা পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। রাজকুমার বিজয়সিংহ, যিনি পিতা কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কতকগুলি অনুচরের সহিত সমুদ্রপোতে আরোহণপূর্ব্বক সিংহলে গমন করিয়া উক্ত উপদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সিংহ উপাধি হইতে ঐ উপদ্বীপ সিংহল নামে আখ্যাত হইয়াছে, তিনি একজন বাঙ্গালী ছিলেন। চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর, যাঁহারা সমুদ্রে গমনাগমনপূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্য সমাধা করিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। দেবপাল, ভূপাল মহীপাল প্রভৃতি সার্ব্বভৌম সম্রাট, যাঁহারা কর্ণাট হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত দেশ সকলকে করপ্রদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ"

যিনি জাহাঙ্গীর পাদ্শার সেনাপতিদিগকে হিম্‌সিম্ খাওয়াইয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন ; কিন্তু যখন এই বর্ত্তমান হীন অবস্থাতেও তাহারা কিছু কিছু কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন এমন আশা করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে তাহারা অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। বর্ত্তমান

কালের এক জন বাঙ্গালী সাহেবদিগের মধ্যে "Fighting Moonsiff" অর্থাৎ "যুদ্ধ-কুশল মুন্সেফ" নাম লাভ করিয়াছিলেন এবং সিপাহী দিগের বিদ্রোহের সময়, ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পক্ষে যুদ্ধ করাতে গবর্ণমেন্ট হইতে জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীরা এক্ষণে ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গ পার হইয়া ইংলণ্ডে গমনপূর্ব্বক তথায় মহা সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালীরা এক্ষণে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দিয়া কলির ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। ভারতবর্ষে যেখানে বাঙ্গালীরা গমন করিতেছে, সেইখানে একটা কারখানা করিয়া তুলিতেছে। যথা,—অযোধ্যায়, জয়পুরে, কাশ্মীরে। বাঙ্গালীরা এক্ষণে ধর্ম্ম ও রাজ্য বিষয়ক আন্দোলনে ভারতবর্ষে অগ্রবর্ত্তী স্থান অধিকার করিতেছে। অতএব বাঙ্গালী দ্বারা যখন এতটুকু হইয়াছে, তখন যে অধিক হইবে না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি নীচকে উচ্চ করিতে পারেন ও উচ্চকে নীচ করিতে পারেন। এই বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে সকলের নিকট ঘৃণিত; কিন্তু হয়ত এই বাঙ্গালী জাতি যাহা করিবে, ভারতবর্ষের আর কোন জাতি তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। হয়ত এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

এতদ্দেশীয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিসনরি রেবরেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিশনরী স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশতঃ সেই সাহায্য রহিত হয়। তাহার পরে শরবোরণ সাহেব কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। শরবোরণ সাহেব ফিরিঙ্গ ছিলেন। তিনি এক প্রকার বাঙ্গালি ছিলেন বলিলে হয়। শুনিয়াছি, তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটি হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে আরাটুন পিদ্রূস নামে আর একজন সাহেব আর একটি স্কুল সংস্থাপন করেন। ঐ স্কুলে কৃষ্ণমোহন বসু ও রামরাম মিশ্র নামে দুই ব্যক্তি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন বসুর জন্মস্থান দক্ষিণ দেশস্থিত বোড়াল গ্রামে। কৃষ্ণমোহন বসু রাজা রাধাকান্ত দেবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন তাঁহাকে পড়াইতে যাইতেন, তখন মতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন। আমার বোধহয়, এই বিষয়ে তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ শিক্ষক ডাক্তার বুষবি সাহেবের দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিবস রাজা দ্বিতীয় চার্লস বুষবি সাহেবের স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। বুষবি সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার রত্নমণ্ডিত টুপিটা আমাকে দিউন। কেন না আমার ছাত্রেরা আমাকেই ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া জানে। আমার অপেক্ষা আর কেহ যে ইংলণ্ডে বড়লোক আছে, ইহা তাহারা জানিলে আমার মানের হানি হইবে।" বোধহয় কৃষ্ণমোহন বসু বুষবি সাহেবের ন্যায় শিক্ষকের কার্য্য অত্যন্ত সম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, এই জন্য ঐরূপ পোষাক পরিতেন।

প্রথমে ইংরাজি শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দুর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমার একখানি গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে।

"ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসার দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কটলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি একজন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পাদদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন।"

হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের কিছু দিন পূর্ব্বে হেয়ার সাহেব হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন। হেয়ার স্কুল আমাদিগের বর্ত্তমান সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন। প্রথম হেয়ার স্কুলের নাম স্কুল সোসাইটি স্কুল ছিল। হেয়ার সাহেব এই স্কুল সোসাইটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই স্কুল সোসাইটি দ্বারা আমাদিগের দেশের অনেক হিতসাধন হয়। তাঁহারা কলিকাতার কালীতলায় একটী বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটী ইংরাজী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটী। তাঁহারা শহরের বাঙ্গালা পাঠশালার গুরুদিগকে পারিতোষিক দিয়া শিক্ষার উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে গুরুদিগকে উল্লিখিত পারিতোষিক বিতরিত হইত। এই সোসাইটির দ্বারা রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা পোষক "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থ ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষোপযোগী "নীতিকথা" প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট ভাল প্রণালীতে একটা বৃহৎ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি হাইকোর্টের পরলোকগত জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব করাতে কার্য্যে পরিণত হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যূষে ভ্রমণ করিবার সময় সার জন হাউড ঈষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। সার জন হাউড ঈষ্ট সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন। তৎপরে হাউড ঈষ্ট সাহেব ও হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৪ সালের ১৪ই মে দিবসে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তিদিগের এক সভা আহ্বান করেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সে সভাতেও কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই। সে সময়ে হিন্দুসমাজে বিলক্ষণ দলাদলি চলিতেছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই সময়ে ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিই সেই দলাদলির মূল। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দু সমাজস্থ লোকেরা বলিয়াছিলেন, "রামমোহন রায় ইহাতে থাকিলে আমরা থাকিব না।" ইহাতে মহামান্য রামমোহন রায় স্বীয় মহত্ত্ব গুণে বলিয়াছিলেন, "আমি থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংস্রবে থাকিব না।" কিছুদিন এইরূপে আন্দোলন চলিল। পরে ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারী দিবসে স্কুল খোলা হইল। এই স্কুলই পরে উন্নত হইয়া হিন্দু কলেজে পরিণত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের সংস্থাপন কালে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় স্কুলটীকে বটবৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যেমন বটবৃক্ষ সামান্য বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ এই বিদ্যালয়ও হইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে হেয়ার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার যত্নে উহা সংস্থাপিত

হয়। স্কুলের সাহায্যের নিমিত্ত বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১০০০০ টাকা ও গোপীমোহন ঠাকুর, ১০০০০ টাকা প্রদান করেন। স্কুলের একটী কমিটি ছিল। গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব, ইঁহারা স্কুলের গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঐ কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। প্রথম গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বশাখের বাটীতে (যেখানে এক্ষণে ওরিএণ্টাল সেমিনরি আছে সেইখানে) স্কুলটী সংস্থাপিত হয়। তাহার পর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাটীতে (এক্ষণে যাহা বাবু হরনাথ মল্লিকের বাটী ও যেখানে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিন হইয়াছিল) লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে স্কুল টিরেটী বাজারে স্থানান্তরিত হয়। তৎপরে ১৮২৬ সালে পটোলডাঙ্গায় সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকায় আনা হয়। ১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী দিবসে ঐ অট্টালিকার মূল প্রস্তর গবর্ণর জেনেরল আমহার্ষ্ট দ্বারা প্রোথিত হয়। ঐ প্রস্তরের উপরে খোদিত লিপি দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উক্ত মূল প্রস্তর হিন্দু কলেজের নামে প্রোথিত হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ অট্টালিকা প্রধানতঃ নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজের জন্য নির্ম্মিত হয়। সেই খোদিত লিপির অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

In the Reign of
His Most Gracious Majesty George the Fourth
Under the Auspices of
The Right Hon'ble William Pitt Amherst
Governor General of the British Possessions in India
This Foundation Stone of this Edifice
The Hindu College of Calcutta
Was laid by
John Pescal Larkins Esquire
Provincial Grand Master of the Fraternity of Free
Masons in Bengal
Amidst the acclamations
Of all ranks of the Native Population of this city
In the Presence of
A Numerous Assembly of the Fraternity
And of the
President and Members of the Committee of
General Instruction
On the 25th day of February 1824 and the
Area of Masonry 5824
Which may God prosper
Planned by B. Buxton Lieutenant
Bengal Engineers
Constructed by
William Burn and James Mackintosh."

হিন্দু অথবা প্রেসিডেনসী কলেজের ইতিবৃত্ত

অদ্য কি আনন্দের দিন! সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী পূর্ব্বে যাহা কলেজে দর্শন করিতাম তাহা আজি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আজি বোধ হইতেছে যে আমরা যেন পুনরায় যৌবনান্বিত হইয়াছি। যৌবন সময়ের ভাব সকল আজি আমাদিগের মনে জাগরূক হইতেছে। এই সম্মিলনের উদ্যোগীগণ কর্ত্তৃক হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমি হিন্দুকলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজকে একই কলেজ মনে করি যেহেতু প্রেসিডেন্সি কলেজ পূর্ব্বকার হিন্দুকলেজেরই অনুক্রম মাত্র। হিন্দুকলেজের ছাত্র, হিন্দুকলেজের পাঠ্য পুস্তক, হিন্দুকলেজের শিক্ষক লইয়াই প্রেসিডেন্সী কলেজ হইয়াছে। অতএব ঐ কলেজদ্বয়কে একই কলেজ রূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য।

নদীর উৎপত্তি স্থান যেমন পর্ব্বতস্থিত ক্ষুদ্র প্রস্রবণ তেমনি যে জ্ঞানালোক হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার উৎপত্তি স্থান হিন্দুকলেজ, অতএব হিন্দুকলেজ কিরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অতি ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু তদ্‌বৃত্তান্ত বলিতে গেলে তাহার পূর্ব্বের ইংরাজী শিক্ষার অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতে হয়।

এতদ্দেশীয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিসনরি রেবরেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিশনরী স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গবর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশতঃ সেই সাহায্য রহিত হয়। তাহার পরে শরবোরণ সাহেব কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। শরবোরণ সাহেব ফিরিঙ্গ ছিলেন। তিনি এক প্রকার বাঙ্গালি ছিলেন বলিলে হয়। শুনিয়াছি, তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটি হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে আরাটুন পিদ্রূস নামে আর একজন সাহেব আর একটি স্কুল সংস্থাপন করেন। ঐ স্কুলে কৃষ্ণমোহন বসু ও রামরাম মিশ্র নামে দুই ব্যক্তি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন বসুর জন্মস্থান দক্ষিণ দেশস্থিত বোড়াল গ্রামে। কৃষ্ণমোহন বসু রাজা রাধাকান্ত দেবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন তাঁহাকে পড়াইতে যাইতেন, তখন মতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন। আমার বোধহয়, এই বিষয়ে তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ শিক্ষক ডাক্তার বুষবি সাহেবের দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিবস রাজা দ্বিতীয় চার্লস বুষবি সাহেবের স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। বুষবি সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার রত্নমণ্ডিত টুপিটা আমাকে দিউন। কেন না আমার ছাত্রেরা আমাকেই ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া জানে। আমার অপেক্ষা আর কেহ যে ইংলণ্ডে বড়লোক আছে, ইহা তাহারা জানিলে আমার মানের হানি হইবে।" বোধহয় কৃষ্ণমোহন বসু বুষবি সাহেবের ন্যায় শিক্ষকের কার্য্য অত্যন্ত সম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, এই জন্য ঐরূপ পোষাগ পরিতেন।

প্রথমে ইংরাজি শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমার একখানি গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে।

''ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কটলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি একজন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন।''

হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের কিছু দিন পূর্ব্বে হেয়ার সাহেব হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন। হেয়ার স্কুল আমাদিগের বর্ত্তমান সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন। প্রথম হেয়ার স্কুলের নাম স্কুল সোসাইটির স্কুল ছিল। হেয়ার সাহেব এই স্কুল সোসাইটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই স্কুল সোসাইটি দ্বারা আমাদিগের দেশের অনেক হিতসাধন হয়। তাঁহারা কলিকাতার কালীতলায় একটী বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটী ইংরাজী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটী। তাঁহারা শহরের বাঙ্গালা পাঠশালার গুরুদিগকে পারিতোষিক দিয়া শিক্ষার উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে গুরুদিগকে উল্লিখিত পারিতোষিক বিতরিত হইত। এই সোসাইটির দ্বারা রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা পোষক ''স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'' গ্রন্থ ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষোপযোগী ''নীতিকথা'' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট ভাল প্রণালীতে একটা বৃহৎ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি হাইকোর্টের পরলোকগত জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব করাতে কার্য্যে পরিণত হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যূষে ভ্রমণ করিবার সময় সার জন হাউড ঈষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। সার জন হাউড ঈষ্ট সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন। তৎপরে হাউড ঈষ্ট সাহেব ও হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৪ সালের ১৪ই মে দিবসে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তিদিগের এক সভা আহ্বান করেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সে সভাতেও কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই। সে সময়ে

হিন্দুসমাজে বিলক্ষণ দলাদলি চলিতেছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই সময়ে ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিই সেই দলাদলির মূল। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দু সমাজস্থ লোকেরা বলিয়াছিলেন, "রামমোহন রায় ইহাতে থাকিলে আমরা থাকিব না।" ইহাতে মহামান্য রামমোহন রায় স্বীয় মহত্ত্ব গুণে বলিয়াছিলেন, "আমি থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংস্রবে থাকিব না।" কিছুদিন এইরূপে আন্দোলন চলিল। পরে ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারী দিবসে স্কুল খোলা হইল। এই স্কুলই পরে উন্নত হইয়া হিন্দু কলেজে পরিণত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের সংস্থাপন কালে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় স্কুলটীকে বটবৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যেমন বটবৃক্ষ সামান্য বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ এই বিদ্যালয়ও হইবে; তাঁহার এই ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে হেয়ার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার যত্নে উহা সংস্থাপিত হয়। স্কুলের সাহায্যের নিমিত্ত বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১০০০০ টাকা ও গোপীমোহন ঠাকুর ১০০০০ টাকা প্রদান করেন। স্কুলের একটী কমিটি ছিল। গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব, ইঁহারা স্কুলের গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঐ কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। প্রথম গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বশাখের বাটীতে (যেখানে এক্ষণে ওরিএন্টল সেমিনরি আছে সেইখানে) স্কুলটী সংস্থাপিত হয়। তাহার পর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাটীতে (এক্ষণে যাহা বাবু হরনাথ মল্লিকের বাটী ও যেখানে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিন হইয়াছিল) লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে স্কুল টিরেটী বাজারে স্থানান্তরিত হয়। তৎপরে ১৮২৬ সালে পটোলডাঙ্গায় সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকায় আনা হয়। ১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী দিবসে ঐ অট্টালিকার মূল প্রস্তর গবর্ণর জেনেরল আমহার্ষ্ট দ্বারা প্রোথিত হয়। ঐ প্রস্তরের উপরে খোদিত লিপি দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উক্ত মূল প্রস্তর হিন্দু কলেজের নামে প্রোথিত হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ অট্টালিকা প্রধানতঃ নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজের জন্য নির্ম্মিত হয়। সেই খোদিত লিপির অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

In the Reign of
His Most Gracious Majesty George the Fourth
Under the Auspices of
The Right Hon'ble William Pitt Amherst
Governor General of the British Possessions in India
This Foundation Stone of this Edifice
The Hindu College of Calcutta
Was laid by
John Pescal Larkins Esquire
Provincial Grand Master of the Fraternity of Free
Masons in Bengal

Amidst the acclamations
Of all ranks of the Native Population of this city
In the Presence of
A Numerous Assembly of the Fraternity
And of the
President and Members of the Committee of
General Instruction
On the 25th day of February 1824 and the
Area of Masonry 5824
Which may God prosper
Planned by B. Buxton Lieutenant
Bengal Engineers
Constructed by
William Burn and James Mackintosh."

এই অট্টালিকার মধ্যদেশে নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজ এবং দুই বাহুতে হিন্দু কলেজ সন্নিবেশিত হইল। এই সময়ে শেষোক্ত বিদ্যালয়টি প্রথম ঐ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে হিন্দু কলেজকে তিন নামে ডাকা হইত, হিন্দু কলেজ, এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান্ কলেজ ও মহাবিদ্যালয়। উহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী পারসি পড়া হইত বলিয়া উহার এক নাম এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান কলেজ ছিল।*

উল্লিখিত মূলপ্রস্তর প্রোথিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সাহেবদিগের মধ্যে এতদ্দেশীয়দিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করির বিধেয়তা বিষয়ে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ইংরাজী শিক্ষার পক্ষ ও কতকগুলি বিপক্ষে ছিলেন, কেবল আরবি পারসি ও সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষ ছিলেন। এই দুই দলে ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল। এই বিবাদ, হিন্দু-কলেজ পটলডাঙ্গায় আসিবার পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া এ ঘটনার পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পরে ১৮৩৫ সালের

---

*উক্ত কলেজের ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট তারিখের প্রদত্ত ৯২ নম্বর সাটিফিকেটে এই সকল ব্যক্তির ইংরাজী স্বাক্ষর দেখা যায়।

	প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
	রসময় দত্ত।
	এ ট্রয়র
জে, সি, সি সদর্লণ্ড	রামকমল সেন
বিজিটর	রাধামাধব বাঁড়ুয্যে
আর, হেলিফেকস	দ্বারকানাথ ঠাকুর
হেড মাষ্টার	রাধাকান্ত দেব
ডেবিড হেয়ার	শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

উক্ত সাটিফিকেটে উহার এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান কলেজ এই নাম দেখা যায়। মেজর ট্রয়র সাহেব সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ছিলেন।

৭ই মে দিবসীয় গবর্ণমেন্টের এক অবধারণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য। মহামান্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ঐ সময়ে গবর্ণর ছিলেন। রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে উক্ত বিষয়ে গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহর্ষ্ট সাহেবকে ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিয়া এক পত্র লিখেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

"To His Excellency the Right Honourable Lord Amherst, Governor General in Council.
My Lord,

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs and ideas, are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances as of the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves and afford our rulers just grounds of complaint at our apathy, did we occasions of importance like the present, to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measure calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.

"The establishment of a new Sanscrit School in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the natives of India by education,—a blessing for which they must ever be grateful, and every well-wisher of the human race must be desirous that the efforts, made to promote it, should be guided by the most enlightened principles so that the stream of intelligence may flow in the most useful channels.

"When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other part of the world.

"While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge, thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude, we already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlighte-

ned nations of the West with the glorious ambition of planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe.

"We find that the Government are establishing a Sanscrit School under Hindu Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago with the addition of vain and empty subtleties since then produced by speculative men such as is already commonly taught in all parts of India.

"The Sanscrit language so difficult that almost a life time is necessary for its acquisition is well-known to have been for ages a lamentable check to the diffusion of knowledge and the learning concealed under this almost impervious veil, is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion or valuable information it contains, this might be much more easily accomplished, by other means than the establishment of a new Sanscrit College, for there have been always and are now numerous professors of Sanscrit in the different parts of the country engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are to be the object of the new seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to their most eminent professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertion.

"From these considerations as, the sum set apart for the instruction of the natives of India was intended by the Government in Enland for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed, since no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Baikarana or Sanscrit Grammar. For instance, in learning to discuss such points as the following; khada, signifying to eat, khadati he or she or it eats; query, whether does khadati taken as a whole conveys the meaning he, she or it 'eats' or are separate parts of this meaning conveyed by distinctions of the word. As if in the English language it were asked how much meaning is there in the eat and how much in thes? And is the whole meaning of the word conveyed by these two portions of it distinctly or by them taken jointly?

"Neither can much improvement arise from such speculation as the following which are the themes suggested by the Vedanta; in what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better member of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence that as father, brother, &C. have no actual entity they consequently deserve no real affection and therefore sooner we escape from them and leave the world the better. Again no essential benefit can be derived by the student of the Mimansa from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronuncing certain passages of the Vedanta and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, &c.

The student of the Naya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how may ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation, the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, etc.

"In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterized, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge the Baconian philosophy would not have been allowed to the sustem of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanscrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislative. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books instruments and other apparatus.

"In representing this subject to your Lordship I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land actuated by a desire to improve the inhabitants and therefore humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship.

I have the honour &c.
Ram Mohan Roy."

রামমোহন রায় এই আবেদন পত্র অমায়িক-স্বভাব ভারতহিতৈষী বিখ্যাত লর্ড বিশপ হিবর সাহেব দ্বারা গবর্ণর জেনারেলের নিকট অর্পণ করেন। হিবর সাহেব এই পত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "The paper for its good English, good sense and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic"। এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

হিন্দু কলেজের নিমিত্ত প্রথমে ১১৩১৭৯ টাকা সংগৃহীত হয়। সেই টাকা জোসেফ বেরেটো কোম্পানী নামক এক পোর্টুগীজ সওদাগরের হাউসে রাখা হয়। তাহার উপস্বত্ব হইতে টাকা লইয়া হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষেরা কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত সওদাগর দেউলিয়া হওয়াতে ২৩০০০ টাকা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই সময়ে কলেজ কমিটী অর্থানুকূল্য জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেন্ট অর্থানুকূল্য প্রদানে সম্মত হয়েন। হিন্দুকলেজ কমিটী ও গবর্ণমেন্টের পক্ষ জেনারেল কমিটী অব পবলিক ইনষ্ট্রক্শন অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা কমিটী, এই দুয়ের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যখন অর্থানুকূল্য করা হইতেছে, তখন সেই অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হয়, তাহা দেখিবার জন্য শেষোক্ত কমিটীর যিনি সম্পাদক হইবেন, তিনি হিন্দুকলেজেরও বিজিটর অর্থাৎ পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হইবেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সাধারণ শিক্ষা কমিটীর সম্পাদক বিখ্যাত উইলসন সাহেব প্রথম ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। উইলসন সাহেব মনে করিতেন যে, হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা বাবু শ্রেণীর লোক ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা পণ্ডিতশ্রেণীর লোক। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর স্বভাবতঃ বিদ্বেষভাব থাকা নিবন্ধন সর্ব্বদা বিবাদের আশঙ্কা কিরিয়া তিনি প্রত্যেক কলেজের চতুর্দ্দিকে শক্ত করিয়া রেল দিয়াছিলেন। উইলসন সাহেবের পর সাধারণ শিক্ষা কমিটীর পর পর সম্পাদক সদর্লণ্ড সাহেব, ওয়াইজ সাহেব প্রভৃতি হিন্দুকলেজের বিজিটর হইয়াছিলেন। জেনারেল কমিটী অব পবলিক্ ইনষ্ট্রক্শন্ অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা কমিটী কোন্সিল অব এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষা সমাজে পরিণত হইলে পর ১৮৪১ সালে যখন সর এডওয়ার্ড রায়েন শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তখন তিনি যেরূপ অর্থানুকূল্য করা হইতেছে সেরূপ তত্ত্বাবধান হইতেছে না, ইহা বিবেচনা করিয়া কমিটির সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, কলেজ কমিটীর সকল সভ্য শিক্ষা সমাজের সভ্য হইবেন এবং শিক্ষা সমাজের সকল সভ্য কলেজ কমিটীর সভ্য হইবেন। কিন্তু যখন কলেজ কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন শিক্ষা সমাজের দুইজন সভ্য এবং তাহার সভাপতি এবং সম্পাদক উপস্থিত থাকিবেন এবং যখন শিক্ষা সমাজের অধিবেশন হইবে তখন কলেজ কমিটির দুইজন সভ্য মাত্র উপস্থিত থাকিবেন। শুদ্ধ এই বন্দোবস্ত হইল তাহা নহে, কলেজ

কমিটীর নাম লুপ্ত হইয়া তদবধি তাহা Section of the Council of Education for the Management of Hindu College অর্থাৎ হিন্দুকলেজের তত্ত্বাবধানার্থ শিক্ষা সমাজের বিভাগ, এই নামে আখ্যাত হইল। তৎপরে ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খৃষ্টীয়ান হইয়া যাওয়াতে কলেজকমিটীর এতদ্দেশীয় সভ্যেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার এবং ইংরাজ সভ্যেরা তাঁহাকে রাখিবার অভিপ্রায় করাতে তাহাদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ নিবন্ধন, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজ কমিটী হইতে অবসৃত হয়েন। এই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, আশুতোষ দেব, রসময় দত্ত প্রভৃতি কলেজ কমিটীর মেম্বর ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেবল রসময় দত্ত সাহেবদিগের পক্ষে ছিলেন। এইরূপ বিবাদ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডেলহাউসি এই প্রস্তাব করেন যে যদ্যপি কলেজকমিটীর এতদ্দেশীয় সভ্যেরা কলেজ নিজে চালাইতে সমর্থ হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা চালাউন, যদি না সমর্থ হয়েন, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক (Sectarian) কলেজ উঠাইয়া দিয়া একটী অসাম্প্রদায়িক কলেজ স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন। হিন্দু কলেজে বর্ণমালা শিক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকাতে লর্ড ডালহৌসী উহাকে Dame's School অর্থাৎ বুড়ির পাঠশালা বলিয়া ডাকিতেন। লর্ড ডালহৌসীর উক্ত প্রস্তাব বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের সূত্রপাত বলিতে হইবে। ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজের প্রথম দুই শ্রেণী লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যখন হিন্দু কলেজের দুই শ্রেণী লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে তখন প্রেসিডেন্সী কলেজকে উহার অনুক্রম বলিতে হইবে। বাহু যেমন হস্তের অনুক্রম, উরু যেমন পদের অনুক্রম, প্রেসিডেন্সী কলেজ সেইরূপ হিন্দু কলেজের অনুক্রম। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু কলেজের সহিত সম্বন্ধবিহীন কলেজ বলিয়া মনে করা অন্যায়। লর্ড ডেলহাউসী কলেজ কমিটীর প্রতি অন্যায় করা হইল বিবেচনা করিয়া কমিটীর সভ্যদিগের সন্তোষার্থ হিন্দু স্কুল সংস্থাপন করেন। ইহাতে কেবল হিন্দুদিগের সন্তান পড়িয়া থাকে। আমার "সেকাল আর একাল" গ্রন্থে গবর্ণমেন্ট যে বিশেষ ইংরাজী কৌশল নিয়োগ দ্বারা কলেজের অধ্যক্ষতা এতদ্দেশীয় লোকদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়েন, উল্লেখ আছে, সেই বিশেষ ইংরাজী কৌশল উপরে বর্ণিত হইল।

এক্ষণে আমি হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকদিগের বৃত্তান্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১৮১৭ সাল হইতে ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত ডেন্‌সেলেম সাহেব হিন্দু কলেজের হেড মাষ্টর ছিলেন। তাঁহার সময়ে টাইটলর, রস, থিওডর ডিকেন্স এবং জন পিটার গ্রান্ট ইঁহারা অন্যতর শিক্ষক ছিলেন। টাইটলার সাহেব সাহিত্য ও গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন বিলক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও গণিত চিকিৎসা বিদ্যা উত্তমরূপে জানিতেন। এতদ্ব্যতীত পারসী ও আরবীতে

ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও সংস্কৃত অল্প অল্প জানিতেন। তিনি একটি কেন্দ্র ছিলেন। ইংরাজী "eccentric" শব্দ আমি "কেন্দ্রবর্জ্জিনী ভাব বিশিষ্ট" এই বাক্য দ্বারা অনুবাদ করিয়া থাকি। মনুষ্য সংক্ষেপ প্রিয়, অতএব ঐ বাক্যের সংকোচ করিয়া লইয়া কেন্দ্রবর্জ্জন ভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শুদ্ধ "কেন্দ্র" বলিয়া ডাকিয়া থাকি। টাইটলার সাহেব একটী "কেন্দ্র" ছিলেন। তিনি এক দিবস তাঁহার বালক পুত্রের ছাগলের গাড়ি চড়িয়া কেল্লার মাঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহেবেরা দেখিয়া অবাক। যে দিবস তাঁহার ছাত্রেরা ম্যাথেমেটিক্স শেখা ফাঁকি দিবার ইচ্ছা করিত, সে দিবস তাহাদিগের মধ্যে একজন একটি সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিত। হয়ত তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিত "নলিনীযুগলতজলবৎ তরলং", তিনি বাঙ্গালায় বলিতেন, "কি বলিলে আবার বল, কি অর্থ ইহার"। এইরূপে ঐ শ্লোকের অর্থের বিচার করিতে করিতে সময় কাটিয়া যাইত, ম্যাথেমেটিক্স পড়া হইত না। একদিন তাঁহার ছাত্রেরা পাঠ্য পুস্তকে "crawl" শব্দ পাইয়াছিল। তাহারা দুষ্টামি করিয়া বলিল যে আমরা ঐ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি না। তিনি তাহার অর্থ নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তবু তাহারা কিছুই বুঝে নাই, এইরূপ ভাণ করিল। পরিশেষে তিনি কি করেন নিজে ভূমিতে "crawl" করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, টাইটলার সাহেব চিকিৎসা বিদ্যা উত্তমরূপে জানিতেন। তিনি গবর্ণমেন্ট দ্বারা সংস্থাপিত তদানীন্তন চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই চিকিৎসা বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষাতে শিক্ষা প্রদত্ত হইত এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু কাটিয়া শরীরবিদ্যা শিখান হইত। যখন মেডিক্যাল কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব হয় তখন টাইটলর সাহেব তাহার বিস্তর আপত্তি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ডফ সাহেব তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজ সংস্থাপনের পক্ষ ছিলেন। রস্ সাহেব কেমিষ্ট্রি বিষয়ে লেকচার দিতেন, তিনি ঐ বিদ্যা ভাল জানিতেন না। তিনি কেবল সোডা পদার্থের গুণ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। উহার গুণই তিনি সর্ব্বদা ব্যাখ্যা করিতেন, এই জন্য ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহার নাম "সোডা" হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "Soda and his pupils" এই শিরস্ক দিয়া এক পত্র তাঁহার বিপক্ষে সম্বাদপত্রে লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত বেরিষ্টর থিওডোর ডিকেন্স ও তাঁহার পর জন পিটর গ্রান্ট আইন বিষয়ে লেকচর দিতেন। এই জন পিটার গ্রান্ট পরে সুপ্রীম কোর্টের জজ হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর গ্রান্ট সাহেবের পিতা।

এই সময়ে ডিরোজিও সাহেব কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন।' ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বালকদিগের মন বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি স্কুলের সময়ে পূর্ব্বে ও পরে বালকদিগের সহিত কথোপকথনচ্ছলে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি তাহাদিগকে Mental Philosophy অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব, ইংরাজী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

তাঁহার উপদেশের প্রভাবে ছাত্রগণের মনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থার উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবীত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার সময় তাহা জপ না করিয়া পোপ নামক ইংরাজী কবি দ্বারা অনুবাদিত হোমর প্রণীত ইলিয়ড কাব্যের পদ সকল মনে মনে পাঠ করিতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কলেজের অধ্যক্ষেরা ভীত হইয়া উঠিলেন। ডিরোজিওর সম্বন্ধে আমার প্রণীত একখানি পুস্তকে যাহা লিখিয়াছি, তাহা এক্ষণে পাঠ করিতেছি—

"ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন। তিনি কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহাকেই অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে তত চিনিত না। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন। হিন্দু কলেজের ভিতর একবার একটি তামাসা হইতেছিল। একটি বালক তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে আড়াল করিয়া তামাসা দেখিতেছিল। তিনি বলিলেন, "My boy you are not transparent" "প্রিয় বালক! তুমি স্বচ্ছ পদার্থ নহ।" তাঁহার এই দেশে জন্ম ছিল। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গী যেমন বলে, "মোদের বিলাত", তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে কবিতাটি তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের একটি পুরাতন-আখ্যানমূলক কাব্যের মুখবন্ধ।

"My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshippped as a deity thou wast,
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou:
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery!
Well let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! One kind wish for thee."

স্বদেশ আমার! কিংবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যায় না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে অভাগা জননি!"*

দুঃখের বিষয় এই যে একজন ফিরিঙ্গী ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন হিন্দু সন্তানকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিত। তিনি কলেজে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তজ্জন্য কলেজের অধ্যক্ষেরা তাঁহারা প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি রাত্রিতে আপনার ইটালিস্থ বাসায় উপদেশ দিবার নিয়ম করিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে এমনি ভালবাসিত যে, অন্ধকার রাত্রি ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাগবাজার হইতে ইটালী যাইতে সঙ্কোচ করিত না। ডিরোজিওর শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে যে পাশ্চাত্ত্য আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল। তাহারা হিন্দু সমাজের নিয়ম সকল অবহেলা করিতে লাগিল। ডিরোজিওর শিষ্যগণের আচরণ হেতু তাঁহার অত্যন্ত নিন্দা হইতে লাগিল, এজন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। হিন্দুকলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার কিছুদিন পরে ডিরোজিও সাহেবের মৃত্যু হয়। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর মাত্র ছিল।"

ডিরোজিও সাহেবের উপরে কলেজের অধ্যক্ষদিগের দ্বারা তিনটি অপবাদ আরোপিত হয়। সে তিনটি অপবাদ এই—ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, পিতামাতার প্রতি অবহেলা করিতে শিক্ষা দেওয়া ও ভ্রাতা ভগিনীর পরস্পর বিবাহ অনুমোদন করা। কিন্তু তিনি

*এই অনুবাদ জন্য আমি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ঋণী আছি।

এ তিনটী অপবাদই অস্বীকার করেন। কলেজের বিজিটর উইলসন সাহেব তাঁহাকে পত্র লেখেন যে, আপনি যদি এ সকল অপবাদ অমূলক বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে কলেজের অধ্যক্ষদিগকে এ বিষয়ে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক জানাইব। তাহাতে তিনি প্রথম অপবাদ সম্বন্ধে এই উত্তর দিয়াছিলেন ;—

Entrusted as I was for sometime with the education of youth, peculiarly circumstanced, was it for me to have made them part as ignorant dogmatists by permitting them to know what would be said upon only one side of grave questions? Setting aside the narrowness of mind which such a course might have evinced it would have been injurious to the mental energies and acquirements of the young men themselves. And (whatever may be said to the country) I can vindicate my procedure by quoting no less orthodox an authority than Lord Bacon. "If a man", says this philosopher (and no one ever had a better right to pronounce an opinion upon such matters than he), "will begin with certainties, he shall end in doubts." This I need scarcely observe is always the case with contented ignorance, when it is roused too late to thought. One doubt suggests another and universal scepticism is the consequence. I therefore thought if my duty to acquaint several of the college students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes and Philo in which the most subtle and refined arguments against theism are adduced. But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more acute replies to Hume—replies which to this day continue unrefuted. This is the head and front of my offending. If the religious opinions of the students have become unhinged in consequence of the course I have pursued, the fault is not mine. To produce conviction was not within my power and if I am to be condemned for the atheism of some, let me receive credit for the theism of others. Believe me, my dear sir, I am too thoroughly imbued with a deep sense of human ignorance and of the perpetual vicissitudes of opinions to speak with confidence even of the most unimportant matters. Doubt and uncertainties besiege us too closely to admit the boldness of dogmatism to

enter an enquiring mind, and far be it from me to say that *"this is"* and *"that is not"* when, after most extensive acquaintance with the researches of science and after the most daring flights of genious, we must confess with sorrow and disappointment that humility becomes the highest wisdom, for the highest wisdom assures man of his ignorance."

দ্বিতীয় অপবাদ সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "আমি এরূপ শিক্ষা কখনই দিই না। আমি নিজে আমার পিতা মাতার অত্যন্ত বাধ্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতার সহিত বিবাদ করিয়া ভিন্ন বাটীতে থাকিবার বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। পরে দেখি যে তিনি আমার বাসার নিকট একটী বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। ইহাতে আমি তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলাম যে, এ বিষয়ে তুমি কেন আমাকে জিজ্ঞাসা কর নাই।" তৃতীয় অপবাদ সম্বন্ধে ডিরোজিও সাহেব এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "I never taught such absurdity।" "এইরূপ অসঙ্গত ভ্রম কখনই শিখাই নাই।" তিনি তাঁহার পত্র এই বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন, "যাহা হউক আমি এই সকল অপবাদের জন্য বড় দুঃখিত আছি। আমি জানিতে পারিয়াছি যে বৃন্দাবন ঘোষাল নামক এক ব্রাহ্মণ, যাহার কর্ম্ম কেবল বাবুদিগের নিকট গল্প করিয়া বেড়ানো, সেই এই সকল মিথ্যা অপবাদ আমার নামে রটনা করিয়াছে।" ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনা জন্য আমরা হেয়ার সাহেবের নিকট ও তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামতনু লাহিড়ী প্রধান। তাঁহার ছাত্রেরা যে তাঁহার কত প্রিয়পাত্র ছিল ও তিনি তাঁহাদিগের কত আশা করিতেন ও তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার কত যত্ন ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

"To the Students of the Hindu College.

"Expanding like the petals of young flowers,
I watch the gentle opening of your minds
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers, that stretch
(Like young birds in soft summer hour)
Their wings to try their strength O how the winds
Of circumstance, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds

Of new perceptions shed their influence,
And how you worship Truth's Omnipotence!
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Weaving the chaplets you are yet to gain
And then I feel I have not lived in vain."

ডিরোজিওর আশা সফল হইয়াছে। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন।

ডিরোজিও সাহেবের পরে স্পীড সাহেব হিন্দু-কলেজের হেড মাষ্টর হয়েন। তিনি অতি কঠোরস্বভাব ছিলেন, তিনি লাষ্ট ক্লাশ হইতে বেত মারিতে আরম্ভ করিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশে আসিয়া নিরস্ত হইতেন। ইনি "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনর" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন ও এতদ্দেশে এরারুটের চাষ প্রথম আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রফেসর পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিন্সিপল হয়েন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত গমন করেন। তিনি সদ্বিদ্যাশালী সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল। তিনি অতি সুন্দররূপে সেক্সপিয়র বুঝাইয়া দিতে পারিতেন ও অতি মনোহররূপে সেক্সপিয়র আবৃত্তি করিতেন। মেকলে সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "I can forget everything of India, but I can never forget your reading of Shakespeare." "বিলাতে যাইলে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় ভুলিতে পারি, কিন্তু তুমি যেমন করিয়া সেক্সপিয়র পাঠ কর, তাহা কখন ভুলিতে পারিব না।" রিচার্ডসন সাহেবের নাম উচ্চারণ করিলে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের মর্মজ্ঞ করিতে ও তাহাদিগের মনে তদ্বিষয়ে সুরুচি উৎপাদন করিতে তিনি যেমন পারগ ছিলেন, এমন অল্প লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বালকদিগের সহিত কাপ্তেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল, এমন কি পরিহাস পর্য্যন্ত চলিত। কোন ছাত্র "Amiss" এ শব্দকে "য়্যামিস না বলিয়া এমিস বলিয়া উচ্চারণ করিলে তিনি তাহাকে বলিতেন, "you are a miss"। সে বালক লজ্জায় আর এরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ করিত না।

এই সময়ে হ্যালফোর্ড সাহেব নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি শব্দশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কথোপকথনের সময়ে বড় বড় কথা ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে এক দিবস কোন স্কুলের অধ্যক্ষ পারিতোষিক বিতরণের সভায় সভাপতির কার্য্য করিতে অনুরোধ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, I am a vegetable being averse to locomotion." "আমি কোথাও যাই না। আমি চলৎশক্তি রহিত একটি

উদ্ভিদ।”

ঐ সময়ে ক্লিণ্ট সাহেব নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি গণিত ও সাহিত্য উভয় শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রিচার্ডসনের খ্যাতিতে অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট রিচার্ডসন সাহেবের সুখ্যাতি করিলে তিনি বলিতেন যে, “A ship in India is but a boat in England” “ ভারতবর্ষের জাহাজ বিলাতের নৌকা মাত্র।” তিনি “boat” শব্দকে “bout” এইরূপ উচ্চারণ করিতেন। ১৮৪৩ অব্দে রিচার্ডসন সাহেব বিলাতে যান। ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত কর সাহেব প্রিন্সিপল পদে নিযুক্ত ছিলেন। আপাততঃ তাঁহাকে অতি কঠোর স্বভাব বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি সেরূপ ছিলেন না। তাঁহার হৃদয় স্নেহার্দ্র ছিল। তিনি বিলাতে গিয়া “Domestic Economy of the Hindus” এবং “Glimpses of Ind.” নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন সাহেব পুনরায় বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেশর পদে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে তিনি হুগলী কলেজের প্রিন্সিপল হয়েন। তৎপরে ১৮৪৮ অব্দের নভেম্বর মাসে পুনরায় হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল হয়ে। কৌন্সিলের মেম্বর মহাত্মা বীটন সাহেব তখন শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন। বীটন সাহেব কলেজের অধ্যক্ষদিগকে এই অনুরোধ করেন যে কাপ্তেন সাহেবের চরিত্র মন্দ, অতএব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা উচিত। পরে ১৮৪৯ অব্দে নভেম্বর মাসে তিনি কর্ম্মচ্যুত হয়েন। ১৮৪৯ অব্দ হইতে ১৮৫৪ পর্য্যন্ত লজ সাহেব প্রিন্সিপলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইলে সট্‌ক্লিফ সাহেব তাহার প্রিন্সিপল হয়েন। তিনি অতি সুখ্যাতির সহিত এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মধ্যে ১৮৫৯ ও ’৬০ অব্দে সটক্লিফ সাহেব ছুটি লইলে ক্লিণ্ট সাহেব কয়েক দিবস প্রিন্সিপলের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় মেজর রিচার্ডসন সাহেব (কাপ্তেন রিচার্ডসন বিলাতে অবস্থিতি কালে “মেজর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।) পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়া কিছুদিনের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। অধুনাতন কালের শিক্ষকদিগের মধ্যে কাউএল সাহেব, ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব, টনি সাহেব ও বাবু প্যারীচরণ সরকার বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এক্ষণে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের যে যে ছাত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদেগের নাম উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। পরলোকগত কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইনি একজন ইংরাজী কবি ও সুলেখক ছিলেন। ইনি ইংরাজী পদ্যে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সে খানির নাম “Shair and other poems”। “শায়ের” পারশি শব্দ। উহার অর্থ কবি। এই কাব্যে একটী কবির অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। কাপ্তেন সাহেব তাঁহার সঙ্কলিত ইংরাজী কবিতার সার সংগ্রহে কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত একটী কবিতা তুলিয়াছেন। তাহার

শিরস্ক "Gold River"। তিনি বাঙ্গালী দ্বারা রীতিমত সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদপত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদপত্রের নাম "Hindu Intelligencer" ছিল। তাহা সিপাহীদিগের বিদ্রোহের সময় রহিত হয়।

পরলোকগত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—ইতি বিখ্যাত সদ্বক্তা জর্জ টমশনকে বিশেষরূপে সাহায্য করেন। বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপন করেন। তৎকালে ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদকগণ বিদ্রূপ করিয়া উক্ত সভাকে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নামে "Chuckerbutty Faction" বলিয়া ডাকিত। এই সভা ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংস্থাপিত "Landholders Society" এই দুই সভা উঠিয়া গেলে বর্ত্তমান "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" সংস্থাপিত হয়। উহা সংস্থাপিত হইলে প্রথমোক্ত দুই সভার অধিকাংশ সভ্যগণ ইহার সভ্য হয়েন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী রামমোহন রায়ের একজন প্রধান সহচর ছিলেন।

বাবু চন্দ্রশেখর দেব—ইনি একজন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি প্রথম ডেপুটী কালেক্টর ও তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সভার মেম্বর হইয়াছিলেন। ইনি রামমোহন রায়ের নিকট ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন। ইনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি অতি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক ও অতি সুবিজ্ঞ ব্যক্তি।

পরলোকগত রামগোপাল ঘোষ—ইঁহার বাগ্মিত্বশক্তি অতি প্রসিদ্ধ। বিলাতের "সন্" নামক একখানি কাগজ ইহাকে "ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস্" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

পরলোকগত রসিককৃষ্ণ মল্লিক—ইনিও সেকালের একজন প্রধান সদ্বক্তা ছিলেন।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—ইঁহাকে অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জ্জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অযোধ্যার বর্ত্তমান শ্রী সৌভাগ্যের মূল তিনি। একজন বাঙ্গালী অযোধ্যার পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তথাকার শূরত্ব-মদ-মত্ত বীরপুরুষ ক্ষত্রিয়দিগকে যদৃচ্ছারূপে চালাইয়া অযোধ্যার উন্নতি সাধন করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের দেশের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

বাবু রামতনু লাহিড়ী—ইনি একজন অতি সরল ও সত্যনিষ্ঠ লোক। "An honest man is the noblest work of God" ইনি এই বাক্যের জাজ্বল্যমান উদাহরণ স্বরূপ। বিখ্যাত নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার প্রণীত "সুরধুনী" কাব্যে বলিয়াছেন যে, ইঁহার সংসর্গে একদিন থাকিলে দশদিন ধার্ম্মিক থাকা যায়।

পরলোকাগত রাধানাথ শিকদার—ইনি গণিতবিদ্যা অতি-উত্তমরূপে জানিতেন। ইতি অতি বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। এ নিমিত্ত দুঃস্বভাব ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বনিত না। সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ হইত। ইনি বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ

করিয়া পণ্ডিতী ভাষার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচনা করিবার দৃষ্টান্ত প্রথম প্রদর্শন করেন।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র—ইনি বাঙ্গলা ভাষার হাস্যকর উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি এ প্রকার উপন্যাস প্রণয়নে ফিলডিংএর ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ফিল্ডিং-এর অশ্লীলতা ইঁহার রচিত গ্রন্থে নাই। তাহা নীতিগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ।

অনরেবল দিগম্বর মিত্র—ইনি আমাদের দেশের একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইনি অতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি ও সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন।

পরলোকগত রমাপ্রসাদ রায়—ইনি রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন ও এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে প্রথম নিযুক্ত হয়েন। ইনি মৃত্যুকালে ঐ কর্ম্মের নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক্ষণে উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাইতেছি। এ পত্রে আমার কি হইবে?"

পরলোকগত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন।

পরলোকগত কিশোরীচাঁদ মিত্র—ইনি ইংরাজীতে সুলেখক ছিলেন।

পরলোকগত মাইকেল মধুসূদন দত্ত—ইনি বিখ্যাত কবি ও নাটককার। অনেকে ইঁহাকে বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া জ্ঞান করেন।

বাবু প্যারীচরণ সরকার—ইনি আমাদিগের দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক ও সুরাপান নিবারণী সভার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহার সাধুচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয় নাই।

বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—ইনি অতি বিদ্বান্ ব্যক্তি ও বাঙ্গালা ভাষায় গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উত্তম উত্তম পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ইনি বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি অতি দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত স্কুল ইন্সপেক্টরী কার্য্য করিতেছেন।

পরলোকগত দ্বারকানাথ মিত্র—ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ইঁহার ন্যায় প্রখর বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। ইঁহার বিচারদক্ষতা দেখিয়া ইংরাজগণ চমৎকৃত হইতেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন—ইনি আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক। কেশববাবুর যে দোষ থাকুক না কেন, তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন ও ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তি, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বিলাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক বাক্য অনুমোদন করা যাইতে পারে না। তথাপি একজন বাঙ্গালী আমাদিগের রাজপুরুষদিগের দেশে গিয়া তথায় ধর্ম্মবিষয়ে একটী সাধারণ আন্দোলন উদ্রিক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা আমাদের দেশের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্র—ইনি বিখ্যাত নাটককার। ইনি বঙ্গভাষায় অনেক ভাল ভাল নাটক লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের অনেক উপকার করিয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—ইনি একজন অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও স্বদেশে ইউরোপীয় বিজ্ঞান-জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট উপন্যাস সকল প্রণয়ন করিয়া অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি বঙ্গভাষায় একজন বিখ্যাত কবি।

বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—ইনি কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি। বাঙ্গালীদিগের কতদূর রাজনীতিজ্ঞতা ও সচীবকার্য্যে দক্ষতা হইতে পারে, তাহা রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

বাবু আনন্দমোহন বসু, র‍্যাঙ্গলার—ইনি কলেজে অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিলাতে গমন করিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথায় র‍্যাঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কোন বাঙ্গালী অদ্যবধি এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইনি ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টর পদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সময়াভাবে অন্যান্য ছাত্রগণের নাম করিতে অক্ষম হইলাম। হয়ত এমন হইতে পারে যে, আমি যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদিগের তুল্য বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

হিন্দু কলেজের আদর্শে হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ প্রভৃতি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজী শিক্ষার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল এখনও ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমরা শারীরিক বল লাভ করিব, সাহসী হইব, অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতা প্রিয় হইব। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন আমরা স্বাধীনরূপে কলেজ সকল সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইব, খৃষ্টান বিবিদিগের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীন স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিব, কবিতা ও উপন্যাস ইংরাজী অনুকরণে পরিপূর্ণ না করিয়া আমাদের নিজের প্রকৃতিগত ক্ষমতাকে স্ফূর্তি প্রদান করিব, স্বাধীন রূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া করিতে সক্ষম হইব, স্বাধীনরূপে উপজীবিকা আহরণ করিব, অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব, ইংরাজী রীতিনীতি অন্ধরূপে অনুকরণ না করিয়া জাতীয় প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারি তাহা রক্ষা করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হইব এবং কেবল গবর্ণমেন্টের নিকট বালকবৎ রোদন না করিয়া আমাদিগের রাশ্ এরূপ ভারী করিয়া তুলিব যে, গবর্ণমেন্ট আমাদিগের আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না।

অদ্যকার সম্মিলন অতিশুভ ঘটনা। ইহার দ্বারা অন্য কোন উপকার যদি না

হয় অন্ততঃ এই উপকার তো হইল যে, আযৌবন-পরিচিত সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী অদ্য আমরা দেখিতে পাইলাম। সেই সকল মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া জীবনের সেই অতি সুখদ পরম মনোহর কাল স্মরণ হইতেছে, যখন আমরা এক বেঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিতাম। ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। এই সম্মিলন প্রকাশ করিতেছে যে আমাদিগের চিত্ত কেবল সামান্য অর্থ চিন্তায় বদ্ধ নহে—তাহা কেবল সামান্য অন্নপানের জন্য ব্যস্ত নহে। ইহাতে প্রদর্শন করিতেছে যে আমাদিগের জ্ঞানের জন্য ক্ষুধা ও সৌহার্দ্দ রস পানের জন্য পিপাসা আছে। বৎসর বৎসর এই প্রকার সম্মিলন দ্বারা ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে তাহা কে বলিতে পারে? এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইলে যে কোন সৎ প্রসঙ্গ ও সৎ প্রস্তাব উত্থিত হইবে না, ইহা অতি অসম্ভব। সেই সকল সৎপ্রসঙ্গ ও সৎ-প্রস্তাব হইতে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে তাহা কে জানে? অবশেষে সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগকর্ত্তাদিগকে ও সকল সাধারণ অনুষ্ঠানে উৎসাহী যে রাজভ্রাতৃদ্বয় এই শোভন উদ্যান বর্ত্তমান অনুষ্ঠান জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং ঈশ্বরের নিকট জ্ঞানাহার ও সৌহার্দ্দ-রসামৃত পানের* একটী প্রধান উপায় এই সম্মিলনের স্থায়ীত্ব জন্য প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।**

* "Feast of reason and flow of soul."

**এই হিন্দু কলেজের পুরাবৃত্ত আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ঐ কলেজের পুরাবৃত্তের পাণ্ডুলিপি এবং তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং আমি যাহা নিজে জানি, তাহা অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইল। হরমোহন বাবুর পুরাবৃত্ত ডিরোজিওর সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছে। হরমোহন বাবু কলেজের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগেরই ইতিহাস বিশেষরূপে জানেন। আমরা ভরসা করি, তিনি কলেজের সম্পূর্ণ পুরাবৃত্ত প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া সাধারণবর্গকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

[আমি অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই বক্তৃতার দিবস হইতে এক বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরমোহন বাবু তাঁহার বন্ধুদিগকে শোকাকুল করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।]

মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে ব্রহ্মোপাসনা*।

কি নিভৃত স্থান! কি শান্তিভাবে পরিপূর্ণ! মনোমধ্যে কি প্রগাঢ় শান্তি-রসের আবির্ভাব হইতেছে! এই মহা প্রাচীন তপোবনে প্রবেশকালে আমাদিগের স্বর স্বভাবতঃ মৃদু হইয়া আসিল। বোধ হইতেছে যেন, তপঃস্বাধ্যায়নিরত মহর্ষি বাল্মীকির আত্মা অদ্যাপি এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। যখন আমরা মনে করি যে তিনি এই তপোবনে রামায়ণের প্রারম্ভে পরিকীর্ত্তিত যে অজ নির্গুণ গুণাত্মক লোকধারী পুরুষের উপাসনা করিতেন, আমরা অদ্য এখানে প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর পরে সেই নিরতিশয় মহান্ পুরুষের উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা মনে করি যে তিনি যে ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে উপনিষদের শ্লোক সকল তিনি পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দরস পান করিতেন, সেই সকল উপনিষদের শ্লোক আমরা পাঠ করিয়া অদ্য সেই ব্রহ্মানন্দ-রস পান করিতেছি, তখন আমাদিগের মনে কি বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হয়! ইহাতে বোধ হইতেছে যে যাবৎ গিরি ও স্রোতস্বতী সকল মহীতলে স্থিতি করিবে, তাবৎ ব্রহ্ম নাম, তাবৎ প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম এই ভারতমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে সকল গভীর মহোচ্চ সত্য-ভাব-প্রতিপাদক

---

*মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন ব্রহ্মাবর্ত্তে স্থিত। ব্রহ্মাবর্ত্ত অর্থাৎ বিঠুর গ্রাম, কানপুরের অতি সন্নিকট। এইরূপ প্রবাদ আছে যে তথায় মহর্ষি বাল্মীকি বাস করিতেন। অদ্যাপি লোকে এক বিশেষ বন তাঁহার তপোবন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উহার অনতিদূরে সীতাপরিহার নামে এক স্থান আছে, লোকে বলে যে ঐ স্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যান। ঐ স্থানে পরিহারমন্দির নামক একটী অপূর্ব্ব মন্দির আছে। কত রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু এই তপোবন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কোন অত্যাচারী মুসলমান রাজা অথবা ভূস্বামী তাহা স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। উপাসনা কার্য্য দুই প্রহরের সময় তপোবনের অভ্যন্তরে পিলু বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় সম্পাদিত হইয়াছিল; এই পিলু বৃক্ষ আর্য্যাবর্ত্তের অপর দুই এক তীর্থস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। তপোবনের বৃক্ষসকল দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কালক্রমে তাহাদের শাখা সকল কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই বক্তৃতার অন্তর্গত কতিপয় শব্দ ও বাক্য বাল্মীকির রামায়ণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। সেই দিবস অপরাহ্নে নদীতীরে বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তির বিষয় বলা হয়। সেই বক্তৃতা হইতে "ভাবী ব্রাহ্ম কবি বর্ণন" এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শব্দ আমাদিগের প্রাচীন ঋষিরা হিমবৎ গুহাদি হইতে নিঃসারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই সকল শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি, তখন স্বদেশপ্রেমাগ্নি আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে কিরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। হে ব্রাহ্মগণ! ইহা তোমাদিগের পৈতৃক ধন; এই পৈতৃক ধনকে তোমরা কখন অবহেলা করিও না। এই পৈতৃক ধনের সাহায্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা ভারতরাজ্যে উড্ডীন হইবে। ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপাদক এরূপ বাক্য অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদিগের দেশের বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যেমন বৈকুণ্ঠের কথা আছে, তেমনি অন্য অন্য জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর সর্ব্বস্থান অপেক্ষা এক বিশেষ স্থানে অধিকতর প্রকাশমান আছেন। উপনিষদে ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ হীন ভাব দৃষ্ট হয় না। উপনিষৎকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর "বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্।" ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ, কিন্তু সৃষ্ট মনের গুণ সকল তাঁহাতে কিছুই নাই। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর "অমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম্" "তিনি মন রহিত, তেজ রহিত, প্রাণ রহিত, মুখ রহিত, উপমা রহিত"। এরূপ মহোচ্চ ভাবে অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-বক্তা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই সকল অপ্রমেয় গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য যাঁহারা উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল বাক্য-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের প্রতি এমত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যাহা অন্য লোকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহারা কি মহাত্মা ছিলেন! সেই সকল শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি মহাত্মাদিগের যে দোষ থাকুক না কেন, তাঁহাদিগের কতকগুলি অসাধারণ গুণও ছিল। তাঁহাদিগের চারটি গুণ অনুকরণ করিবার যোগ্য।

প্রথমতঃ, ঋষিরা ঈশ্বর-গত-প্রাণ ও ঈশ্বর-গত-চিত্ত ছিলেন; তাঁহারা পরমাত্মাতে ক্রীড়া ও পরমাত্মাতে রমণ করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদনে অতীব যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বর-স্মরণ নিশ্বাসপ্রশ্বাসবৎ সহজ ও স্বভাব-সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের এই রূপ যোগ সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। পরমাত্মার সহিত সকল বস্তুর স্বাভাবিক যোগ আছে; তিনি যদি আপনাকে সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে এখনই সকল বস্তু বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মার আত্মার সঙ্গে আত্মারও স্বভাবতঃ নিগূঢ় যোগ আছে। পরমাত্মা যদি জীবাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে জীবাত্মা এখনই বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়। সচরাচর যাহাকে যোগ বলে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার যে স্বাভাবিক যোগ আছে, তাহা উজ্জ্বল রূপে সর্ব্বদা অনুভব করা। কিন্তু সেই রূপ যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া

যেন আমাদিগের অন্যান্য মহান্ কর্ত্তব্য সকল বিস্মৃত না হই। আমাদিগের মনে যেন এই সত্যি সর্ব্বদা জাগরূক থাকে যে সংসারই সমাধির পরীক্ষাক্ষেত্র। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন কালে যদি ঈশ্বর-স্মরণ আমাদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে, তবে তাহাই যথার্থ যোগ। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম ঋষিরা যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য, "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্টঃ" "যিনি পরমাত্মাকে ক্রীড়া করেন, যিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন ও সৎক্রিয়াম্বিত হয়েন, তিনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

দ্বিতীয়তঃ ঋষিদিগের ন্যায় আমাদিগের শান্তপ্রকৃতি হওয়া কর্ত্তব্য। শান্ত সমাহিত না হইলে ঈশ্বর-স্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না। আমাদিগের দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন না করিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। যদি আমরা প্রবৃত্তি-স্রোত দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষীয়মান হই, তবে আমরা ঈশ্বরের অধীন কি রূপ হইতে পারি? ঋষিরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
না শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্নয়াৎ॥"

ঋষিরা ঈশ্বরকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিতেন, কিন্তু শান্ত রূপে উপাসনা করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের অসামান্য প্রীতি ছিল। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ধন মান সকলই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরকে শান্ত রূপে উপাসনা করিতেন। তাহারা বলিয়া গিয়াছেন "প্রিয়মুপাসীত" কিন্তু "শান্ত উপাসীত"। ইহা যথার্থ বটে যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি অত্যন্ত উষ্ণ রূপ ধারণ করে; এমন কি উপাসককে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু যতই প্রীতি প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হয়, ততই তাহা উষ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করে। প্রিয় পত্নীর সহিত নব প্রণয় কালে প্রীতি কি উষ্ণরূপ ধারণ করে? কিন্তু যতই তাঁহার প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যতই তাহা কাল সহকারে প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হইতে থাকে, ততই তাহার উষ্ণতা তিরোহিত হয়। বন্ধুর প্রতি প্রীতিও তদ্রূপ জানিবে। অভিনব প্রীতি একরূপ; পরিপক্ক প্রীতি অন্যরূপ। ঈশ্বর শান্ত-স্বরূপ; যদি আমাদিগের প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অনুগত করা ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হয়, তবে শান্তস্বরূপ ঈশ্বরকে শান্তভাবে উপাসনা করা বিধেয়। শান্ত ভাবে সর্ব্বদা ঈশ্বরের মাধুর্য্যের গাঢ় আস্বাদনই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। কোন ঋষি এই রূপ উক্তি করিয়াছেন যে,—

"নিস্তরঙ্গোঽতিগম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দসুধার্ণবঃ।
মাধুর্য্যৈকরসাধার এক এবাস্তি সর্ব্বতঃ॥"

"ঈশ্বর নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর নিবিড় আনন্দস্বরূপ, সুধাসমুদ্র, মাধুর্য্য রসের এক

মাত্র আধার ও সর্ব্বস্থানব্যাপী।" যাঁহার হৃদয় হইতে এই শ্লোক নিঃসৃত হইয়া ছিল, তিনি কি রূপ ঈশ্বর-প্রেমী না ছিলেন। "ঈশ্বর সুধাসমুদ্র ও মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার" যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের মাধুর্য্য ও শান্তি কি রূপ আস্বাদন না করিয়াছিলেন। যে মহর্ষি এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বশিষ্ঠ; তিনি কত বার এই তপোবনে আগমন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে ব্রহ্মপ্রসঙ্গ করত ব্রহ্মানন্দপীযূষ পান করিয়াছিলেন; আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও এখানে সেই প্রসঙ্গ করত সেই পীযূষ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

তৃতীয়তঃ, মহর্ষিরা যশস্পৃহা-শূন্য ছিলেন। এবিষয়ে তাঁহাদিগের অনুকরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। আমরা সংবাদ পত্রে কোন প্রস্তাব লিখিলে, আমরা সেই প্রস্তাবের লেখক ইহা লোককে জানাইবার জন্য কতই ব্যগ্র না হই, কিম্বা বক্তৃতা করিয়া প্রশংসা-সূচক যথেষ্ট করতালি প্রাপ্ত না হইলে আমরা কতই ক্ষুণ্ণ না হই, কিন্তু মহর্ষিরা এই রূপ যশোলোলুপ ছিলেন না, তাঁহারা আপনাদিগের নাম না দিয়া কতই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কত ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আছে, যাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার কোন নাম নাই। মহর্ষিরা যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, তাঁহারা অস্থায়ী যশের জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, জগতের মঙ্গল সাধন হইলেই তাঁহারা সন্তোষ লাভ করিতেন। কিসে জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয়, সেই বিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রম ছিল; ভ্রম-শূন্য মনুষ্য কোথায় আছে? কিন্তু জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদিগের কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

চতুর্থতঃ, ঋষিরা আড়ম্বর-প্রিয়তা-শূন্য ছিলেন। তাঁহাদের ব্রহ্মোপাসনায় আড়ম্বর ছিল না। ব্রহ্মোপাসনায় আড়ম্বর যত বৃদ্ধি পায়. ততই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য না থাকিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি লোকের মনোযোগ বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া তাঁহার মাধুর্য্য ক্রমাগত আস্বাদন করার সঙ্গে বাহ্যাড়ম্বর সঙ্গত হয় না।

ঋষিদিগের এই সকল গুণ অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদিগের দোষ অনুকরণে যেন আমরা প্রবৃত্ত না হই; শান্তভাব অবলম্বন করিতে গিয়া লোক-সমাজের প্রতি আমাদিগের মহান্ কর্ত্তব্য সকল যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ঋষিরা লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, যেমন ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হইবে, তেমনি তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনও করিতে হইবে। এই দুই এর সমন্বয় অতি দুষ্কর কার্য্য, কিন্তু তাহা অবশ্য আমাদিগকে সম্পাদন করিতেই হইবে।

হে নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর শান্তি-সমুদ্র! হে নিবিড়-আনন্দ-স্বরূপ! হে সুধা-পারাবার! হে মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার! তোমার প্রতি আমাদিগের মনকে আকর্ষণ কর, যাহাতে আমরা তোমার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদন করিতে পারি,

যাহাতে তোমার মনন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় নিয়ত সম্পাদিত হইয়া সহজ ও আমাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, এমত ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান কর। হে "শান্ত শিব অদ্বৈত!" আমাদিগের মনে অপার শান্তি প্রেরণ কর, দুরন্ত ইন্দ্রিয় সকল আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আমাদিগকে রক্ষা কর। ঋষিদিগের বলবৎ স্কন্ধের উপর তুমি অপেক্ষাকৃত লঘুভার অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের ক্ষীণ স্কন্ধের উপর তুমি অতীব গুরুভার অর্পণ করিয়াছ। কি রূপে তোমার প্রতি প্রীতি ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের সমন্বয় সম্পাদন করিব এই চিন্তাতে আমরা আকুল হইতেছি। এক এক বার সংস্কারের ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া যখন আমরা ভয়েতে ম্রিয়মাণ হই তখন বোধ হয় যে ঋষিরা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া একপ্রকার ভালই করিতেন; কিন্তু লোক-সমাজের প্রতি আমাদিগের মহান্ কর্ত্তব্য যখন স্মরণ করি, তখন লোক-সমাজের দিকে আমাদিগের মন অতিশয় হেলিত হয়। হে নাথ! আমরা বিষম শঙ্কটে পতিত হইয়াছি, আমাদিগের ক্ষীণ স্কন্ধ এ দুঃসহ ভার সহ্য করিতে অক্ষম হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের স্কন্ধকে কেন আমরা ক্ষীণ মনে করিতেছি? যখন তুমি আমাদিগের প্রতি ঐ ভার অর্পণ করিয়াছ তখন অবশ্য আমাদিগকে উপযুক্ত বল প্রদান করিবে। আমাদিগের চিত্ত যেন সর্ব্বদা তোমাতে সমর্পিত থাকে। দিগ্ যন্ত্রের শলাকা যেমন উত্তর মুখে সর্ব্বদা অবস্থিত থাকে, সেই রূপ আমাদিগের আত্মা যেন সর্ব্বদাই তোমার দিকে অভিমুখীন থাকে। হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রুবতারা! তোমার জ্যোতি দর্শন করিয়া জীবন-সমুদ্রে যেন আমরা পোত পরিচালনা করিতে সমর্থ হই। যদি পোতের কম্পিত ভাব বশতঃ সেই জ্যোতি আমরা জীবন-সমুদ্রের উপর কম্পিত ভাবে দর্শন করি, তথাপি তাহা যেন কখন আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মেদিনীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২৩ মাঘ ১৭৭৫ শক।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠে প্রতীত হইবে, যে, সমুদয় সভ্য জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে এক এক মহানুভব ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম সংশোধন পূর্ব্বক তাহার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই মহোপকারী গুরুতর কার্য্য সম্পাদনার্থে অতীব যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য স্বদেশস্থ লোকের

প্রিয় না হইয়া তাহাদিগের নিন্দার ভাজন ও নিগ্রহের আস্পদ হইয়াছিলেন। এইরূপ ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য, ইউনান দেশে সোক্রাৎ ও জরমেনি দেশে লূথর নামক মহাত্মা ব্যক্তিদিগের উদয় হইয়াছিল। সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আমারদিগের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে অপ্রকাশ ছিল। সকল লোকে অখণ্ড চরাচর ব্যাপ্ত পরমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন রূপে উপাসনা করিতেছিলেন; সত্য কথন ও সত্য ব্যবহাররূপ পরম ক্রিয়া অবহেলা করিয়া, কেবল হোম পূজাদি বাহ্য অনুষ্ঠানকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেছিলেন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত অনেক তামসিক ব্যাপার মিশ্রিত করিয়া ধর্ম্মের আকার বিকৃত করিয়াছিলেন। এমত সময়ে ধর্ম্মসংস্কারের উষার আভাস চক্ষুগোচর হইল। মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্ম সংস্কারের শুক্র তারকের ন্যায় উদিত হইলেন। তিনি স্বদেশের ধর্ম্ম মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত দেখিয়া অত্যন্ত তাপযুক্ত হইলেন এবং তাহা পুনর্জীবিত করিবার জন্য নানা যত্ন করিলেন। তিনি এই মহৎ ও পবিত্র কার্য্যে কি পর্য্যন্ত আয়াস স্বীকার না করিয়াছিলেন? তিনি এ নিমিত্তে গুরু লোকের দ্বেষ, পরিবারের দ্বেষ, স্বজাতীয়ের দ্বেষ, সকলেরি বিদ্বেষ ভাজন হইয়াছিলেন। অন্যায় পরায়ণ অত্যাচারী রাজা কর্ত্তৃক কোন কারারুদ্ধ বন্দিকে বিমুক্ত করিবার জন্য যদি এক জন সম্যক্‌ চেষ্টা পায়, আর সেই বন্দি যদি আপনার হিতকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে কি আক্ষেপের বিষয় হয়! রাজা রামমোহন রায় তাঁহার স্বদেশস্থ লোকদিগকে অযুক্ত কল্পিত ধর্ম্মের কারাগার হইতে বিমুক্ত করিয়া পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অনাবৃত সুখপ্রদ বিশুদ্ধ সমীরণে আনয়ন করিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণের প্রতি আঘাত করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। এতদ্দেশে সেই মহাত্মা ব্যক্তির উদয় যদি না হইত, তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারে ও অধর্ম্ম-জালে অদ্যাপি আবৃত থাকিতাম, তাঁহার নিকট আমারদিগের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত! যিনি আমারদিগের জন্য সত্য-রূপ মহারত্ন বহু আয়াসে উদ্ধার করিয়াছেন, ও যিনি আমারদিগের দুস্তর সংসার পারের সেই একমাত্র উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাক্য পাওয়া সুকঠিন।

রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অতীব যত্ন পাইয়াছিলেন, সে ধর্ম্মের বীজ এই;—

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ।
তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব-
মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়

সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল দেশীয় জ্ঞানী মনুষ্যের ঐক্য স্থল। এই ধর্ম্মানুযায়ী বাক্য অধিক বা অল্পাংশ সকল দেশের ধর্ম্ম পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধর্ম্ম দ্যুলোকে ও ভূলোকে, বাহিরে ও অন্তরে, অবিনশ্বর জাজ্বল্যমান অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ভাব ও বুদ্ধি এ ধর্ম্মের জনক জননী, আলোচনা ইহার ধাত্রী, জ্ঞানিদিগের উপদেশ ও ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ-সকল ইহার অন্নপান।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" এই ধর্ম্মের সার বাক্য। ঈশ্বরকে প্রীতি করাই প্রধান ধর্ম্ম, তাহা হইতে শাখা-স্বরূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন নির্গত হইয়াছে। যেমন মীন জল ব্যতীত থাকিতে পারে না, জলই যেমন তাহার জীবন স্বরূপ; তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি সতত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, ঈশ্বর-গুণ কীর্ত্তন ব্যতীত থাকিতে পারেন না; ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, ঈশ্বর-গুণ কীর্ত্তন তাঁহার জীবন-স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার মন তাঁহার পরম বরণীয় প্রিয়তম ঈশ্বরকে পাইবার জন্য সর্ব্বদাই সতৃষ্ণ রহিয়াছে, তিনি সেই দিনের জন্য সতত ব্যাকুল রহিয়াছেন, যে দিনে তিনি তাঁহার জীবনের জীবন ও চিরকালের উপজীব্য প্রাপ্ত হইবেন। যে প্রীতি-রস সম্পূর্ণ পান করা তিনি আপনার পরম চরম সুখ জ্ঞান করেন, তাহা তিনি এখন অবধিই পান করিতে অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন; তিনি এই আশাতে আনন্দিত থাকেন, যে অনন্দ-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানের যত স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার প্রীতি-বৃত্তি ক্রমে উন্নত হইয়া তাঁহাকে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করিবে। ঈশ্বর যাঁহার প্রিয়, ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতো তাঁহার প্রিয়। যিনি স্রষ্টা, তাঁহার অবশ্য এমন অভিপ্রায় যে সৃষ্টির মঙ্গল হউক; অতএব যে কার্য্য দ্বারা তাঁহার সৃষ্টির মঙ্গল হয়, তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিতে হইবেক। সেই প্রিয় কার্য্য করা ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি আপনার মহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন। ন্যায়াচরণ, সত্য ব্যবহার, পরোপকার, তাঁহার প্রিয় কার্য্য। সে কেমন ঈশ্বর-প্রেমী, যে বলে আমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি, অথচ তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগের প্রতি অত্যাচার করে? ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, কি স্বধর্ম্মী কি বিধর্ম্মী, সকলেরি উপকার করিতে যত্ন করেন। কেবল মানুষের কেন?

জীব মাত্রেরি ক্লেশ দেখিলে তাঁহার হৃদয় সন্তাপিত হয়। তিনি দেখেন যে পরোপকারে ত্রিবিধ সুখ; উপকার মননে সুখ, উপকার করণে সুখ, কৃতোপকার স্মরণে সুখ।

এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তাহার কতিপয় লক্ষণ সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি।

তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম্মে জাতির নিয়ম নাই, সকল জাতীয় মনুষ্যের এ ধর্ম্মে অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য্য পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে আলোক প্রদান করিতেছে, ঈশ্বরের বায়ু পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে জল প্রদান করিতেছে। অতএব কোন এক বিশেষ জাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ-পাত্র হইয়া সত্যধর্ম্ম উপভোগ করিবে, আর অন্য সকল জাতি তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে, ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সকল মনুষ্যই সেই অমৃত-পুরুষের পুত্র-স্বরূপ। ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি পৃথিবীকে আপনার গৃহ আর সকল মনুষ্যকে আপনার ভ্রাতা স্বরূপ জ্ঞান করেন।

দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম্মেতে উপাসনার দেশ কালের নিয়ম নাই। যে স্থানে যে সময়ে চিত্তের একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে সেই সময়ে ঈশ্বরেতে মন সমাধান করিবে। তন্মধ্যে সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকাল আর যে বিরল সমান ও শুচি স্থান সুমন্দ বায়ুসেবিত ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম, তাহাই একাগ্রতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী জানিবে।

তৃতীয় লক্ষণ। এ ধর্ম্মে কোন গ্রন্থেরও নিয়ম নাই। ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য যে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাই আমারদিগের আদরণীয়, তাহাই আমাদিগের সেবনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ যদিও আমারদিগের মূল গ্রন্থ, তথাপি ইহা বলিতে হইবেক, যে সজীব ধর্ম্ম কোন পুস্তকে নাই। যে ধর্ম্ম নিরন্তর হৃদয়ে জাগরূক থাকে ও কার্য্যে প্রকাশ পায় তাহাই সজীব ধর্ম্ম। এমন অনেক ব্যক্তি দেখা গিয়াছে, যাহারা ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ চিরকাল পাঠ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহারদিগের কার্য্যে ধর্ম্ম প্রকাশ পায় না।

চতুর্থ লক্ষণ। এ ধর্ম্ম কোন অদ্ভুত কৃচ্ছ্র সাধন সাপেক্ষ নহে। যে ঈশ্বর জল বায়ু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এমন সুলভ করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা সহস্র গুণে প্রয়োজনীয় জীবাত্মার প্রাণ-স্বরূপ ধর্ম্মকে যে কষ্টসাধ্য করিয়াছেন, এমত কখনই সম্ভব নহে। ভক্তি যোগই পরম যোগ। ধর্ম্মপথের যে স্থান অতি দূরবর্ত্তী বোধ হয়, ভক্তি-প্রসাদাৎ নিমেষ মাত্রে তাহা নিকট হইয়া আইসে। কেবল বিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়া অবশ্যক করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইয়া তাঁহাতে মনঃ সমাধান করে, সে অবশ্যই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যেমন মলাযুক্ত দর্পণে বস্তুর প্রতিরূপ প্রতিভাত হয় না, তেমনি আত্মা পাপরূপ মলাতে জড়িত থাকিলে ঈশ্বরের প্রতিরূপ তাহাতে কদাপি প্রতিভাত হয় না; সেই মলা প্রক্ষালন কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ আপনা হইতে সহজেই তাহাতে প্রতিভাত হইবেক।

পঞ্চম লক্ষণ। এ ধর্ম্মে সংসার পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যখন দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর আমাদিগকে স্বজাতি মনুষ্যের সহিত সহবাসের এক প্রগাঢ় ইচ্ছা দিয়াছেন, যখন বন্ধুতা দয়া, প্রীতি, স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তি দিয়াছেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ সকল বৃত্তি আমরা নির্দ্দোষ রূপে চরিতার্থ করি। কামাদি রিপু যাহার বশীভূত হয় নাই, সে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলে তাহার অত্যন্ত বিপদ; আর যে সাধকের কামাদি রিপু বশীভূত হইয়াছে, তাহার আর সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি?

ষষ্ঠ লক্ষণ। বাহ্য আড়ম্বরের সহিত এ ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকে ভ্রম বশতঃ কতকগুলি কাল্পনিক ক্রিয়া ও বাহ্য আড়ম্বরই যথার্থ ধর্ম্ম মনে করিয়া পরম ক্রিয়া সত্য ও ন্যায়ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সকলেরই উপর অত্যন্ত নির্ভর করে, কিন্তু তাহারা এক সত্য কথার মূল্য জ্ঞাত নহে। জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, পরোপকার এই সকল, ব্রহ্মোপাসকদিগের ক্রিয়া।

সপ্তম লক্ষণ। এ ধর্ম্মে তীর্থের নিয়ম নাই, সকল স্থানই তীর্থ, যে হেতু এমন স্থান নাই যেখানে তিনি বর্ত্তমান নাই। আকাশ সেই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের শরীর, জগৎ তাঁহার মন্দির, বিশুদ্ধ মন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ, যে হেতু তাহা ঈশ্বরের প্রিয়তম আবাস।

অষ্টম লক্ষণ। এ ধর্ম্মেতে অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত। যদি অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ কোন গর্হিত কর্ম্ম কৃত হয়, তবে তাহা হইতে অনুতাপিত চিত্তে বিমুক্তি ইচ্ছা করিয়া সে কর্ম্ম না করিলে দেখা যায় যে করুণাময় পরমেশ্বর সেই পাপ-ভার প্রপীড়িত চিত্তে আত্ম-প্রসাদরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া লঘুত্ব ও আরোগ্য প্রদান করেন।

বোধ হয়, এই কতিপয় লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এ ধর্ম্মেতে যাহার মনের অভিনিবেশ হইয়াছে, যিনি পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রেম-রসে মগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার সুখের সীমা কি? ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা, তাঁহার এই সকল কার্য্যে দেদীপ্যমান দেখিয়া সর্ব্বদা প্রসন্ন-বদন থাকেন, নির্দ্দোষ সাংসারিক সুখ উপভোগ করাতে তিনি কোন পাপ দেখেন না। করুণাময় পরমেশ্বরের এমন অভিপ্রায় দেদীপ্যমান দৃষ্ট হইতেছে যে তাঁহার করুণারচিত সুখপ্রদ বস্তু সকল তাঁহার সৃষ্ট জীবেরা নির্দোষরূপে উপভোগ করিবে। তন্নিমিত্তই তিনি বিবিধ সুগন্ধ, বিবিধ সুস্বর, বিবিধ সুদৃশ্য, বিবিধ সুস্বাদ দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণা করিয়াছেন। তিনি যেন আমার দিগের সর্ব্বদা এই কথা বলিতেছেন যে, 'আমার উদার সদাব্রত নির্দোষ রূপে তোমরা উপভোগ কর; কিন্তু তোমারদের প্রীতি বৃত্তির চরিতার্থতা-নিষ্পন্ন প্রকৃত যে সুখ, তাহা আমার প্রতি প্রীতি স্থাপন না করিলে পাইবে না।'' ঈশ্বরের রচিত সুখ-প্রদ বস্তু সকল নির্দ্দোষরূপে উপভোগ করিবার সময়ই ঈশ্বরোপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন বসন্ত সমীরণ প্রবাহিত

হইয়া শরীর মধ্যে অনেক কাল অননুভূত আশ্চর্য্য সুখ বিস্তার করে, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে ঈশ্বর-উপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন সুরম্য বিচিত্র পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান হইয়া নির্দ্দোষ অনুপম সুখ সম্ভোগ করা যায়, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে ঈশ্বরোপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন এই অসীম আকাশে জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত হইয়া সুখাসিক্ত আহ্লাদকর কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে পরম রমণীয় অনুপম সুখধাম করে, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে তাঁহার উপাসনার প্রশস্ত সময়। যে সময় অন্য লোকের মনে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসার উদয় হয়, সে সময়ে ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির মনে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মহৎ ভাব সকল উদিত হইতে থাকে।

এইক্ষণে বিবেচনা কর। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবেক যে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম। আমারদিগের দেশের সকল লোকের এই ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া উচিত। এই ধর্ম্মাবলম্বন করিলে দ্বেষ মৎসরতারূপ অনল, যাহা আমারদিগের দেশের সকল অমঙ্গলের নিদানভূত হইয়াছে, তাহা নিবৃত্তি পাইয়া আমাদের দুর্ভাগ্য অনেক হ্রাস হইবেক।

এ ধর্ম্ম সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখুন। পরীক্ষা করিতে কি দোষ আছে? শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব * মহাশয় যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন ও যাহার উন্নতি সাধনে অনেক ধন্যবাদোপযুক্ত যত্ন ও ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনারা উৎসাহ-বারি সেচন পূর্ব্বক মনোরম জ্ঞান-ফল উৎপাদন করুন, যাহাতে নিশ্চয় অমৃত লাভ হইবেক। হা! এমন দিন কবে উপস্থিত হইবেক, যখন এ দেশস্থ তাবৎ লোক হৃদয় হইতে বলিতে থাকিবে যে, একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আমারদিগের উপাস্য দেবতা, তাঁহার প্রতি একান্ত প্রীতি আমাদিগের পূজা, সত্য ও পরোপকার আমাদিগের ক্রিয়া এবং বিশুদ্ধ চিত্তই আমারদিগের পুণ্য তীর্থ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

* শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করেন।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।*

পৌষ ১৭৮২ শক।

একত্রিংশং বৎসর অতীত হইল, আমারদের প্রিয় জন্মভূমি এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত হয়; সেই কালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমারদিগের একবার সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। এই সমালোচনাতে অনেক লাভ আছে। ভবিষ্যতে কি প্রকারে আচরণ করা উচিত, তাহা পুরাকালের ঘটনা আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত লিখিবার ভার ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষেরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। এই ভারটী আমার পক্ষে অতি মনোরম ভার। যে সজীব ধর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বে আমার অল্প ক্ষমতানুসারে আমার ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই সজীব ধর্ম্ম অনেক ব্রাহ্মের মনে এক্ষণে সঞ্চারিত দেখিতেছি। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; ধর্ম্ম কেবল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এমত নহে; তাঁহারদিগের মধ্যে সাধ্যানুসারে কেহ কেহ সেই হৃদ্‌গত প্রত্যয়ানুযায়ী কার্য্যও করিতেছেন। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই এই গাঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে—কষ্ট বহন করিতেই হইবে। দিন দিন অনেক নূতন লোক আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। আমি আমার সঙ্কীর্ণ শক্তি অনুসারে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই ধর্ম্মের উন্নতি দেখিয়া তাহার পুরাবৃত্ত লিখন কার্য্যকে অতি মনোরম কার্য্য জ্ঞান করিতেছি। প্রস্তাবটী অতি মনোরম, আমার ইচ্ছা যে তাহা অতি উৎকৃষ্ট করিয়া লিখি; কিন্তু মনের মত করিয়া লিখিতে আমার অক্ষমতা বোধ করিয়া বিশেষ ক্ষোভ পাইতেছি।

যদ্রূপ অন্ধকার রজনীতে সমস্ত নভোমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে একটী তারকাও আকাশে স্বীয় রমণীয় জ্যোতি দ্বারা চক্ষুদ্বয়কে আমোদিত করে না, এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহার তদ্রূপ অবস্থা ছিল। সকল লোকই পশু, উদ্ভিদ্ ও অচেতন মৃণ্ময় বা প্রস্তরনির্ম্মিত পদার্থকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা-রূপে উপাসনা করিত এবং অলীক ক্রিয়া-কলাপই আপনারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিত। কেহই সেই নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিত না। ধর্ম্মহীনাবস্থায় থাকিলে আর সকলই হীনাবস্থায় থাকে। ভিতরের অন্ধকারের সহিত বাহ্য অন্ধকারের তুলনা কোথায়? এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হওয়াতে সে অন্ধকার ক্রমে দূরীভূত

* এই সাধারণ সভা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে হইয়াছিল।

হইতেছে ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। হুগলী জেলার অন্তঃপাতি খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকে ঐ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি তিব্বতাদি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও যে যে দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের ধর্ম্ম বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন। পর্য্যটনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন;তৎপরে ১৭৪০ শকে বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বাহিরশিমলার উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই উদ্যান হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত কয়েক খানি উপনিষদ্ প্রকাশ করিলেন। সেই সকল উপনিষদের এক একটী ভূমিকা পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি এক একটী প্রবল আঘাত-স্বরূপ হইয়াছে। ১৭৪৫ শকে পাষণ্ডপীড়ন নামক গ্রন্থের উত্তরে 'পথ্য প্রদান' এই কোমল আখ্যা দিয়া প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্মের সম্পূর্ণ খণ্ডন স্বরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। তিনি উল্লিখিত গ্রন্থসকলে সপ্রমাণ করিলেন যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, সকল শাস্ত্রই এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে নানা শত্রু উত্থিত হইল; রামমোহন রায়ের নিন্দা ও অপবাদের আর পরিসীমা রহিল না। কথিত আছে যে, তাঁহার প্রতি বিপক্ষ-দলের শত্রুতা এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি অন্যত্র যাইবার সময় পরিচ্ছদ মধ্যে কিরিচ রাখিতে বাধ্য হইতেন। এই রূপ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আপনার মতের অনুবর্ত্তীদিগকে লইয়া এক উপাসনাসমাজ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেই সমাজ আমারদিগের এই বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজ। ১৭৫১ শকে ইহা সংস্থাপিত হয়। তিনি এই উদ্দেশে ঐ সমাজ স্থাপন করিলেন যে, সকল জাতীয় লোকেরা একত্রিত হইয়া সেই এক মাত্র অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্য মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে। সমাজ স্থাপনে তাঁহার যে এ অভিপ্রায় ছিল, তাহা সমাজ-গৃহের দান পত্রে প্রকাশিত আছে। এই দান-পত্রে উক্ত হইয়াছে।

'যে কোন প্রকার লোক হউক না কেন, যাহারা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া পবিত্র ও নম্র ভাবে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্ব-পাতা অকৃত, অমৃত, অগম্য পুরুষের উপাসনার অভিলাষ করে, তাহাদের সমাগমের জন্য এই সমাজ-গৃহ সংস্থাপিত হইল। যে কোন লোক, বা যে কোন সম্প্রদায়, নামরূপ-বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, এখানে তাহার উপাসনা হইবেক না।

* * *

যাহাতে বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্ব-পিতা পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি ও আত্মা উন্নত হয়; যাহাতে ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা সাধু-ভাবের সঞ্চার হয়; যাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকদিগের মধ্যে একটী ঐক্য-বন্ধন হয়; উপাসনার সময় এই প্রকার বক্তৃতা,

ব্যাখ্যান, স্তোত্র, গান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ব্যবহৃত হইবেক না।'

প্রথমে কমল বসুর বাটীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্ম-সমাজ হইত, তথায় এক বৎসর কাল মাত্র ছিল। পরে ১৭৫১ শকে বর্ত্তমান সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা হইতে লাগিল। সমাজ-দিবসে সূর্য্যাস্তের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইহার এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত; সে ঘরে কেবল ব্রাহ্মণেরা যাইতে পারিতেন। তৎপরে তাহার যে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেন; তৎপরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেন ও মধ্যে মধ্যে নূতন ব্যাখ্যান রচনা করিয়াও পাঠ করিতেন। তৎপরে ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত।

ব্রাহ্ম-সমাজের বিপক্ষে ধর্ম্মসভা নামে এক সভা কলিকাতায় সংস্থাপিত হইল। ধর্ম্মসভার সভ্যেরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি অতিশয় দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-পণ্ডিতদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; তজ্জন্য সমাজের অনেক ব্যয় হইত। সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরি, রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিংহ, এবং তেলিনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা রামমোহন রায়কে অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতেন।

প্রথম কোন মহৎ অনুষ্ঠান করা কঠিন কর্ম্ম। প্রথম অনুষ্ঠাতারা সকল করিয়া উঠিতে পারেন না; ইহাতে কিন্তু তাঁহারদিগের গৌরবের কিছু হানি হইতে পারে না। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান প্রয়োজন রামমোহন রায়ের সময় সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না; কেবল উপনিষদের শ্লোক ও বেদান্ত-সূত্র সকলের ব্যাখ্যান হইত। দ্বিতীয়তঃ তখন ব্রাহ্মদল বলিয়া দল-বদ্ধ কোন সম্প্রদায় ছিল না; তখন প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। তৃতীয়তঃ আত্মপ্রত্যয়-মূলক সত্য যাহা সকল ধর্ম্মের মূলে নিহিত আছে, যাহা তর্ক-তরঙ্গ দ্বারা কখনই আন্দোলিত ও নিরস্ত হইতে পারে না ও যাহা সকল মনুষ্যের হৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজমান আছে, এক্ষণে যেমন সেই আত্মা-প্রত্যয়-মূলক সত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্পষ্টরূপ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এরূপ তখন ছিল না। ইহা যথার্থ বটে যে, রামমোহন রায় সেই আত্মপ্রত্যয় দ্বারাই ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সকলের পরীক্ষা করিতেন। তিনি কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থের সকল বাক্যে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে আত্ম-প্রত্যয়কে যেমন ব্রাহ্মমধর্ম্মের এক মাত্র পত্তন-ভূমি বলিয়া স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, তখন এ রূপ হয় নাই। এক্ষণে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থাতীত ও স্বাধীন করা হইয়াছে, তখন সে রূপ হয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এক বৎসর পরে ১৭৫২ শকে রামমোহন রায় ইংলণ্ডদ্বীপে গমন করেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে সমাজ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল।

যাঁহারা অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বীয় স্বীয় দাতব্য রহিত করিলেন; কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল প্রতি মাসে প্রথমে ৬০ টাকা, পরে ৮০ টাকা করিয়া দিতেন, তাহাতেই সমাজের ব্যয় নিৰ্ব্বাহিত হইত। অত্যল্প লোক প্রতি বুধবারে সমাজে উপস্থিত হইতেন; পরিশেষে এমন হইল যে কেবল ১০/১২ জন করিয়া উপস্থিত থাকিতেন। তথাপি তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয়-প্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত সমাজ যে জীবিত ছিল, তাহা কেবল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে। ঐ মহীয়সী তত্ত্ববোধিনী সভা কি রূপে সংস্থাপিত হয়, তাহার বৃত্তান্ত অতি কৌতূহল-জনক। আমারদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন। যৌবন কালে যখন ঐ সভার সংস্থাপকের মন অত্যন্ত ধৰ্ম্মানুসন্ধিৎসু ছিল, যখন তিনি সত্য ধৰ্ম্ম লাভার্থে নিতান্ত ব্যাকুল চিত্ত ছিলেন, যখন ঐশ্বর্য্যের ও ইন্দ্রিয়-সুখের নানাবিধ প্রলোভন সত্ত্বেও ঈশ্বরের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা তাঁহার মন প্রবল-রূপে আকৃষ্ট হইতেছিল; সেই ব্যাকুলতার সময়ে তিনি এক দিবস রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ঈশোপনিষদের এক খানি পরিত্যক্ত পত্র পাইলেন। সেই পত্রে পরব্রহ্মের নামের উক্তি দেখিলেন; কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত ভাষা না জানাতে তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ প্রকার গ্রন্থের অর্থ করিতে পারেন, ইহা শুনিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকাইলেন। সেই কালাবধি তত্ত্ববোধিনীর সংস্থাপক বেদ ও বেদান্তাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন ও সেই সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহার এই ইচ্ছার উদয় হইল যে, যে সকল ধৰ্ম্মভাব তখন তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল, তাহা আপনার প্রিয় বান্ধবদিগকে জ্ঞাপন করেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহারদিগকে এক দিন আহ্বান করিলেন। সে দিবস প্রথমে উপনিষদের ব্যাখ্যা হয়, তৎপরে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা হইলে পর উপস্থিত বন্ধুদিগের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিলেন যে, ধৰ্ম্মালোচনা জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হয়; সকলেই সেই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন ও মহোপকারিণী তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইল। ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিনে এই সভা জন্মগ্রহণ করেন। সেনাপতির জয়লাভের ন্যায় অথবা রাজপুরুষদিগের সৰ্ব্বত্র ঘোষিত কার্য্যের ন্যায়, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপন সাড়ম্বর নহে; কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে উক্ত সভা সংস্থাপনের গৌরব তদপেক্ষাও অধিক। যে সভা দ্বারা সত্য ধৰ্ম্ম এতদ্দেশে এতদ্রূপ আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, যে সভার যত্ন দ্বারা আমারদের প্রিয় মাতৃভাষা অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে যে সভার প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিবিধজ্ঞানরত্নাকর স্বরূপ; বঙ্গ দেশের ভাবি পুরাবৃত্ত লেখকের উচিত, সে সভার সংস্থাপনকে মহৎ ঘটনা জ্ঞান করেন। তত্ত্ববোধিনী সভাতে উপনিষদের ব্যাখ্যা হইত ও বক্তৃতা হইত। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যত দিন জীবিত ছিলেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী

সভার সংস্থাপককে বিশিষ্ট রূপে সাহায্য করিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মত প্রচার জন্য রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে এবং বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রচারে কৃত-যত্ন হইলেন। তাঁহারা ঐ ধর্ম্মের প্রচার জন্য তিনটী উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা একটী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। ঐ পাঠশালাতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করান হইত। উপনিষদ্ পড়াইবার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। ঐ পাঠশালা প্রথমতঃ কলিকাতায় ছিল; পরে ১৭৬৫ শকে বংশবাটী গ্রামে স্থাপিত হয়। সেখানে ৪ বৎসর থাকিয়া ১৭৬৯ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হওয়াতে উহা রহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা চারি বেদ অধ্যয়ন জন্য চারি জন ব্যক্তিকে কাশীতে প্রেরণ করেন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশাবধি ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ বিষয়ে সুচারু প্রস্তাব-সকল লিখিয়া পত্রিকাকে অলঙ্কৃত ও তাহার মহোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ১৭৬৮ শকে তত্ত্ববোধনী সভা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য-প্রণালী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রকৃতরূপে উপাসনা যাহাকে বলা যায় তাহা পূর্ব্বে ছিল না; বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে অবলম্বিত হইল। তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক দেখিলেন, যাঁহারা সমাজে উপদেশ শ্রবণ করিতে আইসেন, তাঁহারা পৌত্তলিকদিগের ন্যায় কাল্পনিক ধর্ম্মের সকল অনুশাসনই পালন করেন, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসকের ন্যায় কোন কার্য্যই করেন না। অতএব যাঁহারদিগকে বর্ত্তমান লৌকিকাচার পৌত্তলিকতা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণের রীতি প্রচলিত করিলেন। সে প্রতিজ্ঞা এই।

(১) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল দাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

(১) ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

(২) তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

(৩) একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

(৪) তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

(১) পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

(২) তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ,

সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

(৩) এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

(৪) তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই বীজ, সকল ব্রাহ্মের ঐক্যস্থল। এই বীজ আমারদিগের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলসূত্র-স্বরূপ। ইহাতে এমন একটী বাক্য নাই, যাহা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য-মূলক নহে। ইহাতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার হয় না এবং তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করাও যায় না। ইহা ঈশ্বরের লক্ষণ এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি সুন্দর অথচ সংক্ষেপ-রূপে ব্যক্ত করিতেছে। ১৭৭২ শকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের সময়ে যে তিনটী অভাব ছিল তাহা ক্রমে মোচন হইল। উপাসনা-প্রকরণ প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্ম-দলের সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে শাস্ত্রশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের উপর পত্তন করা গেল এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সাধন হইলে পর ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হয়। ভঙ্গ হইবার সময় ঐ সভা স্বকীয় সমস্তভার ও সম্পত্তি ব্রাহ্ম-সমাজে অর্পণ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ধাত্রীর কার্য্য করিয়া অবসৃত হইলেন। যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা হইতেছিল, তাহা এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা হইয়া থাকে। ১৭৮১ শকের ১১ পৌষে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়, তাহাতে ধর্ম্ম-প্রচার সামঞ্জস্য রূপে যে উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে, তাহার বিধান হইয়াছিল ও সমাজের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রচারের সভা ছিল ও ব্রাহ্মসমাজ কেবল উপাসনা সমাজ ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভারও ব্রাহ্মসমাজকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের সংস্থাপন উক্ত কার্য্য সাধন করিবার এক প্রধান উপায় জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম-কর্ত্তারা ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গলাতে ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরাজীতে সুচারু রূপে উপদেশ দেন। বর্ত্তমান শকের ভাদ্র মাসে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা হয়, তাহার ফল অতি সন্তোষ-জনক বলিতে হইবেক। ৩০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। যখন এতগুলি যুবা পুরুষকে উৎসাহ-পূর্ণ নয়নে ঈশ্বর-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে একত্র সমাগত দেখা যায়, তখন সত্য-ধর্ম্মানুরাগী স্বদেশ-প্রেমী ব্যক্তির মন কি পর্য্যন্ত না উল্লসিত হয়? ব্রহ্ম-বিদ্যালয় দ্বারা মহোপকার সাধন হইতেছে। সেই উপকার-সকলের প্রধান মূলীভূত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অসাধারণ বাক্ পটুতা, যত্ন ও উৎসাহ।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসে প্রতীত হইবে যে, ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে সমাজে যে প্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রহ্মধর্ম্ম অতিশয় সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে এইক্ষণে সমাজের বেদী হইতে যে সকল ব্যাখ্যান বিবৃত হয়, তাহা হৃদয়ের অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের ন্যায় গমন করিয়া ঈশ্বর-প্রেমাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করে। পূর্ব্বে যে সকল গান গীত হইত, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-ভাব বড় অধিক প্রকাশিত ছিল না। এক্ষণে যে সকল সঙ্গীত হয়, তাহা চিত্তকে এরূপ আর্দ্র করে, আত্মাকে এতদ্রূপ উন্নত করে যে বর্ণনাতীত। এক্ষণে কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারের পুরুষেরা প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে একত্রিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন। একটী ব্রাহ্ম পরিবারের একেবারে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহার মহোন্নতি তখন সাধন হইবে যখন পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মদিগের কোন সংস্রব থাকিবে না। ঈশ্বর সত্যের পরম নিধান, ঈশ্বর সত্যের সত্য; তিনি আত্মাপহারিকে কখনই প্রকৃত জয় প্রদান করেন না। যত কাল পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম মিশ্রিত থাকিবে তত কাল এ ধর্ম্মের প্রকৃত জয় লাভ হইবেক না। পৌত্তলিকতার অধীনতা স্বীকার করিয়া কি তাহাকে কখন পরাজয় করা যাইতে পারে? পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব আমারদিগের ধর্ম্মের অধিকতর উন্নতির যেমন একটী প্রতিধর্ম্মক, এ ধর্ম্মের প্রচারক না থাকা সে উন্নতির তেমনই আর একটী প্রতিবন্ধক। ইহা যথার্থ বটে যে পৌত্তলিক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মই এই ধর্ম্মের প্রচারক স্বরূপ হইয়া উঠিবেন কিন্তু এমন কতকগুলি লোক সংগ্রহ করা উচিত, প্রচার যাঁহারদের ব্রত ও এক মাত্র জীবনের কর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোন্নতি তখন সাধিত হইবে, যখন বিশুদ্ধ চরিত্র জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্ম-সকল আপন ইচ্ছায় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গমন করিয়া লোকের কটূক্তি ও অপমান ও নিগ্রহ তুচ্ছ করিয়া এই ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং দহ্যমান দারু নিঃসৃত অনলোপম উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম প্রীতিশূন্য নিরুৎসাহ ব্যক্তিদিগের মন উৎসাহ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়া যাবতীয় কুসংস্কার ও অধর্ম্ম-বন ভস্মসাৎ করিবেন। কষ্ট-সহিষ্ণুতা বিষয়ে তাঁহাদের শরীর লৌহ সমান হইবে, উৎসাহ বিষয়ে তাঁহারদিগের মন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইবে। যাঁহারা এই গুরুতর কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই যথার্থ শূর নামের উপযুক্ত। তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের সেনাপতি হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবেন। হা! ব্রাহ্মদলের অলঙ্কারস্বরূপ এবম্প্রকার শূর-সকল আমারদিগের মধ্যে কবে উদিত হইবেন?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

হে জগদীশ্বরর! সুশোভন দৃশ্য এই বিশ্ব তুমি আমারদিগের চতুর্দ্দিকে যে বিস্তৃত করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদ্যপি অধিকাংশ মনুষ্য তোমাকে উপলব্ধি না করে, তাহা একারণে নহে যে তুমি আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে রহিয়াছ। যে কোন বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইতেও আমারদিগের সমীপে তুমি জাজ্বল্যতর প্রকাশমান আছে, কিন্তু বাহ্য বস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকল আমারদিগকে মহামোহে মুগ্ধ করিয়া তোমা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। অন্ধকার মধ্যে তোমার জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু অন্ধকার তোমাকে জানে না। "তমসি তিষ্ঠন্তমসোঽন্তরোয়িং তমোন বেদ যস্য তমঃ শরীরং।" তুমি যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি তেজেতে আছ। তুমি বায়ুতে আছ তুমি শূন্যেতে আছ;—তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ;—হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক্ প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্য্যে দীপ্যমান রহিয়াছ, কিন্তু প্রমাদীও অবিবেকী মনুষ্য তোমাকে একবারও স্মরণ করে না। সকল বিশ্ব তোমাকে ব্যাখ্যা করিতেছে, তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু আমারদিগের এ প্রকার অচেতন স্বভাব যে বিশ্ব-নিঃসৃত এতদ্রূপ মহান্ নাদের প্রতি আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। তুমি আমারদিগের চতুর্দ্দিকে আছ, তুমি আমারদিগের অন্তরে আছ, কিন্তু আমরা আমারদিগের অন্তর হইতে দূরে ভ্রমণ করি; স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না, এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠান অনুভব করি না। হে পরমাত্মন্! হে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস! হে পুরাণ, অনাদি, অনন্ত, সকল জীবের জীবন! যাহারা আপনারদিগের অন্তরে তোমাকে অনুসন্ধান করে তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি তোমাকে অনুসন্ধান করে? যে সকল বস্তু তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহা আমারদিগের মনকে এতদ্রূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যে প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয়-ভোগ হইতে বিরত হইয়া ক্ষণ-কালের নিমিত্তে তোমাকে যে স্মরণ করে, মন এমত অবকাশ কাল পায় না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে জগদীশ! তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ কি পদার্থ? এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ সকল—অস্থায়ী পুষ্প—হ্রসমান স্রোতঃ—ভঙ্গুর প্রাসাদ—ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র—দীপ্তিমান ধাতুর রাশি আমারদিগের মনে প্রতীত হয়, আমারদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে, আমরা তাহারদিগকে সুখদায়ক বস্তু জ্ঞান করি; কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে তাহারা আমারদিগকে যে সুখ প্রদান করে, তাহা তুমিই তাহাদিগের দ্বারা প্রদান কর। যে সৌন্দর্য্য তুমি তোমার সৃষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দর্য্য আমারদিগের সৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি এতদ্রূপ পরিশুদ্ধ ও মহৎ পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ, তুমি "সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তুমি

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ," এ নিমিত্তে যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনারদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে, তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না—হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। আমরা কি দুর্ভাগ্য! আমরা সত্যকে ছায়া জ্ঞান করি, আর ছায়াকে সত্য জ্ঞান করি। যাহা কিছুই নহে তাহা আমাদিগের সর্ব্বস্ব, আর যাহা আমারদিগের সর্ব্বস্ব তাহা আমারদিগের নিকটে কিছুই নহে। এই বৃথা ও শূন্য পদার্থ সকল অধঃস্থায়ী এই অধম মনেরই উপযুক্ত। হে পরমাত্মন্! আমি কি দেখিতেছি? তোমাকেই যে সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখিতেছি। যে তোমাকে দেখে নাই সে কিছুই দেখে নাই; যাহার তোমাতে আস্বাদ নাই, সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পায় নাই; তাহার জীবন স্বপ্ন স্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব বৃথা। আহা! সেই আত্মা কি অসুখী তোমার জ্ঞান অভাবে যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রাম স্থান নাই! কি সেই আত্মা যে তোমাকে অনুসন্ধান করে, যে তোমাকে পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল রহিয়াছে! কিন্তু সেই পূর্ণ সুখী, যাহার প্রতি তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ করিয়াছ, যাহার অশ্রু-সকল মোচন করিয়াছে, তোমার তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্তকাম হইয়া প্রীতি-পূর্ণ কত দিন, আর কতদিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে অপেক্ষা করিব, যে দিনে তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং বিমল কামনা-সকল তোমার সহিত উপভোগ করিব। এই আশাতে আমার আত্মা আনন্দ-স্রোতে প্লাবিত হইয়া কহিতেছে যে হে জগদীশ্বর! তোমার সমান আর কে আছে? এই সময়ে শরীর অবসন্ন হইতেছে, জগৎ বিলুপ্ত হইতেছে, যখন আমি তোমাকে দেখিতেছি, যিনি আমার জীবনের ঈশ্বর এবং আমার চিরকালের উপজীব্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রহ্মসংগীত

রাগিণী মূলতান।—তাল একতাল।

সকলি তাঁহারি কৃপায়,
ভাল মন্দ ভাব কেবল নিজ মূঢ়তায়।
দুঃখ-বেশ সুখ ধরে,
জীব না চিনিতে পারে,
সতত আছে তাঁহার মঙ্গল ছায়ায়॥*

রাগিণী পরজ।—তাল চৌতাল

তোমারি মহিমা অপার, নাথ বলা নাহি যায়,
তুমি অগম, অগোচর, নিরঞ্জন, নিরাকার।
সকল দেব সমস্বরে, সদা যশ ঘোষণা করে,
তবুও না পারে করিতে অন্ত তাহার॥

*এই গীতের প্রথমাংশ একটি বন্ধুর বিরচিত।

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেকা।

জেনেছি নাথ তুমিই পশিছ অন্তরে আমার,
আপন সুগন্ধ গুণে আপনি পড়েছ ধরা।
হৃদয় ধামে নিলীন হতেছ, সখা।
কৃতার্থ করিয়ে অধীনে॥

রাগিণী বেহাগ।—কাওয়ালি।

কি মধুর বেণু রব লাগিছে শ্রবণে
নির্জন নিস্তব্ধ এই তামস নিশীথে।
এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু আহ্বান,
ধন জন পলায়ন করয়ে যখন,
বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে।

-'একমেবাদ্বিতীয়ম্', রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা। ২য় ভাগ।
১৭৯৩ শক, পৃ-১১৭-১১৮

।। পত্রাবলী ।।

॥ ১ ॥

দেওঘর, ৪ আষাঢ় [১২৯০]

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত-সমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক-পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অঙ্কুশ মানে না, ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাস্য করত প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণতন্ত্রের লোক; কেহ কাহারও কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল "Irritabile vates trition" আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা উপদ্বীপ প্রণালী, যোজক, অম্লজান, উদজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দুই-তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়, তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছু মাত্র আপত্তি করিতে পারেন না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্যপ্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে? English Channel একটি উপসাগরের নাম: Channel শব্দে কেবল মাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়, তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারে না; কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্ত্তে এখন "স্থলসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বরসূচক (pedantic) মনে করিবে। ইতি—

বশম্বদ—
শ্রীরাজনারায়ণ বসু

পুনশ্চ—উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের উল্লেখ আছে তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy, Painting, Architecture, Logic প্রভৃতি শব্দও থাকিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দের বাঙ্গালায় অদ্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।

॥ ২ ॥

দেওঘর, ২০ কার্ত্তিক, ব্রা, স, ৫৭।
৫ নবেম্বর, ১৮৮৬ সাল।

মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২২ অক্টোবরের মুদ্রিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে আমি ছাড়া দুইটি মাত্র ব্রাহ্ম ও দুইটি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা আপনার পত্র সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে অভিলাষী নহেন।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ শিক্ষা স্বভাব ও রুচি অনুসারে এক একটি প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়া বিচিত্র নহে। কেহ ব্রাহ্ম থাকিয়া বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়েন কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি, কেহ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি। ক্রিয়াকলাপেও ঐরূপ। কেহ সম্পূর্ণরূপে নূতন পদ্ধতি অনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন, কেহ বা পুরাতন পদ্ধতি অল্পাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা অনুসরণ করিতে ধর্ম্মের হানি বোধ করেন না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রকার সকল লোকই আছেন। এই প্রকার সকল লোকই এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সংজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু আপনারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকের কর্ত্তব্য প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঐ বিশ্বজনীন প্রকৃতি ব্যাহত হইবে।

আপনার প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে আপনারা ব্রাহ্ম কাহাকে বলেন। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে বিধি দিয়াছেন "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ধনের জন্য অন্য কোন জাতির নিকটে যাইবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কেবল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না। বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা বিধি দিতেছেন "ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেন।"

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন "ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই মুক্তি।" কোন ব্রাহ্ম যদি বলেন যে পাপতাপ ও সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তিপূর্ব্বক চিরকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগই যথার্থ মুক্তি (জীবন্মুক্তি এই মুক্তির অন্তর্ভূত) তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন

কি না? বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনারা লিখিয়াছেন ''ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।''

আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন ''বিবেক বাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা।'' উহাতে ঈশ্বরানুপ্রাণনের কথা কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। সে বিষয়ে কিছু থাকা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি প্রধান মত। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে ঈশ্বরানুপ্রাণন বুঝায় না। যদি কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মবল প্রেরণ করেন এবং আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন এবং বিশ্বাস করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না।

আপনারা প্রচারকদিগের কর্ত্তব্যে লিখিয়াছেন ''ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ধর্ম্ম-প্রচারকেরা গ্রহণ করিবেন না।'' ঈশ্বর প্রাপ্য সম্মান কাহাকে বলেন? আমাদিগের দেশীয় প্রথানুসারে যদি কোন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-প্রচারককে প্রণিপাত করেন তাহা ঈশ্বর প্রাপ্য সম্মান মনে করেন কি না? যদি কেহ ঐরূপ প্রণিপাত করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না? এই বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট করিযা বলিলে ভাল হয়।

আপনারা লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ''অনুষ্ঠানে জাতিভেদ প্রশ্রয় দিবেন না।'' যদি আমাদের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে জাতিভেদ পালন করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? বোধ হয় করিবেন না। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক বিষয়ে যাহার যেমন বিবেচনা ও রুচি সেইরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্যের কোন হানি হয় না।

আপনারা লিখিয়াছেন যে ''ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয় তাহাতে যোগ দিবেন না।'' এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে যদি কোন ব্রাহ্ম আপনার কন্যার চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেক অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরে তাঁহার বিবাহ দেন তাহা হইলে আপনাদিগের দৃষ্টিতে তিনি বিবেক ও নীতির অবমাননা করেন কি? যদি আপনারা বলেন যে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন হানি হয় না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহরা বলেন অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধ রক্ষা করা কঠিন হয় অতএব রজোদর্শন হইলেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনারা তাঁহাদিগের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন কি না?

যদি কোন ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেকানুসারে গমনাগমন বিষয়ে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে সে অনিচ্ছা আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন কি? বোধ হয় করেন। কিন্তু

অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাঁহাদিগের বিবেক বলে যে নারী-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এরূপ স্বাধীনতা প্রদান অবিধেয়। তাঁহাদিগের বিবেক প্রতি আপনারা সম্মান করিবেন কি না?

যদি আমাদিগের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বংশীয় ব্রাহ্ম কেবল কৌলিক রীতির অনুরোধে পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া আপনার পুত্রের উপবীত দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না?

এইরূপ আপনাদিগের প্রেরিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য ধরিয়া শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে এইরূপ কোন ব্রাহ্মের মত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যায় কি না, এবং এরূপ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলা যায় কি না? যদি কোন বিশেষ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট মত অথবা কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ না করিলে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম নহেন অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য না করেন বলা যায় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার একশেষ হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা অন্য ধর্ম্মে পোষায়, ব্রাহ্মধর্ম্মে পোযায় না। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ঐ শব্দের "ব্রহ্মের উপাসক" এই অর্থ করিতেন। সামাজিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে মত হউক না কেন, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি কোন ব্যক্তির পক্ষপাত থাকুক না কেন, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইলেই তিনি তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিতেন। আমরা যদি ব্রাহ্ম শব্দে আর কিছু বুঝি তাহা হইলে ঐ শব্দের ব্যবহার আমাদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ঐ শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা যে অর্থে উহা ব্যবহার করিতেন আমরা সেই অর্থ প্রসারণ করিতে পারি, সঙ্কোচ করিবার কোন অধিকার নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ যতদূর পারেন ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতেছেন। জাতি, সম্প্রদায়, মত নির্ব্বিশেষে যে কেহ নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষী তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন! আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুষ্ঠান পদ্ধতি আছে বটে, কিন্তু যে ব্রাহ্মেরা তাহা অনুসরণ না করেন, নিজের বিবেকানুসারে প্রাচীন পদ্ধতি কেবল আচার মাত্র জ্ঞান করিয়া তদনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন এবং আমরা বলি না। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ আছে, কিন্তু তাহা বীজ মাত্র। প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে তাহা বিকশিত করিয়া লইতে পারেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবের সঙ্গে মিল থাকিলেই হইল। উদারতা বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অনেকটা আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়। যদি আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতি অব্যাহত রাখুন। যদি কোন বিশেষ মত আপনারা প্রচার করিতে চাহেন আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই বিশেষ মতাবলম্বী (কোন বিশেষ মতের

অনুবর্ত্তী লোক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অল্পই পাইবেন কারণ আমি দেখিতেছি এক-একটী ব্রাহ্ম এক-একটী সম্প্রদায়।) তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অব্যাহত রাখিয়া একটী প্রচার সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাকে "প্রচার সভা" এই মাত্র নাম দিয়া সেই বিশেষ মত প্রচার করিতে পারেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকের কর্ত্তব্য যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা থাকিবে না। অবিলম্বে আপনাদিগের মধ্য হইতে এক দল উঠিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিবে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন চলিবে। কমিটি সব কমিটির অবধি থাকিবে না। অতএব ব্রাহ্মসমাজকে মতবদ্ধ (Creed bound) করিতে চেষ্টা করা বৃথা, বিশেষতঃ আপনারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ শৃঙ্খলবদ্ধ করা উচিত হয় না, তাহাতে সকল প্রকার ব্রাহ্মের স্থান পাওয়া কর্ত্তব্য, আসল বিষয়ে মিল থাকিলেই হইল।

নিবেদক——

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পুঃ—উপরে যে সকল আধ্যাত্মিক অথবা সামাজিক কথা উত্থাপিত হইল সেই সকল বিষয়ে আমার নিজের মত কিছু প্রকাশ করিলাম না, যাহা বলিলাম তাহা সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম।

এই পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ দিলে এবং তাহা আপনাদিগের ২০ নবেম্বরের সভায় পাঠ করিলে পরম বাধিত হইব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক।

॥ ৩ ॥

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

কলিকাতা, ৪৫নং বেনেটোলা লেন,
১৩ চৈত্র, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

পরম পূজনীয় মহাশয়েষু, প্রীতিপূর্ব্বক প্রণাম।

সে দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে আপনি যে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের চিরসম্পত্তি। আপনার দৃষ্টান্তের কথা সকল লোককে তিনি বলিয়া বেড়ান। ইহাতে কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন যে তিনি দৈবেন্দ্রিক হইয়াছেন। তিনি কোনখানে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে "পিতা নোসি" এই প্রার্থনা দ্বারা আরম্ভ করেন।

পরশ্ব দিবস বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং গতকল্য দরবারের দলের সহিত পদ্মকুটীরে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। প্রণয়াস্পদ প্রতাপচন্দ্র বলিলেন। * * * * প্রেম না হইলে কেহ কথা শুনে না। অন্য অপেক্ষা দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি লোকের এক্ষণে প্রেম হইয়াছে, ঐক্য সাধনার্থ তাঁহার কথা এখন শুনিবে। দেখিলাম মতনিষ্ঠা জন্য দরবারের দলের প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের খুব শ্রদ্ধা আছে। পরশ্ব দিবস সন্ধ্যার পর কৃষ্ণকুমারের বাসায় পাঁচ-ছয়টি বাছাবাছা যুবক ব্রাহ্মের সহিত কথোপথন হইয়াছিল তাহাতে হাফেজের একটী মেস্‌রা আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। "তাঁহার সৌন্দর্য্যে অবগুণ্ঠন অথবা যবনিকা নাই কিন্তু যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর রাস্তার ধূলির প্রতি লক্ষ্য করিবে।" রাস্তার ধূলির বিষয় অনেক বলিলাম। আর বলিলাম যে যেমন নব মধুমক্ষিকা মধু কি পদার্থ তাহা অবিজ্ঞাত হইয়াও মধুগর্ভ পুষ্প দিকে ধাবিত হয় তেমনি আত্মা পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয়। আত্মার এই স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা (Natural instincts of the soul) চালিত হইয়া যে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় তাহাই যথার্থ ধর্ম্মজীবন, দর্শন দ্বারা যাহা আরম্ভ হয় তাহা যথার্থ ধর্ম্মজীবন নহে। তবে দর্শনের কোন কোন বিষয়ে উপকারিত্ব আছে। ধর্ম্মের সোপান এইরূপ সাজাইয়া বলিলাম।

(১) ঈশ্বরের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক আকর্ষণ। যেমন নব মধুমক্ষিকা ইত্যাদি—

(২) এই আকর্ষণজনিত ব্যাকুলতা—

(৩) পাপ দলন। এমনি করিয়া ইহাতে লাগা যেন জীবন মৃত্যুর ব্যাপার। মোহ ও পাপই রাস্তার ধূলি।

(৪) ধূলি অপসরণ ও ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল রূপে আত্মার নিকটে প্রকাশ—

(৫) পরমাত্মাতে আত্মার রমণ। "যথা প্রিয়া স্ত্রী" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদ। কিন্তু এই মধুর ভাবের বিকৃতি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই বিকৃতি বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রবল।

সকলেই আমার কথাতে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই কথোপথনে শ্বেতকেশ শ্রদ্ধেয় মহলানবিশ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

অদ্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেওঘর যাত্রা করিব। কলিকাতায় আসিলেই আমার শারীরিক অসুখ ও লোকের নিকট যাতায়াতে কষ্ট হয়। এক-একবার অনুতাপ হয় যে কেন আসিলাম তথাপি আপনি আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেই আসিব। কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিলে এবং অন্য বন্ধুদিগের সহিত দেখা না করিলে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইবেন এইজনা তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে বাধ্য হইলাম তবু অনেকের সঙ্গে দেখা করা বাকি রহিল।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১৮০৯ শক।

॥ ৪ ॥

[পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লিখিত]

দেবগৃহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ, ৫৮।

পরম সুহৃদ্বরেষু, প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার।

আপনার ৪ জৈষ্ঠ্যের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের পীড়ার সময় আপনি যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত যাহা দিয়াছেন তাহা অতি কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলাম। আপনি ৮ ফাল্গুন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আমি এক সপ্তাহ পরে এখান হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমি যখন চুঁচুড়ায় গিয়া পৌঁছিলাম তখন দেখি বিষাদ সকলের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ও সমস্ত বাটীতে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। আমি যে দিন পৌঁছিলাম তাঁহার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া হুগলির সিবিল সার্জনকে ডাকা হইয়াছে। আমি যখন পৌঁছিলাম তখন তিনি আসিয়া পৌঁছেন নাই। অনেক পরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি শনিবার দিবস চুঁচুড়ায় পৌঁছি। শ্রীমৎ রবিবার ও সোমবার দিবস অচেতন প্রায় ছিলেন। কেবল যাঁহার সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার নিকট যাইতেছেন না। মঙ্গলবার দিবস চৈতন্য লাভ করিয়াই আমাকে উপরে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি সসম্ভ্রমে দূরে বসিলাম কিন্তু তিনি যে খাটে শুইয়াছিলেন তাহার উপর আসিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টি স্বভাবতঃ অতি ক্ষীণ। আমি কিঞ্চিৎ দূর হইতেও ভাল দেখিতে পাই না। খাটের উপর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া যখন তাঁহার শরীরের ভয়ানক শীর্ণতা অনুভব করিলাম তখন আমি আঁতকিয়া উঠিলাম হায়! হায়! বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রক্ষিত সেই মধুর কান্তি ও লাবণ্য এক্ষণে কোথায়? সে সময় একটি আর্ত্তনাদ অবশ্য আমার মুখ হইতে বিনির্গত হইত কিন্তু কোন প্রকার অস্থিরতা দ্বারা তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে ডাক্তারের নিষেধ স্মরণ হইল আর আমি সামলাইয়া গেলাম। যিনি আমাকে উপরে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন তাঁহাকে যাইবার সময় আমি আশ্বাস দিয়াছিলাম যে যতদূর পারি সুস্থিরতা রক্ষা করিব। খাটের উপর যাইবামাত্র শ্রীমৎ আমার হাত তাঁহার হাতের ভিতর রাখিতে বলিলেন। আমার হাত ধারণ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে "আমি এক্ষণে দৃষ্টিহীন, নাড়ি ক্ষীণ" দিবারাত্রির গিত অনুভব করিতে পারি না।—"ন দিবা ন রাত্রিঃ শিব এব কেবলঃ।" আমি এক্ষণে কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি। এই কথা বলাতে অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। তাঁহার প্রিয়তমের স্মরণে অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। অন্তিম সময়ে সেই প্রিয়তমই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। বিদায় হইবার সময় তাঁহার

পদধূলি লইলাম। সেই সময়ে মনের অবস্থা বর্ণনীয় নহে। যখন মনে করিলাম হয়তো তাঁহার সহিত আর ইহলোকে সাক্ষাৎ হইবে না—তখন আকুল হইয়া পড়িলাম। অগ্নিময় মস্তিষ্ক লইয়া নীচে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকের সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। হায়! হায়! এ জীবনের Guide, philosopher and friend" "পথপ্রদর্শক, জ্ঞানদাতা ও সুহৃৎ" চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছেন ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে?

শ্রীমৎ উপরে বর্ণিত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ সুদরাইলে পর (তখনও জীবনের বিশেষ আশা নাই) পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী একদিন তাঁহার হাতের একটি লেখা আমাকে দেখিতে দিলেন। হস্তাক্ষর কিছু অস্পষ্ট ছিল কিন্তু তিনি এরূপ অবস্থাতে আদোবে লিখিতে পারেন তাহা আমি স্বপ্নে মনে করি নাই। তাঁহার হস্তলিপি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম আর তাহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহা দেখিয়া আরও আশ্চর্য্য হইলাম। উহাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল "আমার শরীর এক্ষণে অন্য কর্ত্তৃক যন্ত্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে; তাহা এক্ষণে সকল প্রকার রাসায়নিক পদার্থাগার হইয়াছে। আমার আত্মা এক্ষণে সেই 'শান্তং শিবমদ্বৈতং'-এর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে সংসারে কোন কষ্ট নাই, কোন শোক নাই। সকলই শান্তিময় দেখিতেছি।" আমি এই লেখা পড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলাম যে শ্রীমৎকে বলিবেন যে এ অবস্থাতে তাঁহার মনের শক্তি দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। ইতি

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—শ্রাবণ ১৮০৯ শক।

॥ ৫ ॥

[নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

পরম প্রণয়াস্পদ মিত্রবরেষু—

আপনার ১৬ অগ্রহায়ণের পত্র পাইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। ... ... কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেওঘরে আইসেন। তাঁহার সহবাসে একদিন থাকিয়া দেখিলাম তাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে এরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরল। যে একদিন এখানে ছিলেন তাঁহার সহবাসে কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু উল্লিখিত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের সঙ্গে তিনি এমত কতকগুলি মত অবলম্বন করিয়াছেন যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের

শাস্ত্রসঙ্গত নহে এবং যাহা অবলম্বন জন্য ব্রাহ্মেরা নিজ সম্প্রদায়ের বক্ষে তাঁহাকে রাখিতে পারেন না আর তাঁহারও তাহাতে থাকা উচিত হয় না। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া একটি নূতন হিন্দু সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন তাহা হইলে উক্ত অসঙ্গত দোষ অপনীত হয় এবং তিনি আমার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। আমি অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের (ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে আমি হিন্দু সম্প্রদায় জ্ঞান করি) একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকে তাঁহাদিগের ভ্রম সত্ত্বে যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাঁহাকেও সেরূপ শ্রদ্ধা করিব। আমি তাঁহাকে একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করি। মত বিভেদ সত্ত্বেও আমি ঐরূপ জ্ঞান করি। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আমি কখনই প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, সকল মনুষ্য এক মতাবলম্বী হইবে।

তত্ত্বকৌমুদী ১লা পৌষ ১৮০৯ শক।

স্নেহশীল

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

॥ ৬ ॥

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পূর্ব্বজ বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩) প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার কার্য্যবিবরণ ও প্রবন্ধাদি সবই ইংরেজীতে লিখিত হতো। পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই সভা ইংরেজীতে একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সভার কার্য্য বঙ্গভাষায় সম্পাদন করবার অনুরোধ করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। পত্রখানি ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৩ তারিখের সভায় পঠিত হয়:]

মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

অদ্য Bengal Academy of Literature পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে দেখিলাম লিওটার্ড সাহেব পরিষদের কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য আমার এই মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত রূপ উন্নতি সাধন করিতে চাহেন এবং তাহাই পরিষদের উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেইমত ঘোষণা করা কর্ত্তব্য যে, কোন গবর্ণমেণ্ট ও কোন বিশেষ ইংরাজের সহিত কথোপকথন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা উচিত, আর অন্য কোন উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত

নহে। আমি ইহা দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের, ইংরাজীতে সম্বাদপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না তাহা আপনারা অনায়াসে প্রতীতি করিবেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় পরিষদের কার্য্য সম্পাদিত হইবে এই নিয়ম করিলে আপাততঃ কতকগুলি সভ্য ছাড়িয়া যাইবে বটে, কিন্তু ক্রমে ক্ষতিপূরণ হইবে, এবং এক্ষণে যাঁহারা কেবল ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। বঙ্গ পরিষদের কার্য্য বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশ সম্বন্ধীয় নহে, অতএব উহার কার্য্য কেবল' বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হইবে না কেন বুঝিতে পারি না। যদি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লভনীয় নহে। অধিক বলা বাহুল্য।

বশম্বদ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

এগুলি ছাড়া রাজনারায়ণের বহু ইংরেজী পত্র পৌষ ১৭৯৬ শক, কার্ত্তিক ১৮০০, আশ্বিন ১৮০২ এবং শ্রাবণ ১৮০৩ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সেকালের কথা

৺রাজনারায়ণ বসু

[অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "আত্মচরিত" প্রকাশিত করি, সেই সময়ে তাঁহার অন্যতম জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের গৃহে বসু মহাশয়ের রচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ক এক গ্রন্থের হস্তলিপি দেখিয়াছিলাম। এখন যতদূর মনে পড়িতেছে, ন্যূনকল্পে ছয়খানি খাতাতে এই বইখানি লিখিত ছিল। উহা পাঠ করিবার জন্য আমি লইয়া আসিয়াছিলাম। তখন পাঠ ও প্রকাশ করিবার সুবিধা না হওয়ায় উহা ফেরৎ দিয়াছিলাম। পরে খাতাগুলি কেহ কেহ কোন কোন উদ্দেশ্যে লইয়া গিয়া সবগুলি ফেরত দেন নাই। বর্ত্তমানে মিত্র মহাশয়ের নিকট কেবল দুখানি জীর্ণ ও কীট-দষ্ট খাতা আছে। তাহারই কোন কোন অংশের পাঠোদ্ধার করিয়া দেওয়া হইতেছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

১। কেশবচন্দ্র

যখন দেবেন্দ্রবাবু হিমাচলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি চিন্তা করিতেছেন, তখন কলিকাতায় যে দুইটি যুবক তাঁহার সহায়তার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয় একে একে কথিত হইবে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব-প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের বিষয় অগ্রে বর্ণিত হইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। ইনি ইংরাজী ভাষায় প্রথম সুশিক্ষিত ছাত্রদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, প্রথম ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বিস্তৃত অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমকালবর্ত্তীদিগের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী কলুটোলায় ১৭৬০ শকের ৫ অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালাবধি তাঁহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্বভাব প্রবল এবং মহত্ত্বের আশা বলবতী ছিল। তৎকালে তিনি বয়স্যদিগের নেতা হইয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেন—অন্যান্য বালকগণ তাঁহার অনুগামী হইয়া চলিত। তিনি কলিকাতাস্থিত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। কলেজের উচ্চশ্রেণীতে উঠিয়াই তিনি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ সমালোচনার নিমিত্ত ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় অবধি তাঁহার ধর্ম্মভাবও উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে করিতে তাঁহার ধর্ম্মভাব স্ফূর্ত্ত হয়। তিনি ইংরাজী ভাষায় ধর্ম্মের উপদেশ যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষার মূল। তাহাতে তাঁহার খৃষ্টের প্রতি সহজেই ভক্তি উদিত হইয়াছিল। তদনন্তর তিনি খৃষ্টান মিশনরীদিগের সহিত আলাপ করিলেন এবং তাঁহাদের মত ও বাইবেল শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ জানিতে লাগিলেন। তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধিতে খৃষ্টের ঈশ্বরাবতারত্ব কোন মতেই সংলগ্ন বোধ হইল না। মিশনরীদিগের মধ্যে যিনি একেশ্বরবাদী খৃষ্টান তিনি ত্রিশ্বরবাদীদিগের অপেক্ষা আপনার মত অধিক

সঙ্গত বলিয়া দেখাইলেন, কিন্তু তাহাতে "খৃষ্টানদিগের মতের ঠিক নাই" ইহাই প্রতিপন্ন হওয়াতে তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের উপর অনাস্থা জন্মিয়া গেল। সুতরাং তিনি খৃষ্টান না হইয়া ঐ ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সত্য তাহাই লইয়া আপনারা ধর্ম্ম-তৃষ্ণা শান্তি করিতে লাগিলেন।

তিনি উক্ত ধর্ম্মের মধ্যে পাপ ও প্রার্থনার যে-প্রভাব অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই মুখ্যধর্ম্ম বোধ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার ঐ সময়ের হৃদয়ের ভাব একস্থানে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেনঃ—

"আমি দেখিলাম যে আমার হৃদয় অন্ধকারপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং পৃথিবীর মোহ, ইন্দ্রিয়-সুখের নানাপ্রকার ইচ্ছা, যশখ্যাতি ও বিলাস-বাসনার সাংঘাতিক আকর্ষণের অধীনে উহা অবস্থিতি করিতেছে। আমি একজন দুঃখী পাপী; সম্ভব কি যে, অগণ্য শত্রুর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি? দুর্ব্বল শরীর, দুর্ব্বলতর হৃদয় এবং তদপেক্ষা দুর্ব্বল মত লইয়া অন্তর বাহিরের এইসকল ভয়ানক শত্রু যাহারা দিনযামিনী আমার আত্মাকে পরাস্ত করিবার জন্য ঘোর বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, কেমন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে স্থির থাকিতে পারি?"*

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গভীর পাপ বেদনা এবং আপনার অসহায়তা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহাতে আপনা হইতেই প্রার্থনা-বাক্য সকল তাঁহার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তিনি ঐ প্রার্থনাবলম্বন** দ্বারাই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করেন।

*Lectures and Tracts, by Keshub Chander Sen, London Edition: Page 232.

** পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, যে, যে-স্বভাববশতঃ ভারতবর্ষে উপনিষদের পর পুরাণ-সকল রচিত হইয়াছে সে-স্বভাবকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য; এইজন্য ব্রাহ্মসমাজের কালেও স্বভাবের সেই লক্ষণ প্রত্যাবৃত্ত হইল। কেশববাবু যেরূপ প্রার্থনা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা পুরাণোক্ত প্রহ্লাদাদি উপাসকের প্রার্থনার ন্যায়। কিন্তু হিন্দু পুরাণের ভাব তিনি তখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই; তিনি বাইবেলোক্ত ভক্তগণের প্রার্থনার অনুকরণেই ঐ প্রার্থনা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এজন্য বাইবেলোক্ত আখ্যায়িকা ও তদুক্ত ভক্তগণের উদাহরণ দ্বারাই ঐ প্রার্থনার ভাব সম্যক্ বিদিত হইতে পারে। পুরাণোক্ত ঈশ্বর শরীর ধারণ করিয়া ভক্তকে দর্শন দেন, বাইবেলোক্ত ঈশ্বর অদৃশ্য আকারে কখন বা বিদ্যুতীয় প্রভায় ভক্তকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। পুরাণোক্ত ঈশ্বর আপনি ভক্তকে উপদেশ দেন ও বিপদ হইতে রক্ষা করেন; বাইবেলে সেই কার্য্য সাধনের জন্য ঈশ্বর হইতে এঞ্জেল ও প্রফেট নামক দুই-প্রকার জীব আছে। কিন্তু ঐ উভয় শাস্ত্রেই ঈশ্বর বা তাঁহার আজ্ঞাবাহক দেবতাগণ ভক্তদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, প্রথমে তাহাদের মন পরীক্ষা করেন, পরে দেখা দেন এবং তাহাদের সাহায্য করেন। ইহার জন্য ভক্তগণকে প্রার্থনা করিতে হয়। কখন ঈশ্বর প্রার্থণার পূর্ব্বেও আসিয়া মনুষ্যকে সৎপথে যাইবার জন্য তাড়না করেন, কখন বা তাহাকে অগ্রে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর ভক্তের মন ও অবস্থানুসারে অল্পকাল বা দীর্ঘকালের পর তাহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের চর্চ্চা যেরূপ হইয়া আইসে তাহা উপনিষদের ভাব অনুযায়ী। তাঁহার দৃষ্টিতে এইমত কতক অংশে অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বাস্তবিক এইমতে অনেক সত্য আছে তাহার সন্দেহ কি? কেশববাবু সেইসকল সত্য অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ঐ পৌরাণিক কাল আনয়ন করিয়াছেন। এই তথ্য উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান হইবে।

তিনি তৎকালে ইংরাজী ভাষাতেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেই ভাষায় তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা রচনা করিয়া কখন কখন অতি নিভৃত স্থানে তাহা পাঠ করিতেন। এইরূপে পাঠ করিতে দেখিয়া তাঁহার সহাধ্যায়ী ও বয়স্যগণ মনে করিতেন, তিনি বুঝি মিশনরীদিগের সঙ্গে পড়িয়া খৃষ্টান হইয়াছেন।* তাঁহার আত্মীয়গণ ইহা শুনিলে তাঁহাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিবে এজন্য তিনি তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এতদূর প্রবল হইয়াছিল এবং লোকের ধর্ম্মবিষয়ে অননুরাগ দেখিয়া তিনি এত বেদনা অনুভব করিতেন যে, তাঁহার মনে হইত, কেন সকল লোক আজিই জাগরিত হইয়া উঠিবে না? এই বিষয়ে আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত তিনি এক এক খণ্ড কাগজে "হে পথিকগণ! এই পৃথিবীতে শান্তি নাই, তোমরা কি চিন্তা করিতেছ?" "মৃত্যুকে স্মরণ কর" এইরূপ লিখিয়া অন্ধকারে সকলের অগোচরে প্রকাশ্য পথের এক এক স্থানে সেই কাগজ আঠা দিয়া বসাইয়া দিতেন। মনে করিতেন, এই লেখা যে পাঠ করিবে, তাহারই চিত্ত বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মের সেবায় তৎপর হইবে। কখন কখন ঐ কাগজ তাড়াতাড়িতে উল্‌টো বসান হইত। পথিক লোকেরা মনে করিত বুঝি কোন পাদরীতে এই কার্য্য করিয়া থাকে।

তৎসময়ে কৃতবিদ্য লোকেরা এক এক সভা করিয়া তাহাতে হিতকর বিষয় সকলের অনুশীলন করিতেন। কেশববাবুও ইহার পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজগৃহে মিশনরী ও অন্যান্য সাহেব এবং কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকে লইয়া ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামক সভাস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের নানা বিষয়িণী উন্নতির আলোচনা হইত। এক্ষণে তিনি তাঁহার আন্তরিক ধর্ম্মভাবের আলোচনার নিমিত্ত তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুদিগকে লইয়া "গুড্‌উইল ফ্রেটার্ণিটি" অর্থাৎ সদ্ভাব সঞ্চারিণী সভা** নামে আর-এক সভা স্থাপন করিলেন। ইহাকে একপ্রকার ব্রাহ্মসমাজ বলিলেও বলা যায়। তখন স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে এক-একটি সভা হইত। তাহার কার্য্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজেরই আদর্শে নির্ব্বাহিত হইত। কিছু দিন এইরূপে চলিবার পরে তাহা ব্রাহ্মসমাজ নাম পরিগ্রহ করিত। এখন দূরতর পল্লীগ্রামে ঐরূপ পদ্ধতিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেশববাবুর সভাও সেইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ছিল। "তথায় সকলে একত্র হইয়া প্রার্থনা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিতেন। কখন কখন বা তত্ত্ববোধিনী (পত্রিকা) হইতে কোন কোন অংশ পঠিত হইত।"† এতদ্দ্বারা কেশববাবুর উদ্দীপ্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আপাততঃ তৃপ্ত হইত, কিন্তু যাহাতে ঐ প্রবৃত্তির সমুদায় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় এমন একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম্ম তিনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। পরে একটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতা✠ পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন

---

* ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ২৩১ পৃষ্ঠা।

** ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ২৩৭ পৃষ্ঠা। † ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

✠ এই বক্তৃতাটি ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিত।

যে, ব্রাহ্মসমাজের যে-ধর্ম্ম তাহাই তৃপ্তিপ্রদ। উক্ত বক্তৃতায় উদ্ভাসিত বিবিধ-অঙ্গ-সম্পৃক্ত সত্য-ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি পূর্ণমাত্রায় তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। পূর্ব্বে তিনি অসত্যবোধে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই অথচ সত্যধর্ম্ম কি তাহাও জানিতে সমর্থ হয়েন নাই। এ অবস্থায় তাঁহার মনে এক এক সময় বিস্তর ক্লেশ উপস্থিত হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের ছায়াতে তাঁহার সে সমুদায় ক্লেশের শান্তি হইল। কিন্তু এখনো তাঁহার চিত্ত একবারে সন্দেহমুক্ত হয় নাই। তিনি মনে করিতেন, একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের মতও ত সত্য। পরে জানিলেন যে, যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনি অধিকতর সমাকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহার সংস্থাপক স্বয়ং একজন একেশ্বরবাদী খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্টের কোন কথাই দেখিতে বা শুনিতে পান না। তাহাতে তাঁহার মনে দ্বিধা জন্মিল। পরে তিনি সন্ধান পাইলেন, যে, রামমোহন রায় যে খৃষ্টান ছিলেন, তাহার চিহ্ন তাঁহার লিখিত কোন কোন ইংরাজী গ্রন্থে স্পষ্ট প্রকাশ আছে। কেশববাবু সেই সংশয় অপনোদন নিমিত্ত প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া রামমোহন রায়ের প্রণীত ইংরাজী পুস্তক-সকল পাঠ করিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রত্যয় হইল যে, রামমোহন রায় একজন খৃষ্টান ছিলেন না; কিন্তু খৃষ্টের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। তাহাতে কেশববাবুর খৃষ্টভক্তিযুক্ত চিত্ত সুশান্ত হইল। তিনি খৃষ্ট ও সত্য ধর্ম্মকে একত্রে সেবা করিবার মীমাংসা ও পথ প্রাপ্ত হইলেন। খৃষ্টের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ছিল তাহা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল না। তাহা 'কেবল ভক্তির ব্যাপার'' বলিয়া অন্তরে রাখিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মসমাজের মত গ্রহণ করিতে পারিলেন। এইরূপে তিনি ১৭৭৯ শকের ১৬ মাঘ* ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয়েন।

যৎকালে কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয়েন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর মাত্র ছিল। ঐ সময় দেবেন্দ্রবাবু শিমলা পর্ব্বতে ছিলেন। তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রতি যত্ন করিতেন; তিনি যে পুস্তকাদি পাঠ করিতে চাহিতেন, তাহা প্রদান এবং কথোপকথন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সমস্ত মত তাঁহাকে অবগত করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরাবধি প্রায় একবৎসর তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত দ্বারা ব্রাহ্মদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ মাসে (বা কার্ত্তিক মাসে) দেবেন্দ্রবাবু কলিকাতায় উপনীত হইলে অন্যান্য ব্রাহ্মগণ যেমন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তেমনি একদিন কেশববাবুও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে আসিবার অগেই দেবেন্দ্রবাবু অল্প অল্প তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতামহ

---

*দেবেন্দ্রবাবু পুনরায় স্নেহপূর্ব্বক তাঁহাকে ১৭৮২ শকের ১৭ অগ্রহায়ণ আপনি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

ও দেবেন্দ্রবাবুর পিতা কোন কোন কার্য্যে পরস্পর সহযোগী ছিলেন। সেই উপলক্ষে রামকমল সেনের মর্য্যাদা দেবেন্দ্রবাবুর বিশেষ গোচর ছিল। কেশববাবু নিজে একজন সুশিক্ষিত, প্রতিভাবান্ ও উৎসাহী ব্রাহ্ম, ইহা অবগত হইয়া এবং তাঁহার মুখশ্রীতে সেই উৎসাহের উজ্জ্বল প্রমাণ একবারে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি দেবেন্দ্রবাবুর স্নেহ আকৃষ্ট হইল। তাহার আরো কয়েক মাস পরে ১৭৮১ শকের প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন সূত্রে দেবেন্দ্রবাবু ও কেশববাবুর মধ্যে যোগ আরো বর্দ্ধিত হইল।

অপরন্তু, এবারে দেবেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্য যে অধিক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইবে, এমন শুভ লক্ষণ দেবেন্দ্রবাবু কলিকাতাতে পদার্পণ করিয়া তাঁহার গৃহ মধ্যেই সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় আত্মজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রতসাধনের পক্ষে যে ক্ষমতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি আশার অতীত ফললাভ করিয়াছিলেন।

২। সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬৮ শকের ২ জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, কার্য্যতৎপরতা ও সময়-প্রতিপালনাদি গুণ তাঁহার পরিবার ও বয়স্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের চিহ্ন প্রকাশ করিত। পঠদ্দশায় তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে প্রবেশশক্তি, পরিষ্কার জ্ঞান, এবং সত্যপ্রকাশ সাহসাদি গুণে তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি যাহা উচিত বুঝিবেন তাহাই করিবেন, যাহার আরম্ভ করিবেন, তাহার শেষ না করিয়া ছাড়িবেন না, তাঁহার এই গুণ পরে যৌবনকালের বল ও সাহসের সহিত যুক্ত হইলে, তাঁহার তৎকালীন সহযোগী সমাজ-সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

তিনি প্রথমতঃ হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। পরে ইংরাজদিগের সংসর্গে তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা উত্তম হইবে বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু তাঁহাকে সেন্টপল স্কুলে অধ্যয়ন করিতে দেন। সেইখানে তাঁহার ইউরোপীয় ভাব সমস্ত শিক্ষা হয়। পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

গৃহেতে যিনি তাঁহার ইংরাজী-শিক্ষক ছিলেন তিনি ব্রাহ্ম; যিনি তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতেন তিনিও ব্রাহ্ম; ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা তখন তাঁহার গৃহের সর্ব্বাংশেই প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং অতি অল্প বয়সেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুদায় মত ও ব্রাহ্ম-সমাজের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। যখন দেবেন্দ্রবাবু শিমলা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। এই বয়সেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে উন্নত সাধক ও ব্রাহ্মসমাজের নেতার ন্যায় কার্য্য করিবার সামর্থ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার ভাব দেখিয়া বাৎসল্যরসে বিগলিত হইলেন এবং তাঁহার উন্নত শক্তির অনুরোধে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে যথাযোগ্য স্থান প্রদান

করিলেন। তিনি এই অল্প বয়সেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এক-একটি অপূর্ব্ব প্রস্তাব প্রকাশ ও ব্রাহ্মসমাজে এক একটি উজ্জ্বল বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মগণকে চমকিত করিয়া তুলিলেন।

১৭৮০ শকের পৌষ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত "জগতের শুভাশুভের বিচার ও মনুষ্যের সুখদুঃখ" শিরস্ক যে দুইটি প্রস্তাবে ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের বিরুদ্ধ সমুদায় কোটি অতি নিপুণরূপে মীমাংসিত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারের পথ পরিষ্কৃত হইল সেই প্রস্তাবদ্বয়ের মধ্যে একটি সত্যেন্দ্রবাবুর রচিত। তিনি ১১ মাঘের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে সেই অল্প বয়সেই তিনি ধর্ম্মের তত্ত্বসকল নিজের চিন্তা দ্বারা কেমন নিপুণরূপে শৃঙ্খলাপূর্ব্বক আয়ত্তীকৃত করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে যে স্নিগ্ধগম্ভীর অতুলরসভাবপূর্ণ সঙ্গীত-সকল রচনা করিয়া তিনি ব্রাহ্মদিগের নিকট যশস্বী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের চিরদিনের অবলম্বনীয় অমূল্য সম্পত্তি দান করিয়াছেন—যেসকল সঙ্গীতের নিমিত্ত তিনি বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে এক গণনীয় কবি বলিয়া মান্য হইবার উপযুক্ত—তাঁহার প্রথম দিবসের ঐ বক্তৃতাতে ঐসকল সঙ্গীতের প্রায় সমুদায় ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও ঐ বক্তৃতার সমুদায় ভাগ উদ্ধৃত না করিলে তাহার সমুদায় ভাব ব্যক্ত করা যাইতে পারে না, তথাপি কয়েকটি বিষয়ের পরিচয়ার্থ তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

"সেই চেতনাবানের প্রকাশে এই সমুদায় জড়পদার্থও চেতনাবিশিষ্ট বোধ হয় এবং তাঁহারই অনুপম সুন্দরভাবের ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়া এই সমুদায় সুন্দর দেখায়। এই অচেতন দিবাকর সচেতনের ন্যায় সচল হইয়া প্রতিদিনই যথাকালে সমুদায় জীবের বিশ্রামভঙ্গ পূর্ব্বক সকলকেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করত তাঁহারই শাসন প্রচার করে। গভীর নিশীথ সময়ে সকল জীব সুষুপ্ত হইলে নীলোজ্জ্বল গগনমণ্ডলে দীপ্তিমান্ তারকাগণ সৈন্যদলের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া প্রহরীরূপে যেন তাঁহারই রাজ্য পালন করে। কত নদনদী পর্ব্বত-ক্রোড় হইতে বিনিঃসৃত হইয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিবার জন্য কত দেশ বিদেশ অতিক্রম করিয়া এবং কত দুস্তর প্রতিবন্ধক ছেদন করিয়া ঘোরতর নিনাদে ও প্রবল বেগে ধাবমান হইতেছে এবং তাঁহারই রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন ও অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। জনশূন্য দুর্গম গহনের প্রত্যেক মনোহর পুষ্প তাঁহার অতুল্য তুলিকা দ্বারা উন্মীলিত হইয়া তাঁহারই হস্তদ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারই সুন্দরভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সুন্দর মঙ্গলভাব চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান রহিয়াছে; জগতের অতি সামান্য বিষয়ও গূঢ় পরমার্থভাবে পূর্ণ রহিয়াছে।"

অনন্তর তিনি একটি প্রার্থনাতে তাঁহার আপনার জীবনের ভবিষ্যৎ গতির সূচনা করিয়াছেন।

"হে পরমাত্মন্! তুমি মনুষ্যকে অনন্তকালের উন্নতি লাভে অধিকারী করিয়া তাহার মনে কতই মহত্ত্বের বীজ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি তাহার সুখরাজ্য কতই

বিস্তৃত করিয়াছ; তাহার অধিকার কতই প্রশস্ত করিয়াছ; তাহাকে কতই আধিপত্য প্রদান করিয়াছ। তথাপি যাহারা স্বকীয় গরীয়সী প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া অপথে পদার্পণ করিতেছে এবং আপনাদের সঙ্গে অন্যকেও দূষিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে এবং যাহারা নানাপ্রকার ঘটনাসূত্রে অনুস্যূত হইয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনার জন্য আমার মন উৎসুক হইতেছে। যাঁহারা তোমার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে গমন করিবার মানস করিয়া সম্মুখে অনেক ব্যাঘাত ও বিস্তর প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়েন এবং দেশের কুরীতি বা কুসংস্কারবশতঃ সেই পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না; হে বিঘ্নবিনাশন বিশ্বপিতা! তুমি তাঁহাদের সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দেও এবং তাহাদের মনে উৎসাহ ও সাহস প্রদান কর। * * *

হে পরমাত্মন্! যাহাতে আমাদের সকলের মধ্যে স্বার্থপরতা দুর্ব্বল হইয়া ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয়—যাহাতে তোমার প্রেমানুরূপ সূত্র চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, যাহাতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশ দেশের মধ্যে এবং এই দুর্ব্বল জাতি জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে, তুমি তাহার বিধান কর।''

যখন সত্যেন্দ্রবাবু এইরূপে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি সাধন সম্বন্ধীয় অনেক কার্য্যের ভার ধারণ করিয়া নিপুণরূপে তাহা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তখন কেশববাবু তত্ত্বাবতের দর্শক মাত্র ছিলেন। ইহাও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ গতির অভিব্যঞ্জক। বস্তুতঃ সত্যেন্দ্রবাবু অপেক্ষা কেশববাবুর অধিক দর্শন আবশ্যক। কারণ সত্যেন্দ্রবাবুর বর্ত্তমান আরব্ধ কার্য্য শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহাকে বহুকালের জন্য ব্রাহ্ম-সমাজের ভার ধারণ করিতে হইবে। এই নিয়তির সংসাধন-শক্তি উপার্জ্জন জন্য কেশববাবু সত্যেন্দ্রবাবুর চারি বৎসর পূর্ব্বেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪)

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র

রাজনারায়ণ বসু

যেরূপ চিন্তাকুলিত চিত্তে ও বিষণ্নমুখে দেবেন্দ্রবাবু হিমালয় গমন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার আর-এক প্রকার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইল। শরীর যেমন পরিপুষ্ট, মন তেমনি বীর্য্যবান, মুখমণ্ডল তেমনি প্রফুল্ল। তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাক্ষাৎকারীদিগের সহসা এইরূপ ভাব মনে হইতে যেন সত্য সত্য তিনি হিমালয়ের মধ্যগত দেবলোক হইতে প্রত্যাবৃত হইয়াছেন। বস্তুতঃ হিমালয় প্রদেশে ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা দেবেন্দ্রবাবু যে পারমার্থিক রস উপভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে পৃথিবীতে তাঁহার আরকোন অভাব অনুভূত হইত না। তিনি পূর্ণকাম হইয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্মবলের সহিত পুনরায় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

প্রেম ও ভক্তির বিশিষ্ট রূপ অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যখন কেবল বস্তুতত্ত্বের আলোচনাতে ব্রাহ্মসমাজ রত ছিলেন তখন দেবেন্দ্রবাবু এই কবিতাটি রচনা করিয়া এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,

"ধর্ম্ম-বিনা জ্ঞান বৃথা, জ্ঞান বিনা বল;
ব্রহ্ম-প্রীতি বিনা ধর্ম্ম শ্রমই কেবল।"

এক্ষণের তিনি ব্রাহ্মগণের মধ্যে হৃদয় খুলিয়া ঐ সকল ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেবেন্দ্রবাবু প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজে এক-একটি বক্তৃতা করিতেন। তৎপরে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে উপদেশ প্রদান করেন। পরে ব্রাহ্মসমাজের আর্য্যপদ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখান করেন। প্রথম উল্লিখিত বক্তৃতাগুলিতে উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছিল। তাহাতে দেবাসুরের সংগ্রামের যে প্রকৃত অর্থ আখ্যাত হইয়াছে তাহার মধ্যে ধর্ম্মের অনেক কথা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই জগতের উপর ঈশ্বরের কিরূপ কর্ত্তৃত্ব, ধর্ম্মসাধন পক্ষে আপনার শক্তি ও ঈশ্বরের প্রসাদ কিরূপ উপযোগী, আত্মা কি পরিমাণে স্বাধীন ও কি পরিমাণে ঈশ্বরের অধীন তাহা ঐ সকল উপদেশ দ্বারা সুব্যক্ত হইয়াছে।

প্রথমোল্লিখিত বক্তৃতাগুলি তিনি ব্রাহ্মসমাজে ১৭৮০ শকের পৌষ অবধি ১৭৮২ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ব্যক্ত করেন। এইসকল বক্তৃতাতে অল্পের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব সকলই ব্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের অধিকার, তাহার মাহাত্ম্য, তাহার উপকারিতা, ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ এইগুলি ঐ সকল বক্তৃতার প্রধান বিষয়। সেই সকল বক্তৃতা "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

* * *

১৭৮০ শকে সত্যেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে পিতার যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কেশববাবু তৎসমুদায় দেখিয়া শুনিয়া আপনি আপনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের পর সত্যেন্দ্রবাবুরই সহিত কেশববাবুর প্রথম সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। তাহাই সম্ভব। দেবেন্দ্রবাবুর সহিত দিন কতকের আলাপের পর কেশববাবু সত্যেন্দ্রবাবুকে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া এক পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্ম্মতাত বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্রে দেবেন্দ্রবাবু কেশবাবুর মনের ভাব অবগত হইয়া অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি কেশববাবুর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই যুব সাধারণ লোক হইবেন না। এক্ষণে তাঁহার পিতৃ সম্বোধনে আপ্যায়িত হইয়া তিনিও তাঁহাকে পুত্র বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখনো তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর্য্য অনুসারে তাঁহার আন্তরিক ভাব সহসা প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং তখন তাঁহাদের মধ্যে আর কোনো ঘনিষ্ঠতা জন্মিল না। কিন্তু এইসকল শুভলক্ষণ দেখিয়া তাঁহার মনে যে আনন্দোদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত। কেশববাবুও দেবেন্দ্রবাবুর মহত্ত্ব আপনার জীবনের গতি ও ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে অভাবনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৭৮১ শকের প্রথম দিবস নববর্ষোপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার পর, কেশববাবুর ভক্তিভাব উচ্ছ্বসিত হওয়াতে তিনি ঐ সমাজ-মন্দিরে প্রকাশ্যে পিতৃভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন দেবেন্দ্রবাবুও আর তাঁহার আন্তরিক ভাব অব্যক্ত রাখিতে না পারিয়া পুত্রভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে কেশববাবু ও দেবেন্দ্রবাবুতে ঘনিষ্ঠতর যোগ আরব্ধ হইল।

কেশববাবু আপনি অনুসন্ধিৎসা প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুদায় মত ও ভাব অবগত হইলেন। তখন তাঁহার সংস্থাপিত গুড্‌উইল ফ্রেটার্নিটির সভ্যগণ ও তাঁহার অন্যান্য বন্ধুগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে যে আলোচনা করিতেন, তাহা তাঁহার তৃপ্তিকর হইত না। তিনি এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বহুদিন স্থাপিত উচচতর মর্য্যাদা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। অতএব কেশববাবু দেবেন্দ্রবাবুর সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে অভিলাষী হইলেন। একদিন কেশববাবু তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় খোলা হয়; তাহাতে জিজ্ঞাসু বন্ধুবান্ধবদিগকে ও আগন্তুক ব্যক্তিসকলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হয়। দেবেন্দ্রবাবুর তাহা পূর্ব্বাভ্যস্ত এবং তিনি এখনো তাহাই চাহেন, অতএব তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। অমনি সিন্দূরিয়াপাটিস্থ একটি বাটি স্থির হইল। ১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনা হইয়া সেই দিন অবধি প্রতি রবিবার উপদেশ প্রদত্ত হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ কেশববাবুর বয়স্যগণ সেখানে উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন। কিন্তু তাহাতে অভিলাষানুরূপ ফললাভ হইতে পায় না অতএব সর্ব্বস্থান হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রহের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল। তজ্জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেই সময়টি ঐ কার্য্যের এমনি উপযোগী হইয়াছিল যে, ছাত্র সংগ্রহের জন্য ঐ বিজ্ঞাপন দেওয়া ভিন্ন আর কোনো বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই। তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে ছাত্রসমাগম হইতে লাগিল। বিজ্ঞাপনটি এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে; তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যের সকল অবস্থা জানা যাইবে।

"

সম্প্রতি সিন্দূরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রতি রবিবারে প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টা অবধি ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবারে প্রাতঃকালের পরিবর্ত্তে সন্ধ্যা ৭টার সময় উক্তবিদ্যালয়ের উপদেশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে যুবাদের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলুটোলানিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নিকট আবেদন করিবেন।"

কিছুদিন ঐ সিন্ধুরিয়াপটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য হইবার পর ঐ শকের পৌষমাসে তাহা ব্রাহ্মসমাজের গৃহে দ্বিতীয় তলে উঠিয়া আইসে। দেবেন্দ্রবাবু হিমালয়প্রদেশে অবস্থানকালে ধর্ম্মতত্ত্ব সকলের কোন বিষয়েই চিন্তা করিতে অবশিষ্ট রাখেন নাই। পরন্তু ঐ সময়ে তত্তাবৎ তাঁহার দ্বারা সুচিন্তিত হইয়া সুসম্বদ্ধ ও সুস্পষ্টরূপে আয়ত্তীকৃত হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে তৎসমুদায় জলের ন্যায় সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার উল্লিখিত উপদেশগুলি ২৬শে বৈশাখ আরম্ভ করিয়া দশটি উপদেশে শেষ হয়। উপদেশের বিষয়— প্রথম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও লক্ষণ; ২য়, ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা; ৩য়া, পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ; ৪র্থ, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ; ৫ম, ঈশ্বরানুরাগ ও বিষয় বিরাগ; ৬ষ্ঠ, বিষয় সুখ ও ব্রহ্মানন্দ; ৭ম, পরলোক; ৮ম, স্বর্গ ও নরক; ৯ম ও ১০ম, মুক্তি। দ্বিতীয় প্রস্তাবে উপনিষদের মতের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হয়। তদ্বিষয়ে চারিটি উপদেশ হইয়া বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছিল। পরে আবার তাহা ১৭৮২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে খোলা হইয়াছিল।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এইসকল উপদেশ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় ধর্ম্মালোচনার ফলস্বরূপ। পূর্ব্বে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মনুষ্যের নিয়তি সম্বন্ধীয় সকল তত্ত্ব আন্দোলিত

হইয়াছিল, এক্ষণে সেইসকল তত্ত্বের মীমাংসা হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রবাবু পূর্ব্বে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়া যেমন শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তেমনি এক্ষণে তাঁহার নিজের চিন্তা ও ভাব হইতে এই দশটি উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক জিজ্ঞাসু লোকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলেন।

উল্লিখিত দশটি উপদেশ ১৭৮৩ শকের শেষে "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামে পুস্তককারে প্রচারিত হইল। এই পুস্তকস্থ উপদেশ সকলেরও যে-অংশ অবশিষ্ট ছিল, দেবেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রবাবু তাহা পূরণ করিয়া দিলেন। তিনি ধর্ম্মের সহজ-জ্ঞান-মূলকত্ব প্রতিপাদন করিয়া একটি সারবান্ উপক্রমণিকা তাহার সহিত যোগ করিয়া প্রকাশ করিলেন। সেই উপক্রমণিকাতে ধর্ম্মের মূল যেমন অখণ্ডনীয়রূপে অবধারিত হইয়াছিল, সেই উপদেশগুলিতে তেমনি ধর্ম্মের সমুদায় সার সত্য মনস্তৃপ্তিকররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ফলতঃ এই পুস্তকখানি সকল প্রকার ব্রাহ্মদিগের অতি উপাদেয় হইয়া প্রকাশিত হইল।

কিছুদিন পরে ভবানীপুরে এক ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রবাবু যে-সকল উপদেশ দেন, তাহা "ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ" নামে খ্যাত আছে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এই উপদেশের দ্বিতীয় স্তবকে উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাতে দেবাসুরের সংগ্রামের যে প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের অনেক কথা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই জগতের উপর ঈশ্বরের কিরূপ কর্ত্তৃত্ব, ধর্ম্মসাধনব্যাপারে আপনার শক্তি ও ঈশ্বরের প্রসাদ কিরূপ উপযোগী, আত্মা কি পরিমাণে স্বাধীন ও কি পরিমাণে ঈশ্বরের অধীন, তাহা এই সকল উপদেশ দ্বারা সুব্যক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যেমন সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহা তাহারা স্বায়ত্ত করিতে পারিতেছে কি না, তাহার আবার পরীক্ষা গৃহীত হইত। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তিনি কেশববাবুর স্বাক্ষরিত এক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইতেন।

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রবাবু ব্রহ্মের স্বরূপ, তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন এবং তাঁহার প্রকাশিত ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ২৬শে বৈশাখ প্রথম উপদেশ আরম্ভ হয়। ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীতি হয় যে, উপদেশ আরম্ভের অগ্রে ঐ বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব-কালেই উপদেশকদ্বয় যাঁহার যে মনোমত বিষয়, আপন আপন পক্ষে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে তদবধি এ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই প্রভিন্ন বিষয়দ্বয়ের অবলম্বনেই বলিয়া আসিতেছেন। দেবেন্দ্রবাবুর ধর্ম্মভাব ও কেশববাবুর ধর্ম্মভাব এবং তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য, তাঁহাদের সেই প্রথম সম্মিলনেই নির্ণীত হইয়াছিল।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তন্মধ্যে দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশের পরিচয় উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কেশববাবুর উপদেশের কোনো নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। তৎকালে সত্যেন্দ্রবাবু দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশগুলি ত্বরিত-লিখনে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কেশববাবুর উপদেশগুলি সেরূপে লিখিয়া রাখা হয় নাই। কিন্তু তিনি কি উপদেশ দিতেন, তাহা ফলের দ্বারাই বিশিষ্টরূপে জানা যায়। যাহা হউক, দেবেন্দ্রবাবু স্বয়ং তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এই জীবন্ত সত্য বলপূর্ব্বক তিনি (কেশবচন্দ্র) সকলের মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে, জ্ঞান, প্রীতি ও অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব। ইহার মধ্যে একের অভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যে, সে শুষ্ক জ্ঞান; জ্ঞান ব্যতীত প্রীতি যে, সে অন্ধকার অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান-প্রীতি উভয়েই নিষ্ফল, আবার জ্ঞানপ্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।"*

নূতন ব্রাহ্মদলের ভাব ও চেষ্টা

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের স্থাপনাবধি ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ দশবার্ষিক কালের গণনা আরম্ভ হয়। তৎপক্ষে ইহা অতি উপযুক্ত ঘটনা সন্দেহ নাই; কারণ, এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের স্থাপনাবধি ব্রাহ্মসমাজে নূতন উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল—এই সময় অবধি ব্রাহ্মসমাজ নূতন প্রাণ, নূতন বল ও নূতন শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

পরন্তু অক্ষয়বাবুর সময়ের ইতিহাস পাঠদ্বারা পাঠকগণের চিত্ত এই সংশয়ে সমাবিষ্ট হইতে পারে যে, ব্রাহ্মসমাজের আপাত প্রতীয়মান শুভলক্ষণ সকল তদন্তর্গত বহুতর অশুভলক্ষণে পরিপূর্ণ; বস্তুতঃ ইহা অসত্য নয়। কিন্তু ইহাতেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত সেই কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, আমরা দোষগুণবিশিষ্ট, ভবিষ্যৎ বিষয়ে এক প্রকার অন্ধ, অপূর্ণ মনুষ্যবর্গের পরিচালিত ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। তাহার অধিক কিছু নয়। তথাপি ব্রাহ্মসমাজে যে কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা উন্নতির নিমিত্তই ঘটিয়াছে ইহা শত প্রকারে সপ্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

বর্ত্তমান উন্নতির ঠিক ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে একটি ভগ্নশাখবৃক্ষের তুলনা আনিতে হয়; প্রবল ঝটিকায় একটি উন্নতি-বৃক্ষের প্রধান শাখা ভগ্ন ও তাহার মূল পর্য্যন্ত বিচলিত হইলে পুনরায় যেমন তাহা বদ্ধমূল হয় ও তাহার ঐ ভগ্নস্কন্ধ হইতে বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখা নির্গত হইয়া দশদিকে উত্থিত হয় আত্মীয়সভার বাদানুবাদ-রূপ ঝটিকার পর দেবেন্দ্রবাবু হিমালয় হইতে স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলে ভগ্নশাখারূপ অক্ষয়বাবুর স্থানে বহু সংখ্যক নবীন ব্রাহ্ম সমুত্থিত হইলেন।

---

* পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ৩৪ পৃষ্ঠা।

সেই বৃক্ষের যে-সকল শাখা সমুত্থিত হয় তাহাদের একদিকে গতি হয় না, একরূপ আকৃতি হয় না, বৃদ্ধি বা উন্নতির ক্রমও সমান হয় না, কিন্তু সকলেরই এক উদ্দেশ্য থাকে অর্থাৎ পৃথিবীস্থ লোকসকলকে ছায়া ও ফলদান।

জগতে কিছুরি অভাব চিরকাল থাকে না; ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও তাহাই দৃষ্ট হইবে। অক্ষয়বাবু পীড়িত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন; দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার স্থানীয় সাক্ষাৎ সহায়স্বরূপ সত্যেন্দ্রবাবু ও কেশববাবুকে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রবল ও আন্তরিক অসাধারণ যত্নে অভাবনীয় উন্নতির আশা দেবেন্দ্রবাবুর হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি কাহারো আন্তরিক লক্ষ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া এই ইচ্ছা করিলেন যে, মূল সত্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে যিনি যাহা করিতে পারেন তাহাই করুন। ইহাতে এই হইল যে, ব্রাহ্মধর্মের মূল ঠিক রহিল অথচ ব্রাহ্মসমাজে বহুবিধ বিচিত্রতা প্রদর্শিত হইতে লাগিল। এক এক লোকের এক এক দিকে অধিক আকর্ষণ; কেশববাবুর আকর্ষণ পৌত্তলিকতা বিনষ্ট হউক, সত্যেন্দ্রবাবুর আকর্ষণ জাতিভেদ ও স্ত্রীদিগের পরাধীনতা দূরীভূত হউক, অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের আকর্ষণ কেবল ব্রাহ্মোপাসনা প্রচারিত হউক; দেবেন্দ্রবাবুর আকর্ষণ ব্রাহ্মসমাজের চির-আগত গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ব্রহ্মোপাসনার সহিত সেসকলি সাধিত হউক। এইরূপ এক এক ব্রাহ্মের এক এক দিকে বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু সকলের এইরূপ অভিপ্রায় হইল যে, উন্নতিকল্পে যাহা দ্বারা যাহা কিছু হয় তাহাই প্রার্থনীয়; তাহাতে পরস্পরের সাহায্য করিতে হইবে। বস্তুত তৎকালে ব্রাহ্মসমাজের যে উন্নতি হইয়াছিল, ব্রাহ্মদিগের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকর্ষণ ও গতিই তাহার প্রধান হেতু।

এই সময়ে যে-সকল উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে;—

(১) দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া প্রতিদিন সমস্ত পরিবারের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিবার একটি ব্রাহ্ম পরিবার হইল।

(২) ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত ও তদনুরূপ অনুষ্ঠানার্থ প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন।

(৩) সত্যেন্দ্রবাবু মহৎভাবপূর্ণ নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মের মনোহরণ করিতে লাগিলেন। হার্ম্মোনিয়ম নামক ইংরেজী বাদ্যযন্ত্র তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া সঙ্গীতের আরো মনোহারিতা সাধন করিল।

(৪) সিংহল যাত্রার দ্বারা কেশববাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর মন ও সংকল্প দেবেন্দ্রবাবুর নিকট পরীক্ষিত হইল।

(৫) সমাজে ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ে লোক-সমাগম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

(৬) এইসকল দ্বারা দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজে এমন একদল লোক দেখিতে পাইলেন যাহাদের উপর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি সম্বন্ধীয় অনেক ভার স্থাপন করিতে পারেন।

এইসকল লক্ষণ দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবু স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যের নিমিত্ত আর তত্ত্ববোধিনীসভা রাখিয়া লোকদিগের মতামত লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন যে কার্য্যতৎপর উন্নত ব্রাহ্মগণকে পাওয়া যাইতেছে ইঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ব্রাহ্মদিগের মতামতের জন্য বিবাদের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, কারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক ব্রাহ্মসমাজে মতামতের জন্য বিরোধ হইবার পথ রাখিয়া যান নাই। এই সময় অর্থাভাবে তত্ত্ববোধিনী সভাও অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ পর্য্যন্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রবাবুর পরামর্শক্রমে অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে ১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার অবলম্বিত কার্য্য ও তাহার সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে অর্পণ করিয়া তাহার শরীরে তত্ত্ববোধিনী সভাকে লীন করিয়া দিলেন। উক্ত ১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি হইয়া প্রকাশিত হইল।

অনন্তর দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম সমাজের ট্রষ্টীর ক্ষমতা অবলম্বন পূর্ব্বক ১১ই পৌষ ব্রাহ্মসমাজের এক সাধারণ সভা করেন (তত্ত্ববোধনী পত্রিকা, মাঘ ১৭৮১)। তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রদত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দুইটি মুদ্রাযন্ত্র ও তাহাদের উপকরণ, ইংরেজি বাংলা অক্ষরাদি যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং সমাজের ঋণশোধ ও আয়বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারিত হয়। সেই সভায় দেবেন্দ্রবাবু নিম্নলিখিত পদ সৃজনপূর্ব্বক তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সমাজের কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।—

সভাপতি—শ্রীরমাপ্রসাদ রায়
অধ্যক্ষ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পত্রিকাধ্যক্ষ)
শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত (যন্ত্রাধ্যক্ষ)
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন (ধনাধ্যক্ষ)
সম্পাদক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরিদর্শক—শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

দেবেন্দ্রবাবুর হিমালয়ে অবস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় যন্ত্রালয়ের হিসাবে ১১৩৮৮১৬ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। এই বন্দোবস্ত হইলে পর তিনি তাহা সমাজে

দান করিলেন।

পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের মাসিক দানই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিত্য আয় ছিল। নগদ মূল্যেও কিছু কিছু বিক্রয় হইত। এক্ষণে অন্যান্য সাময়িক পত্রের ন্যায় তাহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ ও একখণ্ডের নগদ মূল্য নির্দ্ধারিত হইল।

(প্রবাসী, ৩ পৌষ ১৩৩৪)

দেবেন্দ্র-বাবুর উপদেশ, উপাসনা ও দীক্ষা-পদ্ধতি

পূর্ব্বাধ্যায়ে, ব্রাহ্মসমাজের যে কর্ম্মচারীদিগের তালিকা প্রদর্শিত হইল, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান কর্ম্মের ভার দেবেন্দ্র-বাবু, কেশব-বাবু এবং সত্যেন্দ্র-বাবুর হস্তে নিপতিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দেবেন্দ্র-বাবুর সম্মতি ও সহায়তায় কেশব-বাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু যে-সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে। দেবেন্দ্রবাবু এই সময়ে স্বয়ং যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইতেছে।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" নামে দেবেন্দ্রবাবুর যে-সকল উপদেশ প্রসিদ্ধ আছে তাহা ১৭৮২ শকের ১১ই শ্রাবণ হইতে ১৭৮৩ শকের ১০ই মাঘ পর্য্যন্ত পরে পরে প্রদত্ত হয়। এই ব্যাখ্যানের সহিত একটি ঐতিহাসিক বিবরণ সংলগ্ন আছে অতএব তাহা প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্যক। রামমোহন রায়ের সময় অবধি নিয়ম ছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে কেবল ভট্টাচার্য্যগণ উপবেশন করিয়া উপদেশ ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবেন। সেই রীতি দেবেন্দ্রবাবু যথাবৎ পালন করিতেন। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজেরও ঐ নিয়ম ছিল। এজন্য কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপাচার্য্যের কার্য্য শিক্ষা করিতেন এবং তাহা শিক্ষা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন। এক্ষণে সে নিয়ম সম্পূর্ণ না হউক এক-প্রকার রহিত হইল। পূর্ব্বে যেমন রামমোহন রায় তেমনি দেবেন্দ্রবাবু ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণ বরাবর বক্তৃতা করিবার সময় বেদীর নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতেন। এক্ষণে ব্রাহ্মেরা প্রস্তাব করিলেন যে, দেবেন্দ্রবাবুকে বেদীতে বসিয়া উপাসনা ও বক্তৃতা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেন তাঁহারা উপাচার্য্য পদে বাচ্য হইতেন। আচার্য্যের পদ রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের মৃত্যু অবধি শূন্য ছিল। দেবেন্দ্রবাবু সেই পদ গ্রহণ করিয়া বেদীতে বসিয়া প্রতি সমাজের দিবস বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তদবধি দুইজন উপাচার্য্য ও আচার্য্য এই তিনজন করিয়া বেদীতে বসিতে লাগিলেন। সেই সময় বিচার হইয়াছিল যে, বেদীতে কেবল ভট্টাচার্য্যগণই উপাচার্য্য হইবেন কেন? শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মদিগকে উপাচার্য্য করিয়া বেদীতে বসান কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহারাই ঐ কার্য্যের উপযুক্ত। যে ব্রাহ্ম তাহারই মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ শোভা পায়। তদনুসারে পূর্ব্বাকার ব্রাহ্মধর্ম্মাধ্যায়ী ছাত্র নিমতলানিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ও তৎপরে বেহালানিবাসী (ব্রাহ্মসমাজ

পরিদর্শক) শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, এই দুইজন উপাচার্য্য হইলেন। ইঁহারা ভট্টাচার্য্য শ্রেণীমধ্যে গণ্য ছিলেন না। যদিও ঘটনাক্রমে এই দুই উপাচার্য্যই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু যে নিয়ম ধার্য্য হইল তাহাতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকেরাও অনায়াসে উপাচার্য্য হইতে পারিবেন, এমন সম্ভাবনা রহিল।*

দেবেন্দ্রবাবু বেদীতে বসিয়া যেসকল বক্তৃতা করিতেন, তাহাই 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৭৮২ শকের ১১ শ্রাবণ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৭৩ শকের ১৭ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ষড়বিংশ ব্যাখ্যানে তাহার প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত হয়। পরে ঐ শকের ৬ আষাঢ় হইতে ১০ মাঘ পর্য্যন্ত একাদশ ব্যাখ্যানে তাহার দ্বিতীয় প্রকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ব্যাখ্যানগুলিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থগ্রথিত কতকগুলি শ্লোকের উন্নত পবিত্র ভাব ও তাৎপর্য্য স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইসকল বক্তৃতায় অথবা "ব্যাখ্যানে" দেবেন্দ্রবাবু প্রবন্ধরচয়িতার ন্যায় এক একটি তত্ত্বের যথাক্রমে ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু ধর্ম্মানুপ্রাণিত ব্যক্তিরূপে আত্মভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার এক-একটি ব্যাখ্যান পাঠ করিলে এক-একটি ধর্ম্মতত্ত্ব জানা যায় এমন নহে; কিন্তু ইহার প্রত্যেক পত্রের এক-একটি বাক্য তড়িতের ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে নবজীবন প্রদান করে, চমকিত করিয়া তুলে। এইসকল ব্যাখ্যার প্রতি সকল প্রকার ব্রাহ্মই অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইসকল বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান দ্বারা দেবেন্দ্র-বাবু কেবল ধর্ম্মভাবে কেন, ধর্ম্মের ভাষা বিষয়েও ব্রাহ্মদিগকে পরম সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। যতদিন ব্রাহ্মগণ ঐসকল ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিতে না পারেন ততদিন তাঁহাদের ধর্ম্মের অনেক অসম্পূর্ণতা থাকে। যাঁহারা আপনার হৃদয়ের ধর্ম্মভাব কোন রূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে দেবেন্দ্রবাবুর ঐ সকল ভাষা অবলম্বন করিতে হইয়া থাকে।

---

*কিয়দ্দিন পরে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাহার পর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ঐ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৭৭৫ শকে যখন দেবেন্দ্র-বাবুর ও রাজনারায়ণ-বাবুর জাতিভেদ বিষয় লইয়া পত্র লেখালেখি হয়—সে সময়ে দেবেন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকেও উপাচার্য্য হইতে পারেন, তবে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের অভিমত হইলেই হয়।" ঐ সময়েও তিনি উপাচার্য্য পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে রাজনারায়ণ-বাবুকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—

"আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা উপাচার্য্যের কর্ম্ম সুন্দররূপে কোন প্রকারে সম্পন্ন হয় না। এক্ষণকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ন্যায় নয়। আবার সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিত এইক্ষণকার নব্যসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মদিগের নিকট কখনই প্রিয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নামধারীরা এক্ষণে অত্যন্ত লোভী হইয়া উঠিয়াছেন। X X X যে ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট হইতে সে ধর্ম্মের কথা শুনা কি? যে কথায় ধর্ম্ম বলে, কার্য্যে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সম্মত নহে তাহাকে সমাজের মধ্যে আসন দেওয়াই বা কোন্ ধর্ম্মবিধি? আমি উপাসনার যে-প্রণালী প্রস্তাব করিতেছি ইহাতে ব্যয়েরও লাঘব হয়, কার্য্যও উত্তম হয়। সমাজের মধ্যে বক্তৃতা পাঠ করা অপেক্ষা বেদীতে বসিয়া বলিলেই ভাল। তাহাতে লোকেরা শ্রদ্ধাই ব্রাহ্মণ না হইলেও উপাচার্য্য হইবেন এ প্রথার মূলেও বজ্রাঘাত করা যায়। শ্রদ্ধার ব্রাহ্ম অপেক্ষা কি কপট ব্রাহ্মণ ভাল?"—পত্র ১৭৮২ শক ৫ ভাদ্র।

এই পত্র দ্বারা বোধ হয় দেবেন্দ্রবাবু এই রীতি অন্যান্য ব্রাহ্ম সমাজেও চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ-বাবুর নিকট এই প্রস্তাব করা, এই রীতি মেদিনীপুরে চালাইবার নিমিত্ত।

এইরূপে বেদী হইতে বুধবারে যে-সকল ব্যাখ্যান অভিব্যক্ত হইত পর সপ্তাহে তাহা এক এক খণ্ড কাগজে মুদ্রিত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। তাহা অন্যান্য ব্রাহ্ম সমাজেও বিতরণ করা হইত।

এইরূপে যেমন এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব অধিকতর বিশদরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, তেমনি উপাসনার পদ্ধতিরও উন্নতি হইয়াছিল। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বাবু "নমস্তে সতেতে" ইত্যাদি স্তোত্রটির বাঙলা অনুবাদ করিয়া উপাসনাপদ্ধতিতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাবু (১৭৮০ শকের মাঘ মাসে) তথাকার সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গিয়া তাহা দেখিয়া প্রীতি হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঐ বাঙ্গালা অনুবাদকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে সংযোজিত করিয়া ১৭৮১ শকের প্রথমাবধি তাহা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত করিলেন। তখন "অসতো মা সদ্ গময়" ইত্যাদি প্রার্থনাটি পৃথকরূপে পঠিত হইত। তাহাও নিত্য পাঠ্যরূপে উপাসনাপদ্ধতির সহিত সংযোজিত হইল। দেবেন্দ্র-বাবু ঐ পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ঐ শকের মাঘ মাসে তাহা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করিয়া তাহাই স্থিরতর রাখিলেন।

যখন সমাজের আর সকলই সুশৃঙ্খলায় পরিপাটিরূপে চলিতে লাগিল তখন এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম উপলক্ষিত হইল। দেবেন্দ্রবাবু দেখিলেন, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না অথবা সংস্কৃত ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা করেন নাই তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য-উপাচার্য্যদিগের সহিত উপাসনা করিতে গিয়া অসম উচ্চারণ দ্বারা অনেক ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। এইজন্য ১৭৮১ শকের ১৫ই বৈশাখ অবধি নিয়ম হইল যে প্রতিদিন এক এক সময়ে সমাগত শিক্ষার্থীদিগকে উপাসনাপ্রকরণ পাঠে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে তাঁহারা অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া সমাজে আচার্য্য-উপাচার্য্যদিগের সহিত উপাসনা পাঠ করিতে পারিবেন। এই নিয়ম অনুসারে কিছুদিন কার্য্য চলিয়াছিল।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে যে-ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহাতে একটু গুরুত্ব সংযোজিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের এই ব্যবস্থা হইল যে, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া কোনো সমাজে আসিয়া বেদীর সম্মুখে উপবেশন করতঃ ব্রহ্মোপাসনা করিবেন। উপাসনান্তে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা পাঠ করিবেন। পরে সেই প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিবার শক্তি লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। আচার্য্য বা উপাচার্য্য এই প্রতিজ্ঞা পাঠের পূর্ব্বে ও পরে দীক্ষার্থীকে ধর্ম্মপালন করিবার উপযোগী উপদেশ প্রদান করিবেন। এতৎ সম্পর্কে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই বিজ্ঞান প্রচলিত হইল—

"যাঁহারা এই সমাজে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা দীক্ষিত হইবার পঞ্চদিবস পূর্ব্বে উপাচার্য্যকে পত্র দ্বারা জানাইবেন এবং তাহাতে আপনার নাম ধাম, পিতার নাম, বয়ঃক্রম বিশেষ কবিয়া লিখিবেন। (তত্ত্ববোধিনী, ভাদ্র ১৭৮২ শক)

এই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের নিত্য উপাসনাতেই আরো বহুবিধ লোকের অধিক সমারোহ হওয়াতে এইরূপ হইয়াছিল যে, যাঁহারা নিয়মিত উপাসক তাঁহারা হয়ত বসিবার স্থান পান না। এই অসুবিধা পরিহারার্থ ব্যবস্থা হইল যে, বেদীর দুই পার্শ্বে কতকগুলি বেঞ্চ নিত্যউপাসকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। তাহাতে যে সে ব্যক্তি বসিতে পারিবেন না। এই নিয়ম হইল যে, (১) যিনি নিয়মিতরূপে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিবার অভিলাষ করেন তিনি পত্র দ্বারা উপাচার্য্যকে জানাইবেন। তাহা হইলে তাঁহার জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। (২) যিনি নিয়মিতরূপে সমাজে আগমন করিবেন না তাঁহার জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে না। (৩) উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিতে হইবে। উপাসনা আরম্ভ হইলে কাহারও নিমিত্ত আসন শূন্য রাখা হইবে না। এই নিয়ম অনুসারে ১৭৮২ শকের পৌষ মাস হইতে কিছুদিন কার্য্য চলিয়াছিল।

এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্প শেষ হইয়াছিল। (প্রতি চারিবৎসর এক এক কল্প গণ্য করা হয়।) দেবেন্দ্রবাবু পত্রিকা সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিলেন যে—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকাতে ঈশ্বরের কৌশল বিষয়ে অনেক লেখা হইয়াছে এবং এখনও সে-বিষয়ে অবশ্যই লিখিত হইবে। কিন্তু আত্মাকে ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ করিবার প্রতি—ঈশ্বরের সহিত আত্মার যে নৈকট্য তহা প্রচারের প্রতি তত্ত্ববোধিনী পত্রিককার পঞ্চম কল্পের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।" (পত্র ৬ই ফাল্গুন ১৭৮১ শক)

যখন দেবেন্দ্র-বাবু সিমলা পর্ব্বতে গমন করেন, তাহার পূর্ব্বাবধি—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশিত তাৎপর্য্য পুনঃ সংশোধিত হইতেছিল। এখন হইতে সেই সংশোধিত তাৎপর্য্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এইসকল দ্বারা দেবেন্দ্রবাবুর কার্য্য অনেক পরিমাণে সম্পন্ন হইল। রামমোহন রায়ের স্থাপিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের নিগূঢ় মূল মন্ত্র তাঁহার পরে দেবেন্দ্র-বাবুই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধর্ম্মের সমুদায় তত্ত্ব আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করিয়া ইহার অঙ্গ গঠন করিয়া দিতে কেবল তিনিই সক্ষম। এত দিনে সেই কার্য্য তিনি সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস তাহার উপাসনাপদ্ধতি ও তত্তাবতের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা জানিবার পক্ষে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্র-বাবু চিরকাল ব্রাহ্মসমাজরূপ তরণীর কর্ণধার। তিনি যেরূপে চালাইতেন, ব্রাহ্মসমাজ সেইরূপে চলিত। এই সময়ে তিনি উল্লিখিত প্রকারে ইহার সকল কার্য্যের

ব্যবস্থা করিয়া এবং সেইরূপে সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার শ্রীযুক্ত কেশববাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর হস্তে দিয়া আপনি অবসৃত হইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু অবসৃত হইবার ইচ্ছা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দেবেন্দ্রবাবুর চিত্ত চিরদিন নির্জ্জনতা-প্রিয়। সংসারের কার্য্য সকল তিনি কেবল ধর্ম্মানুরোধেই করেন। একটু অবকাশ পাইলেই তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিয়া একাকী নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি সমস্ত জীবন কাটাইলেন। সে বিবেচনায় মনে হয় তাঁহার তুল্য সুখী পৃথিবীতে আর কেহ নাই।

কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধন ব্রাহ্মের এক প্রধান কর্ত্তব্য এই যে তাঁহার নিজের উপদেশ, তাহা তিনি কখন বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার নিজের জীবন তাঁহার ধর্ম্মমতের উদাহরণ। কতবার আমরা শুনিলাম তিনি সংসার হইতে অবসৃত হইয়াছেন। পরে দেখিতে পাই আবার তিনি আগমন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কীয় একটি গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার রক্ষার ও উন্নতির পথ আরো পরিষ্কার করিয়াছেন।

এই সময়ে দেবেন্দ্রবাবু স্বয়ং যাহা করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত হইল। অপরাপর কার্য্য যাহা দেবেন্দ্রবাবুর কর্ত্তৃত্বে কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের যত্নে ও সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল তাহা কথিত হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান

১৭৮১ শক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে উপদেশ প্রদান ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যবিধানাদি কার্য্যে অতিবাহিত হইল। ১৭৮২ শক অবধি ১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত এই চারি বৎসরের প্রধান কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে অনুষ্ঠান। কিরূপে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হইল এবং কিরূপ অনুষ্ঠান ব্যবস্থিত হইল তাহার সমস্ত বিবরণ বর্ণন করা যাইবে।

যদিও কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনার জন্যই এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই উপাসনা মাত্রই ইহার মুখ্য অভিপ্রায়; কিন্তু পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিহার করিতে হইবে, ইহাও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক রামমোহন রায় এবং তাহার পরে দেবেন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত কার্য্য বা উদাহরণ দ্বারা সেই অন্তর্নিহিত ভাবটি যতদূর সম্ভব প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। রামমোহন রায় পুত্তলিকার পূজা করিতেন না, এবং পূজার নিমন্ত্রণে গমন করিতেন না। দেবেন্দ্রবাবুরও পিতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার পৌত্তলিকতা পরিহারের চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি জাতিভেদ ত্যাগ করিবার যে-চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। জাতিবিভেদ পরিত্যাগের অনেক প্রতিবন্ধক, তাহাও তিনি সেই উদ্যোগে অবগত হইয়া তদ্বিষয় এ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পৌত্তলিক উপাসনা পরিহারের ইচ্ছা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। পৌত্তলিক উপাসনার প্রতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিরাগবশতঃ

তিনি তাঁহার বাড়ীর দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এই হেতু তিনি ১৭৬৫ শকে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ অবধি এপর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চদশ বৎসর কাল দুর্গোৎসবের সময় আন্তরিক ক্ষোভবশতঃ গৃহত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, এই সময়ে ভ্রমণ করিতে বাহির হওয়াতে "আশ্বিন মাসের রৌদ্র ও কার্ত্তিক মাসের ঝড় আমার মস্তকের উপর দিয়া কতবার বহিয়া গিয়াছে।" কতবার তিনি ঈশ্বরের নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, কবে পরিমিত দেবতার উপাসনা উঠিয়া গিয়া তাঁহার বাড়ীতে অনন্তদেবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। এক্ষণে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি হিমাচল হইতে প্রত্যাগত হইয়া দুর্গোৎসব উঠাইয়া দিবার সুযোগ পাইলেন। বাড়ীর শালগ্রাম শিলাকেও বিদায় করিতে সমর্থ হইলেন। ১৭৮১ শক হইতে তাঁহার বাড়ীতে দুর্গোৎসব বন্ধ হইয়াছে। পরন্তু কেবল তিনি পৌত্তলিকতা উঠাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। তিনি সেই পরিমিত কল্পিত দেবোপাসনার স্থলে অপরিমিত সত্যস্বরূপের নিত্যপূজা স্থাপন করিলেন। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—

আমাদের দালানে এক্ষণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা সকলে মিলিয়া সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকি। সেখানে আর পরিমিত দেবতার উপাসনার সম্ভাবনা নাই। এইক্ষণে আমাদের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, আমাদের দালান হইতে প্রতিদিন ঈশ্বরের মহিমাধ্বনি উত্থিত হইতেছে, ইহা হইতে আর এমন কোন্ বস্তু আছে যাহা দেখিলে আমার জীবনকে সার্থক বোধ হইতে পারে?" (পত্র, ৬ ফাল্গুন, ১৭৮১ শক)

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তদ্বারা ব্রাহ্মদিগের পৌত্তলিকতা পরিহারের প্রতি দেবেন্দ্রবাবুর কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহযোগীগণ এবিষয়ে তাঁহার অনুকূল ছিলেন না, তিনিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর একাধিপত্য করিতে পারেন না। এক্ষণে যাঁহারা তাঁহার সহযোগী এবিষয়ে তাঁহাদিগকে বিলক্ষণে অনুকূল পাইলেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহার মনোরথ সাধনের আর অল্পই প্রতিবন্ধক রহিল।

এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মেরা যে-কারণে অসমর্থ হইয়াছিলেন, শেষের ও নূতন ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে তাহার বিপরীত কারণ জুটিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ প্রাচীন ব্রাহ্মেরা প্রথম বয়সে বিস্তর কুসংস্কারজাল কর্ত্তন করিয়া যখন এই পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ত্যাগরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মকে সম্মুখে পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এক-প্রকার বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টি পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্ম, তাঁহারা যুবা; তাঁহাদের এই প্রথম বয়স ও প্রথমোদ্যম; তাঁহাদের দৃষ্টি পাশ্চাৎদিকে যায় না কেবল সম্মুখের দিকেই ধাবিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্তেরা

কোন্‌টি কতদূর কঠিন তাহা বুঝিয়া তাহার সহিত আপনাদের সামর্থ্যের তুলনা করিতেন; ইঁহাদের যুবাজনসুলভ সাহস ও আশাতে সকলই সম্ভববোধ হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে, তখনকার যে-সকল যুবাব্রাহ্মই পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাহাও নহে। পরন্তু কতিপয় ক্ষমতাবান্‌, ভক্তিমান্‌ উন্নতিশীল ব্রাহ্মের জ্বলন্ত উৎসাহ দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবুর স্বাভীষ্ট সিদ্ধির যে আশা জন্মিয়াছিল, তিনি তাহা খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উৎসাহ-অগ্নি দেবেন্দ্র-বাবুর সহায়তারূপ পরমানুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর প্রজ্জলিত হইতে লাগিল।

যদিও পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদাদি ত্যাগ ঐসকল যুবাব্রাহ্মের প্রথম শিক্ষা বটে; কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাতেও নিপুণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ, ব্রহ্মোপাসনা এবং সাংসারিক সকল কার্য্য সাধন, এইসকল বিষয়ে তাঁহারা আপনাদের যথেষ্ট অধিকার ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাহা না হইলে তাঁহারা যে দেবেন্দ্রবাবুর নিকট প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা কোনমতে সম্ভব নহে। কারণ দেবেন্দ্রবাবু ব্রহ্মানুরাগ ব্রহ্মোপাসনাই প্রথমে চাহেন, তদ্ব্যতিরেকে তিনি কাহারো সহিত এক পদও চলেন না।

নূতন ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াই এই সংকল্প করিয়াছিলেন যে, যেমন বাক্যদ্বারা উপদেশ প্রদান হইবে, তেমনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কি আধ্যাত্মিক, কি মানসিক, কি সামাজিক, সকল উপদেশের পক্ষেই এই নিয়ম। তাহার দুই বৎসর পরে তাঁহারা যে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামক পুস্তক বাহির করিলেন, তাহার অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাদের ঐ সঙ্কল্পই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে রাজনারায়ণ-বাবুর এক বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকার অবস্থা ও বর্ত্তমানকার অবস্থা এই উভয়াবস্থাদর্শী; তিনি এই উভয় অবস্থার তুলনা করিয়া তাঁহার কৃত ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত বিষয়ক বক্তৃতার শেষে এইসকল কথা বলিয়াছেন:—

"এক্ষণে সমাজে যে-প্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতিশয় সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে এইক্ষণে যে-সকল ব্যাখ্যান সমাজের বেদী হইতে পঠিত হয়, তাহা হৃদয়ের অভ্যন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের ন্যায় গমন করিয়া ঈশ্বর প্রেমাগ্নিকে প্রজ্বলিত করে। পূর্ব্বে যে-সকল গান হইত, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিভাব বড় অধিক প্রকাশিত ছিল না। এক্ষণে যে-সকল সঙ্গীত হয়, তাহা চিত্তকে এরূপ আর্দ্র করে, আত্মাকে এরূপ উন্নত করে, যে, তাহা বর্ণনাতীত। এক্ষণে কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারের পুরুষেরা প্রত্যহ নিয়মিতসময়ে একত্রিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন; দু একটি ব্রাহ্মপরিবারে স্ত্রীলোকেরাও এইরূপ উপাসনা করিয়া থাকেন। একটি ব্রাহ্মপরিবারের একবারে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করা হইয়াছে।"

উপরে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক যে পুস্তকের কথা উল্লিখিত হইল, উহাতেই তৎকালীন ব্রাহ্মদিগের দ্বৈবার্ষিক আলোচনার সম্যক্‌ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা ১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরে মাঘ মাসে পুস্তকাকারে প্রচারিত ঐ পুস্তকে কয়েকটি বিষয়ে সার সার উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। (১) উপাসনা, (২) আত্মপরীক্ষা, (৩) আমোদ, (৪) অর্থব্যয়, (৫) অভ্যর্থনা, (৬) সময়, (৭) সত্যবাক্, (৮) নির্ভর, (৯) কর্ত্তৃত্ব, (১০) কৌতূহল, (১১) পৌত্তলিকতা, (১২) সংসার, (১৩) প্রীতি, (১৪) মোহ, (১৫) ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ (১৬) পবিত্রতা, (১৭) লোকভয়, (১৮) ত্যাগস্বীকার, (১৯) জীবনের লক্ষ্য।

ইহাতে যে-সকল কর্ত্তব্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কাহারো শক্তি অশক্তির প্রতি দৃষ্টি করা হয় নাই—কাহারো মুখাপেক্ষা করা হয় নাই। যাহা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহা সংক্ষেপে যত বিশেষরূপে বলা যাইতে পারে সেইরূপে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি কথা এইস্থলে প্রদর্শন করিতেছি—

(আমোদ)

অসৎসঙ্গে, অসৎগ্রন্থপাঠে, পাষ্টি আদি ক্রীড়ায়, অনর্থক পরিহাসে ও পরনিন্দায় আমোদ করিবে না।

ব্রাহ্মের সকলই ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে হইবেক, তাহার জীবনের কোন কর্ম্ম তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

(সময়)

কখন মনে করিবেক না যে আমার কর্ম্ম নাই, আমি কি করিব? ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য আকাশের ন্যায় অনন্ত তাহার কর্ম্ম।

(সত্যবাক্)

তিনি (ব্রাহ্ম) একবার যাহা বলিবেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা, কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, তাহা তাঁহার পক্ষে অপমান।

(কর্ত্তৃত্ব)

কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আধিপত্য হৃদয়ে স্থাপিত করিলে কর্ত্তৃত্বের ভার প্রস্ফুটিত হইতে থাকে।

(কৌতূহল)

আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, আমরা কৌতূহল-পরবশ হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করি, না সত্যভাব দ্বারা পরিচালিত হই।

(পৌত্তলিকতা)

ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুত্তলিকাকে অর্চ্চনা করিলে ব্রাহ্মদিগের যে দোষ হয় না ইহা কপটের বাক্য। কোন ব্রাহ্ম এরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিবেন না।

কেবলবাহ্যিক পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নিষেধ করিতেছেন, এমত নহে। ইহা পরিত্যাগ করা তো সহজ। আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা অতীব ভয়ানক। বিষয়সুখাভিলাষ, ধনাকাঙ্ক্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি সকলের শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে। এ উভয় প্রকার পৌত্তলিকতা পরিহার্য্য।

(সংসার)

স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়া সংসার হইতে মুক্ত হওয়া।

(প্রীতি)

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি কিরূপে জানা যায়? না. প্রথম তাঁহার সহবাসে ইচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সহিত যাহা কিছুর সম্বন্ধ আছে তাহাতে প্রীতি স্থাপন করা, তৃতীয়তঃ তাঁহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা।

কিরূপে এইসকল প্রগাঢ়তর আলোচনা সমুত্থিত ও সমাহিত হইল, তাহা দেখা আবশ্যক। যে-সময়ে উল্লিখিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক পুস্তক প্রকাশ হইল, তাহার পূর্ব্বে দেবেন্দ্র-বাবুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান এবং তাঁহার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তদ্দ্বারা ধর্ম্মের মূলমর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনার সারতত্ত্ব ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়াছেন। কেশব-বাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু কর্ত্তব্যনিষ্ঠাবলে আহারপানাদি সম্পর্কীয় জাতীয় নিয়মভঙ্গ ও স্ত্রীদিগের অবরোধরূপ দুর্গভঙ্গে সাহস ও যত্ননিয়োগ করিয়াছেন। এদিকে মিশনারীরা ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মের যত দোষ দেখিতে পায়, শত্রুরা তাহা দেখাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে মিথ্যাধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। এমন অবস্থায় দেবেন্দ্র-বাবুর মহার্হ উপদেশ-সকল নিবারণের নিমিত্ত এবং মিশনারীদিগের আরোপিত অপবাদ খণ্ডন ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা ও সারবত্তা প্রদর্শন নিমিত্ত ব্রাহ্মগণ অনুষ্ঠানের চর্চ্চা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তদর্থ এইসকল চিন্তা ও চেষ্টা সমুদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। ফলতঃ এই সময়ে ব্রাহ্মগণ যেমন সজ্জীব, সচেষ্ট, উদ্যতহস্ত ও চিন্তাপরায়ণ ছিলেন, এমন আর তাঁহারা কখনই ছিলেন না। ১৭৮১ শক অবধি ১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের যতখানি উন্নতি হইয়াছে ততখানি উন্নতি পূর্ব্বে তাহার ত্রিগুণিত সময়েও সম্পাদিত হয় নাই।

ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশকদ্বয় দ্বারা যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, প্রতিজ্ঞাবান ব্রাহ্মদিগকে তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, ইহাও তাহার মধ্যে এক উপদেশ ছিল। উপদিষ্ট ব্রাহ্মগণ তাহা পালন করিতে তৎপর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত আগ্রহবিশিষ্ট তাঁহারা একেবারে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন এবং তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আলোচনার নিমিত্ত ও পরস্পরের সহানুভূতি ও সাহায্যলাভ নিমিত্ত সঙ্গত সভা নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার আলোচনাতেই "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক পুস্তকখানি সমুৎপন্ন হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবুর বাক্যে প্রকাশ পায়, ইহার সভ্য দশ বারো জনের অধিক ছিল না। (পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত—৩৫ পৃষ্ঠা) এই সভ্যেরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ক্লেশসহিষ্ণু ও প্রতিজ্ঞাবান্। প্রথমেই তাঁহারা যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেই আশা হইয়াছিল যে ইহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও মহাবল বাষ্পীয় শকটের ন্যায় প্রকাণ্ড ভারবহনে সমর্থ হইবেন। (পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত—৩৫ পৃষ্ঠা)

এই সভার অনুরূপ সভা কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী অন্য স্থানেও স্থাপিত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে এইরূপ সভা দূরবর্ত্তী কোন কোন ব্রাহ্মদলের মধ্যেও স্থাপিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামক এক সভা স্থাপিত হয়, তাহাতে ঐ সকল সঙ্গতের

সভ্যেরা এবং অপরাপর ব্রাহ্মেরা আসিয়া যোগ দিতেন। ১৭৮৬ শকের ২৬ বৈশাখ দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত এই ব্রাহ্মবন্ধু সভায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই সভার উৎপত্তি ও কার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেনঃ—

"বোম্বাই নগর হইতে ভাওদাজি নামক একজন কৃতবিদ্য এখানকার সমাজে আসিয়া বলিলেন যে, ব্রাহ্মেরা বৌদ্ধের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া কেবল উপাসনা করে। উপাসনার সময় ব্রাহ্মেরা আর কি করিবে, তাহারা কি ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইবে? তিনি বীটন সভা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মানন্দ তো* কোন অভাব রাখেন না। তিনি মনে করিলেন আমাদেরও বীটন সভার ন্যায় একটি সভা চাই। এই মনে করিয়া তিনি এই ব্রাহ্মবন্ধু সভা স্থাপিত করিলেন। এখন বিদেশী কেহ আসিয়া মনে করিতে পারিবেন না যে, আমরা কেবল উপাসনাই করি। এখন জানিতে পারিবেন যে আমরা চলি, বলি এবং আমাদের শরীরে জীবন আছে। আমি তো ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে ইহার পূর্ব্বে কখনও আসি না। আমি আশ্চর্য্য হইতেছি এত লোকে একত্র মিলিয়া কেমন উৎসাহের সহিত দেশের হিতজনক আলোচনাতে এখানে ব্যস্ত রহিয়াছেন।"†

ধর্ম্মের আলোচনার উদ্দেশে ব্রহ্মবিদ্যালয়, সঙ্গত ও ব্রাহ্মবন্ধু সভা ভিন্ন এইসকল ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তৃক আর একটি বস্তু উৎপাদিত হইয়াছিল। তাহা ইণ্ডিয়ান মিরার নামক সংবাদপত্র। এই সময়ে কতলোক ব্রাহ্মসমাজের উপর অমূলক অপবাদ ক্ষেপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কথার উত্তর দিয়া ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভিন্ন আর কাগজ ছিল না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেশসাধারণের বা মনুষ্য সাধারণের বিষয় ভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের মতামত অথবা তাহার সহিত কোন বিষয়ের বাদানুবাদ প্রকাশ হয় না। আবার ইংরাজদিগের সমক্ষে বিশেষতঃ খ্রীষ্টিয়ানদিগের দ্বারা সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান রিফরমরের উত্তরে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত মত ও অবস্থা পরিদর্শন করিতে হইলে তাহা ইংরাজিতে প্রকাশ করা আবশ্যক হয়। এই নিমিত্ত

---

* দেবেন্দ্র-বাবু আদর করিয়া কেশববাবুকে এই উপাধি দেন।

† পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট হইতে ইণ্ডিয়ান মিরার নামক সংবাদপত্র প্রচারিত হইল। প্রথমে উহা পাক্ষিক ছিল; মধ্যে সাপ্তাহিক হয়; এক্ষণে তাহা প্রাত্যহিক হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু মনমোহন ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেক যত্নে ইহাকে মর্য্যাদান্বিত করিয়াছিলেন।

(প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪)

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা

অনুক্রমিকা

বিগত ৩১ ভাদ্র দিবসে আমি জাতীয় সভায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে উপস্থিত মতে একটা বক্তৃতা করি। সেই দিবসের অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন। ঐ বক্তৃতা দিবার কিছুদিন পর যত দূর তাহা স্মরণ হইল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহাতে এই প্রস্তাবের উৎপত্তি হইয়াছে। ন্যাশনাল্ পেপর্ ও ইংলণ্ডের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে ঐ বক্তৃতার সংক্ষেপ বিবরণ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহারা বাঙ্গলা জানেন না তাঁহারদিগের জ্ঞাপনার্থ উল্লিখিত দুই বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ন্যাশনাল পেপরের সম্পাদকের অনুমতি লইয়া ঐ পত্রে প্রকাশিত বিবরণ স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিলাম। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মান্যাগ্রগণ্য সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর জাতীয় সভায় ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

REPORT
OF A
LECTURE ON THE "SUPERIORITY OF HINDUISM TO OTHER PREVAILING RELIGIONS."

(From the National Paper.)

The Lecturer began with defining Hindooism as the worship of Brahma or the One Supreme Being, whose knowledge and worship all the Hindoo Shastras agree in asserting to be the sole cause of salvation, and other forms of Hindoo worship and the observance of rites and ceremonies as preliminary means for ascending to that knowledge and worship. For a knowledge of Hindooism, the lecturer said we must consult the Hindoo Scriptures, which are 1st the Srutis or the Vedas, 2nd the Smritis, 3rd the Puranas, including what are called Itihashes, the Ramayana and the Mahabharut, and, lastly, the Tantras. He said he can not include the Darshanas in the canon of Hindoo scriptures as they treat of philosophy and not of religion. He then gave a brief description of each of these scriptures. He then proceeded to show the grosser aspect of Hindooism, namely 1stly idolatry, 2ndly, pantheism, 3rdly asceticism and austere mortification, 4thly the system of caste, and proved that they are not sanctioned by the higher teachings of the non-Vedic scriptures, much less by the Vedic scriptures. The Lecturer then proceeded to refute the charges brought against Hindooism, 1stly that it does not inculcate

the necessity of repentance as other Scriputres do; 2ndly, that it does not worship God as the Father and Mother of the universe; 3rdly, that it does not treat of Divine Love, the highest point of development of every religion, and 4thly, that it does not inculcate forgiveness towards enemies as the Christian Scriptures do. In corroboration of what he said on the subject he cited innumerable texts from the Hindoo Scriptures. The lecturer then showed the superiority of Hindooism to other prevailing religions in these respects:—

I. That the name of the Hindoo Religion is not derived from that of any man as that of Christianity, Mohammedanism or Buddhism is. This shows its independent and catholic character.

II. That it does not acknowledge a mediator between the object of devotion and worshipper. The Hindoo worshipping Shiva or Vishnu or Durga as the Supreme Being, recognises no mediator between him and the object of his worship. The idea of *Nubee* or prophet is peculiar to the Shemetic religions.

III. That the Hindoo worships God as the Soul of the soul, as nearer and dearer to him than he is to himself. This idea pervades the whole of Hindooism.

IV. That the idea of holding intimate communion with God even at the time of worldly business demanding the utmost attention of man is peculiar to the Hindoo Religion.

V. That the scriptures of other nations inculcate the practice of piety and virtue for the sake of eternal happiness while Hindooism maintains that we should worship God for the sake of God alone and practise virtue for the sake of virtue.

VI. That the Hindoo Scriptures inculcate universal benevolence while other Scriptures have only man in view.

VII. That the idea of a future state entertained by the Hindoo Religion is superior to other religions, as it allows an expiatory process to sinners by means of transmigration while Christianity and Mohammedanism maintain an eternal heaven and an eternal hell. The Hidoo doctrine of a future state is also superior to that of other religions in as much as it maintains higher states of existence is consonance to the law of progress prevalent in nature.

VIII. That Hindooism is prominently tolerant to all other religions and believes that each man will obtain salvation if he follows his own religion.

IX. That Hindooism maintains inferior stages of religious belief in its own bosom in harmony with the nature of man who cannot but

pass through several stages of religious development before being able to grasp the Supreme Being.

X. That the Hindoo maintains that religion should guide every action of life. It has been truly said "that the Hidoo eats, drinks and sleeps religiously."

XI. That the Hindoo Religion is of a very comprehensive character as grasping within its embrace all human knowledge, all civil polity, and all domestic economy, impenetrating every concern of human life with the sublime influence of religion.

XII. The extreme antiquity of the Hidoo Religion as existing from before the rise of history, thereby showing that there is much in it which can secure a permanent hold over the mind of man.

The lecture then proceeded to show the especial excellence of Gyan Kanda or the superior portion of Hindooism as testified in its ides of the nature of God and of revelation, its disbelief in incarnation and mediation, its rejection of all ritual observances, the stress which it lays on *Dhyan* or the contemplation of God as transcending the inferior offices of prayer and praise, and its having no appointed time or place of worship and recognising no pilgrimages to distant shrines. The lecturer then showed that Brahmo Dharma is the highest developed form of Hindooism, and as such is not distinct from it though it is at the same time entirely catholic in its character. The lecturer then said we need not *borrow* any thing from other religions. The Hindoo Religion contains like the Ocean that washes the shores of India gems without number and will never perish as long as that country exists. The lecturer concluded with an eloquent exhortation to the audience not to leave off the name of Hindoo which is connected with a thousand sacred and fond associations.

(From the Times.)

A lecture, the mere title of which will startle a great many people in England, was delivered in Calcutta last week by the minister of the Adi Samaj, the elder body of the Brahmos. * * * The leaders of this section of the Brahmos are a highly respectable body of men. well-educated, generally calm and thoughtful and thoroughly respected by all classes of their countrymen. The minister of this body startled Calcutta, at least the religious part of it, by announcing a lecture on "The Superiority of Hinduism to every other Existing Religion." This was meeting Christians in a very unusal way.

The lecturer held that Hindooism was "superior" because it owed its name to no man; because it acknowledged no mediator between God and man; because the Hindoo worships God at all times, in

business and pleasure, and every thing; because while other Scriptures inculcate the practice of piety and virtue for the sake of eternal happiness, the Hindoo Scriptures alone maintain that God should be worshipped for the sake of God alone, and virtue of practised for the sake of virtue alone; because Hindooism inculcates universal benevolence, while other faiths merely refer to man; because Hindooism is non-sectarian, (believing that all faiths are good), non-proselytizing, pre-eminently tolerant, devotional to an entire abstraction of the mind from time and sense, and the concentration of it on the Divine; of an antiquity running back to the infancy of the human race, and from that time till now influencing in all particulars, the greatest affairs of the state and the most minute affairs of domestic life.

These are some of the points insisted upon by the lecturer and many a long day will it be, I fear, before we shall alter the people's faith in these points which they can reason about as cleverly as any Englishman among our best theologians here and with a surprising power of illustration from the general history of nations. The lecture was replied to on another evening by the principal of the Free Church College, in the College Hall, and he was met there by several disputants on the previous lecturer's ground by whom his views were roundly questioned. This of itself will show how necessary it is to have an able and thoroughly educated class of men as missionaries in India. The Christian lecturer (an able and gentlemanly scholar) claimed to include among the sacred books of the Hindus the Tantras (Darshanas?). A young Hindu, writing immediately after, asked. Why, then do not Christians include among their sacred scriptures the works of Duns Scotus and Thomas Aquinas? Be the point discussed what it may, it will not be doubted that in dealing with such persons the only weapon of the slightest use is reason.

জাতীয় সভায় সনাতন ধৰ্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

"বিগত সভার কার্য্য বিবরণে বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সুচারু বক্তৃতার স্থূলমৰ্ম্ম 'ন্যাশন্যাল পেপর" নামক সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা ও শীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তিনি সাধুবাদের ভাজন হইয়াছেন।"

কলিকাতা, শ্রী রাজনারায়ণ বসু।

১১ মাঘ, ১৭৯৪ শক।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।।

হিন্দুধর্ম্মের বিষয় বলিতে গেলে প্রথমতঃ এই অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, হিন্দুধর্ম্ম কাহাকে বলে? বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে পরব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম্ম। সকল হিন্দুশাস্ত্র সমস্বরে পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপাদন করে। সকল শাস্ত্র সমস্বরে এই কথা বলে যে পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। ব্রহ্মই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যবিন্দু। জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগ দ্বারা পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে এবং তাঁহার ধ্যান ধারণায় রত হইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করেন। কর্ম্মীরাও সকল কর্ম্মের শেষে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া কর্ম্মের ফলাফল পরব্রহ্মে অর্পণ করেন। শ্রুতি অর্থাৎ বেদেতে পরব্রহ্মের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। স্মৃতিতেও মনুষ্যের নানা প্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে ব্রহ্মলাভ জন্য কি কর্ত্তব্য, তাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মকে লাভ না করিলে কখন মুক্ত হইতে পারা যায় না। তন্ত্রেতেও সেই রূপ। এই সকল শাস্ত্রে অসংখ্য দেব দেবীর কথা আছে, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি অথবা লক্ষণই রূপকচ্ছলে দেবদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সৃজন শক্তি ব্রহ্মা রূপে কল্পিত হইয়াছে; তাঁহার পালন শক্তি বিষ্ণুরূপে কল্পিত হইয়াছে; তাঁহার সংহার শক্তি শিব রূপে কল্পিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে "স্রষ্টাদরোহরি বিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞা"। সর্ব্বপ্রধান দেবতারাও ব্রহ্মোপাসক বলিয়া শাস্ত্রের অনেকানেক স্থানে কথিত হইয়াছে যথা,—মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ৫৩ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে "সধ্যানপথমাধিশ্য সর্ব্বজ্ঞানানি মাধবঃ। অবলোক্য ততঃ পশ্চাৎ দধ্যৌ ব্রহ্ম সনাতনং।" শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানপথে আবিষ্ট হইয়া সমস্ত জ্ঞান আলোচনা করিয়া তৎ পশ্চাৎ সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করিলেন। এতদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রহ্মই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যবিন্দু, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু ধর্ম্ম।

সকল ধর্ম্মের শাসন আছে। হিন্দুধর্ম্মের শাসন ও উপদেশ কি, তাহা হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ কি, না, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। মহাভারত ও রামায়ণ, এই দুই খানি গ্রন্থকে ইতিহাস বলে। কিন্তু আমি তাহাদিগের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে পুরাণ মধ্যে গণনা করিলাম। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র। শ্রুতির অর্থ, যাহা পরম্পরায় এক মুখ হইতে আর এক মুখে শুনা হইয়াছে। তৎকালে লেখার সৃষ্টি ছিল না; গুরু শিষ্যকে বলিতেন, এইরূপে কালপ্রবাহে উহা বহুকাল চলিয়া আসিতেছিল, এই জন্য লোকে বেদকে শ্রুতি বলিয়া ডাকিত। শ্রুতির অর্থ স্মরণ করিয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ। শ্রুতি ও স্মৃতির মতে যেখানে বিরোধ হয়, সেখানে শ্রুতিই গরীয়সী জ্ঞান করিতে হইবে। "শ্রুতিস্মৃতিবিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" শ্রুতি অর্থাৎ বেদ দুই অংশে বিভক্ত; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের অন্য

নাম সংহিতা। সংহিতাতে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব আছে। ব্রাহ্মণে সংহিতার অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ উপনিষৎ। তাহাতে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা আছে; তাহা বেদের অন্ত ভাগ বলিয়া তাহাকে বেদান্ত বলা যায়। অনেকে ব্যাসপ্রণীত বেদান্তসূত্রকে বেদান্ত কহেন কিন্তু প্রকৃত বেদান্ত উপনিষৎ। বেদ চারি অংশে বিভক্ত। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। ঋক্ দেবতাদিগের স্তব, যজুঃ যজ্ঞের বিধি, এবং সাম ধর্ম্মসঙ্গীত। অথর্ব্ব বেদে এই সকলই আছে। বেদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি দ্বারা রচিত। মধ্যে মধ্যে এক এক জন ঋষি উত্থিত হইয়া এই সকল মুখপরম্পরাগত শ্রুতিকে সংগ্রহ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতেন। এই সকল শ্রুতি সংগ্রহকর্ত্তাদিগের নাম ব্যাস। অনেক ব্যাস জন্মিয়াছিলেন; শেষ ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। আমাদের দেশে রঘুনন্দনের স্মৃতি বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে, তাহা কোন বিশেষ স্মৃতি নহে। তাহা অনেক স্মৃতি হইতে সংগৃহীত। রঘুনন্দনের সংগ্রহ নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ। প্রধান স্মৃতিকর্ত্তাদিগের নাম এই—

> মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোসনোঽঙ্গিরা।
> যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তা কাত্যায়নোবৃহস্পতিঃ॥
> পরাশরোব্যাসশংখলিখিতাদক্ষগৌতমৌ।
> শাতাতপোবশিষ্টশ্চ ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উসন, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, ইহারাই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজক।

পুরাণের সংখ্যা আঠারটী। তাহাদের নাম, গরুড়, কূর্ম্ম, বরাহ, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ, স্কন্ধ, বিষ্ণু, শিব, মৎস্য, পদ্ম, ব্রহ্ম, ভাগবত, নারদ, অগ্নি, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। এতদ্ব্যতীত মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ মধ্যেও গণ্য করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন অনেক উপপুরাণ আছে। তন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক শাস্ত্র।

হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গেলে, প্রথম ঋগ্বেদের উপরেই দৃষ্টি পতিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে ঋগ্বেদ অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। উহার অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। ঋগ্বেদে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আর্য্যগণ ভৌতিক পদার্থের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদের আরাধনা করিতেন। তাঁহারা পরমব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপাসনা করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে অবিজ্ঞাত থাকিয়া বায়ু নামে বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর মনে করিয়া উপাসনা করিতেন; মিত্র নামে সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর মনে করিয়া উপাসনা করিতেন; বরুণ নামে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেন। তাঁহারা পরব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত থাকিয়া এই সকল দেবতাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া উপাসনা করিতেন। কিন্তু সেই আদিম আর্য্যেরা যে কেবল সূর্য্য চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা করিতেন, সাক্ষাৎ

ব্রহ্মকে যে অবগত ছিলেন না, এমনও নহে। সেই ঋকের মধ্যেই "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" সেই ঋকের মধ্যেই "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া," সেই ঋকের মধ্যেই "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখঃ" প্রভৃতি বিখ্যাত ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা স্পষ্ট জানিয়াছিলেন যে " একং সদ্বিপ্রা বহুধাবদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহু।" এক সৎপদার্থকে বিপ্র সকল অগ্নি, যম, বায়ু, এই সকল নামে উক্ত করেন। সেই আদিম আর্য্যগণ ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের গাঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যের পিতা মাতা ইহা তাঁহারা অবগত ছিলেন। "ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং হিনো মাতা" তুমি আমারদিগের পিতা, তুমি আমারদিগের মাতা। তাঁহারা ঈশ্বরকে "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্" সখা, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে সখা বলিয়া জানিতেন; তাঁহার বন্ধুতা, তাঁহার সহবাস, তাঁহাদের অত্যন্ত সুখকর বোধ হইত। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, "স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বীপ্রণীতীঃ" তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু, তোমার নেতৃত্বও সুস্বাদু। তাঁহারা আরো বলিয়াছেন, "ত্বমস্মাকং তবাস্মি" তুমি আমার-দের, আমরা তোমার। এই ত ঋগ্বেদের কথা বলিলাম। উপনিষদে দেখা যায় যে তৎকালের ঋষিরা যেমন ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতেন, তেমনি তাঁহাকে আত্মার আত্মারূপে উপলব্ধি করিতেন। "তিনি আত্মার আত্মা" এই পরম সত্য প্রাচীন হিন্দুদিগের হৃদয়ে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পিতা মাতা অপেক্ষা আত্মার আত্মা যে নিকটের সম্বন্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কি নিকটতম কি গূঢ়তম সম্বন্ধ, তাহা উপনিষৎকার ঋষিগণ সুস্পষ্টরূপে জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৈদিক সংহিতাতে বাহ্যবস্তুতে ঈশ্বরের আরোপ দেখা যায়, উপনিষদে এই কথা পাওয়া যায় যে যিনি বাহ্যবস্তুতে, তিনিও আত্মাতে, "যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে সএকঃ" যিনি এই আত্মাতে, তিনি এই আদিত্যে, তিনিই এক মাত্র। "তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং" তাঁহাকে যে সকল ধীরেরা আত্মস্থ করিয়া জানেন তাঁহারদিগের নিত্য শান্তি হয়, তদ্ব্যতীত শাশ্বতী শান্তি আর কেহ লাভ করিতে পারে না। উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ। উপনিষদের পর স্মৃতি রচিত হয়। রাজনীতি, দণ্ড-নীতি, গার্হস্থ্য কর্ম্মের বিধি, এই সকল স্মৃতিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে আমি দর্শনকে গণ্য করিলাম না কারণ, তাহা কেবল বিচার গ্রন্থ মাত্র। দর্শনকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া কোন দেশেই গ্রহণ করে না। এদেশেও উহা ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদির ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ নহে।* পুরাণের মধ্যে মহাভারত ও ভাগবত পুরাণ প্রধান। ভাগবতপ্রণেতা তৎকালে দর্শনশাস্ত্রীয় শুষ্কতর্কের প্রবলতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রীতি করিবার উপদেশ আবশ্যক বোধে ভাগবত রচনা করেন। ভক্তি কি, তাহা ভাগবত ব্যাখ্যাকারী শাণ্ডিল্যসূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে,

* যেমন ইউরোপে "Philosophy" ধর্ম্মদিগের মধ্যে দর্শনও সেইরূপ।

"অত্যন্তানুরক্তিরীশ্বরে ভক্তিঃ।" তন্ত্রের মধ্যে প্রধান মহানির্বাণ তন্ত্র। এই তন্ত্রে পরমব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধীয় অতি আশ্চর্য্য উপদেশ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ সর্ব্বত্র মান্য। তন্ত্র প্রধানতঃ বঙ্গদেশে মান্য। এই সকল গ্রন্থ হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্র। এই সকল গ্রন্থ দ্বারা জানিতে পারা যায় হিন্দু ধর্ম্ম কি?

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে গেলে অগ্রে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে কতকগুলি অমূলক প্রবাদকে নিরাকরণ করা আবশ্যক।

উল্লিখিত অমূলক প্রবাদ সকলের মধ্যে প্রথম অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম্ম। কিন্তু বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম্ম নয়। পৌত্তলিকতার নিন্দা, হিন্দুধর্ম্মে বিলক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিবিধ শাস্ত্র হইতে অনেক যত্নের সহিত নিম্নোল্লিখিত শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুং স্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥

স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নি বচন।

জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত হইয়াছে; রূপ কল্পনা স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়।

রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্॥

বিষ্ণু পুরাণ

পরমাত্মা রূপনাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত, নাশ রহিত, অবস্থান্তর শূন্য, দুঃখ ও জন্ম বিহীন হয়েন; কেবল আছেন এই মাত্র বলিয়া তাঁহাকে কহা যায়।

অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥

স্মার্ত্তধৃত শাতাতপ বচন।

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যদিগের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেব জ্ঞানীরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে; পরামাত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করেন।

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

কুলার্ণব।

পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলে কর্ম্মকাণ্ডাদি কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তাল বৃন্ত কোন কার্য্যে আইসে না।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপানি বিবিধানিচ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের নিমিত্ত কল্পনা হইয়াছে।

মনসা কল্পিতামূর্ত্তির্ণৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥

মহানির্ব্বানি তন্ত্র।

অভিপ্রেত মূর্ত্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বপ্নলব্ধ ও মনুষ্য অনায়াসে রাজা হইতে পারে।

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনাং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

নাম রূপাদি কল্পনাকে বালক্রীড়াবৎ জানিয়া মনুষ্য সৎ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা মুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসামূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

যে সমস্ত মূঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা প্রস্তর তথা সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। পরম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন মন্ত্রারাধনেন বা।
আত্মনাত্মনমাজ্ঞায় মুক্তোভবতি মানবঃ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না, মন্ত্র বা আরাধনার দ্বারা মুক্তিভাজন হয় না, কেবল আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হয়।

যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

সকল প্রাণিতে বর্ত্তমান সকলের আত্মা ও ঈশ্বর যে আমি আমাকে মূঢ়তা প্রযুক্ত

যে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা করে সে ভস্মে হোম করিয়া থাকে।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলং।

অষ্টাবক্র সংহিতা।

সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার পরব্রহ্মকে অচল সত্য জ্ঞান কর।

তোয়োবিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণং।
তত্ত্বজ্ঞানবিনা দেবি তথা মুক্তির্নজায়তে॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

হে দেবি! জল বিনা যেমন পিপাসা শান্তি হয় না, তেমনি তত্ত্ব জ্ঞান বিনা মুক্তিলাভ হয় না।

নানা শাস্ত্রের এই সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যে সকল অল্পবুদ্ধি অজ্ঞব্যক্তি নিরাকার অনন্ত পরমেশ্বরকে ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহারদিগের উপাসনার সহায়তার নিমিত্ত ব্রহ্মের বিবিধ রূপ কল্পনা হইয়াছে ও বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপের বিধান হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপকে না জানিলে কদাপি মুক্তি লাভ হয় না। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম্ম নহে। পরব্রহ্মের উপাসনাই এ ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। হিন্দু শাস্ত্রে এই কথা ভূয়োভূয়ঃ উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করিবে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই।

হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম্ম অদ্বৈতবাদাত্মক ধর্ম্ম। যে মতে বলে যে এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ঈশ্বর, তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে। এই অদ্বৈতবাদ ইদানীন্তন গ্রন্থে বাহুল্য, উপনিষৎ প্রভৃতিতে অল্পই পাওয়া যায়। উপনিষদে ঈশ্বর হইতে জগৎ পৃথক, ঈশ্বর হইতে জীবাত্মাও পৃথক, এইরূপ বাক্য অনেক স্থানে আছে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতিবীতশোকঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে একটী সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে। কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

কঠোপনিষদে আছে, "ছায়াতপৌ ব্রহ্ম বিদোবদন্তি" এই শ্লোকে ঈশ্বর ও জীবাত্মাকে আতপ ও ছায়ার ন্যায় প্রভেদ নিরূপণ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন উপনিষদে আছে।

এষহিদ্রস্টাস্প্রষ্টা ঘ্রাতা রসয়িতামন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা
পুরুষঃ। স পরে অক্ষরে আত্মনিসংপ্রতিষ্ঠতে।

এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ দ্রষ্টা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তা, ইনি অক্ষর পরমাত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন।

মনুসংহিতাতে উক্ত আছে।

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

যাহাতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই উপাস্য পরমব্রহ্ম।

তলবকারোপনিষদে উক্ত আছে।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।

তিনি বিদিত কি অবিদিত সকল বস্তু হইতে ভিন্ন।

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।

তিনি এই কার্য্য-কারণবিশিষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতাতে উক্ত আছে।

ন তং বিদাথ যইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।

তাঁহাকে তোমরা জান না যিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি যে এ সকল হইতে ভিন্ন হইয়াও তোমারদিগের অন্তরে স্থিতি করিতেছেন।

এইরূপ প্রধান প্রধান হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা যেমন প্রতিপন্ন হয় যে, পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ও জগৎ ভিন্ন, তেমনি হিন্দুদিগের ব্যবহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে সাধারণ হিন্দুবর্গের বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন। সমস্ত হিন্দুরা বিবিধ প্রকারে সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, যিনি উপাস্য তিনি অবশ্যই উপাসক হইতে ভিন্ন। যখন হিন্দুরা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বর এবং মনুষ্য এক ইহা তাঁহারা কখনই কার্য্যতঃ বিশ্বাস করেন না, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। বেদান্ত-দর্শনে এই অদ্বৈতবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বেদান্ত-দর্শন শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বুঝায়, নিজ বেদান্তসূত্র বুঝায় না; যেহেতু শঙ্করাচার্য্য যেমন বেদান্তসূত্র অদ্বৈত কল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজস্বামী তেমনি দ্বৈতকল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব উপনিষদের কথা দূরে থাকুক বেদান্তসূত্রও যে অদ্বৈতবাদাত্মক শাস্ত্র তাহা প্রমাণ হয় না। বেদান্ত শাস্ত্র শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। শঙ্করাচার্য্য এক জন অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই বত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি অলৌকিক বীর্য্য ও তেজস্বিতা সহকারে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন। হিমালয় অবধি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত এমন স্থান নাই, যেখানে শঙ্করাচার্য্যের মঠ দেখিতে না পাওয়া যায়। তিনি বৌদ্ধ, চার্ব্বাক,

সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ লোক সকলের সহিত তর্ক করিয়া আপনার মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মত ভারতবর্ষে এক্ষণে এমনি প্রচলিত হইয়াছে যে কবির পন্থি, দাদু পন্থি, নানক পন্থি, চৈতন্য সম্প্রদায়ের ন্যায় শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীদিগকে শঙ্করপন্থি অথবা শঙ্কর সম্প্রদায় বলিয়া কেহ ডাকে না। অন্য সকল মতের অনুবর্ত্তীদিগকে সম্প্রদায় বলিয়া ডাকে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তীদিগকে কেহ শঙ্কর সম্প্রদায় বলিয়া ডাকে না। তাহার কারণ এই যে শঙ্করাচার্য্যের মত ভারতবর্ষে বিস্তৃতরূপে প্রচলিত হইয়াছে। পশ্চিম অঞ্চলের যে অজ্ঞ স্ত্রীলোক সুগভীর কূপ হইতে জল তুলিতেছে, সেও ঐরূপ জল তুলিবার সময় বিচারে জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ ও জগৎ স্বপ্নবৎ বলিয়া থাকে আর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও তাঁহার টোলে বসিয়া শিষ্যদিগকে ঐরূপ উপদেশ দেন। শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈত মত ভারতবর্ষে প্রচলিত করিয়া যান; উপনিষদাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে ঐ মতের চিহ্ন তত পাওয়া যায় না।

হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে লোকের আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে, হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাস ধর্ম্মের পোষকতা করে। তাহাও অযথার্থ। শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাস ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। ঋষিরা বনে বাস করিতেন কিন্তু একবারে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতেন না। শাস্ত্রে ঋষিপত্নী, ঋষিকুমার ইত্যাদির কথা শ্রবণ করা যায়। তবে তাঁহারা নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেন, কারণ তাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে অনেক সহায়তা করে। এখনো ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের অনেক গৃহস্থ বৃদ্ধ হইলে সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া নির্জ্জনে বাস করেন। তাহাদিগকে কখনই সন্ন্যাসী বলা যায় না। ঋষিরা নির্জ্জনে থাকিয়াও লোক সমাজের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা নির্জ্জনে থাকিয়াও রাজনীতি, লোকযাত্রা বিধান, কৃষি প্রভৃতি নানা লোকোপকারী বিদ্যাবিষয়ে গ্রন্থ সকল রচনা করিতেন, রাজ সভায় আসিয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, এবং রাজ্যে অমঙ্গল ঘটনা ঘটিলে তাহার নিরাকরণ জন্য রাজাকে সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপিস্যাদ্যতঃ সআস্তে সহষট্সপত্নৈঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতেবুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিন্নুকরোত্যবদ্যং॥
যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমানো গৃহেষ নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বং।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিতউর্জিতারীন ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

যে প্রমত্ত ব্যক্তির ষড় রিপু প্রবল তাহার বনেও ভয় আছে, আর যে ব্যক্তি জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ও ঈশ্বরপরায়ণ তিনি গৃহাশ্রমে থাকিলেও তাঁহার কি দোষ হইতে পারে? যিনি ষড়রিপুকে জয় করিয়া গৃহে ধর্ম্ম সাধন করেন তিনি দুর্গাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় প্রবল শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষীণ রিপু হইয়া যথেচ্ছা

বিচরণ করেন; তাঁহার কোন আশঙ্কা নাই।

শান্তিশতক সকল হিন্দুরা শাস্ত্রসম্মত কাব্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে।

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥

রিপুপরতন্ত্র লোক সকল বনে থাকিলেও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; গৃহে পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যা। যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হন, তাহার সম্বন্ধে গৃহই তপোবন।

হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ আছে। তাহা এই যে হিন্দুধর্ম্ম কঠোর তপস্যাবিধায়ক ধর্ম্ম। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধন তপস্যা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা পাপ কার্য্য হইতে বিরতিই যে প্রধান তপস্যা বলিয়া জানিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং॥

মহা ভারত।

যে ব্যক্তি মন, বাক্য, কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপ কার্য্য না করেন তিনিই তপস্যা করেন। যিনি শরীর শোষণ করেন তাঁহার তদ্দ্বারা তপস্যা হয় না।

হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে আর এক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম্মে পাপক্ষয় নিমিত্ত বহুল কৃচ্ছ্রসাধন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে কিন্তু অনুতাপ যে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, হিন্দুধর্ম্মে তাহার উপদেশ নাই। এই প্রবাদ অমূলক। মনুস্মৃতিতে আছে।

কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎপ্রমুচ্যতে।
নৈনং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া তজ্জন্য সন্তাপিত হইয়া সেই পাপ হইতে বিরত হয় এবং আর এরূপ পাপ করিব না বলিয়া একবারে নিবৃত্ত হয়, সে পবিত্র হয়।

হিন্দুধর্ম্মের বিষয় আর একটি অমূলক প্রবাদ এই যে ইহা ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া জ্ঞান করে না। ইংলণ্ডবাসিনী ব্রহ্মবাদিনী মিস্ কব্ বলেন যে এমেরিকার থিওডোর পার্কর প্রথমে ঈশ্বরকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক স্থানে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঋগ্বেদে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদে আছে, "পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি।" তুমি আমাদিগের পিতা, পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান কর। "য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বৃ ঋষির্হোতা ন্যসীদৎ

পিতানঃ'' যিনি এই ভুবনকে অস্তিত্বে আহ্বান করিলেন, তিনি ঋষি অর্থাৎ সর্ব্বদৃক্ তিনি হোতা অর্থাৎ আহ্বানকর্ত্তা, তিনি আমারদিগের পিতা। ভগবদগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মের উক্তি স্বরূপ, বলিতেছেন, ''পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ'' আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। অর্জ্জুন এইরূপ বলিতেছেন, ''পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্যপূজ্যাশ্চ গুরোর্গরীয়ান্।'' তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমি ইহার পূজ্য, তুমি গুরু অপেক্ষাও গরীয়ান।

হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম্ম অত্যন্ত নীরস ধর্ম্ম। উহা কেবল শুষ্ক জ্ঞানের ধর্ম্ম, উহাতে প্রীতিভাবের কোন কথা নাই। কিন্তু বাস্তবিক এই প্রবাদ যথার্থ নহে। উপনিষদে আছে।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ

সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা।

পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়।

এই সকল বাক্য এবং ''ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বক'' প্রভৃতি গীতাবচন কি প্রকাশ করিতেছে? কর্ম্মীরা সংকল্পবাক্যে যে বিষ্ণুপ্রীতিকামনার উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহাতেই বা কি প্রকাশ পাইতেছে?

হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের কথা নাই। এ সংস্কার যে অমূলক তাহা শাস্ত্রের এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে।

ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ত্বমানশুঃ।

শঙ্করাচার্য্যধৃত বচন।

ধনের দ্বারা, পুত্র দ্বারা, কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায় না, কেবল ত্যাগ দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়।

প্রাচীন হিন্দুদিগের অগ্নি প্রবেশ, প্রায়োপবেসন ও পঞ্চতপাদি কৃচ্ছ্র সাধনে এবং অধুনাতন কালের হিন্দুদিগের সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে ধর্ম্ম জন্য হিন্দু জাতির অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদিও উল্লিখিত কার্য্য সকল নির্ম্মল জ্ঞান প্রয়োজিত নহে; তথাপি মুক্তির জন্য হিন্দুরা কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম্মে শত্রুর উপকার করার কথা নাই। যাহাদিগের এই সংস্কার আছে. শাস্ত্রোক্ত নিম্নোল্লিখিত উপদেশ তাহাদিগের দেখা আবশ্যক।

ন ক্রুধ্যন্তং প্রতিক্রুধোদাক্রুষ্টঃ কুশলংবদেৎ।

যদি তোমার প্রতি কেহ ক্রোধ করে, তাহার প্রতি তুমি পুনরায় ক্রোধ করিবে না। যদি কেহ তোমার প্রতি আঘাত করে, তাহাকে তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে অর্থাৎ তোমার ভাল হউক, এই কথা বলিবে।

অতিবাদং ন প্রবদেন্নবাদয়েৎ
যোনাহতঃ প্রতিহন্যান্ন ঘাতয়েৎ।
হন্তুং চযোনেচ্ছতিপাপকংবৈ
তস্মৈদেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায়॥

মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব।

যিনি কঠোর বাক্য বলেন না, অথবা তাহা বলিতে অন্যকে উত্তেজিত করেন না, যে ব্যক্তি আহত হইয়াও অন্যেকে আঘাত না করেন কিম্বা আঘাত করিতে অন্যকে উত্তেজিত করেন না, যিনি পাপকারীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহার আগমন দেবতারা স্পৃহা করেন।

অরাবপ্যুচিতং কার্যামাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব।

শত্রুও গৃহে সমাগত হইলে তাহার যথোচিত আতিথ্য করিবেক, বৃক্ষ তাহার ছেদকের পার্শ্বগত ছায়া কদাপি হরণ করে না।

তুমি যে রূপ ইচ্ছা কর অন্যে তোমার সম্বন্ধে করিবে, অন্যের প্রতি তোমার সেইরূপ করা কর্ত্তব্য, ঈসার এই সুমহৎ বাক্য খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মের প্রধান গৌরবস্থল। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে এইরূপ মহোচ্চ উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে নাই, কিন্তু এ সংস্কার অমূলক। মহাভারতে আছে।

শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বাচাপ্যবধার্য্যতাম।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং না সমাচরেৎ॥

ধর্ম্মসর্ব্বস্ব শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া তাহা মনে ধারণ করিয়া রাখ। আপনার যাহা প্রতিকূল অন্যের সম্বন্ধে তাহা করিবে না।

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সপশ্যতি।
আপনার ন্যায় যে সকল জীবকে দেখে সে যথার্থ দেখে।
আত্মৌপমেন সর্ব্বত্রং সমং পশ্যতি যোনরঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী ইতি মে মতিঃ॥

ভগবদ্গীতা।

যে ব্যক্তি সুখ কিম্বা দুঃখ সম্বন্ধে আপনার ন্যায় সকলকে দেখে, সেই ব্যক্তিই আমার মতে যথার্থ যোগী।

অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদের বিশেষ পোষকতা করে। কিন্তু একথা যথার্থ

নহে। ঋগ্বেদে জাতিভেদের উল্লেখ নাই। মহাভারতে আছে।

ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদংজগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাংগতং॥

এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের বিশেষ নাই। ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উচ্চনীচ কর্ম্মানুসারে মনুষ্যগণ এক এক শ্রেণীতে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইতেই জাতির উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষে প্রথমে এক ব্যক্তির চারি পুত্রের মধ্যে বৃত্তি অনুসারে এক জন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য ও একজন শূদ্র হইয়াছিলেন, এমন সকল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।* পুরাকালে কর্ম্ম ও চরিত্র গুণে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইত, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইত।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতিশূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎবৈশ্যাত্তথৈবচ॥

মনু।

শূদ্র ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র পদ প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানের বিষয়েরও এই প্রকার জানিবে।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্য তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিঃ॥
শূদ্রেতু যন্তবেল্লক্ষ্য, দ্বিজেতচ্চ না বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত আজগার পর্ব্বাধ্যায়।

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপস্যা, দয়া এই সকল গুণ যাঁহাতে দৃষ্ট হয় তিনিই স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। শূদ্রেতে যে সকল লক্ষণ, ব্রাহ্মণে সে সকল বিদ্যমান নাই। লোকে শূদ্র হইলেই শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না। হে সর্প! যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হয়েন। হে সর্প! যাঁহাতে উক্ত রূপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশিতব্য।

এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রোব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাংব্রজেৎ॥

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩৩ সংখ্যা।

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোবাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভিঃশুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপিদ্বিজবৎ সেব্যইতিব্রহ্মানুশাসনং॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপিতিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয়ইতি মে মতিঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং॥
সর্ব্বোযং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেনচ বিধীয়তে।
বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণিসমঃ সর্ব্বত্র মেমতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতোধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥

মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বস্থিত উমামহেশ্বর সম্বাদ।

হে দেবি! শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। হে দেবি! এই সকল কর্ম্ম করিলে অতি হীনবংশোদ্ভব শূদ্র আগমসম্পন্ন সংস্কার-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে সর্ব্বসঙ্করভোজনকারী ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র হয়েন। হে দেবি! কর্ম্ম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত যে শূদ্রসন্তান তিনি শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়, এই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্রসন্তান যদি শুভ কর্ম্ম এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ; ইহা আমার অভিপ্রায় জানবে। উত্তমকুলে জন্ম, সংস্কার, বেদ পাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ হয় না; যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারা সকলে, ব্রাহ্মণ হয়, অতএব শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। হে কল্যাণি! ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান, এই আমার অভিপ্রায়; অতএব নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহার হৃদয়ে ধৃত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে যে প্রকারে শূদ্র হয়েন, এই গুহ্য বাক্য তোমাকে কহিলাম।

হিন্দুদিগের মধ্যে চিরপ্রচলিত উক্ত ভাবানুসারে বেদে উল্লেখিত কবস ঋষি শূদ্র হইয়াও এবং পুরাণে উল্লেখিত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং লোমহর্ষণ সূত জাতীয় হইয়াও ঋষিদিগের শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের

দ্বারা ভারতবক্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহে, পরস্পর ভোজ্যান্নতার নিয়মে ও সমুদ্রযাত্রা রীতিতেও প্রকাশ হইতেছে যে অধুনাতন কালের ন্যায় প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে জাতিভেদের নিয়ম এরূপ কঠোর ছিল না। এখনও বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে কোন কোন ভদ্রজাতির মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে।

হিন্দু ধর্ম্মের বিষয়ে এই সকল অমূলক সংস্কারের অমূলকত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহা অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমতঃ সাধারণ হিন্দু ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা দেখাইব। তাহার পর সমর্থাধিকারীদিগের ধর্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

প্রথমতঃ। হিন্দু ধর্ম্মের নাম কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম মূলক নহে। যেমন বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদের নামে প্রচলিত, হিন্দু ধর্ম্ম তেমন কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রচলিত নহে। ইহা দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রশস্ততা প্রমাণীকৃত হইতেছে। ধর্ম্ম সনাতন পদার্থ, তাহার নাম কোন ব্যক্তির নামে হওয়া উচিত নহে। এই জন্য হিন্দুরা আপনারদিগের ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া ডাকেন এবং কোন ব্যক্তির নামে আপনাদিগের ধর্ম্মের নামকরণ করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ। হিন্দু ধর্ম্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না। হিন্দু ধর্ম্মে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার বহুল অবতারের কথা কথিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এমন বলে না যে অনাদ্যনন্ত নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম কোন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদে ব্রহ্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে

নজায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন নবভূব কশ্চিৎ।

পরমাত্মা জন্মেন না, মরেন না, এই সকল বস্তুর মধ্যে তিনি কোন বস্তুই নহেন এবং তিনি কোন বস্তুও হয়েন নাই।

এই ভাব সমস্ত হিন্দুধর্ম্মে রক্ষিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অত্যুক্তিস্থলে কোন দেবতা অথবা দেবাবতারকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের কোন স্থানে এমন উল্লেখ নাই, যে নিরাকার নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম মনুষ্য উদরে জন্মগ্রহণ ও মানব আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ। হিন্দু ধর্ম্ম কোন মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ পেয়গম্বর স্বীকার করে না। খ্রীষ্টানেরা যেমন প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে, "Through Jesus Christ our Lord and Saviour" "প্রভু ও পরিত্রাতা ইশু দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর" বলে হিন্দুরা সে প্রকার বলেন না। নবি অর্থাৎ পেয়গম্বরে বিশ্বাস শেমীয় * ধর্ম্মাবলম্বীদিগের

* ঐসকল ধর্ম্ম শেম বংশোদ্ভব জাতির মধ্যে উদিত হইয়াছিল। এইজন্য এই সকল ধর্ম্মকে শেমীয়ধর্ম্ম বলিয়া ডাকা হইল। য়িহুদি ও আরবেরা ঐ বংশোদ্ভব জাতি।

মধ্যে অর্থাৎ য়িহুদী, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। পেয়গম্বরে বিশ্বাস ঐ সকল ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ। একটী বিশেষ ব্যক্তি মাত্র আমারদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরের নিকট যাইবার এক মাত্র পথ, এরূপ ব্যক্তিকে পেয়গম্বর বলে। এরূপ ব্যক্তিকে ঈশ্বর ও আপনি এই দুয়ের মধ্যে রাখিয়া ঈশ্বরকে উপাসনা করিবার রীতি হিন্দুদিগের মধ্যে নাই। "মুসলমানেরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে উপদেশ দেয় কিন্তু বলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদকে না মানিলে মুক্তিলাভ হইবে না। কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেও মহম্মদের অনুমোদন ব্যতীত ঈশ্বর তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন না। মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন মহম্মদ বলিবেন, আমি ইহাকে চিনি না, ঈশ্বর অমনি তাহাকে নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন। খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যেতেও কেহ কেবল ঈশ্বরকে আরাধনা করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, খৃষ্টকেও মানা চাই। এক ব্যক্তি বলিলেন আমি ঈশ্বরের সমুদায় আজ্ঞা পালন করিয়াছি, আমার উদ্ধার হইবে কি না? খৃষ্টানদিগের মতে তাহার মুক্তি হইবে না, "খৃষ্টকে না মানিলে ঈশ্বর মুক্তি দিবেন না"* কিন্তু আমারদিগের শাস্ত্রকারেরা কেবল ব্রহ্মজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; মুক্তিলাভ জন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর উপাসনা আবশ্যক করে না।

চতুর্থতঃ। আর একটি বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা এই, ইহাতে ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত জানিয়া উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। কি বাইবল, কি কোরাণ, কি আর কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র, কোথাও এরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইটী হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গৌরব স্থল। ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত করিয়া দেখিলে ঈশ্বরকে যেমন নিকট করিয়া দেখা হয় তেমন অন্য প্রকারে দেখা হয় না।

পঞ্চমতঃ। হিন্দু ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের উপদেশ আছে। যোগের বিষয় হিন্দু শাস্ত্রে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত, নিয়মিত, ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এমন আর কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি সে যোগের কথা বলিতেছি না যাহাতে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হয়। যে যোগ সংসারে থাকিয়া হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ যোগ। হিন্দু শাস্ত্রের এক স্থানে এই প্রকার যোগের একটী সুন্দর উপমা আছে।

পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েষ্বনুতৎ পরোপি।
ধীরোন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং ॥
সঙ্গীতনৃত্যকতিতানবশংগতাপি।
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব ॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত ভাগবতের টীকা।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩৩৩ সংখ্যা।

যেমন সুধীরা নটী সঙ্গীত, নৃত্য ও কত প্রকার তানের বশবর্ত্তী হইয়াও মস্তকস্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ,দ্বাও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না।

এ বিষয়ে একটী চমৎকার গল্প হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচলিত আছে। ব্যাসপুত্র শুকদেব পিতার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করাতে, ব্যাস উত্তর করিলেন, তুমি রাজর্ষি জনকের নিকটে যাও, তাঁহার নিকট হইতে ঐ বিষয়ে উত্তম উপদেশ পাইবে। শুকদেব জনকালয়ে উপস্থিত হইলেন কিন্তু জনককে ঐশ্বর্য্যসম্ভোগী ও রাজ কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন এমন বিষয়ী ব্যক্তি কিরূপে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবেন। জনক তাঁহার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক একটী তৈলপূর্ণ পাত্র তাহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন এই তৈল পাত্র হস্তে লইয়া তুমি সমস্ত নগর ভ্রমণ করিয়া আইস কিন্তু দেখিও যেন বিন্দু মাত্র তৈল ভূমিতে পতিত না হয়। শুকদেব তাহাই করিলেন। যথোচিত যত্নসহকারে তৈলপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া সমস্ত নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আইলে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, নগরে কি দেখিলে। শুক যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন তৎপরে রাজর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তৈল পতিত হইয়াছিল ? শুকদেব উত্তর করিলেন, একবিন্দুও পড়ে নাই। জনক বলিলেন এইরূপ মনোনিবেশ সহকারে সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিতে পারা যায়, অথচ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রহ্মের সহিত যোগ স্খলিত হয় না।

ষষ্ঠতঃ। হিন্দু ধর্ম্মের আর একটী চমৎকার লক্ষণ এই যে তাহাতে নিষ্কাম উপাসনার বিধি আছে। হিন্দুধর্ম্মে সকাম নিষ্কাম, দুই প্রকার উপাসনারই বিধি আছে কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মে আদোবে নিষ্কাম উপাসনার কথা নাই। হিন্দুশাস্ত্র নিষ্কাম উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন। অন্য সকল ধর্ম্মে কেবল পারলৌকিক সুখ প্রত্যাশায় ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দৃষ্ট হয় কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ এই যে কোন ফল কামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্ম সাধন করিবে। উপনিষদে উক্ত আছে—

উপাসতে পুরুষং হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ।

যে ধীর ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া সেই পরম পুরুষের উপাসনা করেন তাঁহার জন্ম হয় না।

যাহারা বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকেও কর্ম্মের শেষে "এতৎ কর্ম্ম ফলং ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করে সে এক প্রকার ধর্ম্মবণিক; তাহার ধর্ম্ম অতি হেয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বণিক যেমন মূল্যের বিনিময়ে দ্রব্য দেয়, সেইরূপ এতাদৃশ ধার্ম্মিক ব্যক্তি পারলৌকিক সুখের বিনিময়ে ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রীতি

প্রদান করেন। কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবার নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ঃ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি, এমন সামান্য গ্রন্থ যে বাঙ্গালা ভাষায় কাশীদাস কৃত মহাভারত তাহাতেও ইহার উপদেশ আছে। যুধিষ্ঠির কহিতেছেন—

"আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে কর্ম্ম করে গরু বলি তরে।
লোভে পুনঃ পুন যায় নরক দুস্তরে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেরে সমর্পিলে অবহেলে তারে॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥
এইসব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম যায় তার পায় পশু যোনি॥

সপ্তমতঃ। হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা আর এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই, উহাতে সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া করিবার উপদেশ আছে। বাইবেল ও কোরাণে কেবল মনুষ্যের প্রতি দয়া করিতে উপদেশ দেয়। হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই যে সর্ব্বভূতের হিত সাধন করিবে। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি এই বিষয়ে কেবল মনুষ্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না। পশু পক্ষী জীব মাত্রেই উহা বিস্তারিত ছিল। মাহিংসাৎ সর্ব্বভূতানি, সর্ব্বভূত হিতেরতঃ ইত্যাদি বাক্য ইহার প্রমাণ।

অষ্টমতঃ। পরকালসম্বন্ধীয় মতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রকাশিত আছে। যোনিভ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পর পশু যোনিতে অথবা কীটযোনিতে অথবা মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, এইমত পরকাল বিষয়ক হিন্দু ধর্ম্মমতের নিকৃষ্ট অংশ। কিন্তু দেখ ইহাতেও হিন্দুধর্ম্মের কেমন শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কথা আছে। পুণ্যবান ব্যক্তি অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিবে, পাপী ব্যক্তি অনন্তকাল নরকে পতিত থাকিবে। ইহাতে পাপী মনুষ্যের আর পরিত্রাণের আশা থাকে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এই আশা প্রদান করিতেছেন যে যোনিভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ ক্ষয় হইলে সে পুনরায় উন্নতির পথে সংস্থাপিত হইবে। এ মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু উহা যে পূর্ব্বোল্লিখিত মত অপেক্ষা ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণাভাবের সঙ্গে অধিক সঙ্গত তাহার আর সন্দেহ নাই। পুণ্যবান ব্যক্তি এক লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবেন, পরকাল বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মমতের এই উৎকৃষ্ট অংশে তাহার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার

এই প্রকার ক্রমশঃ উন্নতি স্বভাবের উন্নতিশীলতার সহিত সুসঙ্গত। হিন্দু ধর্ম্মের মত এই যে আত্মা এক লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবে যে পর্য্যন্ত না সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে এই ব্রহ্মলোকের চমৎকার বর্ণনা আছে।

> নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্নশোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বেপাপ্মানোঽতোনিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপমাহ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বাএতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধসন্ননন্ধোভবতি বিদ্ধঃসন্নবিদ্ধোভবতি উপতাপী সন্ননুতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তম হরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতোহ্যেবৈষব্রহ্মলোকঃ।

এই আত্মার সেতুর এপারে দিনরাত্রি নিয়মিত হইতেছে, ওপারে দিনও নাই রাত্রিও নাই, সুকৃতিও নাই দুষ্কৃতিও নাই; ইহা পুণ্য-জ্যোতিতে সদা পবিত্র রহিয়াছে। জীব ইহার ওপারে উত্তীর্ণ হইলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এই নিষ্পাপ ব্রহ্মলোক। এই সেতুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে সংসারের দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়, যে পাপে ও দোষে উপতাপী সে অননুতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি, দিনের সমান আলোকধারণ করে। এই ব্রহ্মলোক, ইহার দিবালোক কখন অস্ত হয় না, ইহার প্রকাশ ও নির্ব্বাণ হয় না; ইহা সদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

নবমতঃ। হিন্দু ধর্ম্মের ঔদার্য্য সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা অধিক। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা বলে যে আমার এই ধর্ম্মটী না মানিলে তুমি অনন্ত নরকে পড়িবে, হিন্দু-ধর্ম্মের ভাব তেমন নয়। হিন্দু ধর্ম্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে ধর্ম্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রকারে পালন করিলেই উদ্ধার হইবে। সকল হিন্দুরই এই বিশ্বাস। ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা যে মহিম্নস্তব নিত্য পাঠ করেন, তাহাতে আছে।

> রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
> নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব।

রুচির ভেদানুসারে ঋজু কুটিল পথ দিয়া মনুষ্য সর্ব্বশেষে তোমাকে লাভ করে, যেমন নদী সকল যে যেরূপ পথ দিয়া যাউক না কেন, শেষে সাগরে গিয়া মিলিত হয়।

এরূপ ঔদার্য্যভাব আর কোন্ ধর্ম্মে পাওয়া যায়? বর্ণাশ্রমাচারবিহীন লোকেরাও হিন্দুদিগের নিকট হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইত। বেদান্তসূত্রে আছে "অন্তরা চাপিতু তদ্দৃষ্টে" "রৈক্য বাচক্নবি প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারবিহীন লোকেরাও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী ইহার প্রমাণ বেদে দৃষ্টে হয়।" কেবল যে বর্ণাশ্রমাচারবিহীন হিন্দুরাই পরিত্রাণের অধিকারী, এমন নহে, কিরাত যবন প্রভৃতি অনার্য্যজাতীয়েরা যাহারা আর্য্যদিগের প্রতি সর্ব্বদা বিদ্রোহাচরণ করিত এবং সর্ব্বদা তাহাদের ধর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করিত, তাহাদিগকেও তাঁহারা একেবারে ধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত অথবা ঈশ্বরের পরিত্যাজ্য, এমন বিবেচনা করিতেন না। এক স্থানে এরূপ স্পষ্ট উক্তি আছে,—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসাআবীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেন্যেচপাপাযদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ পুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবত।

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আবীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি লোক এবং অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তিরা যাহার আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হয়, সেই বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি।

দেখ ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের কি ঔদার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। এমন ঔদার্য্য আর কোন ধর্ম্মে আছে? দরাপ খাঁ নামক একজন মুসলমানের বিরচিত গঙ্গাস্তব বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা গঙ্গা স্নানের সময় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা ঐ ঔদার্য্যের অন্যতর প্রমাণ। কোন্ খ্রীষ্টিয়ান বেদোক্ত ঈশ্বরস্তব উপাসনার সময় পাঠ করিয়া থাকেন? হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারা দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনা ও যাগ যজ্ঞ করিতেন না কিন্তু যাহারা তাহা করিত তাহাদিগকে তাঁহারা কনিষ্ঠ অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন, কখন তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম হইতে পৃথক বা বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টীয়ধর্ম্মের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানেরা বলে, পৌত্তলিক দেখ্ আর কাট্। খৃষ্টানেরা বলে হিন্দুরা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির পূজা করে, তাহার দ্বারা তাহারা ঈশ্বরের পূজা করে না— সয়তানের পূজা করে। সয়তান ঐ সকল দেবতার ভিতরে বাস করে। এ সকল কথা নিতান্তই অসঙ্গত ও অনৌদার্য্য-প্রসূত। যাহারা পুত্তলিকার পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া পূজা করে। নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে দেবদেবীর উপাসনা করা অকর্ত্তব্য, কিন্তু পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকতা পাপ কর্ম্ম নহে, তাহা কেবল ভ্রম মাত্র। বস্তুতঃ সকল লোকের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধারণাশক্তি সমান নহে। সমুচিত চর্চ্চার ত্রুটি, উপদেশের অভাব ও বুদ্ধি ও ধারণ শক্তির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অনেকে ব্রহ্মাকে অনেক প্রকারে ভাবনা করে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা প্রযুক্ত অনীশ্বরে ঈশ্বর জ্ঞান করিবে অথবা কল্পিত দেব দেবীকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাংশ বোধে পূজা করিবে, ইহার বিচিত্রতা কি? এই সকল লোককে এক সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া রাখা এবং উপদেশাদি দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানতা মোচন ও জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য, এই মত হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছে ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে স্বভাবের সঙ্গে এই মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াই মনুষ্য ব্রহ্মের অচিন্ত্য অনন্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেব দেবীর পূজা ব্রহ্ম-জ্ঞানের সোপান স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা এই সোপান অবলম্বন করে তাহাদের প্রতি এই উপদেশ আবশ্যক হয় যে চিরকাল তোমরা সোপানে থাকিওনা, ছাদে উঠ। কিন্তু তাহারা

যে ধৰ্ম্ম বহির্ভূত লোক তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না।

দশমতঃ। হিন্দু ধৰ্ম্ম অন্যান্য ধৰ্ম্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে এই ধৰ্ম্মে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান দেখা যায়।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনেচ জনার্দ্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহেচ প্রজাপতিং।
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসেচ ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং শঙ্কটে মধুসূদনং।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং।
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পৰ্ব্বতে রঘুনন্দনং।
গমনে বামনঞ্চৈব সৰ্ব্বকার্য্যেষু মাধবং॥

শব্দকল্পধৃত বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ।

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়হ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং॥

কৃষ্ণানন্দ সঙ্কলিত তন্ত্র সার।

হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকালে উঠিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকার হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা আমি করি তাহা তোমার পূজা স্বরূপ।

মূলার্থ এই যে কোন কার্য্যে ঈশ্বরকে ত্যাগ করিবে না। ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া কোন কার্য্য করিবে না। হিন্দুরা সামান্য পত্র লিখিতে হইলে ঈশ্বরের নামে তাহা আরম্ভ করেন। এমন ধৰ্ম্মপরায়ণ জাতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

একাদশতঃ। অন্যান্য ধৰ্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধৰ্ম্ম এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে হিন্দুদিগের সকল কার্য্য ধৰ্ম্মের অনুশাসনানুসারে সম্পাদিত হয়। কোন মহাশয় ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে 'হিন্দুগণ ধৰ্ম্মানুসারে আহার করে, ধৰ্ম্মানুসারে পান করে, ধৰ্ম্মানুসারে নিদ্রা যায়।' হিন্দুধৰ্ম্ম শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করে না। প্রথমতঃ শরীর পালন অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে ইহাতে যেমন উপদেশ ও যেমন অনুশাসন পাওয়া যায় তেমন আর অন্য কোন ধৰ্ম্মে পাওয়া যায় না। শারীরিক নিয়ম পালন করা কৰ্ত্তব্য, শারীরিক নিয়ম পালন না করিলে ধৰ্ম্ম সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত হয় এই ভাব হিন্দুধৰ্ম্মে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এমনকি, ঐ উপদেশ সামান্য কাব্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ''শরীরমাদ্যং খলু ধৰ্ম্মসাধনং''। শরীর সুস্থ থাকিলে মন সুস্থ থাকে, মন সুস্থ থাকিলে তাহা ধৰ্ম্মসাধনের অনুকূল হয়। শরীরের সঙ্গে মনের বিলক্ষণ যোগ আছে। মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হয়। অতিভোজন করিলে বুদ্ধির জড়তা হয়। ইহা সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ

হয়েন। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষতঃ তদন্তর্গত যোগ শাস্ত্রে আহারের নিয়ম সকল কথিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "যুক্তাহার বিহারশ্চ যুক্ত চেষ্টশ্চ কর্ম্মষু। যুক্তস্বপ্নাববোধশ্চ যোগো ভবতি দুঃখহা।" "যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, যুক্ত চেষ্টা, যুক্ত কর্ম্ম, যুক্ত নিদ্রা ও যুক্ত জাগরণকে দুঃখহারী যোগ বলে।" হিন্দুধর্ম্মে এইরূপে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মের যোগ স্থাপন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিরা এইরূপ ব্যবস্থাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে রাজনীতি, সামরিক নীতি, সামাজিক নীতি ও গার্হস্থ্য নীতি, সকলই ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণ ও জ্যোতির্বিদ্যারও ধর্ম্মের সহিত সংশ্রব রহিয়াছে। অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন সাত্ত্বিক ও বৈষয়িক* দুই প্রকার শাস্ত্র বিভাগ আছে হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ নাই। হিন্দুধর্ম্ম শরীর, মন, আত্মা, সমাজ কাহাকেও অবজ্ঞা না করাতে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রকৃত সভ্যতা অর্থাৎ ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। এক্ষণে যে সভ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা নিতান্ত অসার। বাহিরে চাক্‌চিক্য, ভিতরে উৎকৃষ্ট উৎকট পাপ। ইহা কৃত্রিম সভ্যতা। ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতাই যথার্থ সভ্যতা। ভারতবর্ষ এককালে এরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যাঁহারা আলেক্‌জাণ্ডরের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে ষ্ট্রেবো নামক গ্রীক ভূগোল লেখক তাঁহার লিখিত ভূগোলের উপকরণ সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থান্তর্গত ভারতবর্ষের বৃত্তান্তে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের লোকদিগের দ্বারে কুলুপ দিবার ও দেনা পাওনায় অঙ্গীকার পত্রের আবশ্যকতা হয় না। পুরাকালে ধর্ম্মযুদ্ধের কি চমৎকার নিয়ম ছিল! এরূপ সাধুতা থাকিলেই যথার্থ সভ্যতা হয়। এই সভ্যতার কাল যখন পুনরাগমন করিবে ও উন্নত আকারে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে তখন পৃথিবীর এক নূতন শ্রী হইবে।

দ্বাদশতঃ। অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় প্রাচীন। মনুষ্যের পুরাবৃত্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইহার বিদ্রোহী সন্তান, ইহার তুলনায় মহম্মদীয় ধর্ম্ম ত সে দিনের। ইহা মনুষ্যের পুরাবৃত্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতে অদ্যপি বর্ত্তমান হইয়াছে, ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে ইহাতে এমন কোন পদার্থ আছে যাহা মনুষ্যের হৃদয়কে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রাখিতে পারে। এই দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্ম্ম হইতে কত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। এই এক এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম আবার এক এক অতি বিস্তৃত ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নর্ম্মদা তীরস্থ কবীর বটের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের তুলনা হইতে পারে। ঐ বটবৃক্ষ কত প্রাচীন, উহার এক এক

* Sacred and profane.

শাখা আবার এক এক বৃহৎ বৃক্ষ হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন হইলে যেমন লোকে দুর্ব্বল ও বুদ্ধিহীন হয়, হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে, উহার স্বীয় নব যৌবন সম্পাদনের ক্ষমতা আছে। উহার আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে। উহা কবীর বটের ন্যায় নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইবার ক্ষমতা ধারণ করে। লোক সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, উহা বুদ্ধিবৃত্তিচরিতার্থকারী নূতন আকার ধারণ করিতে পারে। এই আভ্যন্তরিক সারবত্তা জন্য উহাকে অন্য ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া এক্ষণে হিন্দুদিগের সার ধর্ম্ম ব্রহ্ম জ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা যাহা জ্ঞান কাণ্ড বলিয়া আখ্যাত তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাকে হিন্দুরা সমর্থাধিকারীর ধর্ম্ম আর দেব দেবীর উপাসনা কনিষ্ঠাধিকারীর ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন।

জ্ঞান কাণ্ডের লক্ষ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা। ব্রহ্মের উপাসনা ঈশ্বরধারণে সমর্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। ব্রহ্ম কিরূপ ও তাঁহার উপাসনা কিরূপে করিতে হইবে, তাহা উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রে জ্ঞানের কথা আছে কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান গ্রন্থ। জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের বিষয় যেরূপ উপদেশ আছে, তাহার তুল্য উপদেশ অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাইবেল ও কোরাণে এইরূপ উপদেশ আছে যে ঈশ্বর জগতের কোন বিশেষ স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে বিশেষরূপে প্রকাশমান আছেন। কিন্তু হিন্দুদিগের জ্ঞান শাস্ত্রে বলে যে তিনি "বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং" তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান্ আর তিনি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। বাইবেলের মত এই যে ঈশ্বর স্বর্গের উপর এক স্থানে সিংহাসনে বসিয়া আছেন আর খ্রীষ্ট তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছেন। জ্যোতির্বেত্তারা নিরূপণ করিয়াছেন যে সূর্য্য যেমন আমাদেব সৌর জগতের অবলম্বন তেমনি এমন এক নক্ষত্র আকাশে আছে, যাহা সমস্ত জগতের অবলম্বন। তাহার চতুর্দ্দিকে আমাদের সূর্য্য স্বীয় অধীনস্থ গ্রহ উপগ্রহ লইয়া ভ্রমণ করিতেছে। ডিক্ নামে আমেরিকার এক জন ধর্ম্মোপদেষ্টা ঐ নক্ষত্রকে ঈশ্বরের বিশেষ বাসস্থান অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন হিন্দু জ্ঞানীরা এরূপ ভ্রমে কখন পতিত হয়েন নাই।

জ্ঞান কাণ্ডের এক প্রধান উপদেশ এই যে মনুষ্য মধ্যবর্ত্তীর সহায়তা না লইয়া অব্যবহিতরূপে ঈশ্বরকে দর্শন করিবে।

জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তুতং পশ্যাতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তিসূরয় দিবীব চক্ষুবাততম্।

ঋগ্বেদ।

চক্ষু যেমন প্রসারিত আকাশকে দেখে, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে জ্ঞানীরা সেইরূপ দেখেন।

জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে বোধ হয়, যে তাহাদিগের প্রণেতাদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো আপ্ত বাক্যে অন্ধ নির্ভর ছিল না। কঠঋষি বলিয়াছেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ্‌বণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তণূং স্বাং।

পরমাত্মাকে প্রকৃষ্ট বচন অর্থাৎ বৈদিক বচন দ্বারা অথবা উত্তম মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে পায়, তাহারই আত্মাতে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

শ্বেতাশ্বতর ঋষি বলিয়াছেন।

যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যত।

যে ইহাকে না জানে, ঋক্‌ বাক্যে তাহার কি করিবে?

মুণ্ডক ঋষি বলিয়াছেন।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তংছন্দোজ্যোতি মিতি। অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কোন তত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত হয় না। যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়।

ভগবদ্গীতাতে আছে।

যদাতে মোহ কলিলং বুদ্ধিব্যতিচরিষ্যতি।

তদাগন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহ সমূহের অতীত হইবে তখন তুমি শ্রোতব ও শ্রুতি সম্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণন্তর্গত উত্তরগীতাতে আছে।

গ্রন্থমভাস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ

পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্গ্রন্থমশেষতঃ॥

উল্কাহস্তো যথা কশ্চিৎ দ্রব্যমালোক্য তাংত্যজেৎ

জ্ঞানেন জ্ঞেয়নালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ॥

যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সাকিং প্রয়োজনং
এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং ॥

যেমন ধান্যার্থী ব্যক্তি তৃণসহ ধান্যেরধান্যমাত্র গ্রহণ করিয়া তৃণগণকে পরিত্যাগ করে তেমন মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর ব্যক্তি গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া অশেষ গ্রন্থ নিচয় পরিত্যাগ করিবে। যেমন কোন মনুষ্য উল্কা হস্তে লইয়া প্রার্থিত দ্রব্য দর্শনান্তর হস্তস্থিত উল্কা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞেয় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া জ্ঞানের গ্রন্থ পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অমৃতপান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে তাহার যেমন জলে প্রয়োজন নাই, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি পরম পদার্থকে জানিলে তাঁহার বেদে প্রয়োজন নাই।

পুনরায়।

বিজ্ঞেয়োঽক্ষর সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলং।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাং ॥

জীবিতকালকে অতি চঞ্চল জানিয়া সমস্ত শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎস্বরূপ ক্ষয়বিরহিত সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে।

পুনরায়।

অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং, হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রং ॥

শাস্ত্র সকলের অন্ত নাই, জানিবার বিষয় অনেক, কাল সংক্ষেপ, বিঘ্নও বিস্তর, অতএব হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পাইলে জল পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধপান করে, সেইরূপ যাহা সার তাহার উপাসনা করিবে।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যং তৃণমিবত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥

যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকে বলিলেও গ্রহণ করিবে, কিন্তু ব্রহ্মা যদি ও অন্য অর্থাৎ অযুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

এ প্রকার স্বাধীনতার ভাব হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মে পাওয়া যায় না।

জ্ঞানকাণ্ডের আর এক উপদেশ এই যে কর্ম্ম অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে। এই কর্ম্মত্যাগের ভাব হিন্দু ধর্ম্মে চিরকাল আছে। মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অস্টাদশোক্তমবরং যেষ কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়োঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥

এই যজ্ঞরূপ অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সকল অস্থায়ী ও অদৃঢ়, যাহা অষ্টাদশ ঋত্বিক দ্বারা সম্পন্ন হয়। যে মূঢ়েরা ইহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দন করে তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

দ্বিজোত্তম ব্যক্তি উল্লিখিত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা, শম ও বেদাভ্যাসে যত্নবান হইবেন।

আমাদিগের বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ কুল্লূক ভট্ট, যাঁহাকে সর্ উইলিয়ম্ জোন্স পৃথিবীর সকল টীকাকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রণীত মনু সংহিতার টীকাতে "বেদ সন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানাং" এই বাক্যে এক দল বেদসন্ন্যাসী গৃহস্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গৃহস্থেরা বৈদিক কর্ম্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করিতেন। এখনও দণ্ডী পরমহংসেরা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের ধ্যান ধারণাতে নিমগ্ন থাকেন।

হিন্দু ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড ধ্যানপ্রধান। উপনিষদে যে কেবল ধ্যানের কথা আছে, প্রার্থনা নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ "অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতি র্গময়" ইত্যাদি চমৎকার প্রার্থনা উপনিষদে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সহিত সহবাসই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, প্রার্থনা এবং অনুতাপ দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্তি সেই সহবাসের উপায় মাত্র। যখন ঈশ্বরের সহিত সহবাসই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং কেবল ধ্যান দ্বারা আমরা সে সহবাস লাভ করিতে সমর্থ হই, তখন ধ্যানকে প্রধান উপাসনা বলিতে হইবে। শরীর দ্বারা যেমন আমরা মনুষ্যের সমীপস্থ হই, সেইরূপ তদ্দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের আমরা সমীপস্থ হইতে পারি না। আমরা কেবল ধ্যান দ্বারা তাঁহার সহবাস লাভ করিতে পারি। "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥" "তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, কঠোর তপস্যা কিম্বা ক্রিয়া কর্ম্মরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, যে ব্যক্তির চিত্ত জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়াছে, কেবল সে ব্যক্তিই ধ্যানযুক্ত হইয়া সেই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।" এই ধ্যান যখন অবিচলিত ভাব ধারণ করে, যখন আমরা সকল সময়ে, এমন কি, বিষয় কার্য্য সম্পাদন সময়েও ঈশ্বরকে ধ্যান করি, যখন আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখি, যখন আমরা অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করি, তখন তাহা যোগ বলিয়া আখ্যাত হয়। ইওরোপখণ্ডে প্রার্থনার ভাব অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ইদানীন্তন কোন কোন ব্যক্তিকে যোগ প্রধান উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিতে দেখা যায়। কোন কবিশ্রেষ্ঠ এইরূপ উক্ত করিয়াছেন।

"Rapt into still communion which transcends

The inferior offices of prayer and praise."

"প্রশান্ত যোগেতে হৃত তাঁহার মানস,
যোগের মাহাত্ম্য কাছে গণ্য নাহি হয়
স্তব ও প্রার্থনা আদি নিকৃষ্ট সাধন।।"

জ্ঞানীর সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত স্থানের নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই। যে স্থানে যে কালে মন ঈশ্বরে সংলগ্ন হয়, সেই স্থান ও সেই কাল তাঁহার উপাসনার প্রশস্ত স্থান ও প্রশস্ত কাল।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।

বেদান্তসূত্র।

যেখানে মনের একাগ্রতা হইবে সেইখানে উপাসনা করিবে।

জ্ঞানীর সম্বন্ধে তীর্থ পর্য্যটনের আবশ্যকতা নাই। বিশুদ্ধচিত্তই পরম তীর্থ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে আছে।

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত-দয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেবচ।।
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা।।
জ্ঞানংতীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং।
তীর্থানামপিতত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মানসঃ পরং।।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের একস্থানে ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ত্তব্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যতো জগন্মঙ্গলায় ত্বয়াহং বিনিয়োজিতঃ।
অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্বিশ্বহিতকৃৎ ভবেৎ।।
কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতোবিশ্বং তদাশ্রিতং।।
স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।।
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ।।
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ।।
লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন।।
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ।।
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।।

কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টি করণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে॥
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্যন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে॥
কালং কালয়তে কালো মৃত্যুর্মৃত্যুং ভিয়োভয়ং।
বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যৎতচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে॥

যেহেতু আমি জগতের হিত কথন জন্য তোমা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছি, যাহাতে বিশ্বের হিত হয়, তাহা আমি তোমাকে বলি। হে দেবি! বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বেশ বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর, যাঁহাতে বিশ্ব আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তিনি প্রীত হয়েন। তিনি একমাত্র, তিনি সৎস্বরূপ, তিনি সত্য, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি সদাপূর্ণ, তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি নিরাকার, নিরাধার, নির্ব্বিকার, নিরাকুল গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদৃক্ ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তিনি গূঢ়রূপে সকল ভূতে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপি ও সনাতন। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশক কিন্তু তিনি নিজে সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি লোকাতীত অথচ লোকহেতু। তিনি বাক্য মনের অগোচর। সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সকলকে জানেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে জানে না। চরাচর সমস্ত জগৎ তাঁহার অধীনে রহিয়াছে, অবিতর্কিত সত্যরূপে সকল জগৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সত্যতাকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বস্তু সত্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। হে মহেশ্বরি! সেই কারণ স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারা আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। তিনি সকলের কারণ, তিনি একমাত্র পরমেশ্বর; সৃষ্টিকার্য্য জন্য লোক সকল তাঁহাকে স্রষ্টা ও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করে। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে ও বনে তরু সকল পুষ্পিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে ঋতু সকল গমনাগমন করিতেছে ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে, যাঁহার ভয়ে ভয় ভীত হয়, যে ভগবান্ বেদান্ত শাস্ত্রে তৎ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন, হে প্রিয়ে! তাঁহার বিষয়ে আমি তোমাকে অধিক কি বলিব? তিনি ধ্যেয়, তিনি পূজ্য, তিনি সহজে আরাধ্য, তাঁহা বিনা কখনই মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

পুনরায়।

অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভীচ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ॥
ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।

যতাত্মা দৃঢবুদ্ধিঃস্যাৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥
ন মিত্রা ভাষণং কুর্য্যান্ন পরানিচন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥
তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাং।
ব্রহ্মার্পণমস্তুবাক্যং পানভোজন কর্ম্মযু॥
যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধ্যতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদংধর্ম্মং সনাতনম্॥

যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারনিরত, নির্ব্বিকার, সদাশয়, মাৎসর্য্যাবিহীন, দম্ভহীন, দয়াবান, বিশুদ্ধচিত্ত, এবং মাতাপিতার প্রীতিকারী ও তাঁহাদিগের সেবায় তৎপর হইবেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মবিষয়ক কথা শ্রবণ করিবেন, তিনি ব্রহ্মকে সর্ব্বদা মনন করিবেন, তাঁহার মন ব্রহ্মান্বেষণে সদা নিযুক্ত থাকিবে। তিনি সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইবেন। ব্রহ্ম সম্মুখে আছেন, এইরূপ তিনি ভাবিবেন। তিনি মিথ্যা কথা কহিবেন না ও পরানিষ্ট চিন্তা করিবেন না; ব্রহ্মমন্ত্রে যিনি দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি পরস্ত্রী গমন পরিত্যাগ করিবেন। তিনি সকল কর্ম্মের আরম্ভে 'তৎসৎ' বলিবেন; তিনি পানভোজনাদি সকল কর্ম্মের শেষে 'ব্রহ্মার্পণমস্তু' বলিবেন। যে কার্য্য দ্বারা লোকযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সনাতন ধর্ম্ম।

পুনরায়।

বাচিকং কায়িকং চাপি মানসং বা যথামতিঃ।
আরাধনে পরমশস্য ভাবশুদ্ধর্বিধীয়তে॥
পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্ব্রহ্মসাধনম্॥
অস্নাতো বা কৃতস্নাতো ভুক্তোবাপি বুভুক্ষিতঃ।
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ॥

পরমেশ্বরের আরাধনায় বাচিক, কায়িক ও মানসিক ভাবের বিশুদ্ধতা আবশ্যক। তাঁহার পূজাতে আবাহন নাই, বিসর্জ্জনও নাই। সকল স্থানে ও সকল কালে ব্রহ্মসাধন করিবেক। স্নান করিয়া হউক, না করিয়া হউক, আহার করিয়া হউক বা না করিয়াই হউক, সর্ব্বদা নির্ম্মল মানস হইয়া পরমাত্মাকে পূজা করিবেক।

পুনরায়।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারোত্র ত্যজ্যগ্রাহ্যো ন বিদ্যতে।
ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্॥

এই ধর্ম্মে ভক্ষ্যাভক্ষ্য ত্যজ্যগ্রাহ্যর বিচার নাই, কালশুদ্ধির নিয়ম অথবা স্থানের নিরূপণ নাই।

পুনরায়।

ব্রাহ্মে মন্ত্রে মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ।
স্বীয়মন্ত্রং গুরুর্দ্দদ্যাৎ শিষ্যেভ্যোহ্য বিচারয়ন্।
পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৃন্ পতিস্ত্রিয়ম্।
মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৃন্ মাতামহোপি চ।

হে মহেশ্বরি! ব্রহ্মমন্ত্র প্রদানে বিচার নাই। কোন বিচার না করিয়া গুরু আপনার মন্ত্র শিষ্যকে দিবেন। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, মাতামহ দৌহিত্রকে দীক্ষা করিবেন।

উপরে আমি সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলাম। সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার সময় আমি সপ্রমাণ করিয়াছি যে হিন্দুধর্ম্মের যে অংশ কনিষ্ঠাধিকারীর ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত, তাহার ভাব ধরিয়া বিবেচনা করিলে প্রতীত হয় যে তাহাতেও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানকাণ্ডে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ রূপ অনুভূত হয়। জ্ঞানকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত শ্লোক সকল পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম্ম হইতে বিশেষতঃ বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে অধিরোহণ অতি সহজ কার্য্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মের কত নিকটতর এবং হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ সহজে ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানকাণ্ডের শ্লোক সকল পাঠ করিলে বুঝা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার। হিন্দু ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন অসম্প্রদায়িক ধর্ম্ম যেহেতু উহার সত্য সকল ধর্ম্মে পাওয়া যায় এবং উহাতে পৃথিবীস্থ সকল জাতির অধিকার আছে।* হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া এমন এক আকার ধারণ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বজনীন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন অসম্প্রদায়িক ধর্ম্ম কিন্তু তা বলিয়া কি তাহাকে আর হিন্দুধর্ম্ম বলা যাইবে না? রামচন্দ্র নামে একটী লোককে পাঁচবৎসরের সময় দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর, এখন তাহার আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তা বলিয়া সে কি আর সেই রামচন্দ্র নহে? সেই ঋগ্বেদের সময়ের হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সংশোধিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাকারে পরিণত হইয়াছে, এ বলিয়া কি উহাকে আর হিন্দুধর্ম্ম বলা যাইবে না? ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের ঐক্য স্থল ও সকল জাতির উহাতে অধিকার আছে অতএব উহা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, এ বাক্য যেমন সত্য, হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ সংশোধিত ও উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাকারে পরিণত হইয়াছে অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের

* ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন আকার ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে আমার বক্তৃতায় বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। অদ্য বিংশতি বৎসর হইল ঐ বক্তৃতা রচিত হয়। যখন আমি ঐ বক্তৃতা মেদিনীপুর হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশজন্য প্রেরণ করি তখন উহাতে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলাম কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক প্রস্তাব দীর্ঘ হইবে বলিয়া সেই সকল প্রমাণ প্রকাশ করা বিহিত বোধ করেন নাই।

সমুন্নত আকর এই বাক্য তেমনি সত্য। একজন খৃষ্টীয়ান ব্রহ্মবাদীর ব্রাহ্মধর্ম্মকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ও একজন মুসলমান ব্রহ্মবাদীরও উহাকে মুসলমান ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার বলিবার যেমন অধিকার আছে, একজন হিন্দু ব্রহ্মবাদীর উহাকে হিন্দুধর্ম্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার বলিবার তেমনি অধিকার আছে। যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে জ্ঞানী লোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাই এখন বিশুদ্ধ আকারে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। পূর্ব্বে কেবল অরণ্যবাসী ঋষিরা উপনিষৎ পাঠ করিতেন। এইজন্য উপনিষদের অন্যতর নাম আরণ্যক। এক্ষণে সেই উপনিষদের শ্লোক সকল লোকে পাঠ করিতেছে। তখন লোকসমাজ নিবিড় অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, নিরাকার ব্রহ্মকে সাধারণ লোকে তত ধারণ করিতে পারিত না, অতএব ঋষিরা আশঙ্কা করিতেন, যে ব্রহ্মজ্ঞান সাধারণ লোকের হস্তে পড়িয়া বিকৃত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। এখন বিদ্যালোক সাধারণ লোকসমাজে পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক বিকীর্ণ হওয়াতে ঐরূপ হওয়ার আশঙ্কা নাই। এক্ষণে উপদেশ প্রদানদ্বারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগকে সমর্থাধিকারে উত্তোলন করিবার সুবিধা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানীর ইহা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সর্ব্বসাধারণকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে হিন্দুধর্ম্ম রত্নাকর স্বরূপ। ভারত সমুদ্রের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। ভারত সমুদ্রে যেমন কত রত্ন রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, সেইরূপ হিন্দু ধর্ম্মে কত সত্যরত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ধর্ম্মের নিমিত্ত হিন্দুদিগকে অন্য কোথাও যাইতে হয় না। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় তাঁহার এক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ বিশেষ কি কাল বিশেষ কি জাতি বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদীদিগের জ্ঞানরত্নে আমাদের অধিকার। আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে পৈতৃক ধনে ধনী; সেই ধন আমাদের পরম ধন; তাহা আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ হইতে অপর্য্যাপ্ত লাভ করিয়াছি; তাহা অন্য কোন জাতির নিকট হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে না। এই ভারতবর্ষ ধর্ম্মের আদিম স্থান। বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় পুরাতন ধর্ম্ম আর কোন দেশে আর কোন জাতিতে নাই। পৃথিবীতে প্রথম বৈদিক ধর্ম্মেরই আবির্ভাব। ঋষিদিগের সরল সাধু হৃদয় হইতে যে অনির্দ্দেশ্য পুরাকালে বেদসূক্ত সকল বিনির্গত হইয়াছিল, সে কালে আর সকল দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল। ছন্দের রচনা প্রথমতঃ এই ভারতবর্ষেই হয় এবং সেই পবিত্র রচনা ধর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হয়। ঈশ্বর ভারতভূমি ধর্ম্মের আকারস্থান করিয়াছেন; তাহার অগণ্য রত্নরাজী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। যেমন উত্তর হিমালয় ভারতভূমির যেমন দক্ষিণ সাগর ভারতভূমির, যেমন গঙ্গানদী ভারতভূমির তেমনি বেদ উপনিষৎ

ভারতভূমির, তেমনি পুরাণও ভারতভূমির। ধর্ম্ম লইয়া ভারতবর্ষে যত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এত আর কোথাও হয় নাই। ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ। এখানকার সকলে ধর্ম্মকে যেমন পবিত্র ভাবে দেখিতে পায়, সে পরিমাণে আর কোন দেশের লোকই পায় না। ধর্ম্মেতে এমন শ্রদ্ধা, ঈশ্বরেতে এমন নির্ভর, আর কোথাও নাই। তাহারা গৃহই প্রতিষ্ঠা করুক, কোন স্থানেই বা গমন করুক, সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে অগ্রে স্মরণ করিয়া সকল কর্ম্ম আরম্ভ করে। যে দেশে ধর্ম্মের ভাব অধিক নাই, তাহারা ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। বেদের আদিম অবস্থা হইতে এইপ্রকার ধর্ম্মের ভাব চলিয়া আসিতেছে। এক এক বিষয়ে এক এক জাতি গণ্য হয়; কেহ যুদ্ধে, কেহ বাণিজ্যে, কেহ শিল্পশাস্ত্রে কেহ বা ধর্ম্মভাবে। ভারতবর্ষে যদি আর কিছু না থাকে, তথাপি এ ধর্ম্মভাবে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা ও সতীত্ব ইহার অধিক প্রমাণ দিতেছে। আমরা অন্য জাতির নিকট হইতে রাজকার্য্যের, শিল্পশাস্ত্রের, বাণিজ্য ব্যবসায়ের, শাস্ত্রবিদ্যার, উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষার নিমিত্ত অপর জাতির সাহায্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।''

সভাপতি মহাশয়ের এই সকল বাক্যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রশস্ততা ও বিশালতা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমার এরূপ মনে হয়, যে এই ধর্ম্মবাদীদিগের নিকট যে ইদানীন্তন কোন কোন জাতি আসিয়া ধর্ম্মের কথা বলে, ধর্ম্মোপদেশ দেয়, সে যেন জেঠার নিকট জেঠামি করা। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বোধ হয় যে এধর্ম্ম কোনকালে বিলুপ্ত হইবে না। যতকাল ভারতবর্ষ থাকিবে, তত কাল এই ধর্ম্ম থাকিবে। অনেকে বলেন হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, তাহাদের কথা অমূলক। এ ধর্ম্মকে কে বিলুপ্ত করিতে পারে? বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্ম্মকে বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশার্থ যৎ পরনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহার কিছুই করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় মিসনরিরা এখানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বল দেখিয়া তাঁহাদিগকে এখন পালাই পালাই ডাক ছাড়িতে হইয়াছে। সম্প্রতি ডফ্ সাহেব বিলাতে এক বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছেন, যে হিন্দুদিগের দর্শন শাস্ত্র এমন ব্যাপক যে ইউরোপীয় সকল প্রকার দার্শনিক মতের অনুরূপ তাহাতে পাওয়া যায়। এরূপ বুদ্ধিমান জাতিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করান দুষ্কর। হিন্দুধর্ম্ম হাতির মত। ইহার গাত্র মশার ন্যায় অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আক্রমণ করে কিন্তু একবার গাঝাড়া দিলেই কে কোথায় উড়িয়া যায়। যত কাল '' সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'' এই মহাবাক্য ভারতে বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল এ ধর্ম্মকে কেহ বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। ''আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান এষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ'' এইবাক্য যত দিন ব্রহ্মোপাসকের লক্ষণ বলিয়া ভারতে কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে, ততকাল হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে না। 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি,'' ''আত্মন প্রতিকূলানি পরেষাং না সমাচরেৎ'' যতকাল

এই সকল উপদেশ ভারতবাসীগণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইতে থাকিবে ততকাল হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে না। যতকাল হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, ততকাল হিন্দু নাম থাকিবে। হিন্দুনাম আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দুনামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতীনদীতীরবাসী আদিম আর্য্যগণের বরণীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয় যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'ত্বং হি নঃ পিতাবসো ত্বং হি নো মাতা' "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্" "স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বী প্রণীতিঃ""ত্বং অস্মাকং তবাস্মি"। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিত্তির ঋষির বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়া গিয়াছেন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে বোমন্ সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতাঃ।" হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশচক্ষু-সম্মুখে বরণীয় আর্য্যমূর্ত্তি মাণ্ডুক্য আসিয়া উপস্থিত হয়েন, যিনি বলিয়াছেন "শান্তং শিবমদ্বৈতং"। যখন আমরা এই হিন্দুনাম উচ্চারণ করি তখন আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর জটাকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়, যিনি বলিয়াছেন, "আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ"। যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমার দিগের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে মধুর স্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন, "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যং তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা"। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে সেই নবীন দূর্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েন, যিনি পিতৃসত্য পালন নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হয়েন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম্মশব্দের প্রতিবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে সেই অলোকসামান্য পুরুষ আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যু সাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই নাম উচ্চারিত হইলে সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও এক মুহূর্ত্তও অধ্যাত্মযোগ হইতে স্খলিত হইতেন না। এইনাম উচ্চারণ করিলে মহাত্মা পুরুরবাকে স্মরণ হয়, যিনি এলেকজণ্ডরের নিকট শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেক্জণ্ডর "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, "এক রাজা অন্য রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবেন"। হিন্দুনাম কি মনোহর! এনাম কি কখন আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব

ধারণ করে। এইনাম দ্বারা সমস্ত হিন্দুগণ ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই নাম দ্বারা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী, রজপূত, মাহারাট্টা, মাদ্রাজী, সমস্ত হিন্দুবর্গ একহৃদয় হইবে। তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে, সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আর্য্য শোণিতের শেষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়া কি ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিব? ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিলে আভ্যন্তরিক বীর্য্যের হানি হয় এবং কোনমতেই স্বীয় মহত্ত্ব সাধন হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকেরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। এমন অনুকরণ প্রিয় যে আজি যদি চীনেরা আসিয়া আমাদের দেশের রাজা হয় তাহা হইলে তাহারা কল্য পশ্চাদ্দেশে আপাদলম্বিত দীর্ঘ বেণী রাখে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা কি সমস্ত হিন্দুর সম্বন্ধে খাটে? ভারতবর্ষে কি শত শত সহস্র সহস্র লোক নাই, যাহারা এইরূপ ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতিকে অনুকরণ করিতে বিমুখ? এমন সকল উন্নত পুরুষ যদি ভারত ভূমিতে না থাকেন, তবে ভারত সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া ভারতভূমিকে ডুবাইয়া দিউক্, ভারতভূমি পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অন্তর্হিত হউক, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। আমরা কিছু নিউজিলণ্ডবাসী নহি যে একদিনেই হেট্ কোট্ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব। ইহা ক্রীতদাসের কার্য্য। আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি। আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে, হিন্দু জাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে। হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইবে। ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা। সে সভ্যতা এখনো পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই। আমার আশা হইতেছে যে হিন্দুজাতি পুনরায় প্রাচীন কালের ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতা—এমন কি, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা ত রাজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার কি সামাজিক রীতি নীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে হইবে? মহাকবি হোমর বলিয়াছেন "যখনই মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অৰ্দ্ধেক পুরুষত্ব হারায়"। যদি আমরা এই রূপে সর্ব্ব প্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি, আর কি আমাদের উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে মনের কি বীর্য্য থাকে? মনের যদি বীর্য্য গেল, তবে উন্নতি লাভ কি প্রকারে হইবে? হিন্দুজাতি এইরূপে সর্ব্ব প্রকারে পরহস্তগত হইয়া কি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? আমার ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এই রূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন।

"Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing

herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day beam."

আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি "আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব-যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দু-জাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।" এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।

"মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখণি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥
রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা।
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,

কবিকুল ভারত ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।
বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।
ভীষ্মদ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?
পৃথুরাজ আদি বীরগণ!
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়!
কেন ডর, ভীরু! কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক্ ভারতেব জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।"

পরিশিষ্ট।

———————OO———————

আমি এই পরিশিষ্টে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে ইওরোপীয়দিগের, এবং হিন্দু-ধর্ম্ম ও তাহার সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের, অভিপ্রায় দিলাম। ইওরোপীয়দিগের অভিপ্রায় পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বরবাদিতা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গুণ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের আরো হৃদ্গত হইবে এই জন্য তাহা এখানে প্রকাশিত হইল। পরিশিষ্টের পরিশেষে প্রকৃত অসম্প্রদায়িকতা কাহাকে কহে সে বিষয়েও কিছু বলিলাম।

-OO-

হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে ইওরোপীয়দিগের অভিপ্রায়।

"The history of the Hindu religion, although not traceable with chronological precision, exhibits unequivocal proof that it is by no means of that unalterable character which has been commonly ascribed to it. There are many indications which cannot be mistaken, that it has undergone at different periods important alterations in both form and spirit. These are little heeded, have been little investigated and are little known by even the most learned of the Brahmans. Some have been pointed out by the late Hindu reformer Raja Ram Mohun Roy, but even he was unaware of their full extent." Wilson's Essays on the Religion of the Hindus, vol. II, page 44.

"Upon this, however, seems to have been grafted some loftier speculations, and the elements came to be regarded as types and emblems of divine power, as there can be no doubt that the fundamental doctrine of the Vedas is monotheism. 'There is in truth' say repeated texts, 'but one deity, the Supreme Spirit.' 'He from whom the universal world proceeds, who is the Lord of the universe, and whose work is the universe, is the Supreme Being.' Injunctions also repeatedly occur to worship Him, and Him only. 'Adore God alone, know God alone, give up all other discourse,' and the Vedant says, 'it is found in the Vedas that none but the Supreme Being is to be worshipped, nothing excepting him should be adored by a wise man.' It was upon these and similar passages that Ram Mohun

Roy grounded his attempts to reform the religion of his countrymen, to put down idolatry, and abolish all idolatrous rites and festivals, and substitute the worship of One God by means of prayers and thanksgiving. His efforts were not very successful, not so successful as they might have been had he confined himself to their legitimate objects; but he involved himself in questions of Christian polemics and European politics, and intermitted his exertions for the subversion of Hindu idolatry. He did not however, labour wholly in vain and there is a society (Tuttabodhinee Sobha) which although not numerous is highly respectable, both for station and talent, which professes faith in one only only Sureme God, and assembles once a week, on a sunday to perform divine service, consisting of prayers, hymns, and a discourse in Bengalee or Sanskrit, on moral obligations or the attributes and nature of the Deity. A leading preacher at those meetings, when I left India, was a learned Brahman, who was professor of Hindu law in the Sanskrit College of Calcutta." Ibid p. p. 51-52.

"Ministration to idols in temples is held by ancient authorities infamous. Manu repeatedly classes the priests of a temple with persons unfit to be admitted to private sacrifices, or to be associated with on any occasion; and even still, the priests who attend upon the images in public are considered as of a scarcely reputable order by all Hindus of learning and respectability. The worship of images is declared to be an act of inferior merit even by later authorities, those perhaps with which it originated, and it is defended only upon the same plea which has been urged in other times and other countrie-s—that the vulgar cannot raise their conceptions to abstract deity, and require some perceptible object to which their senses may be addressed. 'Corresponding to the natures of different powers and qualities' it is said 'numerous figures have been invented for the benefit of those who are not possessed of sufficient understanding.' And again: 'The vulgar look for their Gods in water; men of more extended knowledges, in the celestial bodies; the ignorant, in wood, bricks and stones.' It is almost certain therefore, that the practice of worshipping idols in temples was not the religion of the Vedas." Ibid, pp. 53-54.

"There are several sects that have abandoned all worship of idols, that deny the efficacy of faith in any of the popular divinities, and question the reasonableness of many of the existing institutions: they have substituted a moral for a ceremonial code, and address their prayers to one only god. These sects are not numerous but they are in general respectable." Ibid, page 76.

"The Brahmans who compliled a code of Hindau Law, by command of Warren Hastings, preface their performance by affirming the equal merit of every form of religious worship. Contrarieties of belief and diversities of religion, they say, are in fact part of the scheme of Providence, for as a painter gives beauty to a picture by a variety of colours, or as a gardener embellishes his garden with flowers of every hue, so God appointed to every tribe its own faith and every sect its own religion, that man might glorify him in diverse modes, all having the same end, and being equally acceptable in his sight." Ibid, page 82.

"The simple fact, then, of the existence of One Supreme Spiritual Cause of all things—supreme over and quite distinct from mythological divinites—is, with one exception, the received doctrine of the Hindus." Ibid, page 90.

"It (Hinduism) was founded on pure Deism of which the Gayatri, translated by Sir William Jones, is a striking proof but to comply with the gross ideas of the multitude who required a visible object of their devotion, they personified the three great attributes of the deity.

The first founders of the Hindu religion do not appear to have had the intention of bewildering their followers with metaphysical definitions; their description of the Deity was confined to those attributes which the wonders of the creation so loudly attest: his almighty power to create, his providence to preserve and his power to annihilate or change what he has created.

In fact, no idea of the deity can be formed byond this: it is simple but forces conviction upon the mind." The Origin of the Hindu Religion by F. D. Patterson, Vol. 8, Asiatic Researches, page 44.

"The deities invoked appear, on a cursory insection of the Veda, to be as various as the authors of the prayers addressed to them: but according to the most annotations on the Indian Scripture, those numerous names of persons and things are all resolvable into different titles of three deities, and ultimately of One God. The *Nighanta* or glossary of the Vedas concludes with three lists of names of deities: the first comprising such as are deemed synonymous with fire; the second with air; and the third with the sun. In the last part of the *Nirukta* which entirely relates to deities, it is twice asserted, that there are but three Gods. *'Tisraevadevatah.'* The further inference, that these intend but one deity, is supported by many passages in the Vedas and is very clearly and concisely stated in the beginning of the index to the Rigveda on the authority of the Nirukta and of

the Veda itself.' It shows (what is also deducible from texts of the Indian Scriptures translated in the present and former essays) that the ancient Hindu religion, as founded on the Indian Scriptures, recognises but one God." The Vedas by H. T. Colebrooke, Asiatic Researches Vol. 8, page 385.

"The real doctrine of the whole Indian Scripture is the Unity of the Deity in whom the Universe is comprehended." Ibid, Page. 474.

"From the preceding remarks it will perhaps appear that the Hindus, admitting three divine hypostases and several inferior deities, have still always maintained the unity of God; and that though they neither erect temples nor address any external worship to him they neverthe-less believe that he ought to be adored mentally and with devout abstraction." Ancient and Hindu Mythology by Lieutenant-Colonel Vans Kennedy. Page 179.

"It must necessarily follow that every Hindu, who is in the least acquainted with the principles of his religion, must in reality acknowle-dge and worship God in unity. Men, however, are born with different capacities and it is therefore necessary. (as the Brahmans maintain) that religious instruction should be adapted to the powers of comprehe-nsion of each individual; hence a succession of heavens, gradation of deities, and even their sensilbe representation by images, are all considered to be lawful means for existing and promoting piety and devotion. The man who might be capable of comprehending the existence and divine nature of an invisible and immaterial Being might easily understand the *avatars* of Vishnu; and from being made sensible of the superhuman powers manifested in them, might be led to raise his ideas still higher, and to form correct notions of Deity. Placed at the bottom of a flight of steps, no person can at once spring to the top, but must ascend gradually from step to step; and it is in the same manner that the feeble powers of man can only by intermediate helps, attain the knowledge of the real nature of God. But such means being requisite for dispelling the ignorance of created beings and for enlightening them with divine knowledge, affects not the unity of God; and all these apparently diverging paths, which the worship of different deities present lead but to one and the same object." Ibid, page 193.

"But this opinion respecting the nature of a Supreme Being is not confined to the followers of the Vedanta; for every Hindu of best information is more or less acquainted with it." Ibid, page 196.

"The Almighty, Infinite, Eternal, Incomprehensible, Self-existent Being; he who sees every thing, though never seen; he who is not

to be compassed by description, and who is beyond the limits of human conception; he from whom the universal world proceeds; who is the lord of the universe, and whose work is the universe; he who is the light of all lights, whose name is too sacred to be pronounced, and whose power is too infinite to be imagined, is *Brahma,* the one unknown true being, the creator, the preserver destroyer of the Universe. Under such and innumerable other and definitions, is the Deity acknowledged in the Vedas or sacred writings of the Hindus."

"The religion of the Hindu sages as inculcated by the Veda, is the belief in, and worship of, one great and only God—Omnipotent, Omniscient and Omnipresent, of whose attributes he expresses his ideas in the most awful terms. These attributes he conceives are allegorically (and allegorically only) represented by the three personified powers of Creation, Preservation, and Destruction." Mythology of the Hindus, by Charles Coleman.

"It is true indeed, that the Hindus believe in the unity of God. *'One Brahma, without a second,'* is a phrase very commonly used by them when conversing on subjects which relate to the nature of God. They believe also that God is almighty, allwise, omnipresent, omniscient, and they frequently speak of him as embracing in his government the happiness of the good and the subjection or punishment of the bad." The Religion of the Hindus, by W. Ward Vol. II page 5.

"From the passsages quoted alone from the Geeta and those by which they are followed, the belief is pressed upon us that, in the earliest times, Brahminical philosophy held as its grand idea the *absolute unity* of the Supreme God and that their religious ritual corresponded therewith. Idolatry is an aftergrowth, springing from minds incapable of entertaining the elevated abstract notions of the primitive creed. This declension explains itself. The obscuration and weakening of the idea of the several discoveries made of the Supreme Being in his operations and effects. *These impersonations were not so many distinct and independent deities, but representations of one and the same great deity, contemplatd under particular aspects.* This is the true key to the ancient mythology of all countries. The next step in the downward course was to insulate these representations of the particular attributes and operations of God into independent objects of worship; and hence the indefinite multiplication of idols. Idolatry therefore we hold to be a gross accommodation of the pure and sublime religion of India to the capacities of uneducated people.

Hindus themselves hold this opinion, and not without good authority :— 'Corresponding to the nature of different powers or qualities, numerous figures have been invented, for the benefit of those who are not possessed of sufficient understanding.' Mahanirvana quoted by Ram Mohun Roy. 'For the benefit of those who are inclined to worship, figures are invented to serve as representations of God and to them either male or female forms and other circumstances are fictitiously assigned.' Yamadagni cited by Ram Mohun Roy.' 'The three chief divinites are repeatedly admitted to be nothing more than personifications of the power of god in action. With the vulgar the personifications become realities—the types become the things typified. This is the natural progress of all idolatry even where it has been grafted upon the simple truths of Christianity; and there is no difficulty in understanding how it should have taken this course in Hindustan.' Mills British India Vol. I page 383. Wilson's Note. A few references will confirm our hypothesis.

Narud :—What is his likeness ?

Bramha :—He hath no likeness: but to stamp some idea of him upon the minds of men, who can not believe in immaterial being, he is represented under various symbolical forms.

Narud :—What in age shall we concive of him ?

Bramha :—If your imagination can not arise to devotion without an image; suppose with yourself, that his eyes are like the lotus, his complexion like a cloud, his clothing of the lightning of heaven and that he hath four hands.

Narud :—Why should we think of the Almighty in this form ?

Brahma :—His eyes may be compared to the lotus, to show that they are always open, like that flower, which the greatest depth of water can not surmount. His complexion, being like that of a cloud, is an emblem of that darkness with which he veils himself from mortal eyes. His clothing is of lightning to express that awful majesty which surrounds him: and his four hands are symbols of his strength and almighty power." Bedang— Dow's Dissertation, page 48.

Eusebius has assured us that the ancient Brahmans worshipped no image. Many thousands of them who are called Brahmans, according to the doctrine of their ancestors and their laws, do not shed blood, *neither do they worship idols.*

Abul Fazel, who examined the Brahminical theology with the greatest attention, arrived at the same conclusion. "They all believe in the unity of the Godhead, and although they hold images in high véneration, it is only because they represent celestial beings and

prevent the thoughts of those who worship them from wandering." Ayeen Akbery Vol. III. Revd. Garrett's Bhagavatgita, Appendix.

"The transcendent qualities of the Supreme Nature naturally led to the contemplation of the universality of its manifestations. The paragraphs which relate to this subject contain the *Pantheism* of the system; which term is not intended to denote the vulgar doctrine of *identity* of God with the material universe, but that in every portion and phenomenon of it, God is to be *realized;* in other words, that the universe is full of God; that wherever we may go and on whatsoever we may think, there and then God is to be felt and recognized." Ibid.

"There are they, however, who demur admitting all that may be said in relation to the truth and sublimity of Hindooism, because of the practical and popular errors of the people. How can that system have aught in it, that is good or pure, the advocates and professors of which are so corrupt and unprincipled? Does not Hindooism patronize cruelty and oppression? Are not its records stained with the blood of strangled infants and of burning widows? Are not its priests licentious and its temples polluted? True; and none would confess it more mournfully than we. But the errors committed by some of the heathen are no proof that these were committed by all: that it was inevitable that they should be committed by any: neither may we conclude, that they were without the power to accomplish that which by reason of their sinfulness they failed to do. Plato and Cicero recommended idolatry in certain cases. Aristotle disapproved of the forgiveness of injuries. Socrates inculcated inhospitality to foreigners. Several indulgence in its grossest forms was allowed by Xenophon and Solon. Cato committed suicide; and this after having read Plato's treatise on the immortality of the soul! Notwithstanding the encouragement of the vices we have enumerated by these renowned men, their writings enjoin nearly every general duty presented in the New Testament. It has been said that the dying speech of Cyrus is far better fitted to raise the tone of moral feeling in the breast of a young man and to confirm his faith in the reality of moral distinctions than the treatise on Moral Philosophy by Paley, though he was an archdeacon. That many of the most brilliant passages of the English Sermons were borrowed from Plato and Cicero and Seneca, is a well known fact. And who would not shrink from making Christianity responsible for the ignorance and corruption of its professors?" Ibid.

"Remarkable is the precision with which the immortality of the

soul and its *existence when separate* from the body, is expressed in the sacred writings of the Hindoos, and not merely as a *philosophical* proposition but as a *doctrine of religion*. In this respect the Hindoos were far in advance of the philosophers of Greece and Rome who considered the immortality of the soul as *problemetical*." The Theogony of the Hindoos by Count. M. Bjornstjerna, page 27.

"What has been briefly stated here may be sufficient to show that no nation on earth can vie with the Hindoos in respect to the *antiquity* of their *religion* and the antiquity of their civilization." Ibid, page 50.

"These truly sublime ideas cannot fail to convince us that the Vedas recognize *One Only God* who is Almighty, Infinite, Eternal, Self-Existent, the Light and the Lord of the universe." Ibid, page 53.

"The more enlightened, especially the Brahmins, do not share this idolatry, but still support superstition on moral grounds. Human reason, they say, immersed in meditation on the Divine Being, grows weary of a way on which it can not reach goal. To give but a metaphysical deity to men immersed in sensual objects is to make them atheists—is to make them miserable." Ibid, page 61.

"Although stedfast in his faith, the Hindoo is not fanatical; he never seeks to make proselytes. If the Creator of the world, he says, had given the preference to a certain religion, this alone would have prevailed upon the earth, but as there are many religions, this proves the approbation of them by the Most High. Men of an enlightened understanding (says the Brahamin) well know that the Supreme has imparted to each nation the doctrine most suitable for it, and he therefore beholds with satisfaction the various ways in which he is worshipped. They regard God as present in the mosques, with those who kneel before the Cross and in the temple where Brahma is worshipped. And is not this faith more in accordance with the true doctrine of Christ than that which lighted the *Auto-da-fé* for the infallibility of the popes, for the divinity of Mary and for the miracles of the Saints?" Ibid, pp. 67-68.

"God" to use the words of the philosophers of India, "is an Immaterial Being, pure and unmixed, without qualities, form or division; the Lord and Master of all things. He extends over all; without beginning and without end. Power, strength and gladness dwell with Him.

This is but a slight sketch of the lofty terms in which the Hindoo writings, after their philosophers, describe the *Para Brahma* or Supreme Being." Dubois's India, page 322.

"What mainly contributes to the contempt which the Brahmins really feel for the gods whom their interest, education and general custom lead them outwardly to adore, is the clear and distinct knowledge they possess of a God eternal, the author and first cause of all things; of a Being infinite, all powerful, extending through all, immaterial, existing in himself, boundless in understanding, who knows all things, infinitely wise, of a purity which excludes all passion, propensity, division or mixture. This is the idea they entertain and which their books declare of Paramavastu, Parabrahma, Paramátmá; and is the literal signification of the preceding expressions which the Brahmans employ to explain the nature and the attributes of the Supreme Being.

These expressions, extracted from their books and several more which I may likewise produce, signify the perfections of God to which I have alluded." Ibid, page 180.

"But to return to the religious toleration of the Brahmans, we add, that they carry it much beyond the universal adoration of all the deities of their own country. It is a principle established and taught in their books and maintained by themselves in discourse, that in the world, there must be an endless diversity of laws and of worship (expressed by their word *anantaveda* which signifies an infinity of religions) not one of which they can condemn." Ibid page 182.

"La conception fondamentale de l'Indon n'est point exclusive; tout an contraire elle tend à s'universaliser. Elle tend à absorber, à harmoniser an sien d'une idée qu'elle suppose plus élevée, les idées on les dogmes religieux desantres peuples."

"The fundamental conception of the Hindoo is not exclusive; on the contrary, its tendency is to universalize. It tends to absorb, to harmonise in the bosom of one idea, which it supposes more elevated, the ideas or religious dogmas of other nations." Histoire di I' Inde Anglaise by Baron Barchou de Penhöen, Vol. II, chapter VI, page 154.

"Le Brahma exposera sur l'unité, l'éternité de l'être absolue in soi, de Dien, des notions gui penvent le disputer â celles du chrestianesme en sublimité, en purité morales in magnificence dans l'eur expression."

"The Brahmin will descant on the unity, eternity, absolute existence of God;—notions that can dispute with those of Christianity, in sublimity, in moral purity, and in magnificence of expression." Ibid.

"There is every reason to believe, that there existed a period in the Hindoo history, when the dread Brahma was the sole object of

religions adoration. Even at this day, some of the intelligent and elightened Brahmins declare their belief in his existence alone, and worship him as the father and preserver of the universe. They ascribe to him those natural and moral attribute which true religion declares the Deity to possess; and from a consideration of these attributes, and of the relation in which mankind stand towards him, as his rational offspring, they have deduced the most acceptable mode of worshipping him. 'As God' say they 'is immaterial, he is above all conception; as he is invisible, he can have no form; but, from what we behold of his works, we may conclude that he is eternal omnipotent, omniscient, and omnipresent; and that it is only by sanctity of heart and purity of manners that men can expect to gain the approbation or secure the favour of a Being, perfect in holiness.' Such are the elevated sentiments inculcated in the Vedas or sacred books of the Hindoos and, as we have observed, entertained even at this day by some of the Brahmins. Were we to form from them our opinion of the Hindoo religion, we shall dignify it with the appellation of Deism." A Sketch of the State of British India, by the Rev. James Bryce.

"The only sphere where the Indian mind found itself at liberty to act, to create and to worship, was the sphere of religion and philosophy; and nowhere have religious and metaphysical ideas struck roots so deep in the mind of a nation as in India. The Hindoos were a nation of philosophers. Their struggles were the struggles of thought; their past, the problem of creation; their future, the problem of existence." History of Ancient Sanskrit Literature by Max Müller, page 31.

"We must not compare the Aryan and the Semitic races. Where as the Semetic nation relapsed from time to time into polytheism, the Aryans of India seem to have relapsed into monotheism." Ibid, P. 559.

"I add only one more hymn in which the idea of one God is expressed with such power and decision, that it will make us hesitate before we deny to the Aryan nations an instinctive More theism." Ibid, page 568.

"In the same hymn one verse occurs which boldly declared existence of the One Divine Being, though invoked under different names (Rv. I. 164. 46.) 'They call him Indra, Mitra , Varun and Agni; then he is the well-winged heavenly Garutmat; that which One the wise call it many ways; they call it Agni, Yama Magha svan." Ibid, page 567.

"It cannot be denied that the early Indians possessed a knowledge of the true God. All their writings are replete with sentiments and expressions, noble, clear, severely grand, as deeply conceived as in any human language in which men have spoked of their God." Frederick Schlegel's Wisdom of the Ancient Indians.

হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের অভিপ্রায়।

The *Friend of India* describes in glowing terms the sacrifices made by the followers of the Christian religion—and the instances he cites are indeed striking. But we humbly maintain that Hinduism does not yield to the Christian Religion in that respect. The ancient Munis and Rishis used to live in forests leaving all worldly comforts in a state of the greatest self-imposed poverty for the purpose of prayer and meditation. The ceremonies of *Agnipravesha* or self ceremation, *Prayaopaveshana* or fasting one's self to death and *Panchatapa* or accustoming one's self to the extremes of heat and cold by sitting in the midst of blazing fire in summer and exposing himself to the snows in the time of severe winter, performed in ancient times, testify to the sacrificing spirit of Hinduism for the sake of salvation. Those who performed these ceremonies surely acted under an error but it must be admitted that they did them for the sake of obtaining God. Sati is another instance of such sacrificing spirit. *Sannyaseeism* is another. It is no common thing to forsake all worldly possessions as Lalla Baboo, the father of the latee Raja Pertap Chunder Sing of Pikeparah, did and adopt the life of a mendicant. His was not a solitary instance. There are numberless examples of the kind. The Hindoo Religion is in itself a religion of self-imposed privations and a continuous round of hard and irksome duties performed for the sake of obtaining God. The Hindoo Religion can therefore be emphatically called a religion of sacrifice.

The *Friend of India* cites very remarkable instances of active benevolence which occurred in Christendom and which cannot but command our greatest admiration. There is however much of active benevolence in this country also but it is of an unostentatious character.

Unfortunately there are no histories or authentic biographies of individuals who perform great acts of benevolence or else we would have shown our esteemed contemporary that such benevolence is not rare in India. We shall cite only one instance here which occurred within the sphere of our individual testimony and the particulars of which we doubt not the Editor of the *Friend of India* will be able to ascertain by inquiry as the scene of occurrence lies within three miles from his residence. In the village of Connagur there was an orthodox Brahmin lady, the wife of the late Baboo Ram Chunder Chuckerbutty, who used to administer medicines to, and nurse with her own hand, children of the lowest castes, whom according to orthodox ideas it is a pollution to touch. At any hour of the day or night when her services were required by any person in the village or whenever she of herself came to know that such services were required, she used to offer them with the greatest alacrity and willingness of spirit. She used to bathe as often as she touched any children of the lowest caste, not that she had an abhorrence to touch them, but lest she infringed a religious ordination. Hers is not a solitary instance in Hindoo Society. Well may the lines of the Poet apply to members of that society.

Full many a gem of the purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear:
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.

We intend to resume the subject on a future opportunity. *National paper, Oct 9th,* 1872.

We revert to the article of the *Friend of India* on Christianity and Hindooism. We shall try to continue our remarks on it in the same fair and dispassionate spirit with which our contemporary treats of the question. He says: "Is there any representation of the character of God known to men that will bear the slightest comparison with that of the Bible? Is there any other Sacred Book that makes perfect holiness to be the first characteristic of the Supreme and that demands from man truth in the inward parts?" We firmly maintain, that the Hindoo Shasters are replete with sayings that represent God as perfectly pure and inculcate to man the paramount importance of internal purity. The *Ishopanishad* says:—

God is pure and impervious to voice.

The *Swetaswatara Upanishad* says ;—

God is the fountain spring of all righteousness.

The *Vishnu Purana* says ;—

He is one, all pervading and pure.

The *Brahmanda Purana* says ;—

That God is all free, all tranquil, holy, and extremely pure.

The *Kularnava Tantra* says ;—

He is without form, beyond comprehension, and pure.

The *Ashtavakra Sanhita* says ;—

He is pure, all intelligent, the dearest of all, perfect, devoid of material qualities and without disease.

About moral purity in man, the *Mundak Upanishad* says ;—

The man of pure heart sees in mood meditative God who is without form.

The *Brihadarankya Upanishad* says ;—

The righteous man avoideth sorrow and avoideth sin. The same *Upanishad* also says ;—

Sin cannot across him, he crosseth over sin ; sin cannot afflict him, he on the contrary afflicteth sin. Becoming sinless, pure and without doubt, he becomes a Brahmin i. e. a knower of God.

The *Kasi Khanda* says ;—

The best of all places of pilgrimage is purity of heart.

The *Mahabharat* says :—

That truth, which has the least show of policy in it, is not truth.

The same book says ;—

Truth is the constant religion of the virtuous. Truth is the religion eternal. Truth is always to be bowed to. Truth is the highest end. Truth is piety. Truth is mortification of flesh. Truth is divine communion. Truth is the Eternal God. Truth is the highest sacrificial observance. All is established in truth. It takes the name of nobleness when a man does zealously good works to all without any show and in a dispassionate spirit. There is no religion higher than truth. There is no vice greater than untruth. Truth is the *Veda* of religion. Therefore truth should not be extinguished. A single truth being weighed against thousand *Ashwamedhas*, that one truth over-balances them all.

The same book also says ;—

They, who do not commit sin in mind, word, deed and understanding, are the persons who really perform austerities and not those who dry up their bodies.

That book further says;—

Do thou be upright in spirit. The resolve to regulate the body is human. The resolve to be pure in mind is divine.

The *Friend of India* says that the Hindoo Religion has not been able to produce men remarkable for self-sacrifice and disinterested benevolence. We gave in our last issue an instance of such benevolence by a Brahmin lady for whom our contemporary very nobly expresses his admiration. We shall in this article not cite individual instances but show how the whole structure of Hindoo society is based upon a system of most disinterested benevolence causing sacrifice of personal comfort and indulgence for the good of others. The Hindoo Shastras enjoin that the "good householder should support his friends and relations—this is religion eternal." Following out such precepts, the Hindoo maintains his remotest relations, himself suffering the greatest privations. This has obviated the necessity of enacting poor-laws and erecting workhouses for the poor. It is for this reason that instances of starvation are not heard of in ordinary times in India as in European countries. While on this subject, we cannot help mentioning here an anecdote of Sir Charles Napier while Commander-in-Chief of India. On hearing that a private in the Regiments used to remit some money to his poor old mother at home out of his small pay, he issued a public notice recommending such conduct to other soldiers for imitation. The Hindoo requires no such reminder.

The *Tol* system of education, which is fast dying out for want of encouragement to Sanscrit learning, speaks volumes of the selfsacrificing spirit of Brahmins. What hardship and personal discomfort do they not undergo for the sake of feeding, clothing and educating their students without taking any fees from them or any other return for their labors! Under the burning rays of a tropical sun or through pitiless rain, on they go with a bundle on the back and a humble talipot in hand to the distant parts of the country to collect contributions for the support of the *Tol.*

It is a misfortune to this country that such spirit of self-sacrifice is disappearing in contact with ideas which lay much stress upon

the acquisition of money and individual comfort and ease as the principal end of life.

The *Friend of India* has evidently misunderstood Baboo Rajnarain Bose in thinking that the latter meant to say that Hindooism is not derived from any man but directly from God. What he meant to say was that Hindooism has not been named after any Prophet or Avatar. The founders of the Hindoo Religion were of opinion that Religion is eternal. Hence the other name of Hindooism is *Sanatana Dharma* or eternal religion.

The *Friend of India* says that Ram we cannot approach, but Paul we can. Does not Ram's exemplary character exercise a grand salutary influence upon the moral character of Hindoos? His filial obedience, his patience under suffering, his conjugal and fraternal love, his spirit of self-sacrifice and forgiveness, his magnanimity towards his inveterate enemies, his paternal treatment of his subjects and his extreme purity of character are looked up to by every Hindoo as model for imitation. The villager, hearing the affecting recital by our popular *Kathacks* of his magnanimous deeds, takes home the impression left upon his mind and is guided in his dealings with his fellow men by that impression. Hence it is that the lower orders of India are more sober, more temperate, more gentle, and more generous-hearted than those of Europe. Our women learn lessons of sublime chastity and pious regard for thier husbands from the example of the stainless and the peerless Sita.

The *Friend of India* is eloquent upon the acts of Paul. Well may he be so, as he knows of no instances greater than Paul. We would recommend him to read the stories of Prahlad and Dhruva in the Puranas.

The *Friend of India* asks—"What? Catholicity in a faith which splits human beings into grades the bounds of which cannot be passed?" The caste of religious intolerance is certainly worse than the system of caste as it prevails in India. The Hindoo does not believe that any one who does not follow Hindooism will be cast into eternal hell. His idea of caste is founded upon notions of superiority in piety and learning while the system of caste that prevails in Europe is founded upon ideas of superiority in wealth and power.

The *Friend of India* is mistaken in ssupposing that the bounds of caste cannot be overstepped by a Hindoo. The higher phase of

Hindooism or *Gyankanda* rises above prejudices of caste. Brahmacharies and Paramhangsas do not observe its rules.

In making the above observations let us not be understood that we are blind to the merits which Christianity possesses. But truth impels us to say that Hindooism is superior to Christianity in spirituality and depth. *National Paper, October 23rd,* 1872.

To the Editor of the Friend of India.

DEAR SIR,—Your last issue contains the reply of some "Missionaries of the Brahmo Somaj of India" to our letter on the relation of Brahmoism to Hindooism. If your correspondents had rightly considered the meaning of the term "Brahmoism", they would not have fallen into the sad confusion of ideas which their reply betrays. Brahmoism is Hindoo Theism. The very word "Brahmo," which signifies the spiritual worshipper of Brahma, the term by which the Hindoo Shastras designate the One True God, indicates its Hindoo origin. The basis of Brahmoism is the Hindoo Shastras. But, although the Somaj has always maintained this opinion, it has never disacknowledged nor does it do so now the authority of reason. Rajah Rammohun Roy wrote in his preface to the *Ishopanishad: "I hope that, forsaking superstitious idolatry, they (his countrymen) will embrace the rational worship of the God of Nature as enjoined by the Vedas and confirmed by the dictates of common sense." In No. 26 of the Tattwabodhini Patrika,* our friends will find an English article in which it is said: "The knowledge derived from the source of inspiration (the Vedas) deals with eternal truths which require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperverted by fallacious reasoning afford in abundance." No. 40 of the same journal contains a letter of Baboo Debender Nath Tagore published in the *Englishman* 25 years ago, in which he said, that his religion is that religion which inculcates, "that 'among the knowers of God he is pre-eminent whose amusement is God, whose enjoyment is God, and who practises active virtue' (Mundak Upanishad); that religion which enjoins us 'to immerse ourselves in God, yet not forsake actions liberal' (Swetaswatara Upanishad). In short, that religion whose principles are echoed to by that of Nature, Human Reason, and Human Heart, and by the sense of the wisest of all ages of all countries." In about 1850, Mr. Mullens, a Missionary of the Church of Scotland,

having addressed a letter to the Brahmo Somaj enquiring about its doctrines, the Somaj gave a reply containing the following passage: "The doctrines of the Brahmos or spiritual worshippers of God, whom I presume you mean by 'Modern Vedantists,' are founded upon a broader and more unexceptionable basis than the scriptures of a single religious denomination in the earth. The volume of Nature is open to all, and that volume contains a Revelation, clearly teaching, in strong and legible characters, the great truths of religion and morality; and giving us as much knowledge of our state after death, as is necessary for the attainment of future blessedness yet adapted to the present state of our mental faculties. Now, as the Hindoo Religion contains notions of God and of human duty which coincide with that Revelation, we have availed ourselves of extracts from works which are the great depositories of the national faith, and which have the advantage of national associations on their side, for disseminating the principles of pure religion among our countrymen." Baboo Raj Narain Bose, in his recent lecture on the Superiority of Hindooism, said that Brahmoism is the *Viswajanina* or Catholic Religion as well as the highest developed form of Hindooism.

From the above extracts it will be clear that, though recognising the Hindoo Shastras as the basis of Brahmoism, we have never undervalued Nature and Reason. Hence it is not strange that passages of the nature, quoted from the *Tattwabodhini Patrika* by our friends, would have appeared in the columns of that journal. Though maintaining that Brahmoism is Hindooism we bow to Truth wherever found, the Shastras themselves declaring the sovereignty of Reason. They say: "Any thing reasonable is acceptable though uttered by a child; any thing unreasonable should be rejected as grass though uttered by the god Brahmà (the revealer of the Vedas to man)." Judging by the standard of Reason, if we maintain that Hindooism is superior to other religions and contains every thing to satisfy our spiritual wants, we do not certainly say anything which is inconsistent with the principles of Theism.

We are sorry that our friends have given the public only one side of our views on Brahmoism as expressed in the *Tattwabodhini Patrika,* Studiously keeping back from its sight the other which is its Hindoo character. The avowed object of the Tattwabodhini Sabha whose organ was the *Tattwabodhini Patrika* was, as appears from a report published in that journal, "to sustain the labours of the late Rajah Rammohun Roy by introducing among the natives of this country that monotheistical system of divine worship which is to be found inculcated in their

original sacred writings in contradistinction to the multifarious perversions which they have undergone in course of time." In sucessive numbers of the *Patrika* down to the time referred to by our friends, this view has been invariably maintained. Baboo Rajnarain Bose, in a lecture entitled "A Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj" delivered by him at Midnapore in the year 1863 and published in the *Patrika*, said that "it would be a suicidal step to destory the Hindoo aspect of the Somaj." In a discourse delivered by Baboo Debender Nath Tagore at the Bhowanipore Brahmo Vidyalaya or Brahmo School eight years ago and also published in the *Patrika*, he said ;—

"That religion which has all along prevailed in India has been now developed into Brahmoism. We can obtain the best knowledge of politics, arts, commerce, and military science from other nations but we need not at all take their help in learning religion."

The character of the Adi Brahmo Somaj has been so essentially Hindoo that even Baboo Keshub Chunder Sen, who has so materially diverged from its plan of reformatory action, could not shake off its influence after the said Somaj had cut off its connection with him. The truth of this statement will appear from the following extracts from his writings and speeches.

"Brahmoism is the legitimate result of the higher teachings of the Vedas." (Lahore Lecture).

"It is extremely desirable to have a national church based upon the religious tastes, religious instincts, and, if possible, the religious traditions of a nation. Any attempt in this direction is welcome. It centralises truth, makes it successful and accessible to all, and adds to it the many-sidedness of human nature. Religion is either adulterated by foreign elements or dissipated and washed out in abstraction if it is not dammed up by the peculiar boundaries of national thought and predilection."—*Indian Mirror.*

"The Hindoo Shastra is infinite and illimitable. We can get every thing in it. We need go to other countries for dress, for civilization, but we need not necessarily do so for truth. If we can get the nectar of truth by churning the ocean of Hindoo Shastra, then not only we ourselves will drink that nectar but bless our own sons and grandsons as well as all other families in the country with draughts of the same. The Hindoo Shastra is like an ocean. There is nothing wanting in it." (Lecture on Bhakti delivered at Santipore.)

The intelligent reader will at once perceive that the last passage is a reflex of the one already quoted from Baboo Debender Nauth

Tagore's discourse delivered at the Bhowanipore Brahmo Vidyalaya.

Our friends say: "Before the last decade the Calcutta (?) Brahmo Somaj believed with us in the superiority of Brahmoism over all other systems of faith and the consequest insufficiency of Hindooism to lead men unto salvation. To day our brethren of the other Samaj declare that not only is Hindooism superior to all other creeds but it is Brahmoism by itself." We say that Brahmoism is Hindooism on the ground that Brahmoism is the highest developed form of that religion. Baboo Rajnarain Bose in his lecture illustrated this idea by a striking simile. If we again see Ramchundra whom we once saw when he was five years old, after a lapse of 30 years, is he not the same Ramchandra still? So though Brahmoism is not in its entirety the religion of the Rig Veda, it has as much right to be called Hindooism as the religion of the Rig Veda. Hindooism in its successive development has given rise to a religion which is Theism.

Yours truly,
JYOTIRINDRA NATH TAGORE.
Secretary to the Adi-Brahmo Somaj,
Friend of India, October 31st, 1872.

To the Editor of the Friend of India.

DEAR SIR.—With reference to the reply of some missionaries of the other Somaj to our last letter, let us examine firstly, in what points they have agreed with us and in what they have not and, secondly, whether the points on which they seem not to agree with us correspond with those on which they have agreed.

First, we are glad to find that our friends have admitted that the Hindoo religion contains "sublime precepts" and that its spiritual aspirations are of "stupendous magnitude;" secondly, "that the whole problem of Indian reformation must be solved by materials drawn from India," and, thirdly, that historically Brahmoism is Hindooism. But our friends say;—"Withal it is one thing to be a strict Indian in one's entire conduct, thought and worship, and quite another to be called a Hindoo; it is one thing to feel a patriot's pulse, quite another to be confined within the inconvenient waistcoat of an effete religion; it is one thing to be national and Hindoo in sentiment, quite another to be eclectic and catholic with a world-embracing creed of love for one's consolation and guidance."

Now we ask our friends— what is the standard of *strict Indianism*? The term Indian includes Santals, Bheels, Gonds, Native Christians

Eurasians, and Mahommedans as well as Hindoos. But each of these classes of inhabitants of India has its peculiar standard of conduct, thought and worship. Is there a common standard of Indianism or does it exist in mere fancy? We fear the latter is the case. But Hindoo nationality is a Reality.

Our friends further argue that "it is one thing to feel a patriot's pulse, quite another to be confined within the inconvenient waistcoat of an effete religion." The two things are not quite so distinct from each other as our friends imagine. We sincerely believe that a Hindoo, who actually feels a patriot's pulse, cannot say that Hindooism confines him within a narrow compass. Hindooism is not at all an inconvenient thing. Its adaptability to the spiritual wants of Humanity in its different stages of progress is indeed marvellous. From the rudest Fetischism to the sublime adoration of the One Invisible Being pervading the whole universe, all systems of worship find place in it. Hindooism is not an inconvenient waist-coat. The power it possesses of affording spiritual protection to all who avail themselves of it is evidenced by the fact of the varied forms of worship that have prevailed in India from the Vedic age down to the present day, holding the common name of Hindooism.

Our friends moreover say that "it is one thing to be national and Hindoo is sentiment, quite another to be eclectic and catholic with a world-embracing creed of love for one's consolation and guidance." If, according to their theory, a man being an Indian can love other nations, why can he not do so, being a Hindoo? Do we not actually see Hindoos love men of other nations? Do we not actually see Hindoos maintain that the Hindoo Shastras contain every thing to satisfy their spiritual wants yet are delighted with, and respect, truth wherever found?

Our friends are of opinion that we cannot be really catholic unless we take truths from all Scriptures existing on the surface of the globe. Truth is as catholic when taken from the Vedas as from all the scriptures on the earth. Truth is valuable on account of its *intrinsic* catholicity and not for the fact of its being collected from this place or that place.

Our friends admit Brahmoism is Hindooism but with the reservation that it is historically so. Brahmoism is Hindooism not only historically but esssentially also. when we have got a Somaj service containing prayers taken from the Hindoo Shastras, when we have got a *Brahmo Dharma Grantha* which contains texts from the Hindoo Shastras, when we have got a ritual containing Hindoo forms of ceremonies, and

above all, when the highest doctrines of Brahmo Dharma such as those of *Yoga* or divine communion and seeing God in the soul are essentially Hindoo,—in short when Brahmoism is Hindoo both in spirit and form, it would not be truth to say that Brahmoism is not Hindooism. In saying that Brahmoism is Hindooism, its catholicity is by no means injured. The members of the Adi-Brahmo Somaj freely admit that other religions than Hindooism have capabilities of being ultimately developed into Theism and they hope and trust that they will do so.

Your correspondents charge the Adi Brahmo Somaj with vacillation in its opinions and views. The charge is unfounded. The Adi Brahmo Somaj from the time that Ram Mohun Roy held his first prayer meeting down to the time that the Brahmo Dharma Grantha was compiled which was about twenty five years ago, and from that time again down to the period when the Brahmic ritual was prepared, has throughout maintained its Hindoo character. Within the period of forty-two years the Somaj has existed, it has passed through different stages of development. During the first period of its existence it held that the Vedas were infallible works. In the second period, the Vedas and other Shastras were considered to be entitled to veneration because they agreed with a higher authority, that is that of Nature and Reason. In the third, the members carried into effect practical reforms in ritual observanecs. But throughout its career the Adi Brahmo Somaj has maintained its character as a Hindoo movement supported by Hindoos alone and enlisting the sympathy of the educated Hindoo Community.

Yours truly,
JYOTIRINDRA NATH TAGORE,
Secretary, Adi Brahmo Somaj,
Friednd of India, 14th November, 1872.

উল্লিখিত পত্রে "প্রকৃত অসম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে" এই বিষয়ে আমার অভিপ্রায় সম্পাদক মহাশয় দ্বারা সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

সম্পাদকীয় টীকা

আত্মচরিত।। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত প্রথমে প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩১৫ সনে। আখ্যাপত্র : রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত / তৎকর্ত্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত / কলিকাতা / ১৩১৫ / মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১।০, কাগজের মলাট ১ প্ ১৵০ + ২২০

এর পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩১৯, ১৩৫৯, ১৩৬৮ বা ইং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। ১৩১৯ সংস্করণে অরবিন্দ ঘোষ-রচিত কবিতাটি প্রথম সংযুক্ত হয়। ১৩৫৯-এর তৃতীয় সংস্করণটি ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি থেকে প্রকাশ-কালে এর গ্রন্থকার পরিচিতিটি লিখে দেন হরিহর শেঠ।

'আত্মচরিত' রাজনারায়ণ মুখে মুখে বলে যান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এটি শ্রুতিলিখন করেন। ১৮৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দে এর রচনা সমাপ্ত হলেও প্রকাশিত হতে দেরি হয়। এর পরেও তিনি দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

আত্মচরিত-এ তাঁর কালের বহু ব্যক্তি এবং ঘটনার উল্লেখ আছে। কোথাও কোথাও সাল তারিখের উল্লেখের ইচ্ছা থাকলেও (পরে তা করবেন বলে ফাঁকও রেখেছিলেন) শেষ অবধি তা সরবরাহ করতে পারেন নি। আমরা এখানে সেই সব ব্যক্তি, ঘটনা এবং তারিখ সম্পর্কে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করে দিলাম।

বোড়াল গ্রাম : চব্বিশ পরগনা জেলার এই বর্ধিষ্ণু গ্রামটি কলকাতা থেকে ২০ কি.মি.-এর মধ্যে গড়িয়ার সন্নিকটে। প্রাচীন এই গ্রামটিতে একাদশ-দ্বাদশ শতকের মূর্তি পাওয়া গেছে। গ্রাম্য দেব-দেবীর মধ্যে প্রধান ত্রিপুরাসুন্দরী। সত্যজিৎ রায় এই গ্রামেই 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের আউটডোরের সুটিংটি করেন।

রামমোহন রায়ের স্কুল : নাম ছিল অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল। এখানে নীতিধর্মের সঙ্গে স্বাজাত্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হতো। বরাবর অবৈতনিক এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য একটি সভা স্থাপন করে (১৮৩২)।

স্কুল সোসাইটিজ স্কুল : স্কুল-বুক সোসাইটির (১৮১৭) উদ্যোগে ১ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ তারিখে স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পটল ডাঙায় এঁরা ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বস্তুত এটি হিন্দুকলেজের 'প্রিপেরেটরি স্কুল' ছিল।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৯ ২২.২.১৮৭০): জন্ম ২৪ পরগনার মণিরামপুরে। চিকিৎসাবিদ্যায় অসাধারণ খ্যাতির জন্য তৎকালীন খ্যাতনামা চিকিৎসক ডা. জ্যাকসন তাঁকে 'নেটিভ জ্যাক্সন' বলে ডাকতেন। বিদ্যাসাগরের ইংরেজির শিক্ষক দুর্গাচরণ ছাত্রটিকে বিধবাবিবাহাদি কাজে সমর্থন করতেন। ইনি দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা।

রবিনসন ক্রুশো : ডানিয়েল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১) রচিত বিখ্যাত অভিযান কাহিনী।

হিন্দুকলেজ : এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থে সংকলিত 'হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি। ২১ মে ১৮১৫ তারিখের একটি সভাতে প্রস্তাবিত স্কুলের নাম হয় হিন্দু কলেজ। ২০ জানুয়ারি ১৮১৭ তারিখে ৩০৪ নং চিৎপুরে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে ২০ জন ছাত্র নিয়ে এর কাজ শুরু হয়।

কাপ্তেন রিচার্ডসন : ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে এদেশে আসেন এবং পরে লর্ড বেন্টিঙ্কের পার্শ্বচর হন। নানা পত্রিকার সম্পাদক রিচার্ডসন পরে হিন্দুকলেজ, হুগলি কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন। কিছুদিন Suspended থাকার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে পুনরায় আসেন। তাঁর শেক্সপীয়র পাঠ সেযুগের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বদেশে ১৭ ১১ ১৮৬৫ মৃত্যু।

মেকলের রচনাবলী : টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) — লণ্ডনে জাত এই ব্যবহারজীবী ও রাজনীতিবিদ্ ভারতে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন (১৮৩৪-৩৮)। দেশে ফিরে যাওয়ার পর এই দার্শনিক লেখকের বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তাঁর 'ক্রিটিক্যাল অ্যাণ্ড হিস্‌টোরিক্যাল এসেজ' তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-৯.৩. ১৮৫৮): নদীয়ার এই বিখ্যাত মানুষটি সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন। বন্ধুবর্গ তাঁকে তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত করেন। ছাত্রাবস্থাতেই 'রসতরঙ্গিনী' ও 'বাসবদত্তা' কাব্য রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম, কৃষ্ণনগর কলেজ ও সবশেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মদনমোহন শেষ অবধি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক হিসেবে তিনি বেথুন [হিন্দু ফিমেল] বিদ্যালয়ে দুই কন্যাকে প্রথম প্রেরণ করেন। স্বসম্পাদিত 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার (১৮৫০) দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ লেখেন।

ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। লে অফ্ দি লাস্ট মিন্সট্রেল, মারমিওন প্রভৃতি কাব্য; ওয়েভার্লি, দি ব্রাইড অফ্ ল্যামারমুর্ প্রভৃতি গদ্য উপন্যাসের রচয়িতা ও বহু মননশীল সন্দর্ভের লেখক।

তত্ত্ববোধিনী সভা : কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীন এই সভাটি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ২১ আশ্বিন ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় রাজনারায়ণ ৬০ টাকা মাসিক বেতনে কর্মে নিযুক্ত হন। এই সভার অধীনস্থ 'গ্রন্থসভা'রও তিনি সভ্য ছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে লিখেছেন—'রাজনারায়ণবাবু এই সময় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কাছে যোগ দেওয়ায়, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ একজন মস্ত সহায় পাইলেন।'

রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) প্রথমে টাঁকশাল ও পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান রামকমল সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি, মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য নানা সভার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য ছিলেন। তিনিই দেশীয় লোক যিনি প্রথম ইংরেজি-বাংলা অভিধান প্রণয়ন করেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর পৌত্র ছিলেন।

মিসেস্ শেলী (১৭৯৭-১৮৫১): বিখ্যাত কবি পার্সি বিশি শেলির স্ত্রী মেরি উলস্টোনক্র্যাফ্‌ট শেলীর দুটি রচনা বিখ্যাত—ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন অর্ দি মডার্ণ প্রমিথিউস (১৮১৭) এবং দি লাস্ট ম্যান (১৮২৬)।

মহাতাব চাঁদ, মহারাজ (১৮২০-১৮৭৯)। বর্ধমানধিপতি তেজচাঁদের দত্তকপুত্র মহাতাবচাঁদ বর্ধমানে একটি স্বল্পস্থায়ী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং বাংলার জমিদারদের মধ্যে সম্মানসূচক 'তোপ' পাবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১.৮.১৮৪৬) : আইন ব্যবসায়ী ও পরে চব্বিশ পরগনার নিমক মহলের কালেক্টর। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর। রেশম, নীল, কয়লা, চিনি ও জাহাজের ব্যবসায় ধনী হন ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। রামমোহনের বন্ধু দ্বারকানাথ ১৮৪২ ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিলাত যান ও রাজকীয় আমন্ত্রণ পান। জমকপূর্ণ জীবনের জন্য 'প্রিন্স' নামে আখ্যাত হন। লণ্ডনে মৃত্যু হয়। কার টেগোর এণ্ড কোং তাঁর যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮): হিন্দুকলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ছাত্র, পরে আইন ব্যবসায়ী। বিখ্যাত ধনী। বিদ্যোৎসাহী। রিফর্মার পত্রিকার প্রকাশক। নাট্যানুরাগী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর তিন লক্ষ টাকা দানে 'টেগোর ল অধ্যাপক' পদ প্রবর্তিত হয়।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১৮০৬-১৮৬৭): সংস্কৃত কলেজে ছাত্র ও পরে সেখানকার অলঙ্কার শাস্ত্রে

অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র অবসর গ্রহণের পর কাশীবাসী হন। জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপকে খোদিত তাম্রশাসন ও প্রস্তর ফলকের পাঠোদ্ধারে সাহায্য করেন। তিনি ১১টি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬): সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। স্বগ্রাম চাংড়িপোতা (বর্তমানে সুভাষগ্রাম) থেকে বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা পূর্বক প্রকাশ করতেন প্রতি সোমবার।

বেদান্তিক ডক্‌ট্রিন্স ভিন্ডিকেটেড্‌: বিখ্যাত খ্রিস্টান মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ লন্ডন থেকে ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান মিশন্‌স্‌ (১৮৩৯) নামে পুস্তক প্রচার করে ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্‌গার করেন তার প্রতিবাদে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলি পরে সংকলিত হয়ে Vedantic Doctines Vindicated নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কেউ বলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এগুলির রচয়িতা, আবার অনেক এগুলি রাজনারায়ণ বসুর লেখা মনে করেন। গ্রন্থে কোনও নাম ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ প্রেরিত চার যুবক: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চারজন যুবককে কাশীতে বেদপাঠের জন্য বৃত্তি দিয়ে পাঠান তাঁদের নাম আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য (তত্ত্বরত্ন), বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার এবং রমানাথ ভট্টাচার্য।

ধর্মতত্ত্বদীপিকা ও ব্রাহ্মধর্ম সাধনা: ধর্মতত্ত্ব দীপিকা গ্রন্থটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর দুটি ভাগ। বইটিতে ঈশ্বর, উপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত মোট ২৩টি প্রবন্ধ আছে। ভাগ দুটির নাম যথাক্রমে ধর্মতত্ত্ববিবেক এবং ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যান।

A DEFENCE OF BRAHMOISM AND THE BRAHMO SAMAJ নামক বক্তৃতাটি মেদিনীপুর সমাজগৃহ ২১ জুন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত হয় ও তখনই মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২।

শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০): হুগলি জেলার কোন্নগরের এই সুসন্তান ডিরোজিওর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের এই নেতা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজও স্থাপন করেন তিনি সম্ভবত ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। দ্রষ্টব্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কার্তিক ১৭৮৪ শক, পৃ. ১২৩।

'মেদিনী' পত্রিকা। সাপ্তাহিক এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১২৮৬। রাজনারায়ণ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ব্রাহ্মদিগের নরপূজা আন্দোলন: কেশবচন্দ্র সেনের ভক্তগণ তাঁকে অবতার মনে করে যে পূজা শুরু করেন তার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের একাংশের প্রতিবাদ। বিহারের মুঙ্গেরে প্রথম এর সূত্রপাত হয়।

বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন: এই প্রস্তাবে মহাহিন্দু সমিতি নামে একটি মহাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। এর ইংরেজি রূপান্তর Old Hindu's Hope.

ব্রাহ্মিক এ্যাড্‌ভাইস, কশান এ্যান্ড হেল্‌প: এই দশ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। এতে চারটি প্রবন্ধ ছিল— Sorrow for sin and desire for salvation; Inspiration and Man's Alleged Divinity; Respect towards religious teachers; True Charactor of Brahmo Dharma.

ব্রাহ্মিক কোয়েশ্চন্‌স্‌ অফ্‌ দি ডে: এলাহাবাদে প্রদত্ত এই বক্তৃতার পুরো নাম 'Brahmic Question of the Day Answered. এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে।

রাজনারায়ণ আত্মচরিতে নিম্নলিখিত বক্তৃতা ও রচনাগুলির তারিখ সরবরাহ করেন নি সেগুলি পাঠকের জন্য এখানে উল্লিখিত হলো:

(১) ব্রাহ্মধর্ম কি এই প্রশ্নের জবাব (Brahmic Question of the Day-Answered): ১৮৬৯।

(২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা। বক্তৃতার তারিখ — ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭২।

(৩) সেকাল একাল। বক্তৃতার তারিখ—মার্চ ১৮৭৩।

(৪) ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব। বক্তৃতার তারিখ— চৈত্র ১৭৯৬ শকে মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+১০+৪২।

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। বক্তৃতার তারিখ—'জাতীয় সভায়' এই নামে পরপর কয়েকটি বক্তৃতা রাজনারায়ণ দেন। সেগুলির সঠিক তারিখ জানা যায় নি। এগুলি সংকলিত হয় ১৯৩৫ সংবতে।

(৬) 'আদি ব্রাহ্মসমাজ, ইহার মত ও নীতি'। প্রকাশের বৎসর — ১৮৭০। এটি আসলে একটি ইংরেজি পুস্তিকা 'The Adi Brahmo Samaj, Its views and Principles'।

(৭) 'Theistic Toleration and Diffusion of Theism'। প্রকাশের বৎসর—১৮৭২।

(৮) Adi Brahmo Samaj as a Church: প্রকাশের বৎসর—১৮৭৩।

(৯) 'A Science of Religion'। প্রকাশের বৎসর — ১৮৭৮।

(এটি Calcutta Review পত্রিকার No. V. Vol. III তে প্রথমে প্রকাশিত)।

'ব্রাহ্মবাদ কি' পুস্তিকা: পুস্তিকাটির মূল নাম—A Lecture in Reply to the Query "What is Brahmoism" প্রকাশকাল ১৮৭১।

চার্লস ভয়সী (১৮২৮-১৯১২) লন্ডনজাত এই ধর্মোপদেষ্টা ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে খ্রিস্টীয় ইউনিটেরিয়ান থিস্টিক চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'The Mystry of Pain, Death and Sin' এবং 'On Theism' গ্রন্থ রচনা করেন। ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার জন্য ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কারারুদ্ধ হন।

মিস্ ফ্রান্সিস কব ও মিস এলিজাবেথ শার্প: প্রথম জন আইরিশ মহিলা কবি (১৮২২-১৯০৪) ও ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত উদার মানুষ। কিছুকাল নাস্তিক থাকলেও পরে দ্বৈতবাদের সমর্থক হন। সমাজ সেবিকা কব বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি বহু রচনা লিখেছেন। আত্মজীবনীটি লেখেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি লেখিকা। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। তিনিই মিস্ শার্পের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের আলাপ করিয়ে দেন লন্ডনে। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতার বিখ্যাত পংক্তিটি ছিল: 'To me salvation comes from the Eastern shore'.

মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেট: ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষিণী ইউনিটেরিয়ান ইংরেজ মহিলা; রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজি জীবনী 'Life and Letters of Raja Rammmohan Roy' এবং 'Brahmo Year Book নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ দুটির রচয়িতা।

লালবিহারী দে, রেভারেন্ড (১৮২৪-১৮৯৪): বৈষ্ণব বংশে জন্ম হলেও ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইংরেজি ভাষায় গভীর ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের নানা পদে যুক্ত থেকে অবশেষে হুগলি কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নানা উদ্যোগ নেন। তাঁর দুটি ইংরেজি বিখ্যাত গ্রন্থ—ফোক্ টেলস্ অফ বেঙ্গল এবং গোবিন্দ সামন্ত। সম্পাদিত পত্রিকা—অরুণোদয় এবং বেঙ্গল ম্যাগাজিন।

কোচবিহার বিবাহ: ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি

দেবীর সঙ্গে কোচবিহাররাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের বিবাহ। এই বিবাহ ৬ মার্চ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়।

জন বীমস্: ইনি একজন সিভিলিয়ান কর্মচারী ছিলেন এবং ফ্রান্সের 'ফ্রেঞ্চ একাডেমি'র আদর্শে বাংলা ভাষা নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। রাজনারায়ণ তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এটি শুনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুরূপ মন্তব্য করেন। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (২ ভাদ্র ১২৭৯) এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতাটিই প্রকৃতপক্ষে 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'র সূচক।

অন্নদাচরণ খাস্তগীর (১৮৩০-৯০): খ্যাতনামা চিকিৎসক ও প্রবন্ধকার অন্নদাচরণ মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেন ও বহুদেশ ভ্রমণ করেন। মেডিকেল কলেজে এক সময়ে শিক্ষকতা ও পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করেন। নারী শিক্ষার সমর্থক এই চিকিৎসক বাংলায় চিকিৎসা ও শরীর সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি বই লেখেন। তাঁর কন্যা কুমুদিনী চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা স্নাতক।

মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪): মেডিকেল কলেজের আই. এম. এস. এবং এম. ডি. মহেন্দ্রলাল অ্যালোপ্যাথি ও পরে তা ছেড়ে হোমিওপ্যাথি—উভয় চিকিৎসায় খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। 'ডক্টর অফ্ ল' উপাধিতে ভূষিত সমাজহিতৈষী।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১৮৩৬-১৯০৬): প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র সংস্কৃতে আদ্য, মধ্য, উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় নির্মিত হয় হাওড়া-আমতা রেলপথ। সি. আই. ই এবং মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত সমাজসেবী।

চার্লস ভয়সী (১৮২৮-১৯১২): লন্ডনে জাত ধর্মোপদেষ্টা। তিনি প্রচার করেন—মানবাত্মার শাস্তি চিরন্তন নয়। প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের বহু অংশের অসারতা প্রদর্শনের জন্য সমালোচিত। লন্ডনে থিস্টিক চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাজক পদে উন্নীত হন। দুটি গ্রন্থ লেখেন—দি মিস্ট্রি অফ্ পেইন, ডেথ অ্যান্ড সিন এবং অন্ থিজম। ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার জন্য ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কারারুদ্ধ হন। বেশ কয়েকটি 'Sermon'-এর (Langham Hall Pulpit) তিনি রচয়িতা।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি॥ রাজনারায়ণ বসু দিনলিপি লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে তিনি এক সময়ে তা ইংরেজিতে লিখতেন। দেওঘরে রাজনারায়ণ যখন ছিলেন—তখনই একসময় তিনি বাংলাতে ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। বস্তুত তাঁর শেষ জীবন দেওঘরেই কাটে এবং এখানেই ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজনারায়ণ লিখিত দিনলিপির মুখ্য অংশ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রন্থাকারে কখনও হয় নি। অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য প্রথম এর কিছু অংশ বহু আয়াসে সংকলন করে আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় ১৩৯১ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। সেখান থেকেই ঋণস্বীকার করে আমরা এই প্রথম এই দিনলিপিটি গ্রন্থভুক্ত করার অবকাশ পেয়েছি।

'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিতে পত্রস্থ হয়েছিল। কার্তিক ১৮০২ শক; শ্রাবণ ১৮০৫ শক; অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র ১৮০৫ শক; পৌষ, মাঘ ১৮০৬ শক; জ্যৈষ্ঠ ১৮০৮ শক; আষাঢ় ১৮০৯ শক।

॥ টীকাটিপ্পনী ॥

চার্লস ভয়সী: 'আত্মচরিত' প্রসঙ্গের শেষ টীকা দ্রষ্টব্য।

কেদারনাথ দত্ত (১৮৩৮-১৯১৪): ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে ধর্মচর্চায় নিযুক্ত কেদারনাথ ইংরেজি, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিন্দি, ওড়িয়া, উর্দু, ফার্সি—বহুভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজের জন্য 'ভক্তিবিনোদ' উপাধি-ভূষিত কেদারনাথ 'শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা' ছাড়া বাংলা, ইংরেজি ও উর্দুতে বৈষ্ণবধর্মের বহু পুস্তক রচনা করেন।

আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪): লন্ডনজাত এই বিখ্যাত কবির্মনীষীর অন্যান্য গ্রন্থ—দি প্যাস্টোরাল্‌স, রেপ অফ্ দি লক্, উইন্ডসর ফরেস্ট ইত্যাদি। তাঁর 'এসে অন্ ক্রিটিসিজম্' ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) লন্ডনবাসী এই গীতিকবির অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আলেকজান্ডারস্ ফিস্ট প্রকাশিত হয় ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে।

'তৈল' প্রবন্ধ: এর রচয়িতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এটি প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার চৈত্র ১২৮৫ সংখ্যায়।

'আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার': এই প্রবন্ধটি রাজনারায়ণ প্রকাশ করেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভাদ্র ১৭৮৭ শক সংখ্যাতে।

'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাস। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত একটি 'রূপক' উপন্যাস। প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে।

'ইউরোপযাত্রী': প্রবন্ধটির আসল নাম 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'। রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি ভারতী পত্রিকা ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-পৌষ, ফাল্গুন এবং ১২৮৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়। এখানে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের সংখ্যাভুক্ত রচনাটির কথা বলা হয়েছে।

'বান্ধব': কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা। এটি ১২৮১ বঙ্গাব্দে আত্মপ্রকাশ করে।

জেমস্ টমসন (১৮৩৪-১৮৮২): এই মহৎকবির বিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে Sunday up the River, He Heard Her Sing এবং The City of the Dreadful Night প্রভৃতি কাব্য বিখ্যাত। উল্লিখিত কবিতাটিতে আত্মদর্শনের একটি রূপক রূপলাভ করেছে।

'পঞ্চানন্দ': ব্যঙ্গরসাত্মক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বিখাত ব্যঙ্গপত্রিকা। প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে।

'সাধারণী': অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা (১২৮০-৯২)।

থিওডোর পার্কার (১৮১০-১৮৬০): খ্রিস্টিয়ান ইউনিটেরিয়ান যাজক সম্প্রদায়ের অন্যতম পার্কারের জন্ম হয় আমেরিকায়। তাঁর স্বাধীন চিন্তাসমন্বিত ধর্মোপদেশ ও রচনাবলী এক সময়ে সমাজে আলোড়ন তোলে। ১৪ খন্ডে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা॥ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য/ বিষয়ক বক্তৃতা। / শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত। নানান্ দেশে নানান্ ভাষা/ "বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?" / নিধিরাম গুপ্ত/ বঙ্গ-ভাষা সমালোচনী সভা কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / শ্রী সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক / কলিকাতা,— শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ১০২ নং ভবনস্থ/ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে / মুদ্রিত। / সম্বৎ ১৯৩৫/

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত সমধর্মী আরও তিনটি প্রবন্ধ সহ এর একটি 'গ্রন্থন' সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এর গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিত লিখে দেন স্বপন মজুমদার।

রাজনারায়ণ 'জাতীয় সভা'য় বাংলা ভাষা সম্পর্কে পর পর কয়েকটি বক্তৃতা করেন। তাই পরে সংকলিত হয়ে এই নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে মেদিনীপুরেও তিনি ১৯ বৈশাখ ১৭৯৮ শকে একটি বক্তৃতা দেন। এটি পুনশ্চ 'বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা'-তে পঠিত হয়।

এই গ্রন্থে উল্লিখিত কবিতার পাঠগুলিতে প্রভূত পাঠান্তর আছে।

॥ **টীকাটিপ্পনী** ॥

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব : রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪)—রচিত এই গ্রন্থটির কেবলমাত্র প্রথম ভাগ প্রকাশিত (১৮৭২)। এই বইটি থেকে রাজনারায়ণ প্রভূত সহায়তা পান।

Descriptive Catalogue of Bengalee Books : রেভারেন্ড জেমস্ লঙ্ প্রণীত এই তালিকাটির পুরোনাম 'Descriptive Catalogue of Books and Pamphlets Forwarded by the Government of India to the Paris Universal Exhibition 1867. Calctutta 1867.

'হাউএনথ্স্যাঙ্' : সাধারণভাবে হিউয়েন সাং বা য়ুয়াং-চুয়াং নামে পরিচিত।

'কৃত্তিবাস ওঝা'। তিনি ফুলিয়াতে বাস করেন, জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাব্য রচনার তারিখ ১৪৬০ শক নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না।

রামেশ্বর চক্রবর্তী (আনুমানিক ১৬৬৭-১৭৪৮)। শিবকীর্তন 'শিবায়নে'র বিখ্যাত কবি। জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রাম। 'শিবায়ন' রচনার সমাপ্তিকাল ১৭১১।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার (১৭১২-১৭৬০) : পেঁড়ো ভুরসুটের এই খ্যাতনামা বহুভাষী কবি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ছাড়া রসমঞ্জরী, নাগাষ্টক, সত্যপীরের কথা প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ (আনুমানিক ১৫৪৭ ? — ?) বর্ধমান দামুন্যার এই কবি 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য লিখে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি পান। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এমন সমাজমনস্ক জীবনরসের কাব্য দুর্লভ।

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) : উইলিয়াম কেরির বাংলা শিক্ষক এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক রামরাম বসু দুখানি বই লেখেন—প্রতাপাদিত্য চরিত এবং লিপিমালা। বই দুটি যথাক্রমে ১৮০১ ও ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে ভুল ক্রমে ১৮০৬ বলে উল্লিখিত।

কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র : বইটির পুরো 'মহারাজকৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', লেখকের নাম রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লিখিত এই বইটি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

'রাজাবলী' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'—গ্রন্থ দুটির লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। প্রথম বইটির সঠিক বানান 'রাজাবলি'। বই দুটির সঠিক প্রকাশকাল ১৮০৮ এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

'পুরুষ পরীক্ষা' বইটির রচয়িতা হরপ্রসাদ রায়। প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে (১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে নয়)।

'আলালের ঘরের দুলাল'। টেক চাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে লিখিত প্যারীচাঁদ মিত্রের এই উপন্যাসকল্প রচনাটি তাঁর ও রাধানাথ শিকদারের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকায়' ধারাবাহিক ভাবে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে।

রঘুনন্দন গোস্বামী (১৭৮৬—?) বর্ধমান জেলার মাড়্গ্রামে এই 'দাস গোস্বামী' কবি ১৮ বছর বয়সে কবিতা রচনা শুরু করেন। ৪৫ বছর বয়সে বিখ্যাত বই 'রামরসায়ন কাব্য' লেখেন।

অন্যান্য বই—রাধামাধবোদয়, দেশিকনির্ণয় প্রভৃতি।

'সুরসুন্দরী বধকাব্য': লেখক জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৮৪২-১৯০৬)। এটি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২ আশ্বিন ১২৭৫ সংখ্যায়। ৭২ ছত্রের কবিতা।

'গীতরত্ন': গীতরত্ন-এর লেখক নিধিরাম গুপ্ত নন, রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)। গীতরত্ন প্রকাশিত হয় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। এতে তাঁর লেখা ৯৬টি গান আছে। বাংলায় তিনি টপ্পা গান রচনা করেন।

'বঙ্গদর্শন': বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৭৯ (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ)। ১২৮২, চৈত্র পর্যন্ত তিনি সম্পাদনা করেন। ১২৮৩ সালে বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। নবপর্যায়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে প্রকাশিত হয়ে চৈত্র ১২৮৯ অবধি চলে। মধ্যে ১২৮৮ সালের আশ্বিন-চৈত্র মাসে কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি। চৈত্র ১২৭৯ সংখ্যায় রাজনারায়ণের 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-১৮৮৪): বাংলা নাটকের প্রথম পর্বের এই নাট্যকার বিদেশী বিষয় নিয়ে বাংলা নাটক রচনার পরীক্ষা করেন। শেক্সপীয়রের মার্চেন্ট অফ ভিনিস এবং রোমিও জুলিয়েট নিয়ে তিনি লেখেন 'ভানুমতী চিত্ত বিলাস' এবং 'চারুমুখ চিত্ত হরা'। বর্মীয় কাহিনী নিয়ে লেখেন 'রজতগিরিনন্দিনী'। পৌরাণিক নাটক 'কৌরব বিয়োগ'।

ভদ্রার্জুন: বাংলা নাটকের প্রথম যুগে দুটি নাটক লেখেন জি. সি. গুপ্ত 'কীর্তি বিলাস' এবং তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন'। উভয় নাটকই ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'হুতুমপেঁচার নক্সা': বইটির মূল নাম 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'। এটি কালীপ্রসন্ন সিংহ লেখেন বলে প্রচলিত।

ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১): রাজনারায়ণ নামটি ভুল লিখেছেন, সঠিক নাম 'ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়'। ব্যঙ্গবিদ্রূপ রচনায় সিদ্ধহস্ত ইন্দ্রনাথ 'কল্পতরু' নামে যে উপন্যাস-কল্প রচনাটি লেখেন তা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য রচনা 'ভারত উদ্ধার কাব্য' (১৮৭৮), ক্ষুদিরাম (১৮৮৮) প্রভৃতি।

সমাচার দর্পণ: এটি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের নয়।

সম্বাদকৌমুদী: ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে নয়, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর থেকে প্রতি মঙ্গলবার এটি প্রকাশিত হতে থাকে। রামমোহন রায় এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এটি সম্পাদনা করেন তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরের অন্যেরা যুক্ত হন।

সমাচারর চন্দ্রিকা: ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি ৫ মার্চ ১৮২২ থেকে সম্পাদনা পূর্বক প্রকাশ করেন। এটি দীর্ঘদিন চলে, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দেও এর সংখ্যা দেখা যায়।

বঙ্গদূত: নীলরত্ন হালদার এটি ৯মে ১৮২৯ থেকে প্রকাশ করেন।

সংবাদ প্রভাকর: ঈশ্বরগুপ্ত-সম্পাদিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে।

ব্রাহ্মণ সেবধি: **ব্রাহ্মণ সেবধি ও মিসিনরি সম্বাদ** রামমোহন-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে সেপ্টেম্বর ১৮২১ থেকে প্রকাশিত হয়।

ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২): স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ঘড়ি-ব্যবসায়ী এই মানুষটি এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। স্কুল বুক সোসাইটির কলুটোলা ব্রাঞ্চের স্কুলটি তিনিই পরিচালনা করতেন। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন তিনি মারা যান।

অকল্যান্ড, লর্ড (১৭৮৪-১৮৪৯): ভারতের শাসনকর্তা রূপে এদেশে আসেন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে।

তাঁর শাসনকালে প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২) হয়। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এদেশ ত্যাগ করেন।

সে কাল আর এ কাল।। সে কাল আর এ কাল প্রথম গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। আখ্যাপত্র: সে কাল আর এ কাল/ শ্রী রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। / কলিকাতা / জাতীয় যন্ত্রে মুদ্রিত। / ১৭৯৪ শক পৃ [২] + বিজ্ঞাপন + ৮২।

এটি পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রস্তাবানুসারে রাজনারায়ণ জাতীয় সভায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সে কাল আর এ কাল বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। ঈশানচন্দ্র বসু এর নোট রাখেন। এই ঈশানচন্দ্র বসু ছিলেন রাজনারায়ণের প্রিয় ছাত্র ও হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁর রক্ষিত নোট থেকেই এই পুস্তিকাটির রচনাকর্ম সম্পাদিত হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক নিজে পড়ার জন্য দুশো টাকা খরচ করিয়ে এটি অনুবাদ করিয়ে নেন। 'সাধারণী' (কার্তিক ১২৮১), 'দর্শক' (অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১২৮১) প্রভৃতি পত্রিকায় এর অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হলে চিন্তাশীল বাঙালিদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন (পৌষ ১২৮১)-এ এর সমালোচনা করেন।

।। টীকাটিপ্পনী ।।

বুনো রামনাথ।। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত অষ্টাদশ শতকের এক প্রবাদ পুরুষ। শিক্ষাব্রতী এই দরিদ্র মানুষটি ছাত্র প্রতিপালনে অসমর্থ হলেও ছাত্ররা তাঁর পাঠদানে মুগ্ধ হয়ে নিজেরাই কষ্ট করে পড়তে আসতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্যান্য টোলে সাহায্য দিলেও রামনাথ তাঁর প্রদত্ত বৃত্তি নেন নি। 'বুনো রামনাথ' নামেই এই আদর্শ শিক্ষক বিখ্যাত।

ডিরোজিও: হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)—'ফকির অফ্ জাংগিরা'র কবি এবং হিন্দুকলেজের বিখ্যাত প্রগতিশীল শিক্ষক। তাঁর শিক্ষাপ্রণালী, তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন তৎকালে বাংলার নব্যশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অন্যায় অপবাদে তাঁকে কর্মচ্যুত হতে হয়। মাত্র ২২ বছরে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোমপ্রকাশ: দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৫ নভেম্বর ১৮৫৮।

স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক: এই পুস্তিকাটির লেখক গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। রাধাকান্ত দেব তাঁকে এটি প্রণয়ন ও প্রচারে সহায়তা করেন (১৮২২)।

হটী বিদ্যালঙ্কার: সোঞাই (বর্ধমান)-এর এই মহিলা পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও নব্যন্যায় শিখে গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করে পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি পান। প্রকাশ্যে পণ্ডিতদের সভায় যোগ দিয়ে দক্ষিণাও নিতেন বলে প্রচার।

বিডন সাহেব: স্যার সিসিল বিডন সিভিলিয়ন হিসেবে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন এবং পরে বাংলার শাসনকর্তা হন (১৮৬২-৮৭)। এঁর আমলে কলকাতায় কলের জলের প্রবর্তন হয়। নীলকর সাহেবদের বিরোধিতা করেন।

চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩-১৯০২): সুখ্যাত রাজশেখর-শশিশেখর-গিরীন্দ্রশেখরের বিখ্যাত পিতা। স্বয়ং বেদান্ত-দর্শনের পণ্ডিত এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিশ্বস্ত প্রতিবেদক চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত।। হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী / কলেজের ইতিবৃত্ত/ শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা / অভিব্যক্ত। / কলিকাতা/ বাল্মীকি যন্ত্র/ শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / শক ১৭৯৭।
পৃ. [২] + বিজ্ঞাপন [২] + ১৮-৫৭

অনেক পরে ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে এর একটি সংস্করণ দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

॥ টীকা-টিপ্পনী ॥

রেবরেন্ড মে: পাদ্রী রবার্ট মে এদেশে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন কালে চুঁচুড়া অঞ্চলে স্বাধীন ভাবে বহু পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮২৩ সাল থেকে সরকার এগুলির ভার গ্রহণ করে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫): প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ও বহুভাষাবিদ্ এই কৃষ্ণমোহন প্রথম বাঙালি খ্রিস্টীয় আচার্য। বহুজনকে এই ধর্মে দীক্ষা দেন। কয়েকখানি সংস্কৃত ইংরেজি এবং কোষ গ্রন্থের রচয়িতা।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-১৮৭৩): হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ইংরেজি ভাষায় গদ্য-পদ্যের রচয়িতা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার লেখক কাশীপ্রসাদ নিজে 'হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৪৬)। 'শায়ির অ্যান্ড আদার পোয়েমস্' প্রকাশিত হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। অন্য গ্রন্থ 'মেময়ার অফ্ নেটিভ ইন্ডিয়ান ডিন্যাস্‌টিজ্' (১৮৩৪)।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-১৮৫৫): হিন্দু কলেজে ডিরোজিও ছাত্র তারাচাঁদ সংস্কৃত সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদে উইলসনকে সাহায্য করেন। রামমোহন সুহৃদ্, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক। অনেক ভাষা ও আইনবিদ্ ছিলেন। সেকালের প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮): ডিরোজিও শিষ্য রামগোপাল প্রখ্যাত ব্যবসায়ী, সুখ্যাত ইংরেজিনবিশ, সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, উদার দানশীল এবং অতিখ্যাত বাগ্মী হিসেবে প্রবাদপুরুষ। তাঁর বক্তৃতা শক্তির জন্য তাঁকে 'ভারতের ডিমস্থেনিস' বলা হতো।

॥ এই নির্বাচিত সংকলন অন্যান্য রচনাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকাটিপ্পনি ॥

● **মেঘনাদবধ কাব্য ॥** রাজনারায়ণ বসু প্রথম যে সাহিত্য সমালোচনাটি লেখেন তার নাম ছিল 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা'। এটি রাজনারায়ণ বসুর 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খন্ড (১২৮৯) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজনারায়ণ লিখেছেন—'মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে আমার পরম বন্ধু ও সমাধ্যায়ী কবিকুল গৌরব শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রার্থনানুসারে তাহার দোষগুণ বিষয়ে ইংরাজীতে এক পত্র লিখি তাহাও উমেশবাবু দ্বারা অনুবাদিত হইয়া এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।'

এই উমেশবাবু ছিলেন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণের বিশিষ্ট ব্রাহ্মবন্ধু, সমাজসেবী এবং 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সুখ্যাত সম্পাদক। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হলে মধুসূদন একটি চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন—Last evening I got a copy of the new Meghnada forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me; for there is no man whose opionion I value more that that of a

certain Madinapore Pedagogue.'

● **মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে ব্রহ্মোপাসনা।।** এটি রাজনারায়ণ প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত এই বক্তৃতার তারিখ ১১ ফাল্গুন ১৭৮৯ শক। এটি তাঁর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (১৭৯২ শক) - বক্তৃতাসংকলন, দ্বিতীয় ভাগ থেকে এখানে সংকলিত হয়েছে।

● **মেদিনীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।।** এটিও রাজনারায়ণ-প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে তিনি যে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক বক্তৃতা দেন—সে দুটি যথাক্রমে ২৬ মাঘ ১৭৮১ শক এবং ২৬ মাঘ ১৭৮৫ শকে প্রদত্ত হয়। আমরা তাদের একটি তাঁর পূর্বোক্ত বক্তৃতাসংগ্রহ দ্বিতীয়ভাগ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—থেকে নমুনা স্বরূপ উদ্ধার করে দিলাম।

● **ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।।** এটি একটি বক্তৃতা বিশেষ। পৌষ ১৭৮২ শকে প্রদত্ত।

● **ব্রহ্ম স্তোত্র।।** এই বক্তৃতাটি রাজনারায়ণ বসু-রচিত বক্তৃতা সংকলনের প্রথম ভাগ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' (১৭৮৩ শক) থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি ঐ গ্রন্থের শেষ রচনা।

● **ব্রহ্ম সংগীত।।** রাজনারায়ণ কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। এছাড়া জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষকে সম্বোধন করে ইংরেজিতে যে চারটি সনেট রচনা করেন, পাঠক সেগুলিকে 'আত্মচরিত'-এ লক্ষ্য করেছেন। 'একেমাদ্বিতীয়ম্' নামে তাঁর বক্তৃতা সংগ্রহের যে দ্বিতীয় ভাগ বইটি আছে তার ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠায় যে চারটি ব্রহ্মসঙ্গীত মুদ্রিত আছে, সেগুলি এখানে পুনশ্চ মুদ্রিত হয়েছে। এ থেকে সংগীত রচয়িতা হিসেবে রাজনারায়ণের সামর্থ্যের কথা পাঠক জানতে পারবেন।

● **চিঠিপত্র।।** রাজনারায়ণ-রচিত কিছু চিঠি এখানে ছাপা হল। এছাড়া আরও চিঠি আছে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'পত্রাবলী', বিশ্বভারতী পত্রিকা ও অন্যত্র।

● **সেকালের কথা।।** রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকার কার্তিক ১৩৩৪ সংখ্যায় রাজনারায়ণের এই অগ্রন্থিত রচনাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে এই প্রথম সংকলিত হল।

● **ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র।।** এই প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকার পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যা থেকে সংকলিত হয়েছে। এটিও প্রথম সংকলিত হল।

● **দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ, উপাসনা ও দীক্ষা পদ্ধতি।।** এই অগ্রন্থিত প্রবন্ধটিকে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছি 'প্রবাসী' পত্রিকার মাস ১৩৩৪ সংখ্যা থেকে উদ্ধার করে।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা।। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা/ শ্রী রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। / কলিকাতা। / জাতীয় যন্ত্রে মুদ্রিত । /১৭৯৪ শক। পৃ. অনুক্রমণিকা ১+ ৬০ পরিশিষ্ট। — ২৪।

রাজনারায়ণের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে নবগোপাল মিত্র যে 'হিন্দুমেলা' বা 'চৈত্রমেলা' স্থাপন করেন তার অন্তর্ভুক্ত একটি সভার নাম ছিল 'জাতীয় সভা'। প্রতিমাসেই এর অধিবেশন হতো। এই 'জাতীয় সভা'র ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ তারিখের অধিবেশনে রাজনারায়ণ তাঁর যুগান্তকারী দীর্ঘ প্রবন্ধ 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পাঠ করেন। কেন এই প্রবন্ধ লেখেন, সে বিষয়ে পাঠক বিস্তারিত সংবাদ 'আত্মচরিত'-এ পাঠ করেছেন। এই প্রবন্ধ কলকাতাকে আলোড়িত করেছিলেন। পক্ষে বিপক্ষে বহুজন বক্তব্য রাখেন। এঁদের অনেকে কলকাতার বাইরের লোকও ছিলেন। রেভারেন্ড লালবিহারী দে The Bengal Magazine পত্রিকায় মন্তব্য করেন 'শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর হইতে আনীত চুন দ্বারা হিন্দুধর্মের কলি ফেরান হইতেছে।' প্রসঙ্গত— রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে থাকতেন। কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিরা বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশ করলেও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। বিদেশে ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া এবং টাইম্‌স্

পত্রিকায় প্রশংসামূলক মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বক্তৃতা জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করে।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এর একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন চৈত্র ১২৭৯ সংখ্যায়।

'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রবন্ধ পাঠ নিয়ে মত দ্বৈধতাও আছে। ১৫.৯.১৮৭২-এর 'ন্যাশনাল পেপার'-এর সংবাদানুসারে এটি জাতীয় সভায় পঠিত হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু রাজনারায়ণ 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন এটি ১৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাড়িতে প্রদত্ত হয়েছিল। শেষোক্ত ঘটনার উল্লেখে রাজনারায়ণের স্মৃতিভ্রম হয়েছিল মনে হয়. 'বঙ্গসুহৃদ' পত্রিকার আশ্বিন ১২৭৯ সংখ্যায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—'গত ৩১ ভাদ্র রবিবার ট্রেনিং একাডেমি স্কুল ভবনে জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশন হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার মানসে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্ম চূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।'' 'আত্মচরিত'-এ অবশ্য তিনি লিখেছেন—'একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, খ্রীষ্টীয়ধর্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে, হিন্দুধর্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি হয়।'

সমাপ্ত